কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

২০শ খণ্ড। | বৈশাখ, ১৩২৬ সাল। | ১ম সংখ্যা।

গো-বিজ্ঞান

(এগ্রিকলচারল এণ্ড ডেয়ারি ষ্টুডেণ্ট লিখিত)

গোবৎসাদির শয়ন ও অঙ্গমার্জ্জনা

গোজাতির স্বচ্ছন্দতার উপর পালকের দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। গোজাতির [illegible] হইলে, গোহালে মশার উপদ্রব হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে উহাদের স্বচ্ছন্দতা নষ্ট হয়, ও প্রতিদিন উত্যক্ত হইলে উহাদের দুধের পরিমাণ হ্রাসের সহিত [illegible] হইবার আশঙ্কা থাকে। রাত্রিকালে গাভীর শয়নের জন্য বিচালী উত্তম শয্যা, প্রত্যেক গাভীর চারটী চারটী বিচালী সন্ধ্যার সময় বিছাইয়া দিতে পারিলে উত্তম হয়, অভাবে চৈত্রমাসে গাছের শুষ্ক পাতা সংগ্রহ করিয়া বিছাইয়া দিতে হইবে। গাভীর শয্যা প্রত্যুষে পরিষ্কৃত হইবার সময় যাহার উপর চোনা পড়িয়া সিক্ত হইবে সে গুলি পরিত্যক্ত হইয়া অবশিষ্ট পাতা বা বিচালী রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুনরায় [illegible] প্রদত্ত হইবে ও সিক্ত পাতা বা বিচালী সারের গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইবে। গোহাল[illegible]পার্শ্বের অপরিচ্ছন্নতা ও অবাধে বায়ু প্রবেশের অভাবে মশার উপদ্রব হইয়া থাকে। গাভীর দেহ রোমাবৃত বলিয়া মশা লোমহীন পালান গুণ্ডের উপর বসিবার সুবিধা পায়, ও কামড়াইয়া এত উত্যক্ত করে যে উহারা কোন মতে বিশ্রাম করিতে পারে না। গোহালের আশে পাশে কোথাও বদ্ধ জল থাকিলে মশা ঐ [illegible] ডিম্ব প্রসব করিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে। গোহালে আলোক ও বায়ু অবাধে প্রবেশ করিলে উহার ভিতর তিষ্ঠিতে পারে না নচেৎ কোণে কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গোহালে বাস করে। প্রত্যেক গাভীর জন্য মশারি দেওয়া [illegible]

না ও রাত্রি কালে বাহিরের মশার প্রবেশ বন্ধ করা যায় না এজন্য প্রত্যহ সন্ধ্যার ঘোর-ঘোর সময়ে, ভুক্তাবশিষ্ট ঘাস পাতা, বিচালী প্রভৃতি জ্বালাইয়া ধুম দিলে বাহিরের মশা ভিতরে আসিতে পারে না এবং গোহালে বায়ু অবাধে প্রবেশ করিলে এক স্থানে তিষ্ঠিতে পারে না। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে পালানে খাটী সরিষার তৈল মর্দ্দন করা হইলে গণ্ড উত্তেজিত হয়, শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলেও অপকার হয় না এবং মশাও বসিতে পায় না। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় যেমন ঘোড়ার গায়ে বুরুষ মারা হয়, অবিকল সেই প্রথায় গোজতির অঙ্গ মার্জ্জনা হইবে; গো অঙ্গে প্রত্যহ বুরুষ পড়িলে উহাদের লোমকূপে যে ধুলা বালি পতিত হইয়া ছিদ্র বন্ধ করে তাহা দূরীভূত হয় ও তাহার সহিত দেহের উকুন আঠালু প্রভৃতি যাহা থাকে, সহজে বিদূরিত হইয়া থাকে। লোমকূপ বন্ধ হইলে, চর্ম্মের তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হইতে পারে না এতদ্ব্যতীত দেহের ঘর্ম্ম বাহির হইতে পারে না। প্রাণিগণের দেহ হইতে যে পরিমাণ ঘর্ম্ম প্রত্যহ নির্গত হওয়া প্রয়োজন তাহা মানুষের দেহজাত ঘর্ম্ম হইতে অত্যন্ত অধিক। মল, মূত্র প্রস্রাবের মত, ঘর্ম্ম একটী দূষিত পদার্থ; দেহের অপরিচ্ছন্নতার জন্য নির্গত হইতে না পারিয়া দেহ মধ্যে অবস্থিতি করিলে রক্তের সহিত পুনরায় মিশ্রিত হয়, ও এই ক্রিয়া সমভাবে কিছুদিন চলিলে দেহের মধ্যে বিষ ক্রিয়ার সঞ্চার হইয়া সর্ব্বাগ্রে যকৃৎ দূষিত হইয়া থাকে, কালে পেটের পীড়ার সহিত নানাবিধ চর্ম্ম রোগে দেহ আবৃত হইয়া চর্ম্মের মসৃণতা নষ্ট করে। স্নান অপেক্ষা প্রসাধন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন; প্রত্যহ মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির জড়তা দূর হয়, কিন্তু প্রসাধনে দেহের মলিনত্ব দূর হইয়া চর্ম্মের মসৃণতা খাদ্য পরিপাকে শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। প্রত্যহ বুরুষ বর্ষণে দেহের রক্তবাহিকা শিরাগুলীর মধ্যে অধিক পরিমাণে রক্ত চলাচল হইয়া দেহ সতেজ রাখে; প্রত্যহ বুরুষ দিয়া ঝাড়িবার সময়ে বুরুষ গলার দিকে আসিবামাত্র গোরু অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে। রাত্রিকালে গোবর চোণার উপর উপবেশন করিলে প্রাতঃকালে ঐ দাগ ধৌত করা প্রয়োজন, নচেৎ উপেক্ষিত হইলে গোরুর গায়ে হলুদবর্ণের একপ্রকার দাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গোজাতিকে শীত কিম্বা গ্রীষ্ম কালেও প্রত্যহ স্নান করান উচিত নহে। গ্রীষ্মের দিনে হপ্তায় এক দিন, বা অধিক গ্রীষ্ম বোধ হইলে কাপড় ভিজাইয়া প্রথমে মাথা পরে সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া দিলেই হইবে, বা সপ্তাহে এক আধ দিন স্নান করাইলে যথেষ্ট হইবে। গাভীকে প্রত্যহ স্নান করাইলে, উহাদের চর্ম্মের ভিতর হইতে যে তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া চর্ম্মকে মসৃণ ও উজ্জ্বল করে তাহা ধৌত হইয়া নষ্ট হয় ফলে চর্ম্ম খসখসে ও বিসদৃশ হইয়া থাকে। দুধের জন্য গোপালন; কিন্তু কথায় কথায় দুধের পরিমাণ হ্রাস হয়, যে সকল কারণে দুধের পরিমাণে হ্রাস হয় তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিবারণ করিতে যে উপায় গুলি সহজ ও অল্পব্যয়সাপেক্ষ তাহাই প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত। গোজাতির উন্নতি সাধনে

যে সকল উপায় পাশ্চাত্য দেশের প্রয়োগ হইত উহাদের উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে, দেশ ভেদে বিবেচনা করিয়া অল্লাধিক পরিবর্ত্তন করিলে নিশ্চয়ই সুফল প্রদান করিবে। এই গোহাল নির্ম্মাণে অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু নির্ব্বাচন বা পরিচর্য্যায় অর্থের প্রয়োজন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না,—এইখানে বিবেচনা, ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সম্যক্ পরিচর্য্যা, ও নির্ব্বাচনের উপর গোজাতির নীতি সাধন নির্ভর করিলেও পালকের অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণশক্তিকে কোন মতে ফেলিয়া দেওয়া যায় না। প্রকৃত কার্য্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক গাভীর স্বভাব সম্যক্‌রূপে অবগত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টার অপর নাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পর্য্যবেক্ষণ। চোখ আছে বলিয়া সমস্তই দেখিতে পাইব, একথা যেন কেহ মনের মধ্যে স্থানও না দেন। গোরুর নিকট যত অধিক থাকা যায় ততই উহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিভিন্নতা তুলনা করিবার ক্ষমতা স্বভাবের ব্যতিক্রম ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারা যায়। যদি উহাদের স্বভাবের ব্যতিক্রমগুলি প্রতিদিন লিখিয়া রাখা যায় ও একের সহিত অপরের তুলনাও কার্য্যত দেখা যায় তাহা হইলে যে যত শক্তি নিয়োগ করিবে, সে তত উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হইবে। একটী বড় খাতায় প্রত্যেক গাভীর জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়া উহাদের স্বভাবের ব্যতিক্রম গুলি নিম্নোক্ত নিয়মে লিখিত হইবে—

দৈনিক খাদ্য—দানার মিশ্রণ, কাঁচা ঘাস ও শুষ্ক মিশ্রিত হইলে উহার মিশ্রণ ও পরিমাণ প্রত্যহ লিখিত হইবে।

খাদ্যে আগ্রহ—উপরোক্ত কোন্ খাদ্যে আগ্রহ, নূতন খাদ্যের আগ্রহ বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, ঐ খাদ্যের পরিপাক বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

পরিপাক শক্তি—মলের আকার কঠিন বা পাতলা, বা স্বাভাবিক, ছিবড়ার দুর্গন্ধ, মলের ভিতর দানার অংশ থাকে কি না, দেখিয়া লিখিতে হইবে।

ঋতু—ঋতুর সময়, স্থায়িত্ব, ডাক, ও চঞ্চলতা, এক ঋতু হইতে অপর ঋতু কতদিনে হয় ঋতুকালীন দুধ বা উহার গুণ হ্রাস লক্ষ্য করিয়া লিখিতে হইবে।

দুগ্ধ—দৈনিক পরিমাণ, মাখনের দৈনিক পরিমাণ বর্ণ, গাঢ় বা জলীয় প্রত্যহ লিখিত হইলে একটি গাভী কি পরিমাণে দুধ প্রদান করে জানা যায়।

স্বভাব ও স্বাস্থ্য—অলস চঞ্চল, দুষ্ট প্রকৃতি, লাথি ছোড়া, খাদ্য কাড়াকাড়ি করা ও সহজে পীড়িত হয় কি না লেখার প্রয়োজন।

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি খাতায় পালের পরিচয় ইতিহাস, দুধের ও মাখনের পরিমাণ ; ক্রয়, বিক্রয় প্রভৃতি লিখিতে হইবে ; এই পুস্তকগুলির সাহায্যে গাভীর বংশ পরিচয় প্রদান ও নির্ব্বাচন সরল হইয়া আইসে।

অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে যে খাতার প্রয়োজন তাহার নমুনা

নাম (কামধেনু) নম্বর (৩৬) বয়স (৫ বৎসর)।

তারিখ।	দৈনিক খাদ্য।	খাদ্যে আগ্রহ	পরিমাণ শক্তি।	দুগ্ধ ঋতু।	স্বভাব দুগ্ধ	স্বভাব ও স্বাস্থ্য।
১৪ই মার্চ্চ	১নং মিশ্রণ ৩ ভাগ কাঁচা ঘাস ৩ ভাগ শুষ্ক ঘাস ১ ভাগ	কাঁচা ঘাসে বিশেষ আগ্রহ কাঁচা ঘাস পাইলে দানা খাইতে চাহে না।	মল স্বাভাবিক কোন গন্ধ নাই। পরিমাণ স্বাভাবিক।	প্রসবের ২৯ দিন পরে ঋতুমতী হইয়াছে, গাভী অতিশয় চঞ্চল হইয়া ডাক দিয়াছিল, এই সময়ে দুগ্ধের পরিমাণ অর্দ্ধেক হইয়াছে মাখন—৪২·২।	১৬ পাউণ্ড মাখন ২·২	নূতন লোক দেখিলেই চঞ্চলতা বৃদ্ধি হয় ; নচেৎ দোহনে গোলযোগ নাই। স্বাস্থ্য ভাল
১৫ই মার্চ্চ		ঘাসের সহিত লাউ দেওয়া হয়, লাউ খুব আগ্রহের সহিত খাইয়াছে।			১৫ পাঃ ৬ পাঃ মাখন ২·৭	ঐ

রেজিষ্টার নং ১।

নম্বর।	গাভীর নাম।	নম্বর।	প্রসবের তারিখ।	দোহনের তারিখ।	দুগ্ধ বন্ধের তারিখ।	এক বিয়ানের দুগ্ধের দৈনিক হিসাব।	ছাড়ন্তের দিন হিসাব।	এক বিয়ানের দুগ্ধের পরিমাণ।	দিন প্রতি দুগ্ধের হিঃ।	দিন প্রতি মাখন হিঃ।	মন্তব্য।
১											
২											
৩											

রেজিষ্টার নং ২।

সমগ্র পালের মাসিক রেজিষ্টার বহি।

১	২	৩	৪ পাল বৃদ্ধি।		৫ পাল হ্রাস।			৬	৭
নম্বর	গোরুর পরিচয়।	সমগ্র পালের শেষ মাসের সংখ্যা।	জন্মের দ্বারা।	খরিদের দ্বারা।	মৃত্যুর দ্বারা।	বিক্রয়ের দ্বারা।	অপর কোন কারণে।	মোট সংখ্যা।	মন্তব্য।

রেজিষ্টার নং ৩।

বৎসের রেজিষ্টার।

নম্বর	নাম	যৌন।		নম্বর	বর্ণ	জন্মের তারিখ।	পিতা ও মাতা।				দান, বিক্রয় বা মৃত্যু।	জাত	মন্তব্য
		পুং সন্তান	স্ত্রী সন্তান				পিতা	নম্বর	মাতা	নম্বর			
১	মুণ্ডা	পুং	—	১	সাদা	৫ই ডিসেম্বর	বাঘা	২৩	সুমতী	২৬	—	বিশুদ্ধ হান্সি	—
২	ভোলা	—	স্ত্রী	২	মেটে	১৭ই ডিসেম্বর	ঐ	৯	যন্ত্রী	৩২	মৃত্যুর তারিখ ২১শে ডিসেম্বর, ১৯১৭।	হান্সি ও মণ্টগোমারির মিশ্রণ ১ম শ্রেণী।	সাপে কামড়াইয়া মৃত্যু।

১নং রেজিষ্টার। ৫ম ঘরে—প্রসবের পর প্রথম দোহণের তারিখ লিখিত হইবে, এইখানে মনে রাখা উচিত যে, যে দিন হইতে দুগ্ধ ব্যবহারের উপযোগী বলিয়া স্থির হইবে সেই দিনের তারিখ লিখিত হইবে; যতদিন দুগ্ধ উত্তপ্ত হইলে ফাটিয়া যাইবে তত দিনের হিসাব রাখিতে হইবে না।

৮ষ্ঠ ঘরে—যে দিন হইতে দুধের পরিমাণে এক সেরে দাঁড়াইবে সেই দিন হইতে গাভী ছাড়ন্ত হইবে সেই দিনের তারিখ লিখিত হইবে, ও যে দিন হইতে বাস্তবিক এক ফোঁটাও দুগ্ধ দিবে না, সেই দিনের তারিখ, মন্তব্যের ভিতর লিখিয়া রাখিতে হইবে।

৯ম ঘরে—এক বিয়ানের সমস্ত দিনের দুগ্ধ খোয়া করিয়া যত হইবে পাউণ্ড হিসাবে লিখিত হইবে।

১০ম ঘরে—এক বিয়ানের সমস্ত দুধের পরিমাণ স্থির হইলে, ইহার ভিতর হইতে দিন প্রতি দুধের হিসাব বাহির করিয়া লিখিত হইবে। উদাহরণ যদি এক বিয়ানে ৭৩০ পাউণ্ড দুধ হয় তাহা হইলে ৩৬৫ দিনে বৎসর হিসাবে দিন প্রতি ২ পাউণ্ড করিয়া দুধ হয় ধরিতে হইবে। বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন মন্তব্যের ভিতর অপর কিছুই লিখিত হইবে না।

২নং রেজিষ্টার। ২য় ঘরে—গোরুর নাম, নম্বর, বর্ণ, বয়স লিখিতে হইবে।

৩য় ঘরে—শেষ মাসে সমগ্র পালের যে সংখ্যা হইবে তাহা প্রত্যেক গাভীর নামের পর লিখিত হইবে। মোট সংখ্যাও পর পর লিখিত হইবে।

এই তিনটী খাতা নির্ব্বাচনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে; ইহার সহিত দুধের খাতা, মাখনের খাতা, ঘৃতের খাতা, ছানার খাতা ইত্যাদি যে গুলির প্রয়োজন হইবে প্রস্তুত করিতে হইবে।

নানা জাতীয় ঘাস ও তাহার ব্যবহার

কৃষি তত্ত্ববিদ্ শ্রীশশিভূষণ সরকার লিখিত।

এই জাতীয় প্রায় ২৫ প্রকার ঘাষ ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কয়েকটি যাহা আমাদের সচরাচর উপকারে আসে উল্লেখ করিতেছি। ইহারা (Gramineae) গ্রামিনেয়ী উদ্ভিদ শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের পাতা গুলি ধান গাছের মত সরল সোজা হইয়া উঠে। ইহাদিগকে এণ্ড্রোপোগান জাতীয় বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে।

লেবু ঘাস Lemon grass (Andropogan Citratus)—এই ঘাষের পাতায় লেবুর গন্ধ আছে ইহা হইতে সুগন্ধ তৈল নিষ্কাষণ করা যায়—ইহাকে লেবু তৈল বা ভার্বিনা তৈল বলে। সিঙ্গাপুর ও আর্কিপিলেগো দ্বীপপুঞ্জ সমুহে ইহার রীতিমত চাষ হইয়া থাকে। লেবু তৈল প্রকৃত ভার্বিনা তৈলের সহিত মিশাল করিয়া সাবান প্রস্তুতের জন্য

ব্যবহার করা হয়। সিংহলে বৎসরে প্রায় ২০০০ পাউণ্ড লেবুতৈল উৎপন্ন হয়—ইহার মূল্য প্রতি আউন্স ১সিলিং, ৪পেন্স = প্রায় ১৲টাকা।

লেবু ঘাষের পাতা গরম জলে ফেলিয়া চা'য়ের মত পানীয় প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহাতে কফ সংযুক্ত সামান্য জ্বর আরোগ্য হইতে পারে। এই প্রকার জলে ভাপর (Vapour bath) লইলে শরীরে জড়তা, জ্বরভাব, সামান্য মাত্রায় কফাক্রমণ শোষ করিয়া যায়। লেবু ঘাষের মূল ও কচি পাতা সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিলে স্ত্রীলোকের বার্ষিক রোগের উপশম হয়। লেবুর তৈলে অজীর্ণ জনিত অম্লশূল আরোগ্য হয়।

ভারতে বিবিধ প্রকারের লেবুঘাষ দেখিতে পাওয়া যায় সকলগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ গুণশালী নহে। চাষ করিতে হইলে প্রকৃত লেবুঘাষ বাছিয়া লইয়া চাষ করা কর্ত্তব্য। অন্য গুলি অপেক্ষা ইহাতে তৈলাধিক দৃষ্ট হয়।

লেবুপাতা ভাত ওব্যঞ্জনাদি সুঘ্রাণ করিতে ব্যবহার করা হয়।

খস্ খস্—ইহাও লেবু জাতীয় ঘাস। খস ঘাষ হইতে খস্ খস্ আতর তৈয়ারি হয় ঘাষের নাম হইতে আতরের নাম A muricatus.

আরব দেশে এই ঘাস প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বাঙ্গালা দেশে ও হাইদ্রাবাদে ঐ জাতীয় ঘাষ আছে কিন্তু আরব দেশের খস্ ঘাসই সমধিক গন্ধশালী। মহীশুরে, বাঙ্গালা ওব্রহ্মদেশে নদীর ধারে ও সিক্ত ভূমিতে ঐ জাতীয় ঘাষ জন্মিতে দেখা যায়, কটকের পাড়া জায়গায়ও ঐ ঘাষ আছে।

ইহার পাতায় ও শিকড় হইতে তৈল ও গন্ধনির্য্যাস নির্গত হয় কিন্তু তৈল বা নির্য্যাস বাহির করা নিতান্ত সহজ নহে। ইহা হইতেই খস্ খস্ আতর প্রস্তুত হয়। শিকড় মাদুরের মত বুনিয়া লোকে ব্যবহার করে। গ্রীষ্মকালে দরজায় ও জানলায় খস্ ঘাসের পরদা টাঙ্গাইয়া জল সিক্ত করিয়া রাখে ইহাতে ঘর শীতল হয় এবং সুগন্ধময় হয়। খসের ঘাষ কাগজ প্রস্তুতের উপযুক্ত। পঞ্জাবে এই ঘাষের চাষ হয় এবং তথাহইতে লক্ষাধিক মণ ঘাষ এই কারণে রপ্তানি হইয়া থাকে। দাম তাদৃশ অধিক ছিল না—য়ুরোপায় যুদ্ধারম্ভের পর হইতে ইহার দর বাড়িয়াছে। নতুবা ইহার চাষ চাষীরা প্রায় ছাড়িতে ইচ্ছা করিয়াছিল। ভাল জমি না হইলে ইহার চাষ হয়, এংব ঐ ঘাষ জন্মিলে তাহা মারিয়া জমি পুনরায় পরিষ্কার করা বড়ই কঠিন ব্যাপার এই কারণে তাহারা ইহার প্রতি এত বিতরাগ।

লেবু ঘাষের মত ইহার পাতার ও শিকড়ের ভীষণ গুণ আছে, অধিকন্তু ইহার শুষ্ক পাতা বা শিকড়ে সিগারেট তৈয়ারি করিয়া খাইলে কফাক্রমণ প্রশমিত হয় ও মাথাধরা সারিয়া যায়। কচি অবস্থায় ইহা গবাদির খাদ্য। প্রথম বারিপাত হইলে যখন ঘাষ গজাইয়া উঠে, তখনই ইহা কাটিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। শুষ্ক ঘাষ অশ্বশালে

ঘোড়ার বিছানার জন্য সাহারাণপুর অঞ্চলে ব্যবহার হয়। ইহাতে গরীব লোকের উলু, কাশ, ও কুশেরমত ঘর ছাওয়া চলে ইহাত জানাই উচিত।

সিট্রোনেলা The Citronella (A. Nardus) ইহাও একপ্রকার লেবু ঘাষ পঞ্জাব উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিংহল ও সিঙ্গাপুরে এই ঘাষ প্রচুর আছে। ইহাতে সমধিক পরিমাণে তৈল আছে। জলের সহিত ইহার পাতা চোলাই করিলে ১হন্দর ৩আউন্স তৈল পাওয়া যায়। স্থূল হিসাবে ১হন্দর ১মণ ১৪সের জল; ১আউন্স কমবেশী আধ ছটাক।

রুসা ঘাস (A. Schenanthus) বাঙ্গালায় যে কয় জাতীয় বাঁশ দৃষ্ট হয় তাহাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্রব্যাধার এবং গৃহাদি নির্ম্মাণে বাঁশের ব্যবহার সকলেই অবগত আছেন। সম্প্রতি বংশচূর্ণ লইয়া কাগজ প্রস্তুতের কাজে লাগান হইতেছে। রাউসা ঘাষ নামে দাক্ষিণাত্যে এক প্রকার ছোট জাতীয় ঘাস আছে তাহার পাতা কাগজ প্রস্তুতের বিশেষ উপযোগী। ইহার নামই সেইজন্য Rousa paper grass। ইহা হইতে তৈল ও নির্য্যাস পাওয়া যায়। ইহার গুণের সহিত লেবু ঘাষের তৈলের অনেকাংশে মিল আছে। ইহার তৈল মালিস করিলে বাতব্যাধি সারিয়া যায়।

মাদুর ঘাস বা মাদুর কাটি mat grass মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ইহার চাষ সমধিক। ইহার চাষে খুব লাভ আছে। ইহার কাটতি অধিক বলিয়া ইহাতে পয়সা আছে। এমন গৃহস্থ কমই আছে যাহার বাটিতে কোন না কোন কারণে মাদুর মসলন্দ ব্যবহার হয়।

উত্তর বঙ্গের মধ্যে দিনাজপুর জেলায় ঠাকুর গাঁ সবডিভিসনের এলাকায় বিস্তর সপ প্রস্তুত হয়। এখানে মাদুরকাঠির যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে; যে গাছের দ্বারায় সপ প্রস্তুত করে, তাহাকে স্থানীয় লোকেরা "মুথা"বলে। ঐ জাতীয় আরও একপ্রকার মোটা মোটা গাছ তত্তৎ দেশে এবং অন্যান্য জেলাতেও দেখা যায় তাহাকে "নাগর মুথা" বলে। ইহা দ্বারাও মোটা রকমের সপ প্রস্তুত হয়। বোধ হয় ঐ অঞ্চলের মুথাগুলি উচ্চ ডাঙ্গা জমীতে রোপণ করিলে সকল দেশেই হইতে পারে। ঐ সকল মাদুর দুই চারি আনা হইতে চারি বা পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত এক এক খানি বিক্রয় হয়, বালক বালিকারাও সুন্দর ভাবে মাদুর বুনিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছে।

এখানকার লোকে চৈত্র, বৈশাখ মাসে এক বা দেড় ফিট গভীর করিয়া জমীকে কোপাইয়া ফেলে, কিছু দিন ঐ ক্ষেতে বাতাস পাইলে তাহাতে পুষ্করিণীর পুরাতন পাঁক আনিয়া সাররূপে ছড়াইয়া দেয়, দোয়াঁস বালুকাময় ভূমি কিম্বা এঁটেল মাটী ইহার চাষের উপযুক্ত, ছায়াযুক্ত স্থানে কিম্বা পুষ্করিণীর পাড়ের নিম্নে উহা ভালরূপে জন্মিয়া থাকে। চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে ঐ ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে উচ্চ

করিয়া আইল বাঁধিয়া দেয়, যেন বৃষ্টি হইলে উহার জল গড়াইয়া বাহির হইয়া যাইতে না পারে, কয়েকদিন ঐ জমিতে থাকে।

অনন্তর বৃষ্টি আরম্ভ হইলে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ঐ জমিতে এক একটি পটী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পুরাতন গাছের মূল হইতে বহির্গত ছোট ছোট চারা সকল আনিয়া রোপণ করিতে হয়, রোপণের পর যদি বৃষ্টি হয় কিম্বা ক্ষেত্রে রস থাকে তাহা হইলে আর জল দিবার আবশ্যক করে না, ২।১ মাসের মধ্যে ঐ রোপিত চারাগুলি কিছু বড় হইলে উহার ঘাস আগাছা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। আর কোন বিশেষ যত্ন করিতে হয় না।

আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসের মধ্যে ঐ গাছগুলি ৪ বা ৫ হাত লম্বা হইয়া কাটিবার উপযুক্ত হইলে তখন ঐ গুলিকে কাটিয়া লয়, পুনরায় ক্ষেত্রের আগাছাদি পরিষ্কার করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে একবার পাঁক মিশ্রিত জল সেচিয়া দিলে ঐ কর্ত্তিত পুরাতন গাছের চতুর্দ্দিক হইতে বহু পরিমাণে চারা জন্মিয়া থাকে। ঐ চারাগুলি বড় হইলে মাঘ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে আর একবার তরল পাঁক সেচিয়া দেয়, তখন চারাগুলি খুব তেজাল ও মোটা হইয়া চৈত্র মাসের মধ্যে পুনরায় কাটিবার উপযুক্ত হয়। তখন ঐ গুলিকে কাটিয়া ক্ষেত্র কোপাইয়া মূল গুলিকে কোন ছায়াযুক্ত স্থানে লাগাইবার চারার জন্য রাখিতে হয়। পুনরায় নূতন করিয়া ঐ ক্ষেতে পাঁক সার দিয়া চারা লাগাইতে লয়, ক্রমান্বয়ে একই ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর উহার চাষ করিলে কাঠি উত্তমরূপে জন্মে না, এজন্য দু এক বৎসর অন্তর ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিলেই ভাল হয়।

কাঠিগুলি কাটিবার পর অগ্রে বড় ছোট পৃথক বাছিয়া মোটা সরু অনুসারে সেগুলিকে লম্বা দিকে দুই চারি অথবা ততোধিক খণ্ডে চিরিয়া ফেলিয়া, খুব লম্বা লম্বা কাঠিগুলিকে প্রস্থের দিকে মাঝামাঝি দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। একদিন রৌদ্রে রাখিবার পর ২।১ দিন জলে ফেলিয়া ও জল হইতে উঠাইবার পর রৌদ্রে পুনর্ব্বার শুকাইয়া ঐ কাটির দ্বারা মাদুর বুনিতে হয়। পাটের দড়ির দ্বারা মাদুর বুনা হয়। উৎকৃষ্ট মছলন্দি মাদুর কিন্তু সুতা দিয়া বুনে। বয়ন কালে এক কি দেড় ফিট বিস্তৃত ও ৫।৬ হাত লম্বা কাষ্ঠের হাতার প্রয়োজন হয় এই হাতাটিতে লম্বালম্বি ভাবে পাশা পাশি দুইটি করিয়া দুই সারিতে অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। প্রথমে কাপড় বুনিবার টানার ন্যায় মাদুরের দীর্ঘ বিস্তারের মাপে দড়ি বা সুতার টানা করিতে হয়। টানার দুই মাথায় দুই খানি কাষ্ঠের দ্বারা টানা আবদ্ধ থাকে ও পূর্ব্বোক্ত হাতাটির ছিদ্রের মধ্যে টানার দড়ি লি থাকে, ঠিক কাপড় বুনিবার ন্যায় এক একটি কাঠি ঐ টানার মধ্য দিয়া চালাইয়া দু এক ইঞ্চ বুনা হইলে ঐ হাত দ্বারা সেগুলিকে একত্র বেশ করিয়া

ঠাসিয়া দিতে হয়। ঐ প্রকার বয়ন কার্য্য শেষ হইলে তৎপরে উল্টা দিকের মাথাগুলি দড়ির মধ্য দিয়া মুড়িয়া বাঁধিয়া বেশীর ভাগ সমান করিয়া কাটিয়া দিতে হয়। ইহাতে বৎসরে গড়ে দুই মাসের বেশী পরিশ্রম লাগে না। এক একরে বা প্রতি তিন বিঘায় বৎসরে প্রতিবারে ৫০।৬০৲ টাকা হিসাবে শতাধিক টাকার কাঠি জন্মিয়া থাকে এবং তাহাতে প্রায় ২০ শত টাকার মাদুর প্রস্তুত হইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার খরচাদি বাদে বিঘায় প্রায় শতাধিক টাকা লাভ হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ভারতে অন্য জাতীয় ঘাসও বিস্তর আছে যেমন উলু ঘাস—গৃহাচ্ছাদনের কার্য্যে ইহার মত ঘাষ আর কমই দেখিতে পাওয়া যায়। উলুর ছাওয়া ঘর একাধিক্রমে ১০বৎসর কাল মেরামত না করিলেও চলে। কচি উলু ঘাষ গবাদির প্রিয় খাদ্য এবং উহাতে উহাদের পুষ্টিও বেশ হয়। মাঠে চরিয়া উলু ঘাষ খাইতে পারিলে আরও ভাল। কিন্তু ঐ সকল মাঠের ঘাষ এত ছোট হইয়া যায় যে বর্ষাশেষে আর কাটিয়া ঘর ছাইবার উপযুক্ত থাকে না।

কুশ ও কাশ ঘাস—কাশ ঘাষে গৃহাচ্ছাদন কার্য্য ভালরূপ চলে কিন্তু ইহা উলুর মত টিকে না। উলু, কাশ ও কুশ ঘাষে রসারসিও প্রস্তুত হয়। কুশের এবং কাশের আসন ও মাদুর প্রস্তুত হইতে পারে! কুশের আসন এবং কুশ পত্র পূজাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে নিতান্ত প্রয়োজন।

বেনা—ইহা প্রায় জলাশয়ের ধারে এবং বিল ও নাবাল স্থানে জন্মিয়া থাকে। একপ্রকার বেনা আছে তাহাকে গন্ধ বেনা বলে—উহা রসা বা খস্ ঘাসেরই মত এবং ঐ জাতীয় বলিয়া বোধ হয়, উহার মূলে টাটি ও মাদুর প্রস্তুত হয়, উহা খস্ খস্ টাটির মত ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গের মাদুর প্রস্তুতের আরও কয়েকটি উপাদানের উল্লেখ করা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

পাতি—ইহা বিল জমিতে জন্মে, ইহাতে মোটা মাদুর প্রস্তুত হয়। পল্লীগ্রামে দরিদ্র কুটিরে ইহারই শয্যারচনা করে। ইহাকে চলিত ভাসায় ঝাঁতলা বলে। ঝাঁতলা বিছাইয়া কলাই শরিসা ধনে শুষ্ক করিবার বিশেষ উপযোগী।

হোগলা—ইহারাও বিল জমিতে জন্মিয়া থাকে। ইহার পাতা ১।১॥ ইঞ্চ চওড়া, লম্বে ৪।৫ হাত পর্য্যন্ত হয়। পাতার মধ্যাংশ কথঞ্চিত ফাঁপা নরম, ইহাকে পাটের দড়ি দিয়া গাঁথিয়া জল বৃষ্টির আচ্ছাদন প্রস্তুত করিবার সুবিধা হয়। বিবাহে, বারোয়ারিতে, মেলায় আসরের চালা আচ্ছাদনে ইহা অদ্বিতীয়। নৌকায় পান্সীতে বা ডোঙ্গায় মাল বহন করিতে হইলে আচ্ছাদনের আবশ্যক। ক্যাম্বিশের তৈয়ারি ত্রিপলের (Tarpaulin) মূল্য অতিশয় অধিক। গরীব লোকে তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। সেই জন্য হোগলার আচ্ছাদনের সৃষ্টি। ইহাকে চলিত ভাষায় ছৈ বলে—আচ্ছাদন হইতে ছৈ কথাটি চলিত হইয়াছে।

শর—মজা পুষ্করিণী নদী ও খালের ধারে ও বিলজমিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই উদ্ভিদের ইক্ষুর সদৃশ আকৃতি—পাব পাতা ঐ ধরণের। শর দণ্ড চিরিয়া বা পেষণ করিয়া লইয়া চেটাই এবং মাদুর প্রস্তুত হয়। ইহাতে মোটা বসিবার আসন এবং শয়নের শয্যা প্রস্তুত হইতে পারে। মোটা বলিয়া ভদ্রঘরে ইহার ব্যবহার খুবই কম। গুদামের মেজেতে পাতিয়া দিয়া মাল রক্ষা করিতে ইহার উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক। ইহাতে আচ্ছাদনের কার্য্য চলিতে পারে। মালের বড় বড় নৌকায় যেখানে ঢাকিবার বা স্থায়ী আচ্ছাদনের আবশ্যক হয়, সে ক্ষেত্রে এই চেটাই অধিক ব্যবহার হয়। হোগলা দ্বারাও আচ্ছাদন হইতে পারে কিন্তু তাহা এক বৎসর কাল মাত্র টিকে। চেটাইদ্বারা ঢাকিলে ৩ বৎসর অনায়াসে কাটিয়া যায়।

কৃষকের বর্ষারম্ভ

নববর্ষে কি শিখিলাম—পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে দিন চলিয়া যাইতেছে। কালের গতি কেহ রোধ করিতে পারে না, কালের স্রোতে সুখ দুঃখ ভাসিয়া চলিয়াছে—কখন সুখ, কখন দুঃখ, কাহার সুখ, কাহারও অসুখ, এখানে সুখ, সেখানে নাই; এই নিয়ম, এই নিয়মের যেন ব্যতিক্রম নাই। কালের সতত চঞ্চল গতি; এই কালের স্রোতে যাহা কিছু ভাসিতেছে, তাহাও কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। কিন্তু মানুষের শক্তি অনন্ত, অপরিসীম, যে মানুষ আত্মশক্তি খুঁজিয়া পাইয়াছে, যে আত্মশক্তিতে নির্ভর করিতে পারিয়াছে—সে এই চাঞ্চল্যের মাঝখানেও স্থির, ধীর ও শান্ত! সে শত সহস্র বিঘ্ন বিপদের মাঝেও আপনার পথ খুঁজিয়া লইতে কৃতসঙ্কল্প। সব সম্ভব—যে সত্যসঙ্কল্প সে কালের অপেক্ষা করে না, কালই তাহার অপেক্ষা করে।

নূতন বর্ষ মানে, কে কি বুঝে, তাহা আমরা আলোচনা করিতে চাই না—আমরা বুঝি বর্ষব্যাপি জীবনের শেষ হইল, নববর্ষে নূতন জীবন লাভ করিলাম। এই মৃত্যুতে আমাদের দেহত্যাগ করিতে হয় নাই—সেই দেহ সেই রকমই আছে। সত্য সত্য মৃত্যুতে দেহ ছাড়িয়া যায়, বিস্মৃতি আসিয়া পূর্ব্ব জীবনের সব কথা ভুলাইয়া দেয়; সেই জন্য দেহত্যাগের পর আবার নূতন জীবন পাইলে বর্ত্তমান জীবনের অনেক বিষয়ের মীমাংসা করিতে আমাদিগকে কল্পনার সাহায্য লওয়া ব্যতীত উপায়ন্তর নাই। বর্ষান্তে নবজীবন পাইলে পূর্ব্ব কথা সকলই মনে থাকে।

সেই দেহ মন থাকে ; সুতরাং আমরা মরিয়া কি শিখিলাম সহজে তাহার আলোচনা করিতে পারি।

আমরা কৃষির ও কৃষকের কথা বলিতেছি—কৃষকও মানুষ, মনুষ্য চরিত্র আলোচনায় কৃষক চরিত্র আলোচনাই হইতেছে। চাষীরা বলে এক যো'য় সাত পো'য় সমান। বর্ষারম্ভে বা বর্ষাশেষে প্রথম যো পাইলে যদি চাষী তাহার ক্ষেত্রটি চষিয়া খুঁড়িয়া তৈয়ারি করিতে না পারে তবে তাহার সে বৎসরের চাষ মাটি হইবে। সাত ছেলে, সপরিবারে মিলিয়া কাজ করিলেও তাহার কাজ অগ্রসর হইবে না।

গত বৎসর যে চাষী তাহার জমির উপযোগী ধানের বীজ বা পাটের বীজ সময় মত রাখিতে বা সংগ্রহ করিতে ভুলিয়াছে এবং তাহার জন্য যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা তাহার বর্ত্তমান বর্ষে স্মরণ থাকিলে কত উপকার হইবে।

জমিটী চাষ বা আগাছা শূন্য করা, কর্ষণদ্বারা জমির রসরক্ষা করা চাষের প্রধান কৌশল। যদি বিগতবর্ষে সে কোন ভুল চুক করিয়া থাকে, উচিত তাহার বর্ত্তমান বর্ষে সাবধান হওয়া !

বিগত বর্ষে বৃষ্টির অভাবে বাঙলার কত চাষীই বিপন্ন হইয়াছে ; উচিত তাহাদের বর্ত্তমানে যথাসম্ভব সেচের জলের সুবিধা করিয়া রাখা—ষোল আনা কাজ না হউক অৰ্দ্ধেক ত কাজ হইবে।

হালের গোরু, লাঙ্গল বা অন্য কৃষি যন্ত্রের অভাবে বা তাহাদের অনুপযুক্ততা হেতু তাহারা বিগত কালে কতই বিপন্ন হইয়াছে, উচিত বর্ত্তমানে তাহার যথাসাধ্য, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা সময়মত করা। কালের গতির সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে যে, আমরা কত শিক্ষা লাভ করি সেই গুলিকে আমরা যদি মনে গাঁথিয়া লইতে পারি এবং শক্তি লাভ করিয়া নিজ শক্তিকে আমরা কাজে লাগাইতে পারি তবে আমাদের পুনর্জ্জন্ম সার্থক হয় নতুবা জলস্রোতে তৃণটা কুটটার মত ভাসিয়া গেলে কি কাজ হইবে ! জ্ঞানই আমাদের ভবিষ্যৎ পথ প্রদর্শক—জ্ঞানই আমাদিগকে শক্তির নিকট পৌঁছিয়া দেয়।

কৃষকের দারিদ্র্য ঘুচে কিসে—ভারতের কৃষক তোমরা বড় দরিদ্র, তোমাদের অর্থ নাই, তোমাদের সহায় সম্পদ কিছু নাই ; কিন্তু তোমরা সংখ্যায় ২০ বিশ কোটী, তোমাদের আত্মশক্তির উদ্বোধন কর, তোমাদের অভাব বুঝিয়া কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লও, দেখিবে তোমাদের সম্পদ ফিরিয়া আসিবে।

রাজা, জমিদার, ধনী তাহারা সংখ্যায় কয়জন ? তোমরা ঠিক থাকিলে তাহারা তোমাদিগকে দূরে ফেলিয়া রাখিয়া কোন কাজ করিতে সাহস করিবেন না। তোমারাই দেশের অস্থি মজ্জা, বিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি—তোমাদের ছাড়িয়া, তোমাদিগকে অবহেলা করিয়া রাজা, জমিদার বা ব্যবসাদারগণের এক দিনও চলিবে না।

ভারতে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে, সুবৃষ্টি না হইলে অজন্মা হয়; মাঝে মাঝে বৃষ্টির কম বেশী হইবে ইহা বিধির বিধানের মত। দেবমাতৃক দেশে সুজন্মা বা অজন্মা হওয়া দৈবায়ত্ব। সুজন্মার বৎসরে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিলে অজন্মার দিনে ব্যবহার করা চলে; কিন্তু কৃষকের সঞ্চয়ের সামর্থ্য কোথায়! বর্ত্তমান যুগের দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাব হয় না, এক্ষণে খাদ্যাভাবে মানুষ মরে না, অর্থাভাবই তাহাদের ধ্বংসের কারণ। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তোমার দুয়ারে খাদ্য আসিয়া উপস্থিত হইবে কিন্তু তোমার অর্থ নাই তোমার আহার জুটিল না। চাষার ঘরে অর্থ সঞ্চিত থাকে না, সে দৈনিক খরচ কুলাইতে পারে না, সঞ্চয় করিবে কি প্রকারে! কখন কখন সে মহার্ঘের বাজারে অতিরিক্ত দরে তাহার ক্ষেত্রজাত শস্যাদি বেচে বটে এবং আশাতিরিক্ত দুপয়সা রোজগার করে; কিন্তু তাহা কতক্ষণ তাহার হাতে থাকিতে পায়—বালুকাভুমিতে বারিপাতের মত শত অভাবে তাহা শুষিয়া যায়—ভবিষ্যতের জন্য এক কপর্দ্দক ও থাকে না!

জমিদারগণ মনে করিলে কৃষকের অর্থের অনাটন ঘুচাইয়া দিতে পারেন, রাজা ইচ্ছা করিলে খাদ্য শস্যের অব্যাহত কেনা বেচা বন্ধ করিতে পারেন। ব্যবসায়ীগণ নিজের স্বার্থ ভুলিয়া, দেশের ও কৃষকের দিকে চাহিলে ভারতের লোক কখন অনাহারে মরিবে না—মরিতে পারে না। আমাদের দেশের চাষীদেরও অনেক দোষ আছে তাহা অজ্ঞের ও অনভিজ্ঞের থাকা কতকটা স্বাভাবিক। তাহারা কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজের মতিগতি সহজে ফিরাইতে চায় না, সময়ের ও অর্থের অপব্যয় করিতে কখনই কুণ্ঠিত হয় না, স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া চলিতে চায়। এই পাপে তাদের বোধ হয় এত শাস্তি হয়। যদি কেহ তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন, যদি তাহাদিগকে সময়োচিত ব্যবহার শিখাইয়া দিতে পারেন, তবে তিনি এই বিশ কোটি চাষীকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারেন। এই বিশ কোটি কৃষক যদি চাষাবাদের সুপ্রণালীগুলি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া চাষের কার্য্যে লাগিয়া যায়, দেশে লুপ্তপ্রায় কুটীর শিল্পগুলি পুনর্জ্জীবিত করে, যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে শিখে, তাহা হইলে ভারতের ভাবনা আর কাহাকেও ভাবিতে হয় না—তাহারা নিজেরাই এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিয়া লইবে। তখন আর তাহাদিগকে রাজা বা জমিদারগণের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না, তাঁহারাই তাহাদের দিক চাহিয়া থাকিবেন।

ভূমি, লোকবল এবং অর্থবল এই তিনটী দেশের সম্পদ—কৃষিকার্য্যেও তিনটী জিনিসের আবশ্যক—জমি, কৃষাণ ও মূলধন। এ দেশের জমিদারগণ মধ্যবর্ত্তী লোক মাত্র, গভর্ণমেণ্টই সকল জমির মালিক। সূক্ষ্ম হিসাবে দেখিতে পাইবে যে গভর্ণমেণ্টকে উৎপন্নের প্রায় শতাংশের ২৫ ভাগ দিতে হয়—বাকি পঁচাত্তর ভাগের অধিকাংশ জমিদারের ঘরে যায়—কৃষক অল্পই উপভোগ করিতে পায়, তাই কৃষকের দুর্দ্দশা ঘুচে

না। তারপর যাহারা মজুর খাটিয়া খায়, তাহাদের রোজগার খুব কম—লক্ষ্মীর কৃপা না থাকিলে ষষ্ঠীর কৃপা বেশী হয়—দিন দিন লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, তাই সকলের গ্রাসাচ্ছাদনের মত রোজগার হয় না—এই কারণে কৃষক ও কৃষাণের দুর্গতি সমান। ইহার একমাত্র প্রতিকার নষ্টশিল্পের পুনরুদ্ধার, অল্প মূলধন লইয়া ছোট শিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র মূলধন বাড়ে এবং অনেক লোককে কাজে লাগান যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এত অভাব বুকে করিয়া লইয়া কৃষক দিন কাটাইতেছে; অভাবের চাপে সে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। চেষ্টার অভাবে সুজলা বঙ্গভূমির খাল, বিল, মজিয়া পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে, পল্লিভূমি—কৃষকের আবাস স্থল—দারুণ অস্বাস্থ্যকর। দুরারোগ্য রোগ সমূহ পল্লিবাসিগণের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে।

কৃষক এখন কি করিতে পারে—রাজা, জমিদার দয়া করিলে তাহারা না পারে কি ?

কৃষি-যন্ত্র—আমাদের চাষীরা নিতান্ত নির্ব্বোধ এ কথা আমরা বলিতে পারি না—বলিতে রাজি নহি। তাহারা বিদ্যালয়ে বা কৃষি ক্ষেত্রে বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। তাহারা তাহাদের সেই একঘেয়ে পুরাতন লাঙ্গল কোদালের সংস্কার করিতে যায়। বাঙলার এমন কি ভারতের অনেক স্থানের লাঙ্গল কাঠেই নির্ম্মিত হইত। এখন কৃষক ক্রমশঃ জমির অবস্থা বুঝিয়া ও আবাদী ফসলের আবশ্যক মত নূতন ধরণের লাঙ্গল ব্যবহার করিতে শিখিতেছে। ধান, পাট, কলাই, সরিষার জন্য অধিক গভীর চাষের আবশ্যক নাই, কিন্তু মূলজ খন্দ—আলু, পালম, বীট, মানকচু, ওল প্রভৃতির ক্ষেতের গভীর কর্ষণ আবশ্যক। এই জন্য মাটী উল্‌টান লাঙ্গল (Turn-wrest) ব্যবহার করিলে ভাল হয়, তাহারা ইহা বুঝিয়াছে, তাহারা কাজের জিনিসের আদর বুঝে। ভারতীয় কৃষি-সমিতি হইতে মাটি উলটান মেষ্টন লাঙ্গল ও প্লানেট জুনিয়ার কোদাল সরবরাহ করা হইতেছে। তাহারা একটু সচ্ছল বোধ করিলে ছোট বড় নানা রকমের হাতকোদাল, চাকা ওয়ালা জুনিয়ার হো, আক কাটা, পাট কাটা, যব গম কাটা যন্ত্র, বীজবপনযন্ত্র, দাঁড়াটানা যন্ত্র, অচিরে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিবে এবং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, স্থানীয় আবশ্যকানুযায়ী কৃষি যন্ত্র নির্ম্মাণের ও মেরামতের কারখানা স্থাপিত হইলে উন্নত কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার আরও বাড়িবে।

পঞ্জাবে, মধ্যপ্রদেশে, বোম্বায়ে শস্য আহরণ করা লাঙ্গল, শস্য ঝাড়া মাড়া কল ব্যবহার হইতেছে। সম্ভব হইলে, তাহাদের সামর্থ্যে কুলাইলে তারা উন্নত কৃষিযন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক এবং ব্যবহারে অনুপযুক্ত নহে।

জলোত্তলন যন্ত্র—ভারতীয় কৃষিসমিতি স্থানীয় চষিগণের নিকট হইতে জলোত্তলন সম্বন্ধে ব্যবস্থার জন্য প্রায়ই পত্রাদি পাইয়া থাকেন। তাহাদিগকে

আমরা বলি বাষ্প চালিত জল তোলা যন্ত্র বসাইতে এবং কাজ চালাইতে ব্যয় অত্যন্ত অধিক বিশেষতঃ য়ুরোপীয় যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত কল কব্জা ও পাইপের দর এত অধিক হইয়াছে—যে এখন উহা স্থাপনের কল্পনা করা কর্ত্তব্য নহে। যেখানে সিউনি দ্বারা কাজ চলে তথায় সিউনিই ব্যবহার করা ভাল। ক্ষেতের মাঝে কুয়া খুঁড়িয়া তাহাতে লাটা বসাইয়া কাজ চালাইতে পারা যায়। কৃষি কর্ম্ম নিরত ব্যক্তিগণ যেন একটা বিষয় স্মরণ রাখেন যে, জমি হইতে একটা ফসল উৎপন্ন করিবার লইবার জন্য বহু ব্যায়সাধ্য জল যোগানের ব্যবস্থা করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। একই জমি হইতে পরপর ৩।৪ টা ফসল লইতে হইলে—যেমন আলুর পর কুমড়া, কুমড়ার পর শসা উৎপন্ন করিতে হইলে ঐ প্রকারের ব্যবস্থা আবশ্যক এবং তখন তাহাতে লাভ আছে। তথাপি দেখা কর্ত্তব্য লাটা চালাইয়া জল তুলিয়া যদি কাজ চলে তাহাহইলে অধিক খরচার দিকে যাওয়া ভাল নহে। জমির আয়তন বা কাজের গুরুত্ব বুঝিয়া এবং নিজের সঙ্গতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইবে। আক মাড়া ও চিনির কারখানার কার্য্য হাতে বা বলদ সাহায্যে সম্পাদন করা অপেক্ষা বাষ্পচালিত কল সাহায্যে করাই ভাল। হাড় গুঁড়া করিতে, তৈল বীজ হইতে তৈল বাহির করিতে কলই ভাল।

সার—জল যোগাইবার ব্যবস্থা করিলাম, এক জমি হইতে দুই বা ততোধিক ফসল লইলাম কিন্তু জমির তেজ অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি প্রকারে? জমির তেজ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে জমিতে সার যোগান চাই। ভারতের চাষী গবাদি পশুর মলমূত্র সার প্রচুর ব্যবহার করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত গৃহাদির আবর্জ্জনা, ছাই পুরাতন দেওয়ালের মাটি, পুকুরের পাঁক মাটি, পানা ও দামদল পচা সার, খৈল সার, সোরারচূণ এই গুলিকেও সার মধ্যে গণ্য করে এবং জমিতে জমির তেজ বাড়াইবার জন্য ব্যবহার করে। সবুজ সারের প্রয়োগ কৌশল তাহারা শিখিয়াছে। শুঁটিধারী শস্য চাষে জমির উর্ব্বরতা বাড়ে তাহা আমাদের দেশের চাষীরা জানে কিন্তু কেন বাড়ে তাহা বলিতে পারে না। শুঁটিধারী শস্যের শিকড়ের গ্রন্থি স্ফীত হইয়া তাহাতে নাইট্রোজেন সার সঞ্চিত হয় এবং তাহাতে জমির উর্ব্বরতা বাড়াইয়া তুলে। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের চেষ্টায় এবং 'কৃষক' পত্রের সাহায্যে এই সকল তথ্যগুলি চাষীরা ক্রমশঃ জানিতেছে ও বুঝিতেছে।

আলুর জমিতে রেড়ীর খৈল প্রদান করিতে চাষীরা অনেক দিন শিখিয়াছে। ধানের জমিতে চাষীরা সার দিত না এখন তাহারা ধানের জমিতে হাড়ের গুঁড়া দিবার জন্য ব্যগ্র এবং কপি চাষ করিতে গেলে শরিষার খৈল খুজিয়া লয়। আগে বেগুন চাষের ক্ষেতে পাকমাটি ছড়াইয়া লইয়া ক্ষান্ত হইত কিন্তু এখন তাহারা বেগুনে শরিষার খৈল প্রয়োগ করিয়া ফসলের মাত্রা ১॥—২ গুণ বাড়াইতে পারিতেছে। এখন অনেকে

নাইট্রেট অব লাইম, নাইট্রেট অব সোডা, সালফেট অব এমোনিয়ার সন্ধান রাখে। আমাদের মনে হয় চাষ ব্যবসায়ীগণের হাতে কৃষি রসায়ন পুস্তক খানি দিতে পারিয়া আমরা অনেক সুবিধা করিয়াছি।

ধানের ফলন বৃদ্ধি—বাঙ্গলা দেশে ধানের ফলন বাড়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের নির্ব্বাচিত ইন্দ্রশালি ধানের ফলন অধিক। এই ধানের চাষ পূর্ব্ব হইতেই ছিল এখন ইহা লইয়া আলোচনা হওয়ায় অনেকেই ইহায় অনুসন্ধান করিতেছে। ঝাড়াবাছা একটা অমিশ্র ধানের চাষ করাই ভাল। বঙ্গের অনেক স্থানে পাটনাই ধানের চাষ বেশ ভাল রকম হইয়া থাকে এবং ইহার ফলন ইন্দ্রশালি ধান অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। পূর্ব্ব বঙ্গে বালাম ধানেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। সকল স্থানের জন্য একটা ধানের চাষ সমিচীন নহে। কৃষকে আমরা ধানের আবাদ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছি—তাহাতে ধান চাষে কতকটা অভিজ্ঞতা হওয়া খুব সম্ভব।

তুলা চাষ—ভারতে তুলা চাষ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা খুব সুদৃঢ় ভিত্তিতে এখনও পৌছে নাই। তুলা চাষী দিগকে আমরা নিবারণ বাবুর পুস্তক খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সরকারী কৃষি বিভাগের বিবরণীতে আমরা দেখিতে পাই বোম্বাই, অঞ্চলে রোজ তুলার (Neglectum Roseum) চাষ করা প্রশস্ত। বেহারে ও বাঙ্গালায় বেরারের বুড়ীতুলার চাষই উপযোগী।

ইক্ষু চাষ—ইক্ষু চাষের উন্নতি বাঙ্গালায় না হউক ভারতের অন্যত্র হইতেছে বাঙ্গালায় ইক্ষুর আবাদ কমিতেছে। শৃগাল ও বন্য শুকরের উৎপাত হইতে বাঙ্গালার ইক্ষুক্ষেত রক্ষা করা দায়। ইক্ষু চাষে লাভ করিতে হইলে উহার বিস্তৃত চাষ করাই কর্ত্তব্য এবং সঙ্গে সঙ্গে গুড় প্রস্তুতের কারখানা বসাইতে যথোপযুক্ত মূলধন লইয়া ইক্ষু বা আলু চাষে হাত দিলে যে কেহ লাভবান হইতে পারেন। যে কোন কাজে হাত দেওয়া হউক না চাষিগণকে সঙ্গে লইতে হইবে তাহাতে তাঁহাদের উপকার ও চাষীদের উপকার হইবে ইহা খাঁটি সত্য। ইক্ষু চাষ বা আলু চাষ সম্বন্ধে কোন কিছু জানিতে চাহিলে আমরা সর্ব্বদাই সব খরচ জানাইতে প্রস্তুত আছি। স্বর্গীয় এন, জি, মুখার্জী প্রণীত শর্করা বিজ্ঞান পাঠে ইক্ষু চাষে এবং চিনি প্রস্তুত অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারে।

চা ও পাট—চা পান ভারতবাসীর পক্ষে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চা-এর ব্যবসা করিয়া অনেকে বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেছেন। যাঁহারা ব্যবসায়ের হিসাবে চাষ আবাদে লিপ্ত হইতে চান তাঁহারা চা-এর আবাদ করিলে লাভবান হইতে পারেন। একাযেক চা-এর আবাদ চালান বড় সহজ নহে। কারণ, চা-এর আবাদে প্রথমতঃ মূলধন অধিক আবশ্যক। ভারতবাসী যদি কোন যৌথ কারবারে সফলকাম হইয়া থাকেন

তাহা এই চা-এর আবাদে হইয়াছেন ও হইতেছেন। প্রতি বৎসর ভারত হইতে ৩৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি হয়। ভারতেও অনেক চা খরচ হয়। প্রতি পাউণ্ড চা ভারতে ।০ আনা হইতে ১।০ পাউণ্ড দরে বিক্রয় হয়। ভারতীয় কৃষি-সমিতি সম্প্রতি কয়েকটা চা কোম্পানীর সহিত যোগ দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে প্রধান—খড়িবাড়ী চা কোম্পানী, ইন্দু চা কোম্পানী। যদি কেহ ঐ সকল চা কোম্পানীর সহিত যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাদিগকে পত্র লিখিলে সমুদয় খবর পাইতে পারেন।

ভারতের একটা বিশেষ সম্পত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গলা দেশের মত পাট জন্মান আর অন্য কোন দেশে সম্ভব নহে; এবং ভারতের ভাল মত চা আর কোথাও হয় না এ কথা জোর করিয়া বলা চলে। এই দুইটি পণ্য হইতে অনেক টাকা বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হয়। ভারত হইতে ৮০।৯০ লক্ষ গাইট পাট (১ গাইট ওজনে ৪০০ পাউণ্ড) রপ্তানি হয়। ভারত পাট এবং পাটজাত দ্রব্য হইতে বৎসরে ৪৯।৫০ কোটী টাকা মুনফা পাইয়া থাকে।

পাটের মধ্যে আমরা বোম্বাই পাট ও কাঁথির পাট—এই দুইটিকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া মনে করি। পূর্ব্ববঙ্গে যে পাট জন্মে তাহা গোলশুঁটী পাট, আমাদের দেশের চাষীরা তাহাকে তিত পাট বলে। ইহা বিল জমিতে হয়, ইহার শাস্ত্রীয় নাম C. Capsularis. ২৪ পরগণার অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে যে পাট জন্মে—তাহা মিঠা পাট, ইহার লম্বা শুঁটী হয়, ইহার নাম C. Olitorius. পাট শুঁটীধারী উদ্ভিদ বলিয়া শণ, দঞ্চের মত সবুজ সার হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

ভদ্রলোকের চাষ—কৃষক পত্রের মারফৎ উত্তর পাইবার জন্য আমরা অনেক সময় চিঠি পাই যে কোন্ চায ভদ্রলোকের উপযোগী, ব্যবসায়ের হিসাবে চাষ করিলে কোন্ চাষে অধিক লাভবান হওয়া যায়? এক কথায় এই বিষয়ের মীমাংসা হয় না। সামান্যতঃ আমরা দেখিয়া, ঠেকিয়া যাহা শিখিয়াছি বা সিদ্ধান্ত করিয়াছি—কৃষকের প্রশ্নকর্ত্তাগণকে সেই মত একটা জবাব দিতে পারি—

আক ও আলু চাষ—ভদ্রলোকের উপযোগী এবং ইহাতে খরচের মাত্রা কিছু অধিক হইলেও সাধারণ সবজী চাষ অপেক্ষা খুটীনাটি পরিশ্রম ইহাতে কম এবং লাভের মাত্রা অধিক।

গুড় তৈয়ারি করিবার জন্য আক চাষ এবং চিবাইয়া খাইবার জন্য আক চাষ দুয়েতেই লাভ আছে। কোন্ আক ভাল, কোন্টি মন্দ এ উত্তর আমরা এখানে দিব না—জানিতে চাহিলে জানাইব। আলুর মধ্যে দার্জ্জিলিং শিলং, নৈনিতাল এইগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভারতীয় কৃষিসমিতি এই কয়প্রকার আলু চাষের বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহাদের চেষ্টা ফলপ্রদ হইবে বলিয়া আশা করেন।

ফসলের আবাদ—ফলের মধ্যে কলা, পেঁপে শশা চাষে লাভ প্রচুর হওয়া সম্ভব। ঢাকাতে যেমন নালি এবং আইল বাধিয়া কলা চাষ করা হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ইহার বিশেষ খরচ কৃষকে প্রকাশিত হইয়াছে। শশা বৎসরে ৩ বার চাষ করা যায়। পেঁপে চাষের বিস্তৃত বিবরণ কৃষকে বাহির হইয়াছে। অনুরাগী ব্যক্তি কৃষক পাঠে লাভবান হইবেন, ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে সাহস করি।

পাতিলেবু, পেয়ারার আবাদ কাশী এলাহাবাদ অঞ্চলে করা ভাল। আম, লিচুর আবাদ মজঃফরপুর, দারবঙ্গ, পুর্ণিয়া, মালদহ অঞ্চলে সুবিধাজনক। কাঁঠাল, কলা, কাগজী সরবতী প্রভৃতি লেবু আনারস বাঙ্গলায় ভাল হয়। কিন্তু নিম্ন বঙ্গের ২৪ পরগণা, হাওড়া হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে আমের ফসলের নিশ্চয়তা নাই। ২৪ পরগণায় বারুইপুর অঞ্চলে লিচু, লকেট পেয়ারা অপরিযাপ্ত জন্মিয়া থাকে। সরকারী কৃষি বিবরণী পাঠে জানিতে পারি যে বেলুচিস্থানে এপ্রিকট ও কুল, মধ্যপ্রদেশে কমলা ও কলা চাষের বিশিষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

সর্ব্বাগ্রে আমরা চাই ভারতে ধান, গম, তুলা, পাট, ইক্ষু চাষের উন্নতি দেখিতে। সরকারী কৃষিবিভাগ এই দিক দিয়া কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছেন।

ফলের বাগান রচনা ও সবজী সম্বন্ধে আমরা নিয়তই কৃষকে আলোচনা করি। সবজী চাষ পুস্তক লোকের বোধহয় অনেক উপকারে আসিতেছে—ফলের বাগান রচনা ইহা এখনও পুস্তক আকারে বাহির হয় নাই তাহার কারণ পুস্তক মুদ্রন এখন বড়ই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

পাট চাষের পক্ষে কৃষিতত্ত্ববিদ শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরির পুস্তকখানি (Jut in Bengal) প্রামাণ্য গ্রন্থ। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে এইখানি কাছে থাকিলে পাট চাষে কিম্বা পাট ব্যবসায়ে কিছুতেই ঠকিতে হইবে না। পুস্তকখানির বাঙ্গলা সংস্করণ আমাদের অভিপ্রেত হইলেও উপস্থিত কালে হওয়ার সুবিধা হইতেছে না।

ফসলে পোকা—কৃষিকর্ম্মের সাফল্যের অনেক অন্তরায় আছে, ফলে পোকার উপদ্রব তন্মধ্যে একটি প্রধান। পুর্ব্বে সাবধান না হইলে ইহার প্রতিকার বা প্রতিবিধান চিন্তা পুর্ব্ব হইতে করিয়া না রাখিলে আপদ্‌কালে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়। শৃগাল বুনোশুকর, হরিণপ্রভৃতি বন্তপশুতে শস্ত নষ্ট করিলে তাহার প্রতিবিধান সহজে করা যায়; কিন্তু পতঙ্গাদির মত ক্ষুদ্র শত্রুর হাত হইতে সহজে রক্ষা পাওয়া যায় না। সকল চাষী মিলিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্র ও ক্ষেতের চারিধার পরিষ্কার করা ও পরিষ্কার রাখা, সন্নিহিত জঙ্গলের আগাছা কুগাছা কাটিয়া মধ্যে মধ্যে পুড়াইয়া ফেলা প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা পোকার উপদ্রব কতকটা প্রশমিত হইতে পারে। সেকালে ক্ষেতে, বাগানে বৎসরে দুই একদিন ধোয়া দেওয়ার ও দীপ-দানের বিধি ছিল। এখনও বাঙ্গালার অনেক চাষীর

ঘরে সেই নিয়ম অনুসৃত হয়। এই সকল আপদ প্রতিকারের জন্য কার্ত্তিকের সারা মাসে আকাশে দীপ-দানের বিধি, মাঝে মাঝে বহ্নি উৎসব ও বাজী পুড়াইবার ব্যবস্থা। শত্রু ক্ষুদ্রই হউক বা বৃহৎ হউক সকলের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন তাহার দমন সহজসাধ্য হয় না। সকলে দুই চারিটা দীপ জ্বালিলে কত অসংখ্য দীপ এক সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিবে, সকলে এক সঙ্গে ধোঁয়ার সৃষ্টি করিলে ধোঁয়ায় গগন ছাইয়া ফেলিতে পারে ইহা ধারণা থাকা আবশ্যক। ভারতীয় কৃষিসমিতি ফসলের পোকা নামক পুস্তকখানি কৃষিকর্ম্ম নিরত ব্যক্তিগণকে উপহার দিতে পারেন। এইখানিকে তাঁহাদের সঙ্গের সাথী করিলে ভাল হয়। পুস্তকখানি পুষা অনুসন্ধান আলয়ের অন্যতম কীটতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত চন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। পোকা সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমরা ইহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছি।

ভারতীয় কৃষি-সমিতির আর একটি সৎ চেষ্টায় বিঘ্ন ঘটিয়াছে। সৎকর্ম্মে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয় এই জন্য মহাজনেরা বলেন যে সৎ বিষয়ের কল্পনা মাত্রেই কার্য্যে পরিণত করা ভাল। এই সমিতি একটি একটি কৃষি বিষয় লইয়া ১৬ পাতা এক একখানি ক্ষুদ্র কৃষি পুস্তিকা ছাপাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা, মশালা ও মশালার গাছ গাছড়া এই দুইখানি পুস্তিকা বাহির হইয়াছে। এইরূপ পুস্তিকা গুলির দাম ৵০ আনার বেশী হইবে না। উদ্দেশ্য এইরূপ পুস্তিকার যাহার যেখানে আবশ্যক বাঙ্গালায় ঘরে ঘরে যাইয়া হাজির হউক। য়ুরোপীয় মহাসমর হেতু পৃথিবীময় বিপ্লব উপস্থিত হইল, মুদ্রাঙ্কনের দ্রব্যাদির কল্পনাতীত মূল্য হইল, সমিতির আশা কোরকে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল—ফুটিবার অবসর পাইল না।

য়ুরোপীয় মহাসমরে আমরা কত যে বিপন্ন হইয়াছি তাহা সামান্য বুদ্ধিতে অনুমান হয় না। আমরা কতটা যে পরাধীন, কতটা পরমুখাপেক্ষী, জড় আমরা, আমাদেরও কথঞ্চিৎ অনুভব সীমায় আসিয়াছে। কাগজ, পেন্সিল, কলম কালী আমরা বিদেশ হইতে না পাইলে লেখাপড়া করিতে পারি না। মুদ্রাঙ্কন যন্ত্র তাহাও বিদেশী। ধুতী উড়ানি, শাটী, জামার কাপড় বিদেশ হইতে আসিলে তবে আমাদের লজ্জা নিবারণ হয়; আমরা তুলার চাষ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিলাম। সূতাটি ছুঁচটি, দেয়াসলাই, বোতামটি পর্য্যন্ত আমাদের নাই—জাহাজ মারা যাইতে লাগিল, মাল আসা বন্ধ হইল, আমরা প্রমাদ গণিলাম, হাহাকার করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে জাপান এমেরিকা আসিয়া অন্যের স্থান জুড়িয়া বসিল। আমাদের অভাব কিয়ৎপরিমাণে পূরণ হইল, কিন্তু অভাবের তাড়নায় যে একটু চোখ ফুটিয়াছিল তাহাও আবার ক্রমশঃ মুদিয়া আসিতে লাগিল—আমরা আবার যে জড়, সেই জড়। আমাদের দুর্দ্দশার পরিমাণ হয় না।

বীজ-ক্ষেত্র ভারতের মত জায়গা থাকিতে, ভারতের মত ষড়ঋতু বিদ্যমান থাকিতে

সবজী প্রভৃতি অনেকানেক বীজের জন্য জাহাজের প্রতীক্ষায় সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়—ইহা অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে! ভারতীয় কৃষিসমিতি অনেক গণ্যমান্য লোকের কাছে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন কিন্তু কখনই উপযুক্ত সহানুভূতি পাইল না কোনকালে পাইবে কি না আশা করিতেও পারেন না। আমরা সর্ব্বদাই বিস্মৃত হইয়া আছি—যে আমরা সংখ্যায় ৩৩ কোটী, এই ৩৩ কোটীর নর নারীর সমবেত চেষ্টায় কি না হইতে পারে—এই ৩৩ কোটী লোক যদি এক সঙ্গে সজোরে নিশ্বাস ত্যাগ করে তাহা হইলে এমন ঝড় বহিবে যে তাহাতে বঙ্গোপসাগর আলোড়িত হইবে। আমরা এখন রাষ্ট্রনিতি লইয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি কিন্তু তাহাতে কোন্ ফললাভ করিতেছি—ইহা অপেক্ষা যদি আমরা রাজবিধান মাথা করিয়া লইয়া আমাদের ঘর সামলাইয়া লইতে পারি—পল্লিগ্রাম ও সহর এক ছাঁচে ঢালিতে পারি, রাজা প্রজা একসঙ্গে একযোগে কাজ করিতে পারি তাহাতে আমাদের অধিক উপকার হয় না কি? সমাজ বিপ্লব না ঘটাইয়া বিধির বিধানে যে, যে অবস্থায় আসিয়া জন্মিয়াছে তাহাকে সেই অবস্থায় থাকিতে দিয়া, তাহাকে একটু শিখাইয়া, পড়াইয়া বুঝাইয়া, সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কাজের মানুষ করিতে পারিলে অধিক লাভ হয় না কি? চাষ নিরত বিশকোটী প্রজা অকেজো নহে—সে স্বভাবতই কাজের মানুষ কাজও সে করে, তাহার কাজটা সুনিয়ন্ত্রিত করিলে অনেক বেশী কাজ হয় না কি? রাষ্ট্রনীতি পরিচালনের জন্য লোক খুজিবার পূর্ব্বে ভারতে চাষের সুব্যবস্থার জন্য ঐরূপ একজন উপযুক্ত লোক খোঁজা আবশ্যক হইয়াছে। স্বার্থত্যাগী সন্ন্যাসী না হইলে এ কাজের উপযুক্ত হইতে পারে না। ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষিত ভারতে কি এমন একজন লোকও নাই।

কৃষি-শিক্ষা—কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষি শিক্ষার আয়োজন ক্রমশঃ বাড়িতেছে দেখিয়া আমরা একটু আশ্বস্ত হইয়াছি। ইহাতে সামান্য কৃষিগৃহস্থের প্রকৃতপক্ষে কোন উপকার না হইলেও পরোক্ষে ইহার ফল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ছয়টি প্রদেশে ছয়টি কৃষি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে—

(১)	পুষা	কৃষি-কলেজ—
(২)	কইম্বাটোর	,,
(৩)	নাগপুর	,,
(৪)	সাবর	,,
(৫)	কানপুর	,,
(৬)	লায়েলপুর	,,

এতদ্ব্যতীত মহীশূরে কৃষি-বিদ্যালয় আছে, পুষাতে গ্রাড়ুয়েট ছাত্রগণের জন্য উন্নত কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরে গ্রাম্য নৈশ কৃষি-বিদ্যালয় ও মহীশূরে কৃষকপুত্রগণের শিক্ষার জন্য গ্রাম্য কৃষি-পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। কাণপুরে ও লায়েলপুরে স্থানীয় ভাষায় কৃষি-শিক্ষার জন্য পাঠশালার প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হইয়াছে—আরও অনেক হওয়ার আবশ্যক আছে। চাষীর ছেলেরা এখনও অনেকে নিরক্ষর। তাহাদের এই অজ্ঞান নাশ হয় এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে হওয়া আবশ্যক। স্থানীয় ভাষায় কৃষি পুস্তকাদি তাহারা সহজে পড়িতে ও বুঝিতে পারে, তাহারই প্রচার হউক ইহাই আমরা চাই।

কৃষকের প্রচার—সর্ব্বশেষে আমাদের প্রার্থনা কৃষকের বহুল প্রচার; বাঙ্গালার প্রত্যেক পাঠশালা ও স্কুলে প্রত্যেক পল্লিতে পল্লিতে প্রত্যেক পাঠশালায় কৃষক পত্র অধীত হয় ইহাই আমরা দেখিতে চাই। কৃষকের পাঠক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষকের লেখক সংখ্যা বাড়িয়া যাউক ইহাই আমাদের কামনা। যিনি যাহা কিছু নূতন করিবেন যাহা কিছু নূতন কৃষি পদ্ধতির কল্পনা করিবেন, কৃষিসম্বন্ধীয় নূতন বিষয়ের সন্ধান পাইলে তাহা কৃষকে প্রকাশ করেন ইহাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। সকলের কৃষি প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। ইহাতে আমরা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছি না—আমরা দুই চারিজনে সব জানে না বুঝি ইহা কখন সম্ভব নহে। যাহা আমাদের জানা নাই, তাহা কৃষকের গ্রাহক, অনুগ্রাহক বর্গের কাহার না কাহারও জ্ঞানের বিষয়ীভূত সুতরাং অধিকাংশ প্রশ্নের সুমীমাংসা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইবে না। যে কথার মীমাংসা আমরা করিতে পারিব না তাহা ভারতের কৃষি বিভাগ পারিবেন কিম্বা এমেরিকার বা জাপানের কৃষি বোর্ডে পারিবেন এরূপ বিশ্বাস আমাদের আছে। আমরা কৃষক পত্রের জন্য ভারতের প্রত্যেক জেলা হইতে প্রত্যেক মহকুমা, প্রত্যেক চৌকি হইতে সংবাদ দাতা চাই—আমরা বঙ্গীয় কৃষি বিভাগকে কৃষক প্রচার কল্পে যেমন পৃষ্টপোষক বলিয়া জ্ঞান করি, তাঁহাদিগকেও সেইরূপ পৃষ্টপোষক বলিয়া জ্ঞান করিব। সকলে, কৃষককে তাঁহার নিজ সম্পত্তি বলিয়া জ্ঞান করিবেন ইহা আমরা বোধ হয় আশা করিতে পারি।
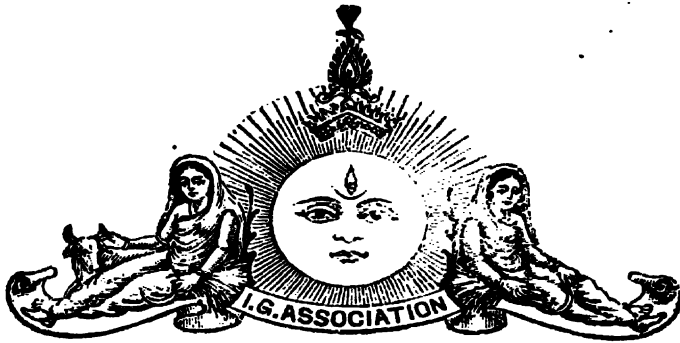
বৈশাখ, ১৩২৬ সাল।

কুমড়াচাষের সাধারণ নিয়ম

কুমড়া শসাকী জাতীয় (Cucurbitaceæ) উদ্ভিদের শ্রেণীভুক্ত। ইহা প্রকারভেদে ৩ প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়।

১। মিঠা কুমড়া বা বিলাতি কুমড়া। ইহাকে ইংরাজিতে Red Gourd বলে। স্থানবিশেষে ইহার বিভিন্ন নাম—পশ্চিম দেশীয় লোকে ইহাকে ডিঙ্গেলা বলে, উড়িষ্যায় বৈতাড়ু এবং বিহারে কোঙরা বলে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম কুষ্মাণ্ড। সিদ্ধ ও ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাইতে অতি সুস্বাদু ও মিষ্ট। এই জন্যই ইহার নামই হইয়াছে মিঠা কুমড়া। কুমড়ার বীজ পর্য্যন্ত ভাজা খাওয়া যায়।

সার—সাধারণ গোবর সার ও পুষ্করণীর তোলা মাটিই ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

কাল নিরূপণ—এদেশে মাঘ মাসে বীজ বপন করিয়া চৈত্র মাস মধ্যে মিঠা কুমড়ার খুব বেশী ফলন হইতে দেখা যায়। বিজ্ঞ চাষী কখন কখন কার্ত্তিক মাসেই কুমড়ার বীজ বপন করিয়া থাকে। গাছ জন্মিয়া ছোট হইয়া থাকে পরে মাঘ ফাল্গুনে গাছ গজাইয়া উঠে ও ফল ধরে। শীতকালে চারা হইতে বিলম্ব হয় সেই জন্য কার্ত্তিক মাসে গাছ তৈয়ারী করিলে ভাল হয়। আবার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ পুতিয়া ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মধ্যেও কুমড়া ফলিতে দেখা যায়। কিন্তু বাসন্তী ফলন অপেক্ষা বর্ষাতী ফলন অনেক কম হয়।

বর্ষাকালে গাছ অতিশয় ধাপাইয়া যায়, সুতরাং সে গাছের ডগা কাটিয়া খাইলে তবে ফল ফলিতে আরম্ভ হয়। বর্ষার সময় গাছকে এদেশে মাচায় তুলিয়া দিতে হয়।

ইহার গাঁইটে গাঁইটে শিকড় জন্মে, সুতরাং লাউ কুমড়া গাছ মাটিতে লতাইতে পাইলে গাছগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক দূর ব্যাপ্ত হয় ও অধিক ফল প্রসবে সমর্থ হয়। ক্ষেতের মধ্যে যে গাছটি সমধিক তেজস্কর সেই গাছের সুপুষ্ট কুমড়া বীজের জন্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বীজের জন্য ভাল কুমড়া উৎপন্ন করিতে হইলে একটা গাছে দুই তিনটির অধিক ফল রাখিতে নাই। বাঙ্গালার সুনিপুণ চাষীরা বলে যে, যে কুমড়াটীর বীজ রাখিতে হইবে, সেটী যে ডগায় জন্মে, সেই ডগাটীর শিকড় মাটীতে বসিলে, ঐ ডগার দুই বা আড়াই হস্ত পশ্চাতভাগ হইতে কাটিয়া মূল গাছ হইতে পৃথক করিয়া দিলে, ফলটী খুব বড় হয়। মাঠে যে লাউ, কুমড়া হয় তাহার ৬ ফিট × ৬ফিট অন্তর মাদা প্রস্তুত করিতে হয়। এক বিঘা জমিতে কুমড়ার আবাদ করিতে ১০ তোলা বীজ আবশ্যক হয়। প্রতি মাদায় ৫ কিম্বা ৬টী বীজ বপন করিতে হয়। চারা জন্মিলে যে চারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজস্কর এমন দুইটি চারা রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়।

ফলন—এক বিঘা জমি যাহার মাপ ১৪৪০০ ফিট তাহাতে ৪০০ কুমড়া গাছ বসিতে পারে। গাছের মরা হাজা বাদ ৩০০ গাছে ফল হইবে ধরিয়া লইলে এবং প্রত্যেক গাছে অন্ততঃ ৩টার অধিক কুমড়া ফলিলে এক বিঘায় ১০০০ কুমড়া হওয়া অসম্ভব নহে। উহা হইতে পচা ও খারাপ ফল বাদ দিয়াও আনুমানিক গড়ে ৫ সের ওজনের ৫০০ কুমড়া নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

কুমড়া গোল, লম্বা, বোতলাকারের দৃষ্ট হয়।

২। ছাঁচি কুমড়া। ইহাকে ইংরাজিতে White Gourd বলে। ঘরের চালে হয় বলিয়া লোকে চালকুমড়া বলে, সাধারণতঃ সকলে দেশী কুমড়াও বলিয়া থাকে। এই কুমড়া কুরুণীদ্বারা নারিকেল কুরার মত কুরিয়া লইয়া দাইল বাটার সহিত মিলাইয়া বড়ি প্রস্তুত করা যায়। উহা ব্যঞ্জনে খাইতে অতিশয় সুস্বাদু। কচি কুমড়ার ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাওয়া যায়। পক্ক কুমড়া খোলা ফেলিয়া দিয়া চিনির রসে পাক করিয়া বরফি মোরব্বা প্রস্তুত করা যায়। কুমড়া কোরার দ্বারাও কয়েকপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদে বলে কচি অপক্ক কুমড়া গুণে বিষতুল্য; পক্ক কুষ্মাণ্ড অমৃত তুল্য। কুষ্মাণ্ড খণ্ড রক্তপিত্ত রোগে মহৌষধ বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহা হৃদরোগ ও উন্মাদাদি চিত্ত রোগ নাশক। ইহা সচরাচর শাদা গোলাকৃতি ও লম্বা আকারের হইয়া থাকে; পূর্ব্ববঙ্গে কিন্তু ইহা গোল হয়।

মৃত্তিকা—ঘরের পোতার মাটী ও বাগানের জমিই উত্তম; সাধারণ দোয়াঁস জমিতেই ইহার চাষ হয়।

সার—ঈষৎ ক্ষার মাটী, আবর্জ্জনা, এবং গোবর সারই উপযুক্ত।

কাল নিরূপণ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টির সময় বীজ বপন করিতে হয়। মাদা করিয়া বীজ পুতিতে হয়। প্রতি মাদায় ৪কিম্বা ৫টী বীজ পোতা বিধি। মিঠা কুমড়ার অনুরূপ ইহার চাষ। মাটী অপেক্ষা মাচা বা চালের উপরে কিছু অধিক পরিমাণে ফল ফলে। ইহা এদেশের লোকে শুক্ত ও অন্যান্য ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খায়। কবিরাজেরা বলেন অপক্ক কুমড়া বিষবৎ, পক্ক কুষ্মাণ্ড অমৃততুল্য। কুষ্মাণ্ডখণ্ড রক্তপিত্ত পীড়ার একটী প্রধান ঔষধ। কুমড়ার মিঠাই বাজারে যথেষ্ট বিক্রয় হয়। এই কুমড়া শ্বেতবর্ণ ও লম্বাকৃতি। পূর্ব্বাঞ্চলে গোলাকৃতি একপ্রকার দেশী কুমড়া জন্মে। উহা খুব অধিক ফলে।

৩। গিমা কুমড়া বা চুণা কুমড়া—ইহা ছাঁচি কুমড়ার মত শাদা রঙের, আকারে মিঠা চাকা আকারের কুমড়ার মত হয়। ইহার ব্যবহার ছাঁচি কুমড়ারই অনুরূপ, গুণে ছাচি কুমড়ার সমান কি না ঠিক বলা যায় না।

মৃত্তিকা—মাঠেই ভাল হয়, দোয়াঁস জমিতেই ইহার চাষ উপযুক্ত।

সার—'পলিমাটীই' ইহার উত্তম সার। গোয়ালের আর্বজনাও সার রূপে ব্যবহার করা হয়।

কাল নিরূপণ—ইহাও ছাঁচি কুমড়ার ন্যায় শাদা রঙের, কিন্তু আকারে মিষ্ট কুমড়ার ন্যায় চাকা চাকা। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে লাউ, কুমড়ার মত মাদা করিয়া চারা করিতে হয়, আর চৈত্রমাস মধ্যে ফল পাকিয়া গাছ মরিয়া যায়। ইহা পূর্ব্ববঙ্গের চর জমিগুলিতে অধিক জন্মাইতে দেখা যায়।

বীজ বপন অন্যান্য পাইট মিঠা কুমড়ার অনুরূপ।

৪। ভুমি কুমড়া বা ভুঁই কুমড়া—ইহার কেহ চাষ করে না বা তরকারি প্রভৃতিতে খাইবার জন্য ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। ইহার ব্যবহার কবিরাজগণের নিকট—রক্তপিত্ত ও কাশাদি রোগে ইহা মহৌষধরূপ ব্যবহার করা হয়। কবিরাজগণ বনজঙ্গল হইতে ইহা সংগ্রহ করেন। কোন কোন কবিরাজ আবশ্যক মত ব্যবহারের জন্য নিজ আলয়ে বা উদ্যানে ইহার গাছ জন্মাইয়া রাখেন। ইহার অতি সুন্দর ফুল হয়। ইহার প্রান্ত ভাগ ঈষৎ লালাভ হয় বলিয়া বড়ই মনোরম। বাগানের ফটকের উপর বা বারান্দার কেয়ারিতে তুলিয়া দিলে বেশ সুন্দর দেখায়।

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের একটু বিশেষ পরিচয় জানিয়া রাখিলে উহার চাষাবাদের বিশেষ সুবিধা হয়।

লাউ, কুমড়া প্রভৃতি সমস্ত শসাকী জাতীয় ফসল মাত্রেই দোঁয়াশ মাটিতে উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে; বরং বালির পরিমাণ অধিক হইলে তাদৃশ ক্ষতি হয় না, কিন্তু কর্দ্দমের পরিমাণ অধিক হওয়া উচিত নহে। অনেক স্থলেই লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি গৃহ প্রাঙ্গনেই রোপিত হইয়া থাকে এবং গোয়ালের আবর্জ্জনা ও উনুনের ছাই সার

রূপে ব্যবহৃত হয়। গোবর এবং ছাই উভয়ই শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে উত্তম সার। কিন্তু গোবরের আধিক্যে অনেক সময় গাছ কেবল বড় হইয়া থাকে এবং ফল হয় না। তজ্জন্য গোবর সার কিছু কম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বিঘা প্রতি ৮ মণ অসিক্ত (unslaked) ছাই এই সমস্ত উদ্ভিদের পক্ষে উত্তম সার বলিয়া পরিগণিত হয়। ছাইপ্রয়োগে জমির কৈশিক আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহাতে গাছে অধিক পরিমাণে জল শোষিত হয় এবং ফলও বড় হইয়া থাকে। গাছে জল প্রয়োগ করার সময় যাহাতে গাছের গোড়ায় জল না জমে তৎসম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক। গাছের কাণ্ডে জল লাগিলে উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইয়া থাকে।

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের চাষে সাধারণতঃ দোয়াশ মৃত্তিকাই প্রশস্ত।

সার (একর প্রতি)—নাইট্রোজেন	...	৫০ হইতে ৬০
পটাস	...	১৬০ হইতে ১৫০
ফস্ফরিক অম্ল	...	৮০ হইতে ১০০

শসা লতার অগ্রভাগ

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের বীজ হইতে সাধারণতঃ ১০ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম হয়।

এক একর (প্রায় তিন বিঘা) জমিতে সরিষার খৈল ৬ মণ, ছাই ১০ কিম্বা ১২ মণ ঘুঁটে চূর্ণ ৩ মণ হাড়ের গুঁড়া ১ মণ মিশ্রিত করিয়া লাউ কুমড়া শসা, খরমুজ, কাঁকুড়, কাঁকড়ী চাষে ব্যবহার করিলে পর্য্যাপ্ত ফসল পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এই রূপ সার প্রয়োগের কথা উল্লেখ করা গেল।

শশাকি জাতীয় উদ্ভিদের স্বভাব দেখাইবার জন্য শসার একটি ডগা ও কুমড়ার ডগা ফুল প্রদর্শিত হইয়াছে।

কুমড়ার পাতা, ফুল, ডগা

শসাকী জাতীয় প্রায় সমস্ত উদ্ভিদই লতানীয়া কাণ্ড বিশিষ্ট। আকর্ষণী নামক (Tendril) একটি প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ইহারা কোন প্রকার কঠিন পদার্থ অবলম্বন করিয়া মৃত্তিকা ছাড়াইয়া উঠে। প্রকার ভেদে আকর্ষণীর গঠনের তারতম্য হইয়া থাকে। মৃত্তিকার উপরিস্থিত লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছের অগ্রভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহারা কোন প্রকার অবলম্বন অনুসন্ধান করিতেছে এবং এই প্রকার অবলম্বনের অনুসন্ধানে উহাদেয় কাণ্ড অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া থকে।

এই জাতীয় সমস্ত গাছেরই পুষ্প এক লিঙ্গ ; অর্থাৎ কেবল স্ত্রী। আবার এই জাতীয় গাছের অনেক 'প্রকার' গাছেই উভয় জাতীয় পুষ্প জন্মিয়া থাকে, যেমন লাউ ও কুমড়ায়।

খাদ্য হিসাবে বিচার করিলে ইহাকে একটা প্রধান তরকারী বলিয়া গণ্য করা যায়। ইহা খুব মিষ্ট, মুখরোচক তরকারী এবং রন্ধনে অন্যান্য তরকারীর সহিত বেশ মিশ্রিত হয়। রাসায়নিক খাদ্য বিচারে ইহাতে প্রোটিড ভাগ ১, শ্বেতসার ও শর্করা ৪ ভাগ, তৈল ১ ভাগ দৃষ্ট হয়।

কুমড়া গাছ মাটিতে লতাইয়া হইলে কুমড়া অধিক ফলে। নদীর চর জমিতে ইহার ফলন অত্যন্ত অধিক। এক বিঘা জমিতে ১৫০ হইতে ২০০ শত কুমড়া ফলিয়া থাকে। ভাল জমিতে আরও অধিক হওয়া সম্ভব। কলিকাতার বাজারে মাঝারি কুমড়া ১৫৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা প্রতি শত বিক্রয় হয়। চরের কুমড়া এক এক খান আধ মণ হইতে এক মণেরও উপর হয়। আলু তুলিয়া লইয়া সেই খেতে কুমড়ার চাষ করিলে কুমড়ার ফসল হইতে জমির খাজানা ও জমিটি মেরামত ও পরিষ্কার রাখিবার খরচ উঠিয়া যায়।

বুড়িরহাটফার্ম্মে তামাক চাষের পরীক্ষা

(সরকারী বিবরণ।)

রংপুর জিলায় অধিক তামাকের আবাদ হইয়া থাকে। ইহার উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট রংপুরের ৫ মাইল উত্তরে বুড়িরহাটফার্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন। গত বৎসর যাবৎ এই ফার্ম্মের কার্য্য চলিয়াছে এবং তামাকের উন্নতি করা হইয়াছে।

তামাকের জমি—নিকৃষ্ট বালি মাটিতে চূণ সবুজসার ও গোবর দিয়া জল সেচন করিলে ভাল তামাক জন্মে ইহা বেশ প্রমাণিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই ফার্ম্মের যে যে অংশে অনুর্ব্বরা মৃত্তিকার জন্য তামাকের চাষ করা অসম্ভব বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, উহাতে এইক্ষণ বেশ ভাল তামাক জন্মিতেছে, এইরূপ মাটিতে মাত্র এক বৎসরের মধ্যে তামাকেরই ফসল করা হয়।

সকল কৃষকই তামাকের জমিতে প্রচুর পরিমাণে গোবর সার ব্যবহার করিয়া থাকে। খৈল তামাকে একটী ভাল সার। এতদ্ব্যতীত বিঘা প্রতি অল্প পরিমাণে সোরা সার প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে সোরার দর অধিক, কিন্তু নিকৃষ্ট সার ব্যবহার করা ঠিক নহে একারণ যাহাতে অধিক পরিমাণ গোবর সংগ্রহ করিয়া বর্ষার শেষভাগে জমিতে ভাল মত ছড়াইয়া দেওয়া যায় তাহায়

চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কৃষকেরা বর্ষাকালেও তামাক ক্ষেত্রে গোবর দিয়া থাকে, ইহাতে অনেক সার ধুইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

এই ফার্মে বঙ্গদেশে যত প্রকার তামাক উৎপন্ন হয় তাহার পরীক্ষা হইতেছে। ইহাদের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিয়া যাহাতে বিভিন্ন জিলায় উৎকৃষ্ট তামাকের আবাদ করা যায়, তাহারই চেষ্টা করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত নানা জাতীয় বৈদেশিক তামাকের পরীক্ষা করা হইতেছে। এপর্য্যন্ত চুরুটের জন্ম সুমাত্রা তামাকের বিশেষ উন্নতি করা হইয়াছে।

১। সুমাত্রা তামাক—এই বৎসর ৭॥০ বিঘা জমিতে ইহার আবাদ করা হইয়াছে, ইহাতে প্রায় ৪০৴ মণ তামাক পাওয়া যাইবে। ইহার দর প্রায় ৩,০০০৲ টাকা। গত বৎসর এই তামাকের এত কাটতি হইয়াছিল, যে এই ফার্ম্ম হইতে উহা সম্পূর্ণরূপে সরবরাহ করা চলে নাই। মান্দ্রাজের চুরট ব্যবসায়ীগণ এই তামাক খরিদ করিয়া থাকেন।

২। এদেশীয় তামাক প্রধানতঃ দুই প্রকার যথা,—

(১) হামাকু বিলাতী কিম্বা মতিহারী ;

(২) দেশী তামাক।

গত দুই বৎসর যাবৎ বিভিন্ন জিলার প্রায় ৪০ প্রকার দেশীয় তামাকের পরীক্ষা করা চলিতেছে। এখন পর্য্যন্ত রংপুরের তামাকেরই ফলন ও কাটতি বেশী দেখা যায়, পাবনা জিলার এক জাতীয় তামাকের পাতা ছোট বটে কিন্তু বেশ কড়া ও সুস্বাদু।

এই প্রদেশের প্রায় প্রত্যেক জিলাতেই অল্পাধিক পরিমাণে তামাক জন্মে কিন্তু বিভিন্ন স্থানের মাটি, আবহওয়া ও চাষ-প্রণালীর মধ্যে অনেক প্রভেদ। কি রকম মাটিতে কোন জাতীয় তামাক কিরূপে চাষ করিলে ভাল হয় এবং উহা বিক্রয় করিবার কি কি সুবিধা আছে এই সমস্ত বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক হয়। এতদ্ব্যতীত যাহাতে উৎকৃষ্ট বীজ রক্ষা করিবার জন্য অল্প কয়েকটী গাছের ফুল হইতে দেয় ও ফুল পাকিলে বীজ সংগ্রহ করে। এই সমস্ত গাছের শাখা প্রশাখা হইতেও বীজ হইয়া থাকে। ইহাতে বীজ ভাল হয় না। যাহাতে এইরূপ শাখাপ্রশাখা প্রথম হইতেই ভাঙ্গিয়া দিয়া কেবল মূল পুষ্প দণ্ড হইতে বীজ সংগ্রহ করা যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জাতীয় তামাকের বীজ নিকটবর্ত্তী জমিতে রক্ষা করিলে দোঁয়াস জন্মিতে পারে এবিষয় মনে রাখা কর্ত্তব্য।

হামাকু—বর্ত্তমান সময়ে হামাকু তামাকের আবাদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে, এই তামাকু পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানেই ভাল জন্মিতে পারে, তথাপি প্রতিবৎসরই রংপুর ও কুচবিহার হইতে ইহার রপ্তানি ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে। এই বৎসর এই

ফার্ম্মে কুচবিহারের বীজ আবাদ করা হইয়াছিল। রংপুরের অপেক্ষা কুচবিহারের হামাকুর বোঁটা ছোট এবং তলব অধিক। এই বৎসর ইহার দর প্রতি মণ ১০৲ ।১৫৲ টাকা, দেশী তামাকের দর ৭৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা।

দেশী তামক—রংপুরের ভাল তামাকের অধিকাংশই ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহার মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই তামাকের আরও উন্নতি করিবার জন্য তামাক ক্ষেত্র হইতে বাছাই করিয়া উৎকৃষ্ট আদর্শ তামাকের বীজ উৎপাদন করিবার চেষ্টা হইতেছে। ক্রমাগত ৫।৬ বৎসর এইরূপ বাছাই করিয়া আরও ভাল তামাক উৎপাদন করিবার পরীক্ষা চলিতেছে।

এই বৎসর ৩০ বিঘা জমিতে দেশী তামাকের আবাদ হইয়াছে; ইহাতে প্রায় ১৬০/ মণ তামাক পাওয়া যাইবে। ইহার মূল্য প্রায় ২,০০০৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত ৭॥০ বিঘা সুমাত্রা তামাকের আবাদ করা হইয়াছিল। তামাকের আবাদে প্রায় ৫,৫০০৲ টাকা পাওয়া যাইবে। মোট ৩৭॥০ বিঘা জমিতে এইরূপ ফসল আবাদে খরচ বাদেও বিশেষ লাভ পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

কৃষকের জমিতে প্রদর্শন—সুমাত্রা তামাক শুকাইতে বিশেষ প্রকারের ঘরের আবশ্যক। এই কারণে, এইরূপ ঘর তৈয়ার না করিয়া এই তামাকের আবাদ করা যায় না। ৪ জন কৃষক এই বৎসর ৫॥০ মণ সুমাত্রা তামাক আবাদ করিয়াছে। এই জন্য কৃষকের বাটীতে এই তামাক শুকাইবার জন্য একখানা ঘর উঠান হইয়াছে। উহার ব্যয় স্থানীয় কৃষি-সমিতি বহন করিয়াছে। এই তামাকের দর প্রতিমণ ২২৲ টাকা করিয়া ঠিক করা হইয়াছে।

জোয়ার বা দেধান—এই পরীক্ষা ক্ষেত্রে জোয়ার বাদে ধান বেশ ভাল হয়। উহা গবাদির মন্দ খাদ্য নহে।

কৃষিযন্ত্র—তামাকের ক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য প্ল্যানেট জুনিয়ার হো অতি উত্তম, রংপুর জিলায় এইজন্য এক প্রকার হাত লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়, ইহা অপেক্ষা এই 'হো' ৩।৪ গুণ অধিক কাজ করে। স্প্রিংটুথ্ হ্যারো দ্বারা এই ফার্মে এক খানা দেশী লাঙ্গল হইতে ৪ গুণ কাজ পাওয়া গিয়াছে। এক জোড়া বলদেই চালাইতে পারে। এই বৎসর আরও দুইখানা স্প্রিং টুথ্ হ্যারো আনা হইয়াছে; ইহাদের দ্বারা বেশ কাজ হয়।

পত্রাদি

প্রোটিড্—

শ্রীশ্যামলধন সরকার, বনহুগলী, বরাহনগর।

প্রশ্ন—কৃষকে খাদ্যবস্তুর বিচারকালে প্রায়ই প্রোটিড্ কথার উল্লেখ পাই। ইহা খাদ্যাদির সারাংশ ইহা বুঝি কিন্তু ইহা প্রকৃত কোন্ পদার্থ জানিতে ইচ্ছা করি।

উত্তর—খাদ্যবস্তু হইতে আমরা শ্বেতসার ও শর্করা, তৈলাক্ত পদার্থ, নাইট্রোজেন প্রধান পদার্থ, লবণ প্রভৃতি সংগ্রহ করি। খাদ্যের নাইট্রেজেন যুক্ত পদার্থকে সাধারণতঃ প্রোটিড্ বলা হয়। জান্তব খাদ্যে অধিক পরিমাণে প্রোটিড্ পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে ডাইলে জন্তুর খাদ্যের অনুরূপ বা অপেক্ষাকৃত অধিক প্রোটিড পাওয়া যায়। শ্বেতসার ও শর্করা এবং তৈলের দাহ্যগুণ এবং প্রোটিডের মেদকারিতা গুণ আছে। শর্করা ও তৈলময় পদার্থ হইতে শরীরের উত্তাপ রক্ষা হয়, প্রোটিড্-দ্বারা দেহের মেদ বৃদ্ধি হয়।

সোরা সার—অনেকে প্রশ্ন করেন যে সোরা লবণাক্ত পদার্থ বলিয়া মনে হয়, ইহা প্রয়োগ করিলে মাটি লোণা হইয়া অনিষ্ট হইবে কিনা এবং ইহার সারবত্তা কত ইত্যাদি—

উত্তর—ইহা লবণের ন্যায় ক্ষার পদার্থ বটে কিন্তু ইহা বৃক্ষাদির বিশিষ্ট সার ইহা প্রয়োগে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। ইহাকে পোটাসিয়াম-নাইট্রেট বলে। নাইট্রোজেন, পোটাসিয়াম ও অসিকজেন একত্র মিশিয়া ইহার উৎপত্তি হয়। নাইট্রোজেন ও পোটাসিয়াম এতদুভয়ই বৃক্ষাদির প্রধান খাদ্যোপাদান। ইহা জলে শীঘ্র দ্রব হয় এবং উদ্ভিদগণ শিকড়দ্বারা ইহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। ইহা নাইট্রোজেন প্রধান সার এবং সার হিসাবে সোরার মূল্য নিতান্ত কম নহে। সোরা সম্বন্ধে আরও বিশেষ বিবরণ কৃষি রসায়ন পুস্তকে দেখুন।

দুগ্ধ রক্ষা করা যায় কি প্রকারে ?

শ্রীশ্রীনিবাস ক্ষেত্রী, বর্দ্ধমান।

উত্তর—দুগ্ধ ব্যবসায়ীগণ সাধারণতঃ অপরাহ্নের দোহা দুধে কয়েক ফোঁটা শরিষার তৈল সংযোগ করিয়া শীতলস্থানে রাখিয়া দেয়। কেহ কেহ জ্বাল দিয়া কটাহ সমেত শীতল স্থানে রাখে পরদিন সর তুলিয়া লইয়া বাজারে ঐ দুধ বিক্রয় করে। কিছুকাল এইরূপে দুধ রক্ষা করা যায় বটে কিন্তু ভাল থাকিবে বা মন্দ থাকিবে ঠিক নিশ্চয় বলা যায় না কিম্বা অধিক কালে এইভাবে দুধকে অবিকৃত রাখা যায় না।

দুধ রক্ষা করিবার অন্য উপায়—

একসের দুধে ২০ গ্রেণ বাই কার্ব্বনেট-অব-সোডা যোগ করিলে দুধ অনেকক্ষণ অবিকৃত থাকে। কোন কোন রসায়নতত্ত্ববিদ্ বলেন যে বোরিক এসিডের জলে দুধের পাত্রগুলি ধৌত করিয়া লইয়া তাহাতে দুধ রক্ষা করিলে দুধ সহজে নষ্ট হইবার

আশঙ্কা থাকে না। ফুটন্ত জলে ধৌত বোতলগুলি দুধ পূর্ণ করিয়া, ফুটন্ত জলপাত্রে ১৫।২০ মিনিট গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসাইয়া রাখিলে দুধের উত্তাপ যখন জলের উত্তাপের সমান হইবে তখন সেগুলিকে উত্তমরূপে ছিপি বদ্ধ করিতে হইবে এবং জ্বাল সরাইয়া বোতলগুলি ক্রমশঃ শিতল করিয়া লইয়া শিতল স্থানে রাখিয়া দিলে ইহা কয়েকদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখিতে পারা যায়। দুধ ঘন করিয়া জ্বাল দিয়া এবং তাহাতে চিনি যোগ করিয়া ছিপি আটিয়া বায়ুবদ্ধ করিয়া রাখিলে দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে।

কাঁচাদুধ পাঠাইবার অসুবিধা হইলে ক্ষীর করিয়া পাঠাইলে ৮।১০ দিনের পথে আনিয়াও ব্যবহার করা যায়।

বাগানের মাসিক কার্য্য

জ্যৈষ্ঠ মাস

কৃষিক্ষেত্র—এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন ভাঁটি বান্ধিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাঁকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জী বাগ—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতি মধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালা শসার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মুলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলদি ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুল কপি বপন করিয়া চারা তৈয়ারি করিতে হইবে।

ফুলবাগিচা—এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়ার মূল এই সময় বসাইতে বলেন, আমরা কিন্তু বলি আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূলগুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলে ভাল। কিন্তু শিঘ্র শিঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্বে কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমরান্থস, কল্পকোষ, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ বপনের এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাইট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের ধাপকলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাঁধা কপি ও ফুলকপির বীজ এখন বপন করা যায়।
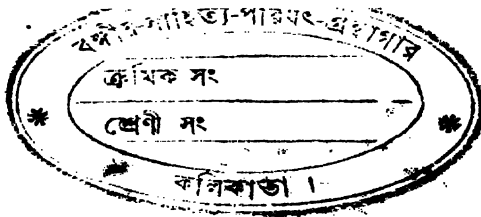
কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

২০শ খণ্ড। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ সাল। | ২য় সংখ্যা।

গো-বিজ্ঞান

(এগ্রিকলচারল এণ্ড ডেয়ারি স্টুডেণ্ট লিখিত)

ডেইরী ফারম বা দুধের ব্যবসা।

একটি ডেইরী ফারমে ৪০টীর অধিক দুগ্ধবতী গাভী রাখা উচিত নহে কিম্বা এক সঙ্গে ৪০টী ক্রয় করা উচিত নহে। চার মাস অন্তর ১০টী করিয়া দুগ্ধবতী গাভী নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ক্রয় করা উচিত, আজ কাল বিশুদ্ধ মণ্টগোমরী, সিন্ধি, হান্সী গাভী কলিকাতার চিৎপুরবাজারে যথেষ্ট আমদানী হইয়া থাকে। ক্রেতা ইচ্ছামত যে কোন বিশুদ্ধ জাত পছন্দ করিয়া ক্রয় করিতে পারেন। এইখানে মনে রাখা উচিত যে গাভীর আয়তনের উপযোগী যে জাতের গাভী ক্রয় হইবে সেই জাতের ষণ্ড প্রয়োজন। দেখা যায় যে যতগুলি গাভী ক্রয় করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা ব্যবসায়ী নিজের মূলধন অনুযায়ী পূর্ব্বেই স্থির করিয়া তদনুযায়ী বাগান বা মাঠ, বন্দবস্ত, গোহাল নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন; কিন্তু অনেক সময়ে অভিজ্ঞতার অভাবে এক সঙ্গে সমস্ত গাভী ক্রয় করিয়া বিপদগ্রস্থ হয়েন। আমরা সচরাচর যে প্রকৃতির গাভী দেখিতে পাই তাহারা প্রায়ই ১৩।[illegible] মাস অন্তর সন্তান প্রসব করে, ও প্রসবের পর ৪ মাস কাল পর্য্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় দুগ্ধ প্রদান করিয়া ক্রমশঃ দুধের পরিমাণ হ্রাস হয়, ব্যবসা হিসাবে গাভীর দুগ্ধ দাত্রিকাশক্তি ৪ মাস কাল ধরা হয়, কারণ ইহার পর কোন গাভী কি, পরিমাণে কত, কাল

অল্প মাত্রায় দুগ্ধ প্রদান করিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই ও এই দুধের উপর নির্ভর করিয়া দুধ যোগান দেওয়া যাইতে পারে না। দুধের ব্যবসায়ে দেখা যায় যে ক্রেতা যেখানে, যথাসময়ে নিত্য প্রয়োজন উপযোগী বিশুদ্ধ দুগ্ধ প্রাপ্ত হয়েন সেই স্থান ভিন্ন অপর কোথাও দুধের বন্দোবস্ত করেন না। দুগ্ধ ব্যবসায়টীকে ক্রেতার অভাব অভিযোগের উপর সম্যক দৃষ্টি রাখিতে হইবে; নচেৎ বাজারে সুনাম নষ্ট হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। ব্যবসা বন্ধ না করিয়া বাজারে সুনাম রাখিতে হইলে প্রথমবারে যতগুলি দুগ্ধবতী গাভী খরিদ হইয়াছে পুনরায় ততগুলি ক্রয় না করিলে সমভাবে দুধের যোগান চলিতে পারেনা; গোড়ায় এই গলদ করিলে গাভীর অতিরিক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি গোহাল নির্ম্মাণ ও প্রতিপালনের ব্যয় এত অধিক হয় যে যথেষ্ট মূলধন না থাকিলে এই কার্য্য কিছুতেই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। একটি গৃহস্থ যদি বারমাস সমভাবে দুগ্ধ পাইবার জন্য প্রথম বৈশাখে একটী দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করেন তাহা হইলে বৈশাখ হইতে শ্রাবণের শেষ পর্য্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় দুগ্ধ প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু ভাদ্রের প্রথম হইতে তাঁহার দুধের অনাটন হইবে। যদি ভাদ্র মাসের আর একটী দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করেন তাহা হইলে ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত দুধের অনাটন হইবে না, এবং পৌষ মাসে আর একটি গাভী ক্রয় করিলে একবৎসরকাল সমভাবে দুগ্ধ প্রাপ্ত হইবেন, এই তিনটী গাভীকে সময় হিসাব করিয়া—ষণ্ড না দেখাইলে ঠিক সময় মত দুধ পাওয়া যাইবে না কিন্তু প্রসবের পর একটী নির্দ্দিষ্ট কালে (৫।৬ মাস)—ষণ্ড দেখান হয় তাহা হইলেও দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসে পুনরায় দুধের অভাব হইবে; এজন্য দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম বৈশাখে আর একটী গাভী ক্রয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাভী সংযোজিত হইলে বার মাস সমভাবে দুধের জন্য ভাবিতে হয় না। বার মাস সমভাবে দুধের যোগান রাখিতে হইলে কি গৃহস্থ, কি ডেইরী ফারমের অধ্যক্ষ সকলকেই এক যোগে গাভী ক্রয় না করিয়া প্রয়োজন মত ৪ মাস অন্তর গাভী ক্রয় করা কর্ত্তব্য এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ষণ্ড দেখান আবশ্যক। গাভীর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবসায়ীর প্রয়োজন মত হিসাবের সহিত, প্রসবের ৫।৬ মাসের মধ্যে ষণ্ড দেখান নিতান্ত প্রয়োজন। শেষোক্ত কার্য্যটি মানুষের ইচ্ছাধীন নহে, ইহা গাভীর উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে; গাভী মাসে মাসে ঋতুবতী হইলে সকল ঋতুতে ষণ্ড গ্রহণেচ্ছা তাদৃশ প্রবল হয় না; কিন্তু "ডাক" দিলে সকল সময়ে অগ্রাহ্য করা যায়না, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, "ডাক" অগ্রাহ্য করিলেও চতুর্থ ডাক কোনমতে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। প্রকৃতির আহ্বান সকল সময়ে অগ্রাহ্য করিলে, অনেকসময়ে গোজাতীর অনিষ্ট হইয়া থাকে। গাভীগণের প্রকৃতি এক বিয়ানের পর স্থির করা যায় না, এজন্য ডেইরী ফারমের প্রথম দুই তিন বৎসর গোলযোগের,

ইহাকে কোন মতে আয়ত্ত করা যায় না, প্রথম ২।৩ বৎসর অতি সতর্কতার সহিত গাভীর প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া, প্রতীকার করা অসম্ভব নহে কিন্তু অর্থসাপেক্ষ। গাভীর সংযোজন ক্রিয়া নিয়মাধীন করিতে পারিলে যেমন বার মাস দুধের যোগানে গোলযোগ হয় না সেইরূপ ভবিষ্যতে লোকসান হইবার আশঙ্কা থাকে না। সংযোজন ক্রিয়া নিয়মিত করিতে যে কয়টী গাভী পরিত্যক্ত হইবে; তাহা পূর্ব্ব হইতে ক্ষতি হিসাবে ধরিয়া মূলধনের সহিত হিসাব করিতে হইবে; কখন কখন হিসাব অতিরিক্ত খরচ হইয়া থাকে, এজন্য, ডেইরী ফারমের মূলধনের সহিত রিজার্ভ ফণ্ড রাখার প্রয়োজন। ডেইরীফারমে ৫।৬ মাসের মধ্যে সংযোজন ক্রিয়া সম্পাদন করিলে যে হিসাবে যতদিন পূর্ণমাত্রায় দুগ্ধ পাওয়া যাইবে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

মাস।		১ম বৎসর			২য় বৎসর				৩য় বৎসর				৪র্থ বৎসর			
বৈশাখ	...	(১)	...	...	+	+	X	(৪)	+	+	(৩)	+	+	X	(৩)	∧
জ্যৈষ্ঠ	...	(১)	...	...	+	+	∧	(৪)	+	+	(৩)	+	+	∧	(৩)	+
আষাঢ়	...	(১)	...	...	(১)	+	∧	(৪)	+	+	X	(৪)	+	∧	(৩)	+
শ্রাবণ	...	(১)	...	...	(১)	+	+	(৪)	+	+	∧	(৪)	+	+	(৩)	+
ভাদ্র	...	X	(২)	...	(১)	+	+	X	(১)	+	∧	(৪)	+	+	X	+
আশ্বিন	...	∧	(২)	...	(১)	+	+	∧	(১)	+	+	(৪)	+	+	∧	+
কার্ত্তিক	...	∧	(২)	...	X	(২)	+	∧	(১)	+	+	X	(১)	+	∧	+
অগ্রহায়ণ	...	+	(২)	...	∧	(২)	+	+	(১)	+	+	∧	(১)	+	+	+
পৌষ	...	+	X	(৩)	∧	(২)	+	+	X	(২)	+	∧	(১)	+	+	(৪)
মাঘ	...	+	∧	(৩)	+	(২)	+	+	∧	(২)	+	+	(১)	+	+	(৪)
ফাল্গুন	...	+	∧	(৩)	+	X	(৩)	+	∧	(২)	+	+	X	(২)	+	(৪)
চৈত্র	...	+	+	(৩)	+	∧	(৩)	+	+	(২)	+	+	∧	(২)	+	(৪)

প্রথম	খরিদ	ও	পূর্ণ	মাত্রার	দুগ্ধের	চিহ্ন	(১)
দ্বিতীয়	,,		,,	,,	,,	,,	(২)
তৃতীয়	,,		,,	,,	,,	,,	(৩)
চতুর্থ	,,		,,	,,	,,	,,	(৪)
সংযোজনের সঙ্কেত						,,	V
হ্রাস দুগ্ধের					,,	,,	Λ
ছাড়ন্ত						,,	+

এই তালিকায় দৃষ্ট হয় যে পঞ্চম মাসে সংযোজন হইলে কোন মাসে দুধের পরিমাণ হ্রাস হয় না, ১ম দল বা দ্বিতীয় যে কোন দলের গাভী হউক না কেন, কোন একটি দলের দুগ্ধ বার মাস সমভাবে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। পূর্ণ মাত্রা শেষ হইলে যে অল্প মাত্রায় দুগ্ধ পাওয়া যাইবে ওযে দুগ্ধ ক্রমশ হ্রাস হইবে তাহা হিসাবের মধ্যে ধরা গেলনা। সংযোজন ক্রিয়া নিয়মিত করিতে হইলে যে অর্থ ব্যয় হইবে প্রথমে তাহা লোকসান বোধ হইলেও ভবিষ্যতে ডেইরী ফারমের স্থায়ী উন্নতি বিধানে সমর্থ হইবে। গাভী ২৮৫ দিনে গর্ভ ধারণ করিয়া সন্তান প্রসব করে এজন্য ৯½ সাড়ে নয় মাস, প্রসবের দিন ধরিয়া ১৫ দিন হাতে রাখিয়া গর্ভধারণ প্রসবের ব্যতিক্রম, ও বিধানের চতুর্থ দিন হইতে দুগ্ধের মূল্য ধার্য্য করিয়া মোটামুটী ১০ মাস কাল প্রসবের কাল বলিয়া ধার্য্য করা অসঙ্গত নহে।

বাঙ্গালী ও সাহেবের ডেইরী ফারমে একটি প্রভেদ দৃষ্ট হয়, যে সকল দুগ্ধজাত খাদ্য সামগ্রী সাহেবেরা পছন্দ করেন সে গুলি উচ্চ মূল্যে অতি সত্বর বিক্রয় হইয়া যায় ও সাহেব ব্যবসায়ীর যথেষ্ট লাভ হয়। তাঁহাদের ফারম সংলগ্ন চাষের জমীর প্রয়োজন হয় না কিন্তু রাখিতে পারিলে অত্যধিক লাভ হইয়া থাকে। বাঙ্গালী ফারমে সাহেব পছন্দ দুগ্ধজাত খাদ্যাদি প্রস্তুত হইলে উহার ক্রেতার অভাব দৃষ্ট হয় ও অজ্ঞতার সহিত চালিত হয় বলিয়া পদে পদে লোকসান দিতে হয় ও দুধ বিক্রয় করিয়া যে লাভ হয় তাহাতে ব্যবসায় সন্তুষ্ট না হইয়া দুধে ভেজাল আরম্ভ করে। এই সকল মারাত্মক অসুবিধা দূর করিবার জন্য বাঙ্গালীর ফারম সংলগ্ন এক লপ্তে জমীর প্রয়োজন। দুধের ব্যবসার সহিত প্রয়োজন উপযোগী বাজার বুঝিয়া দুই একটি ফল মূল কন্দ ও সবজির চাষের সহিত বার মাস গোখাদ্য কাঁচা ঘাষের চাষ করা যায়, তাহা হইলে একটি ডেইরী ফারম অপর ডেইরী ফারমের সাহায্য ব্যতিরেকে সৎপথে থাকিয়া লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে! ডেইরী ফারমে কখনও নিক্তির ওজনে প্রত্যহ দুগ্ধ পাওয়া যায় না, ইহার হ্রাস বৃদ্ধি প্রত্যহ হইয়া থাকে তবে এই হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাণ অল্প। গাভীর সম্যক পরিচর্য্যে না হইলে দুধের পরিমাণ হ্রাসই হয়। দুধ অধিক হইলে ঐ

দুগ্ধ তৎক্ষণাৎ বিক্রয় না হইলে নষ্ট হইবার প্রবল আশঙ্কা থাকে ও দুধ অল্প হইলে যোগান দেওয়া ভার হয়। প্রত্যহ যে পরিমাণ পূর্ণ মাত্রার দুগ্ধ পাওয়া যাইবে তাহার ৩ তিন ভাগ যোগান দিয়া অবশিষ্ট এক ভাগের সহিত অন্যান্য গাভীর অল্প মাত্রায় দুধ হইতে বাজার বুঝিয়া মাখন ছানা বা ঘৃত যাহা প্রয়োজন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে দুধ লোকসানের আশঙ্কা থাকে না।

কাঁচা মালের ব্যবসা যেমন লাভ জনক সেইরূপ বিপদ জনক। যাঁহারা দুগ্ধ হইতে ছানা, মাখন, প্রস্তুত করিতে জানেন ও তাহার বন্দোবস্ত করেন তাহারাই লোকসানের পরিবর্ত্তে লাভ করিয়া থাকেন।

বিশুদ্ধ, দুগ্ধ,ঘৃত, মাখন প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য সমূহ আজকাল বাঙ্গালায় এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য; দুগ্ধব্যতীত আমাদের একদণ্ড চলেনা; গব্যদ্রব্যহীন খাদ্য প্রকৃত আহার্য্য নহে; প্রতিদিন নিয়মিতরূপে দুগ্ধ পান করিলে শরীরের পুষ্টি সাধন হয়। বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য সামগ্রী নিরামিষাশী ভারতবাসীর খাদ্য দ্রব্যের তালিকায় আদর্শ খাদ্য রূপে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। সদ্য প্রসূত সন্তান হইতে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, রোগাতুর,সকলেরই পক্ষে দুগ্ধ অত্যন্ত হিতকারী; যে সকল উপাদানে মনুষ্য দেহ গঠন হয় দুধের মধ্যে সেই সকল উপাদান যথোচিত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। সদ্য প্রসূত শিশুসন্তানের একমাত্র খাদ্যই দুগ্ধ; যাহাদের জীবন ধারণ পুষ্টি, বৃদ্ধি, উন্নতি সাধন এই দুধের উপর নির্ভর করে তাহাদের ভেজাল মিশ্রিত দুগ্ধ কি পরিমাণে অনিষ্ট করে তাহা এক মুখে বলা যায় না, ভেজাল মিশ্রিত দুগ্ধ খানা ডোবার জলের নিম্নে স্থান প্রাপ্ত হয়; এই দুগ্ধ ব্যবহারের ফল, প্রত্যক্ষ্য ভাবে প্রত্যেক গৃহস্থের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়া অযথা ডাক্তার, বৈদ্য ঔষধ পথ্য প্রভৃতির গুরু ভার বহন করিতে বাধ্য করে। আমাদের দেশের নীচ স্বার্থপর গোপ জাতীর অবৈধ উপার্জ্জনের জন্য দেশে জটীল রোগ, শিশু সন্তান গুলির অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা চিকিৎসক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। হৃষ্ট পুষ্ট গাভী বিশুদ্ধ দুগ্ধ প্রদান করিতে পারে, গাভীর হৃষ্ট পুষ্টতা উহার খাদ্য, পানীয়, বাসার্থে উৎকৃষ্ট গোহাল, পরিচ্ছন্নতার উপর নির্ভর করে। যে গোহালে বায়ু অবাধে প্রবেশ করিয়া খেলিতে পারে ও আলোক প্রবেশে কোন বাধা প্রাপ্ত না হয় সেই গোহাল বাসের জন্য প্রশস্ত। কলিকাতা বা মফস্বলে কয়টী গোয়ালা এইরূপ পরিচ্ছন্ন গোহালে গাভী আবদ্ধ রাখে? উহাদের গোহাল মাত্রেই আবর্জ্জনাপূর্ণ দুর্গন্ধময় ও সঙ্কীর্ণ; যেখানে বায়ু, আলোক প্রবেশের পথ না থাকায় আবর্জ্জনাদি পূতিগন্ধময় হইয়া গোহাল ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানের বায়ু কলুষিত করিয়া থাকে। ও অনেক সময়ে সংক্রামক রোগ উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। যদি গভর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে কলিকাতার সমগ্র গোহাল ও গাভীর

গোযক্ষা পরীক্ষা করিবার অনুমতি পাওয়া যায় তাহা হইলে শতকরা ১০টী গাভীর দেহে এই রোগের বিকাশ দেখা যাইবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

কলিকাতার ন্যায় বহু জনাকীর্ণ মহানগরীতে কাঁচা ঘাস দুর্ম্মূল্য হইলেও দুধের ব্যবসা চালাইতে পারিলে যেরূপ লাভ জনক সেরূপ অপর কোন ব্যবসা নহে। দুধের ব্যবসায় গোপজাতী অভিজ্ঞ ও সঙ্গতিপন্ন হইলেও উহারা বিশ্বাসের সম্পুর্ণ অনুপযোগী; অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করা সমগ্র গোপজাতীর মজ্জাগত হইলেও নিষ্ঠুরতায় বাঙ্গালী গোয়ালা সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহারা একটি সরু বাঁশের নল যোণীদ্বারের ভিতর দিয়া জরায়ু মুখে প্রবিষ্ট করাইয়া বাহির হইতে ফুঁ দেয়; ফু দিলে, গাভী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া থাকে ফলে বাঁট টানিবা মাত্র সমস্তদুধ বাহির করিয়া দিতে পথ পায়না, ফুকা প্রণালীর দুগ্ধ দোহনে যেমন অধিক মাত্রায় দুগ্ধ পাওয়া যায় সেরূপ দোহন কালে পানাইবার জন্য বৎসের প্রয়োজন হয় না। যে ২।৩ দিন গোরুর দুধে রক্ত বা পুজের মত পদার্থ থাকে সেইকটী দিন বাছুর মাতৃ দুগ্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুই তিন দিনের পর দুধের ভিতর হইতে যেমন ঐ পদার্থ গুলীর আমেজ দূর হয় সেই সময় গাভীর দুগ্ধ দোহন, ও ঐ দুগ্ধ হইতে ছানা বহিষ্করণ হইয়া উচ্চমুল্যে সাহেবী হোটেলে বিক্রীত হইয়া থাকে ও গোবৎস ৪।৫ দিনের ভিতরই মিউনিসিপাল মার্কটে ১ম শ্রেণী "বিফ" রূপে পরিণত হয়। গাভীর "ফুঁকা" দেওয়া জরায়ু বিকৃত হইয়া পুনরায় গর্ভধারণে অসমর্থ হইয়া থাকে তাহা গোয়ালা মাত্রেই জ্ঞাত আছে, এজন্য এক বিয়ানের হৃষ্ট পুষ্ট গাভীর দুগ্ধ গ্রহণ করিবার পর অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্যে কসাইহস্তে বিক্রীত হইয়া থাকে; ও লব্ধ অর্থ দ্বারা পুনরায় নূতন গাভী ক্রয় করে। বৎসকে দুধের ভাগ দিতে হইবে বলিয়া, ও গাভীটী প্রতিপালনের অনুপযোগী বলিয়া, উহারা শুধু পরিত্যক্ত হয় না। গাভী ছাড়ন্ত হইলে, যখন বসিয়া খাইবে এই অপব্যয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য গোপজাতি এই কুকর্ম্ম করে। দুধের ব্যবসায় ছাড়ন্ত গাভী, ও বৎস পালন না থাকিত তাহা হইলে ব্যবসায় যথেষ্ট লাভ হইত, ডেইরী ফারমে এই ব্যয়টী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গোয়ালার প্রণালীতে আদৌ খরচ দৃষ্ট হয় না, উহারা চতুর্দ্দিক হইতে লাভের পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য প্রতি বৎসর কত উৎকৃষ্ট গাভীর অযথা প্রাণবধ করে তাহার সংবাদ অনেকেই জ্ঞাত নহেন। গো, বৎস, একযোগে পালন করিয়া, অনভিজ্ঞ লোকের দ্বারা ডেইরী ফারম চালিত হইলে প্রতিপদে লোকসানের আশঙ্কা থাকে এই জন্য জমী শূন্য ডেইরী ফারমে অসৎ উপায় ভিন্ন লাভের আশা থাকে না। যে উপায় অবলম্বন করিলে সকলের চোখে ধূলা দিয়া, আইনের হাত বাঁচাইয়া ভদ্রভাবে দুধে ভেজল মিশ্রিত হয় তাহা পাঠকের জানা উচিত। যে সকল ডেইরী ফারমে মাখন বা ঘৃত প্রস্তুত হয় না, সেই ফারমে ২।৪টী মহিষ প্রতিপালিত হইতে দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে ভদ্র ভাবে দুধ ও

জলের সংযোগ এই খানেই হয়, যদি মিলিটারি ষ্টেশনের গোয়ালার মতে মহিষকে খাওয়ান হয় তাহা হইলে মহিষ প্রতিপালনে ব্যয় একেবারেই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; আমি মহিষ প্রতিপালন করিয়া, কি খাওয়াই, দুধ কি করি, তাহা গুপ্ত রাখিতে হইলে ট্রেডসিকরেট (Trade Secret) এর দোহাই দিলেই ভিতরে প্রবেশ নিষেধ হইবে। গো দুগ্ধ অপেক্ষা মহিষ দুগ্ধ এত ঘন, মাখনের পরিমাণ এত বেশী যে তুল্যাংশে জল ও দুগ্ধ মিশ্রিত হইলে যেমন বাহ্যিক আকার সেইরূপ পরীক্ষাদ্বারা কোন দোষ ধরা যায় না, আমরা সচরাচর মহিষ দুগ্ধে ৬ হইতে ৭ ভাগ পর্য্যন্ত মাখন প্রাপ্ত হইয়া থাকি, ও মহিষ দুগ্ধের মুড়া মারিয়া, সমপরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া গো দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইলে কোনমতে ধরা যায় না, দুধের ভিতর ৩ ভাগ মাখন রাখিতে পারিলে কোনমতে দণ্ডনীয় হইতে পারে না। এই মিশ্রিত দুগ্ধে যে সর পড়ে তাহাও ধরা যায় না, ও কলিকাতার গৃহিণীরা দুধ চিনিতে পারেন না বলিয়া, খাটী দুগ্ধ রূপে বাজারে সুনাম রাখিয়া ব্যবসায়ী দুধের যোগান দেয়। গো-দুগ্ধের ছানার কণা অপেক্ষা মহিষ দুগ্ধের ছানার কণা বড়, জল মিশ্রিত হইলেও কণার পরিবর্তন হয় না, ছানার এই বড় কণাগুলী শিশু সন্তানেরা পরিপাক করিতে পারে না, পেটে পড়িবামাত্র শিশুসন্তান প্রায়ই উদগার করিয়া ফেলে, এই দুগ্ধ ব্যবহারের ফলে উহাদের যকৃত আক্রান্ত হইয়া অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। শুধু ডেইরী ফারমের কার্য্য কলাপ দর্শকের জন্য উন্মুক্ত রাখিলে অসৎ ব্যবসায়ীর এই চালাকি ফাঁসিয়া যায়। জমী শূন্য ছোট ডেইরী ফারমে গাভী প্রতিপালন করিয়া শুধু দুধ বিক্রয় করিলে ব্যবসায়ীর পেট ভরে না, এ জন্য তাহারা বাধ্য হইয়া অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া উহাকে জীবিত রাখে। বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোঝা যায়—

১। ব্যবসায়ীর অজ্ঞতা এ জন্য তত্ত্বাবধারণের সম্পূর্ণ অভাব ও গোয়ালা চাকরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর

২। বিশুদ্ধ জাতীর ষণ্ডের অভাব

৩। জাতী নির্ণয়, গাভী নির্ব্বাচনের অক্ষমতা

৪। গাভী পরিচর্য্যা ও বৎস পালন ও নির্ব্বাচন

১। এই সকল উপরোক্ত কারণে বাঙ্গালীর চালিত ডেইরী ফারম উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু সাহেব ব্যবসায়ী যেখানে এই ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সেই খানে ইহার উন্নতি সাধন করিয়া প্রভুত অর্থ লাভ করিতেছেন; আলিগড় ডেইরী ফারম, বোম্বাইয়ের ডেইরী ফারম গুলিও ভারতের সমগ্র মিলিটারি ষ্টেশনের ডেইরী ফারম গুলি কলিকাতার অতি পুরাতন এক্সেলসার ডেইরী ফারমটী এখনও জীবিত রহিয়াছে। দেখা যায় যে সাহেব ব্যবসায়ীর নিজের অভিজ্ঞতা না থাকিলে একটী

অভিজ্ঞ কাজের লোক বাছিয়া তাহাকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে তাহার উপর কাজের ভার দিয়া ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন ও ডেইরী ফারমের স্থান নির্ব্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কার্য্যে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করেন। অংশীদার ডেইরী ফারমে বাস করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিজ তত্ত্বাবধানে সকল কার্য্য চালাইয়া থাকেন। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ঠিক ইহার বিপরীত, এতদ্ব্যতীত যে জঘন্য স্থান নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েন সেখানে তাঁহার বাস করিবার কোন বন্দবস্ত না থাকায় বা অপর কোন কারণে বাস করেন না; প্রত্যহ সকালে বিকালে আয়ব্যয়ের হিসাব দেখিতে আসেন। ব্যবসায়ের অজ্ঞতা পাছে প্রকাশ হয় ও লোকসানের আশঙ্কায় ধূর্ত্ত গোয়ালা চাকরের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়েন ও গোয়ালার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া দুধে ভেজাল মিশ্রিত করেন, ভেজালের জল খানা ডোবা যেখান হইতে প্রাপ্ত হয়েন তাহাই দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া থাকেন। যত দিন গোয়ালা চাকরের স্বার্থে আঘাত না পড়ে ততদিন গাভী হঠাৎ পীড়িত হইয়া দুগ্ধ বন্ধ করে না কিন্তু কোন কারণে ইহার ব্যতিক্রম হইলে গাভীর দুধের বাঁট আক্রান্ত হইতে সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহাদের এই কার্য্যে অভিজ্ঞতা আছে তাহারা কখনই ফারমের বাহিরে বাস করেন না ও নিজ তত্ত্বাবধানে সমগ্র পরিচর্য্যা করেন, ও ডেইরী ফারমের চুরি নিবারণ করিয়া থাকেন। অভিজ্ঞ লোকের নিকটে গোয়ালার চাতুরী থাকে না, ও তাঁহারা গোয়ালা চাকর একেবারেই পছন্দ করেন না, কাজ চালান অপর যে কোন জাত প্রাপ্ত হইলে তাহাদের নিযুক্ত করেন। অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর উপর গোয়ালার প্রভাব এরূপ বিস্তার করে যে তিনি তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া থাকেন। নিজ তত্ত্বাবধান ভিন্ন এ ব্যবসায় লাভ হইতে পারে না।

২। বাঙ্গালী ডেইরী ফারমে ষণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ গাভীর মত ষণ্ড যে একটী ডেইরী ফারমের অঙ্গ বিশেষ তাহা কেহই জ্ঞাত নহেন। বার মাস সমভাবে দুধের যোগান রাখিতে হইলে নিদৃষ্ট সময়ে জননক্রিয়া সম্পাদনের জন্য একটী বিশুদ্ধ জাতের হৃষ্টপুষ্ট ষণ্ডের একান্ত প্রয়োজন। গাভীর যেরূপ আকৃতি, আয়তন, গঠন দুগ্ধ গণ্ড ও দুগ্ধ দায়িকা শক্তি ও জাতের বিশুদ্ধতা দেখিয়া ক্রয় করা উচিত ষণ্ডের সেইরূপ সর্ব্বাগ্রে জাতের বিশুদ্ধতা পরে আকৃতি আয়তন গঠন, ও পিতা মাতার পরিচয় যতদূর সম্ভব জানিয়া ক্রয় করিতে হয়। ডেইরী ফারমের এক জাতের গাভী ও ষণ্ড হইলে ভাল হয় নচেৎ যে কোন বিশুদ্ধ জাতের ষণ্ড ক্রয় করিতে হইবে। জাতের বিশুদ্ধতার উপর লক্ষ্য না রাখিলে, পরবর্ত্তী সন্তান গুলি হীন বংশ হইবে। প্রাণী সম্পদের যে সকল গুণাবলী মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করে সেগুলি সংখ্যায় যত অধিক হয় ও সেগুলির উৎকর্ষ যাহাতে সাধিত হয় সতত সেই চেষ্টায় থাকিলে, উহাদের উন্নতি সাধন হইয়া থাকে। প্রাণী সম্পদের গুণাবলী এক শোণিতের ভিতর আবদ্ধ

হান্সি হিসার গাভী
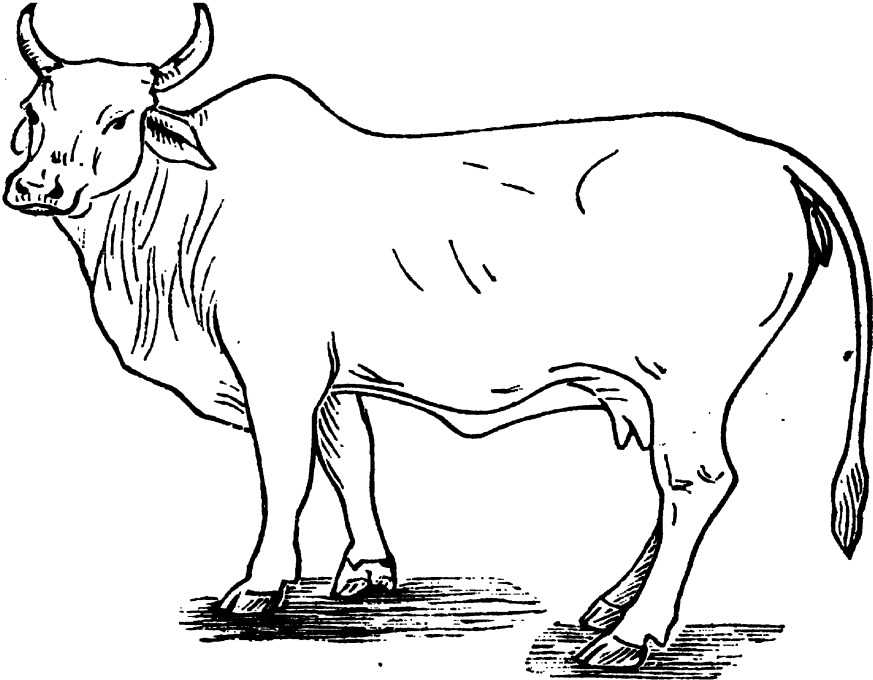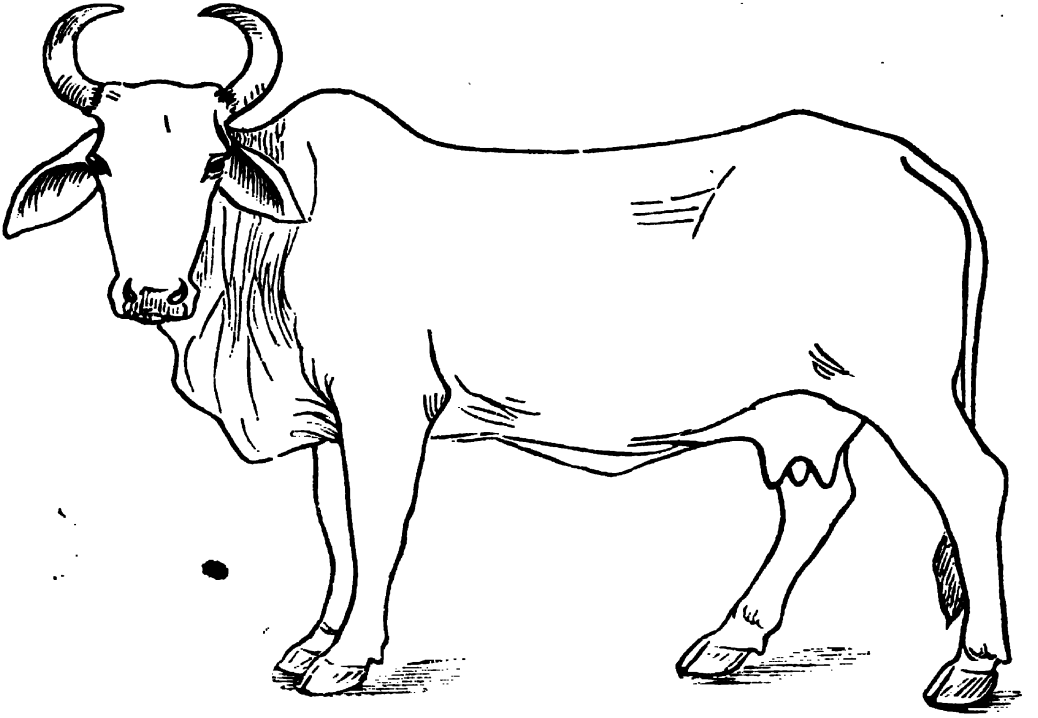
থাকিয়া যত পুরাতন হইতে থাকে, ততই সেগুলি মজ্জাগত হইতে থাকে, ও গুণাবলী মজ্জাগত হইয়া যেমন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, সেইরূপ স্থায়ী ভাবে রক্ষিত হইয়া বংশানু ক্রমে সন্তানে সংক্রামিত করিবে! গোজননে ষণ্ডের বিশুদ্ধতার প্রভাব এত বেশী যে উহার দ্বারা শঙ্কর শাবক ও ক্রমাগত আট পুরুষ পর্য্যন্ত উৎপাদন করিলে পিতার সমগ্র গুণাবলী শঙ্কর জাত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ডেইরী ফারমে বিশুদ্ধ জাতীয় ষণ্ড কি করিতে পারে বা না পারে তাহা কেহ জানেন না বা জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

৩। জাতি নির্ণয় করিয়া বিশুদ্ধ জাতের গাভী বা ষণ্ড নির্ব্বাচন, শুধু পুস্তক পাঠে জানা যায় না, এক স্থানে এক গোটে সমগ্র দুগ্ধবতী গাভী দেখিতে পাওয়া যায় না দেশ ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন জাত দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করা যথেষ্ট অর্থব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে জাতের গাভী অধিক দুগ্ধ প্রদান করে ও যাহাদের পুংসন্তান গুলা কৃষিকার্য্যের উপযোগী তাহারাই বাস্তবিক ডেইরী ফারমে পালনের উপযোগী। বিলাতি গাভী অত্যধিক পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে কিন্তু উহাদের কুকুদ হীন পুংসন্তান গুলা কি কৃষি কার্য্য, কি গাড়ী টানা, কোনটির উপযোগী নহে, এ জন্য ইহাদের পালনে লাভ নাই, গো সম্পদের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য শুধু দুধ নহে, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যাদির অভাব মোচনের সহিত কৃষির উন্নতি সাধন যতদূর সম্ভব এক যোগে চেষ্টার প্রয়োজন, যখন ডেইরী ফারমে উৎকৃষ্ট জাতের গাভী ও ষণ্ড প্রয়োজন, তখন, ডেইরী ফারমের গাভী ও ষণ্ড বাছাই করিয়া স্থাপন করিলে দুধের অভাব মোচনের সহিত শুধু উহাদের বৎস গুলিকে পালন করা যায় তাহা হইলে সহজেই আমরা দেশের জলবায়ুর উপযোগী উৎকৃষ্ট গো সম্পদ প্রাপ্ত হইতে পারি, এই সুযোগ কোনমতে অবহেলা করা উচিৎ নহে; একযোগে গোপালন, গোজনন ও উহাদের নির্ব্বাচন যত অল্প ব্যয়সাধ্য, শুধু ব্রিডিং ফারম্ (Breeding farm) তাহা হইতে পারে না। এজন্য যে সকল জাত আমাদের প্রয়োজন তাহা ভারতবর্ষেই আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি ইংলণ্ডের শর্ট হরণ বৃহৎ হরণ আমদানী করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ভারতের সমগ্র গো পরিবারের দুগ্ধ দায়িকা শক্তি তুলনা করিলে দৃষ্ট হয় যে—

পঞ্জাবের প্রদেশের হান্সি গাভী
,, মণ্টগোমারি গাভী
সিন্ধু দেশের সিন্ধি ,,
গুজরাট ,, গির গাভী
মান্দ্রাজ প্রদেশের নোলোর গাভী

আরব দেশের এডেন গাভী

দিল্লির মহিষ

ডেইরীকারমের উপযোগী, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা ইহাদের ভিতর হইতে দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ বাছার প্রয়োজন। গাভীর বর্ণ জাতের বিশুদ্ধতার পরিচায়ক, জাত বাছিতে গরুর সিং একটী প্রধান চিহ্ন; ইহার সহিত গড়ন দেখিয়া অনেক সময়ে জাত চেনা যায়। গরুর সিং বা বর্ণ যেমন একটী পদার্থ কিন্তু গঠন তাহ নহে, বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশ ও সমাবেশের সহিত সামঞ্জস্য যুক্ত হইলে তবে গড়ন হয়। ইহাকে মনুষ্য একদিনে, বা পুস্তকপাঠে আয়ত্ত করিতে পারে না। যে সকল চিহ্ন ও বর্ণের দ্বারা জাতি নির্ণয় করা যায় তাহা ছবিতে ফোটান সহজ নহে, কিন্তু দুই তিনটী বিভিন্ন গঠনের গরুর চিত্র দেখিলে ও সেই চিত্রগুলি জাতের অনুরূপ হয় তাহা হইলে সেই চিত্র হইতে যাহা কিছু সামান্য শিক্ষা হয়, সেই শিক্ষাটুকু হাজার পাতায় শুধু বর্ণনা করিলে হয় না। এজন্য জাতি নির্ণয় অধ্যায়ে প্রত্যেক জাতের অবিকল অনুরূপ বা চিত্রের সহিত, যে চিহ্ন দেখিলে সহজে জাত চেনা যাইবে তাহাই প্রদত্ত হইল। ইহাদের অপেক্ষা বলিষ্ট ও বড় জাতের গরু ভারতের আর কোথায় দৃষ্ট হয় না, পাঞ্জাবের কতকগুলি জেলায় ইহাদের জন্মস্থান বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। মথুরার কুশি জাতের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য দেখা যায়।

বর্ণ—হাঁন্সির সাদা রং ও কাণের ভিতর ঈষৎ লালের আভার সহিত হরিদ্রাভ জাতের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে। কিন্তু ঈষৎ ধূসর বা শ্যামল বর্ণও দৃষ্ট হয়।

সিং—অল্পাধিক বড় মোটা ও ঈষৎ চেপ্টা মাথার পাশ হইতে বাহিরের দিকে বক্র হইয়া ভিতরের দিকে প্রবেশ করে।

গুণ—ইহাদের সকল গাভী শান্তপ্রকৃতির না হইলেও গির গাভীর মত উচ্ছৃঙ্খল নহে, ইহার চারণ পছন্দ করিলেও ঘরে বসিয়া খাইতে পারে যেমন বলিষ্ঠ সেইরূপ অধিক দুগ্ধবতী, ভিন্ন দেশে নীত হইলে দুধের পরিমাণ কমে, কিন্তু ইহাদের দুধে মাখন বেশী। ইহারা বৎসরে ৫ মাস হইতে ৬ মাসকাল ছাড়ন্ত থাকে ও অল্প বয়সে ঋতুমতী হয়, ইহাদের পুংসন্তান-গুলি ২০।৩০ বিশ-ত্রিশ মণ মাল অক্লেশে বহন করে ও উন্নত প্রণালীর বড়, চাষের লাঙ্গল সহজে টানিয়া থাকে। দুধের পরিমাণ ৮ সের হইতে ২০ সের পর্য্যন্ত।

গড়ন—মাথা উন্নত কপাল প্রশস্ত, নাকের ফুটা বড়, চক্ষু উজ্জ্বল, পিট অপেক্ষা পাছা উচু ও বিস্তৃত, বুক প্রশস্ত লেজ দীর্ঘ ও কুকুদ, ঝুল মানান সই, নাভীর নিচে সামান্য ঝুল থাকে, যোনীদ্বারের দুই পার্শ্ব কুঞ্চিত, পালান আটা ও ঝোলা দুই রকম পাওয়া যায় কান লম্বা,
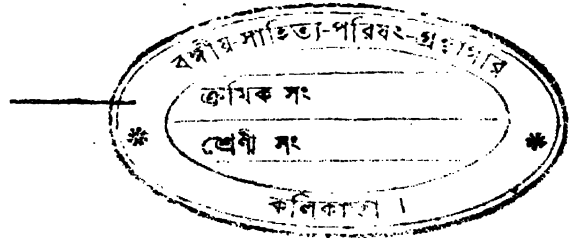
সরকারীতন্তুতত্ত্ববিদের কার্য্যবিবরণ

সন ১৩২৩ সাল

১। লাল মাটিতে পাটের সার:—গত কয়েক বৎসরের বিবরণীতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে এই জমিতে চূণ এবং হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে বিঘা প্রতি গড়ে ১॥ মণ পাট অধিক হইতে পারে এবং সারের মূল্য বাদ দিয়াও ইহাতে ৯৲ টাকা লাভ দাঁড়ায়। চূণ ও হাড়ের গুঁড়ার সহিত ধৈঞ্চা প্রভৃতি সবুজ সার প্রয়োগ করিলে লাভ হয় কি না স্থির করিবার জন্য ১৯১৫ সালে কয়েক খণ্ড জমিতে নূতন করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করা হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সবুজ সার প্রয়োগ করিলে পাটের ফলন আরও বেশী হয়। কিন্তু ইহার অসুবিধা এই যে এই জমিতে আউস ধান প্রভৃতির ফসলের আবাদ চলে না। সবুজ সার প্রয়োগ করিলে যে পরিমাণ পাট বেশী উৎপন্ন হয় তাহাতে এই ক্ষতিপূরণ করিয়াও লাভ হইবে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়; এ কারণ আরও কয়েক বৎসর পরীক্ষা করা আবশ্যক।

২। পাটের জমিতে পটাস সার:—গত বৎসরের বিবরণী হইতে দেখা যাইবে যে ১৯১৫ সালে পটাস সার (ক্ষার) ব্যবহার করিয়া পাটের বেশ ফলন হইয়াছিল।

১৯১৬ সালে এই পরীক্ষাক্ষেত্রে পুনরায় পাট বপন করা হয় কিন্তু পটাস সার না দিয়া কেবল মাত্র রেড়ির খৈল ও সোরা প্রয়োগ করা হইয়াছিল। পটাস সার (ক্ষার) এক বৎসর ব্যবহার করিলে কয় বৎসর পর্য্যন্ত তাহার গুণ থাকে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য পুনরায় পটাস সার (ক্ষার) ব্যবহার করা হয় নাই। ১৯১৬ সালে অনা-

বৃষ্টির জন্য পাট ভাল হয় নাই। নিম্নের পরীক্ষার ফল হইতে দেখা যাইবে যে পাট সকল ক্ষেত্রেই প্রায় সমান জন্মিয়াছিলঃ—

		১৯১৫	১৯১৬
বিনা সার বিঘা প্রতি গড়পড়তা ... (check plot)।	ফলন	৯৷১৷৷৶০	৩৷৭৷৶০
সোডা সার	,,	৯৷৭	৩৷০
পটাস সার	,,	১১৷৴৯৷৴০	৩৷২৷৴০

১৯১৬ সালে সকল ক্ষেত্রের পরীক্ষায় ফল প্রায় সমান হওয়ায় প্রমাণ হইতেছে যে ১৯১৫ সালে যে পটাস সার ক্ষার প্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহা সেই বৎসরের পাটেই প্রায় সমস্ত শোষণ করিয়া লইয়াছিল।

৩। রাইজকৃটোনিয়া (Rhizoctonia):—ইহা এক প্রকার পাটের পচা রোগ, সম্প্রতি লাল মাটিতে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই রোগ দেখা গিয়াছে। এই রোগ আরম্ভ হইলে ডাটাগুলি কাল হয়, পাতাগুলি ক্রমশঃ ঝরিয়া পড়ে ও অবশেষে গাছগুলি মরিয়া যায়। ইহা অধিকাংশ কৃষি শস্য আক্রমণ করে। প্রায় সকল পাটের জমিতেই রাইজকৃটোনিয়া জন্মে কিন্তু সাধারণতঃ যে সকল জিলাতে পাট ভাল জন্মে উহাতে ইহার কম ক্ষতি হয়। ঢাকাফার্মে কতকগুলি ক্ষেত্রে এই রোগ অনেক ক্ষতি করিয়াছিল প্রায় দশ আনা গাছ মারিয়া ফেলিয়াছিল। যে সকল ক্ষেত্রে ভাল সার বিশেষতঃ পটাস পড়িয়াছিল তাহাতে এই রোগ অপেক্ষাকৃত অনেক কম লাগিয়াছিল। আরও দেখা গিয়াছিল যে একই ক্ষেত্রে ক্রমাগত দুই বৎসর পাট জন্মাইলে এই রোগ আরও অধিক লাগে। পূর্ব্ববর্ণিত সোডা ও পটাস (ক্ষার) সার প্রয়োগ করিলে রাইজকৃটোনিয়া কম লাগে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য এই সকল ক্ষেত্রে ১৯১৭ সনে পুনরায় পাট বপন করা এবং নূতন করিয়া সোড়া ও পটাস সার প্রয়োগ করা হয়। এই বৎসর পাট ভাল জন্মে নাই বটে কিন্তু পটাস সারের জমিতে অপেক্ষাকৃত ভাল ও রোগ শূন্য পাট হইয়াছিল। কোন ক্ষেত্রে কতকগুলি গাছে রোগ লাগিয়াছিল তাহা গণনা করা হইয়াছিল। নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল।

সার।	বিঘা প্রতি রোগাক্রান্ত গাছের সংখ্যা।
(ক) সোডা সার	৫,৮৬২
(খ) বিনা সার	৫,২১৬
(গ) কচুরীর ছাই (যাহাতে পটাস আছে)	৬৩৪
(ঘ) সোডা সার	৩,৩৮৩
(ঙ) বিনা সার	২,৯৫৮
(চ) কচুরীর ছাই	৩৩২

এই পরীক্ষার ফল হইতে দেখা যাইতেছে যে কচুরীর ছাই সার দিলে রাইজক্টোনিয়া রোগ অনেক পরিমাণে নিবারণ করা যায়। যে দুই ক্ষেত্রে এই সার দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে শতকরা মাত্র একটী করিয়া গাছ রোগা হইয়াছিল; অন্যান্য ক্ষেত্রে শতকরা ১০টী পর্য্যন্ত গাছে রোগ জন্মিয়াছিল এবং পরে তাহাদের সংখ্যা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সকল ক্ষেত্রের ফলন অতি অল্পই হইবে এবং পটাস ক্ষেত্রের ফলন অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে।

কচুরী, টাগই বা বিলাতী পানা (Water Hyacinth):—আজকাল এই জলজ উদ্ভিদ প্রায় সকলের নিকটেই পরিচিত; কারণ ইহা কেবল মাত্র বঙ্গদেশের খাল, বিল ইত্যাদিতে নহে ভারতবর্ষের ও ব্রহ্মদেশের অনেক স্থানেই বড়ই ক্ষতিকর হইয়া উঠিয়াছে। ১৯১৫ সন হইতে তন্তুতত্ত্ববিদ মহাশয় ইহার পরীক্ষা আরম্ভ করেন ও উহার রসায়নিক বিশ্লেষণ করেন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহাতে প্রচুর পরিমাণে পটাস আছে। একারণ ইহা পাটের পক্ষেই উৎকৃষ্ট সার। ১৯১৬ সালে অনেকগুলি ক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষায় পচান কচুরী ও কচুরীর ছাই উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছিল। অন্যান্য পটাস সার যথা—কারবনেট অব পটাস ও সলফেট অব পটাসও ব্যবহৃত হইয়াছিল। যে সকল ক্ষেত্রে পচান কচুরী কিম্বা কচুরীর ছাই প্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহাদের ফলন বিনা পটাস ক্ষেত্র অপেক্ষা বিঘা প্রতি প্রায় ২৲ মণ অধিক হইয়াছিল। এই পরীক্ষা সম্বন্ধে যদি কেহ সমস্ত বিবরণ জানিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহার পুসা হইতে প্রকাশিত পুস্তিকা (Bulletin No, 71—Water Hyacinth—its value as a fertilizer) পাঠ করা উচিত। ক্ষেত্রের নিকটে কচুরী জন্মিলে তাহাকে বর্ষার শেষে স্তূপাকারে রাখিয়া পচান উচিত এবং পরে সেই পচান কচুরী ক্ষেত্রে দেওয়া কর্ত্তব্য। দূর হইতে কচুরী আনিতে খরচ অধিক পড়ে একারণ উহা ছাই করিলে সুবিধা হইবে। যাহারা নিজের জমিতে ছাই ব্যবহার করিতে অপারগ তাঁহারা কলিকাতায় মেসার্স সওয়ালেস কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিতে পারেন। কলিকাতায় তাহারা ইউনিটে চারি টাকা হিসাবে দাম দিয়া ছাই ক্রয় করিতেছেন (অর্থাৎ যদি ছাইতে শতকরা এক ভাগ পটাস থাকে তাহা হইলে প্রতি মণ ৵০ আনা হইবে।) সওয়ালেস কোম্পানি ইহার মধ্যেই ৭০০০৲মণ ছাই ক্রয় করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ ঢাকা ফার্মের ব্যবহারের জন্য ৫০০৲ মণ ছাই ক্রয় করিয়াছেন। কি প্রকারে কচুরী পোড়াইতে ও পচাইতে হয় তদ্বিষয়ে দুইখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কচুরি ছাইয়ের কারবার ভালরূপে চলিবে এবং তাহা হইলে এই উপদ্রব সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত না হইলেও অনেকটা কম হইবে।

কচুরী সম্বন্ধে কোন কিছু জানিতে হইলে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের তন্তুতত্ত্ববিদ মহাশয়ের নিকট ঢাকাতে আবেদন করুন।

৫। বীজ নির্ব্বাচন ও উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহঃ—১৯১৬ সনে ৩০০/ মণ কাকিয়া বোম্বাই পাটের বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল। গ্রাহকের সংখ্যা বেশী হওয়ায় এই বীজে সঙ্কুলান হয় নাই। ১৯১৯ সনে যাহাতে ১,৫০০/ মণ বীজ সরবরাহ করিতে পারা যায় তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বীজ উৎপন্ন করিবার জন্য ৩০,০০০ হাজার প্যাকেট কাকিয়া বোম্বাই পাটের বীজ জিলাকর্ম্মচারিগণ পঞ্চায়েতদিগের দ্বারা বিতরণ করিয়াছেন। এই বীজ উৎপন্ন করিতে যদি সকলেই কৃতকার্য্য হয়েন তাহা হইলে আগামী বৎসরে ৯০,০০০ বিঘা বপন করিবার উপযুক্ত বীজ পাওয়া যাইবে। ১৯১৬ সনে কাকিয়া বোম্বাই এবং স্থানীয় পাটের তুলনা করিবার জন্য নিম্নলিখিত বিভিন্ন পাট গুদাম আফিসের সন্নিকটে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কাকিয়া বোম্বাই পাটের যে ফলন অধিক তাহা এই পরীক্ষার ফল হইতে নিঃসন্দেহে জানা যায়। পাটগুদাম আফিসের পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ার জন্য এই বীজের প্রচলন অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে। কলিকাতার মেসার্স সিন্‌ক্লেয়ার মরেও ল্যোনগুেল এবং ক্লার্ক এবং কোম্পানি যাহাদের বিভিন্ন পাটগুদাম অফিসের জমিতে এই পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাঁহারা বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের ধন্যবাদার্হ।

জল বায়ুর গুণে অনেক জিলায় দেশী পাট (গোল গুটি পাট অথবা তিত পাট) অপেক্ষা দেও (পাট লম্বা গুটি কিম্বা মিঠাপাট) ভাল জন্মায়। এই সকল জিলার জন্য বিভিন্ন নির্ব্বাচিত বীজ (pure lines) গত তিন বৎসর হইতে উৎপন্ন করা হইতেছে। আশা করা যায় যে আগামী বৎসর ১০০/ মণ এই নির্ব্বাচিত বীজ (pure lines seeds) পাওয়া যাইবে। এই বীজ বপন করিবার যদি বীজ পাট রাখা হয় তাহা হইলে যে বীজ উৎপন্ন হইবে তাহাতে ১৯১৯ সনে এই সকল জিলায় অনেক স্থানেরই সঙ্কুলান হইবে।

রেশমকীট পালন।

(সরকারী কার্য্যবিবরণী)

এই বিভাগের জন্য একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত আছে। কৃষীবিভাগের ডিরেক্টর, মুর্শিদাবাদের কালেক্টর ও তিনজন রেশমতত্ত্ব-অভিজ্ঞ ব্যক্তি উহার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই বৎসর উক্ত সমিতির ৪টী অধিবেশন হইয়াছিল।

রেশম শিল্প—এই বৎসর বঙ্গীয় রেশমের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এই বিভাগ হইতে রেশমকীটের ব্যবসায়ীগণ অনেক উপকার পাইতেছে, ইহা তাহারা বেশ বুঝিয়াছে। বীজাগারগুলি হইতে অনেক পরিমাণে নারোগ ও বিশুদ্ধ বীজকোষ উৎপাদন করা হইয়াছে; উহা স্থানীয় লোকেরা অধিক দরে ক্রয় করিয়াছেন ও উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছেন। প্রত্যেক বীজাগারের তত্ত্বাবধানে মনোনীত বসণিগণের দ্বারা নীরোগ ও বিশুদ্ধ বীজ উৎপন্ন করা হইয়াছে ও অন্যান্য বসণিগণের নিকট উহা বিক্রয় করিয়া অনেকের বিশেষ উপকার করা হইয়াছে। এইক্ষণ রেশমকীট ব্যবসায়িগণ উত্তম নীরোগ ও বিশুদ্ধ বীজকোষ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাইতেছে। এই জন্য সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত এই ব্যবসা পুনরায় অবলম্বন করিয়া লাভবান হইতেছে।

এই বৎসরে কাঁচি কোয়া ৬০৲।৬২৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইয়াছে, তুঁত পাতার মূল্য প্রতি মণ ৬৲।৬৷৷০ টাকা দর এবং বিশুদ্ধ ও নীরোগ বীজকোষ প্রতিসের ৬৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছে। অনেক প্রাচীন ব্যবসায়িগণ বলেন যে তাঁহারা বহুকাল যাবত এত অধিক মূল্য দেখেন নাই। ইহার বিশেষ কোন কারণ থাকিতে পারে বটে কিন্তু এই বিভাগের বহু যত্নের যে যথেষ্ট ফল হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

বীজাগারের কার্য্য—আলোচ্য বর্ষে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি ও নানা দুর্য্যোগ বশতঃ একটী প্রধান বন্দের বিশেধ ক্ষতি হইয়াছিল। তত্রাচ গত বৎসর অপেক্ষা সমুদয় বীজাগারগুলিতে অধিক পরিমাণে নীরোগ বিশুদ্ধ বীজকোষ উৎপন্ন করা গিয়াছে। পর বৎসর সমস্ত বীজাগার সমূহে ১০,৯৭ কাহণ ১৪ পণ ৪২ গণ্ডা বীজকোষ ১২৮৯৬।০/৬ পাই মূল্যে বিক্রয় করা গিয়াছিল এবং এই বর্ষে ৯৬০১ কাহণ ১৩ পণ ১২২ গণ্ডা বীজকোষ ১,২৮৯৬।০/৬ পাই মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। প্রত্যেক বীজাগারের তত্ত্বাবধানে মনোনীত বসণিগণের বাটীতে নীরোগ বিশুদ্ধ বীজকোষ সকল উৎপাদন করাইয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে; ইহাতে উহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ পাইয়াছে। এই সমুদয় কারণ বশতঃ বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের উপদেশ লইয়া কার্য্য করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন। এইক্ষণ কীট পালকগণ সকলেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে উৎকৃষ্ট বীজ তৈয়ার করিতে হইলে পূর্ব্বকালের কতকগুলি কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক নিয়মে কার্য্য করিতে হইবে এবং তুঁতিয়া ও গন্ধক প্রভৃতির ব্যবহারে কতকগুলি উৎকৃষ্ট রোগের আক্রমণ হইতে পোকা রক্ষা করা আবশ্যক। পূর্ব্বে এই বিভাগ হইতে তুঁতিয়া কিম্বা গন্ধক বিনা মূল্যে বিতরণ করিলেও উহারা ব্যবহার করিতে স্বীকার করিত না, কিন্তু আজকাল দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইলেও উহারা এই সমুদয় ঔষধ নিজ

ব্যয়ে খরিদ করিয়া ব্যবহার করিতেছে ; ইহা বড়ই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। এই বৎসরে ১॥৪৮০ সের তুঁতিয়া ও ৬॥৭৵০ পোয়া গন্ধক যথাক্রমে ৩৪৮০ আনা ও ৮৫৫/৯ পাই মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে।

কীটগুলিকে মাছির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তারের জাল ব্যবহার করিলে বড়ই উপকার হয় ইহা প্রত্যেক রেশম কীটপালকই ভালরূপে বুঝিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান যুদ্ধ হেতু উক্ত প্রকারে জাল একেবারেই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বসণিগণের প্রয়োজন মত উহা সরবরাহ করা যাইতেছে না। উক্ত রেশমকীট পালকগণের মধ্যে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা সুতার জাল দ্বারা কাশার' করিতেও বিশেষ ইচ্ছুক ; কিন্তু ইহার মূল্যও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া উহারা ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না। এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণ যেরূপ শ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিতেছে তাহাতে রেশম শিল্প অচিরে পুনরায় উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে ইহা বেশ আশা করা যায়। উক্ত কর্ম্মচারিগণ প্রজা সাধারণের তুঁতক্ষেত্রের উন্নতি করিবার জন্যও নিশ্চেষ্ট নহেন। তাঁহাদের উপদেশের ফলে পলুর টাট্‌কা নাদি, কাশার বা মরা পলু জমিতে সারের জন্য ব্যবহার করার প্রথা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

মালদহ জিলার বসণিগণ প্রতি কাহণ বিশুদ্ধ নীরোগ সরকারী বীজাগারের সঞ্চ হইতে গড়ে ১০০ কাহণ হইতে ১২৫ কাহণ পর্য্যন্ত রেশম গুটি পাইয়াছেন। এরূপ ফল বহুকাল যাবৎ পাওয়া যায় নাই। প্রত্যেক বীজাগার সংস্পৃষ্ট জমিতে মনোনীত বোম্বাই তুঁত গাছের কলম রোপণ করা হইয়াছে, ইহাতে অধিক পরিমাণে বীজকোষ উৎপন্ন হইবে এরূপ আশা করা যায়। চৈত্র ও বৈশাখের ভীষণ গ্রীষ্মে এই তুঁত গাছে টুক্‌রা লাগিতে পারে না।

দৈব বশতঃ কোন বীজাগারে রেশম কীট ভাল না পাকায় উহা বীজের জন্য বিক্রয় করা হয় নাই।

যে সমস্ত বীজাগারে গোবর বা পুকুরের পাঁক মাটির অভাববশতঃ সার দেওয়া কঠিন সেই খানে রেড়ির খৈল ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বসণী সাধারণের তুঁত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রয়োজন ও সম্ভবমত উত্তম তুঁতের মুড়া উহাদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

কীট পালন শিক্ষা—রাজসাহীর রেশমকীটপালন শিক্ষার বিদ্যালয়

হইতে ১১ জন ও বহরমপুরের বিদ্যালয় হইতে ২ জন ছাত্র পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে। তাহারা যথারীতি পুরস্কার পাইয়াছে ও আদর্শ পলুঘর নির্ম্মাণ করিয়া বৈজ্ঞানিক মতে রেশম কীট পালন করার উপকারিতা গ্রামবাসীদিগকে দেখাইতেছে। বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ ইহাদের কার্য্য তত্ত্বাবধান করেন।

কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী ঃ—রংপুর বানজেটিয়া এবং সিউরি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীতে যথাসম্ভব বোধগম্য ভাবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে কীট পালন সম্বন্ধে শিক্ষা ও অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী প্রদর্শিত করা হইয়াছিল।

আগামী বৎসরের জন্য কার্য্যের তালিকা ঃ—

১। সমুদয় বীজাগারে অধিক পরিমাণে নীরোগ বিশুদ্ধ বীজকোষ উৎপাদন ;

২। অধিক জমিতে তুঁতের চাষ ;

৩। প্রত্যেক বীজাগারের তত্ত্বাবধানে সাধারণ বসণিগণের পুত্রদিগকে রেশম কীট পালন শিক্ষার জন্য পাঠশালা স্থাপন করা ;

৪। যতদূর সম্ভব প্রত্যেক বীজাগারের নিকট মনোনীত বসণিগণের দ্বারা নিজব্যয়ে বীজাগার স্থাপন করা ;

৫। উক্ত মনোনীত বসণিগণের বাড়িতে যত অধিক পরিমাণে সম্ভব কারখানার ন্যায় বিশুদ্ধ নীরোগ বীজকোষ উৎপন্ন করাইয়া বঙ্গদেশের উপযুক্ত বীজের অভাব মোচন করা ;

৬। প্রত্যেক বীজাগারের সংসৃষ্ট উক্তরূপ পাঠশালা স্থাপন করাইয়া স্বল্প ব্যয়ে সাধারণ বসণিগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মতে রেশম কীট পালনের শিক্ষা বিস্তার করা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ সাল।

বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা

অদ্যাপি প্রাথমিক কিম্বা প্রাবেশিক বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই বলিলেই হয়। প্রথম শিক্ষারম্ভ হইতে ছাত্রগণের কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক একথা সকলেই স্বীকার করেন এবং তাহার জন্য কিছু উদ্যোগ আয়োজনেরও প্রয়োজন ইহা কি কর্ত্তৃপক্ষ, কি দেশবাসী সকলেই বুঝিতেছেন কিন্তু এতাবৎকাল তাহার কোন সুবন্দোবস্ত হয় নাই বা হইবার চেষ্টাও দেখা যায় না। যে দেশের ২০ কোটী লোক চাষ ব্যবসায়ী সে দেশে কৃষি-শিক্ষার যে কতটা প্রয়োজন তাহা সকলের ধারণা হওয়া উচিত। অন্যান্য দেশে কৃষি কর্ম্মে বিপুল আয়োজন এবং তত্তৎ দেশে কৃষি-শিক্ষার সুব্যবস্থা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

১৯১৩ শালের ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের একটী মন্তব্য অতর্কিতভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আমরা আজ আবার কৃষি-শিক্ষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। মন্তব্যটীর কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম—The scheme of primary and Secondary education for the average scholar should steadily, as trained teachers become available, be diverted to more practical ends eg, by means of manual training, gardening, out door observation, practical teaching of geography, school excursions, organised tours of instruction etc."

আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনায় অতি আক্ষেপের সহিত জানাইয়াছিলাম যে প্রাথমিক বা প্রাবেশিক বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষার প্রধান অন্তরায় প্রকৃত শিক্ষকের ও বিদ্যালয় সংলগ্ন উদ্যানের অভাব।

আমাদের দেশে বিদ্যামন্দিরসমূহ নিরতিশয় অপরিসর স্থানের উপর স্থাপিত, তাহাতে শিক্ষালয়ের ঘর দুয়ার ব্যতীত ছাত্রগণের সচ্ছন্দ বিচরণের স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই, উদ্যান-উপযোগী তৎসংলগ্ন ভূমি থাকাত পরের কথা। এখন দেখিতেছি যে হাওয়ার গতি কথঞ্চিৎ ফিরিয়াছে আমাদের স্কুল কলেজগুলি আর ছাত্রগণকে কেবল মাত্র সাধারণ শিক্ষা দিয়া সন্তুষ্ট হইতে চায় না। কেবল কেরাণী গিরি বা পরের চাকুরী করিলে আর চলিবে না। ছাত্রগণকে ব্যবহারোপযোগী শিক্ষা দিতে হইবে তাহাদিগকে শিখাইয়া পড়াইয়া সংসারের ও সমাজের উপযোগী করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে নতুবা ভীষণ জীবনসংগ্রামে তাহারা টিকিতে পারিবে না। ছেলে মেয়েদের প্রকৃতির সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া, প্রকৃতির জল, মাটি হাওয়া উত্তাপ এগুলিকে কাজে লাগাইতে শিখান মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য। মানুষের নিজ শক্তির উদ্বোধন করিতে পারিলে মানুষ সহজে প্রকৃতিকে নিজ আয়ত্ত্বে আনিতে পারে।

আমাদের এই বিষয়ের আলোচনার সমসময়ে বা তাহার পরে কোথাও কোথাও স্কুলের সংলগ্ন বাগান রচিত হইয়াছে, এবং ঐরূপ বাগানের সংখ্যা বাড়িতেছে কিন্তু তথাপি আমরা নিসংঙ্কোচে বলিতে পারি যে তাহাদের সংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই যা ছাত্রগণকে প্রকৃতির সহিত পরিচয় করিয়া দিবার মত শিক্ষকের সংখ্যাও এখনও অত্যল্প। চাষনিরত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে লোক বাছিয়া লইয়া শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিতে পারিলে এবং তাহাদিগকে শিক্ষকতার উপযোগী শিক্ষা দিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে পারিলে আমাদের অভাব মোচন হইলেও হইতে পারে কিন্তু সে দিক দিয়া আমাদের দেশের উদ্যোগ আয়োজন এখনও অধিক অগ্রসর হয় নাই। প্রত্যেক গ্রাম্য গৃহস্থ যাহাদের জমির সহিত সম্পর্ক আছে তাহাদের ছেলে মেয়েদের কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, তাহাদের জল, মাটি, আবহাওয়ার সহিত পরিচয় করিয় দিতে পারিলে আমাদের দেশের কৃষি সহজেই উন্নতির পথে চলিবে।

অধিকাংশস্থলে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা আমাদের সাংসারিক ব্যাপারে বড় কিছু বেশী কাজে লাগে না—যাহারা সাহিত্য সেবী হইবে তাহাদের ব্যাকরণ শিক্ষার আবশ্যক, যাহারা দার্শনিক হইবে তাহাদের ন্যায় শাস্ত্র পড়ার প্রয়োজন কিন্তু ব্যবহার উপযোগী জ্ঞানের জন্য অত কিছু শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। চাষীর ছেলেদের সাধারণ শিক্ষা দিয়া বরং তাহাদের অনিষ্ট করা হয়। শিক্ষা পাইয়া তাহারা আর চাষের কাজ করিতে রাজি হয় না এবং তাহার পিতা মাতাও তাহাদিগকে পয়সা খরচ করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া চাষে নিযুক্ত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কোন একটা চাকুরি জুটাইয়া দুপয়সা রোজগার করিতে পারিলে তাহারাও সুখী হয়, তাহাদের পিতা মাতাও সুখী হয়। ইহাতে চাষীদের প্রকৃতপক্ষে উপকার না হইয়া

অপকার হয়। একজন এমেরিক লেখক সত্যই বলিয়াছেন—any form of education to be effective, must reflect the daily life and interest of the community in which it is employed." বস্তুতঃ বিজ্ঞানের সহিত শিক্ষাই কার্য্যোপযোগী শিক্ষা, প্রকৃতির সহিত পরিচয় হওয়াই যথার্থ প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত এস, এচ, ফ্রিমাণ্টল্ সাহেব ভারতীয় কৃষি পত্রিকায় "স্কুল উদ্যান" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমাদের মতের সহিত প্রতি বর্ণে বর্ণে মিলে। আমরা নিম্নে তাঁহার বাক্যের সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

বিদ্যালয় সংলগ্ন বাগান রচনার উদ্দেশ্য

১। ইহাতে বিদ্যামন্দিরের চারিদিকের সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হয়;

২। স্কুলের ঘর বাটীর খরচ সীমা বদ্ধ হয়,

৩। স্কুলে কৃষি-শিক্ষার অবসর হয়;

৪। ছাত্রদিগের অভিভাবকগণের, স্কুলের অধ্যক্ষগণের, এবং পল্লীর জনসাধারণের স্কুলের উন্নতি কল্পে আগ্রহ জন্মে;

৫। সম্ভব মত নূতন ফল শস্য উৎপাদনে স্থানীয় লোকের উৎসাহ জন্মে;

৬। কায়িক পরিশ্রমে বালক বালিকা দিগকে অভ্যস্থ করা হয় এবং তাহারা পল্লীগ্রামের উপযোগী কায়িক পরিশ্রম সম্মানার্হ বলিয়া মনে করিতে শিখে;

৭। কৃষি কর্ম্মের মূল্য অনুমান করিতে পারা যায়;

৮। এবং ইহার সঙ্গে উক্ত বিদ্যামন্দিরে সাংসারিক জীবনযাত্রা চালাইবার উপযোগী ভূ-তত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, স্বাস্থ্যরক্ষাতত্ত্ব, গণিতবিদ্যা, পরিমাণ বিদ্যা, জল, হাওয়া উত্তাপের গুণাগুণ, মৃত্তিকাতত্ত্ব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, কৃষি রসায়নের যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া ছাত্রগণ ধন্য হইবার অবসর পায়।

এক্ষণে আমরা বিচার করিয়া দেখি যে ঐ বাক্যগুলি প্রকৃত সারগর্ভ কি না—আমরা দেখিতে পাই যে, বৃক্ষলতা পরিশূন্য খালি মাঠের উপর একটি ইষ্টক নির্ম্মিত বাটিতে ছেলেরা অধ্যয়ন করিতেছে—বিদ্যা গৃহটিকে প্রখর সূর্য্যাতপ হইতে রক্ষা করিবার মত একটি বৃক্ষও তথায় নাই, কিম্বা প্রবল শীতাতপের প্রচণ্ড হাওয়ার গতিরোধ করিবার তথায় কিছুই নাই—এ হেন গৃহে কে সুখানুভব করে?

কেহ নহে—ছাত্রেরা সুখ পায় না, শিক্ষকগণ স্বচ্ছন্দতানুভব করেন না—পল্লীবাসিগণও স্বেচ্ছায় তথায় যাইতে চান না—ছাত্রসংখ্যা বাড়িলেই গৃহের আয়তন বাড়াইতে হয়, তাহাতে ব্যয়ও অধিক হয়। এই ব্যয় কতকটা অনর্থক বলিয়া মনে হয়। কারণ আমরা ঘর না বাড়াইয়া, যদি গৃহাঙ্গনটি বড় করি, ঘরের চতুষ্পার্শ্ব বৃক্ষ লতায় সুশোভিত করিতে পারি তাহা হইলে অল্প খরচে কত অধিক কাজ হয় দেখ—ছাত্রেরা বৎসরের

অধিকাংশ সময় বৃক্ষতলে মাদুর বিছাইয়া পাঠাভ্যাস করিতে পারে, ছাত্রগণের জন্ত ব্যয়সাধ্য অধিক কাষ্ঠাসনের আবশ্যক হয় না। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রের বিভিন্ন স্থানে স্থান সঙ্কুলানের আর কোন ভাবনা থাকে না—অথচ কোন গোলযোগ নাই। ঘরের আয়তন এত লম্বা এত চওড়া, এত উচ্চ হইবে ইহা লইয়া দুর্ভাবনা হয় না। আমাদের আবশ্যক একটি উপযুক্ত গৃহ—যাহার ভিতর ছেলেমেয়েরা প্রয়োজন মত আশ্রয় পাইতে পারে এবং যাহার ভিতর পুস্তকাদি, মাণচিত্র, ছবি, অঙ্কনাদর্শ, যন্ত্রপাতি সুরক্ষিত হইবে। আগে আমাদের এইত ছিল—টোলে ছাত্রগণ যখন পাঠ করিত তখন টোলের জন্য সুবৃহৎ অট্টালিকার আবশ্যক হইত না—আবশ্যক হইত পণ্ডিতগণের বাসোপযোগী একটি গৃহ, ছাত্রগণের একটি অবস্থান গৃহ, একটি বারান্দা যেখানে ছাত্রেরা পণ্ডিত সান্নিধ্যে বসিতে পারে এবং টোলের সংলগ্ন উদ্যান ও জলাশয়। আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি যদি এই আদর্শে রচিত হয়, যদি আমরা অট্টালিকার খরচ বাঁচাইয়া সেই খরচে উদ্যান রচনায় অধিক মনোযোগী হই এবং বিদ্যালয় আঙ্গিনায় শিক্ষকের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি, আঙ্গিনাটি মনোমত বৃক্ষলতায় সাজাইয়া লইতে পারি— স্থূল কথায় যদি আমরা পুরাতনকে ফিরাইয়া আনিয়া নূতন যুগের মধ্যে নবভাবে স্থাপন করিতে পারি তবে আমাদের আশা ফলবতী হওয়া সম্ভব হয়।

আমাদের তৃতীয় উদ্দেশ্য কৃষি শিক্ষার অবসর—পল্লীবাসে প্রত্যেক গৃহস্থই কৃষি কর্ম্মে নিযুক্ত—যিনি নিযুক্ত নহেন তিনি পল্লীবাসের উপযুক্ত নন্ বলিয়া মনে হয়। কৃষি কি ?— ক্ষেতে হাল দেওয়া, বীজ বোনা, জমি নিড়ান, জমিতে সার দেওয়া, জল সেচন করা, শস্য-আহরণ করা, গো-রক্ষণ, পশু-পালন, দুগ্ধাদি উৎপাদন ইহাই কৃষি—ইহা লইয়া কৃষি জীবন। ছাত্রগণকে ইহাতেই অভ্যস্থ করিতে হইবে। বই, কাগজ, শ্লেট লইয়া কোন গৃহাভ্যন্তরে কেবল সাহিত্য, ইতিহাস, ভুগোল কণ্ঠস্থ করিয়া তাহারা কি ফল পাইবে! এই কারণে আমরা উন্মুক্ত বায়ুতে প্রকৃতির ক্রোড়ে বসিয়া বালক বালিকা গণের শিক্ষার প্রয়োজন প্রাণে প্রাণে অনুভব করি।

চতুর্থ কথা—চাষী সর্ব্বদা হাতের দোষর চায়—তাহার ছেলে মেয়ের সাহায্য না পাইলে সে বড়ই অসুবিধা ভোগ করে। তাহার ছেলে মেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও স্কুলে আটক থাকুক ইহা সে পছন্দ করে না। তাহাদের ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিলেই একটু স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে চায়—চাষের কাজ যেন তাহার আর সাজে না—সে তখন চায় ভাল বেশভূষা করিতে, চাকুরি করিতে কিন্তু চাকুরিও সুবিধামত মেলে না—চাষী এরূপ স্থলে বিষম ফাঁপরে পড়ে। পক্ষান্তরে যদি ছেলেরা উপযুক্ত সৎশিক্ষা পায় চাষের অর্থ বুঝে তবে সে শিক্ষাতে চাষেরই উন্নতির দিকে তাহাকে লইয়া যাইবে।

৫ম কথা—যদি বিদ্যাপ্রাঙ্গনটিকে একটি ছোট খাট আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা যায় তবে কত সুখেরই হয়। নূতন ফল শস্য উৎপাদন, নূতন কৃষি প্রণালীর

চর্চা যদি এখানে সম্পাদিত হয় তবে পল্লীবাসের প্রত্যেক চাষীর এই বিদ্যালয়ে অনুরাগ জন্মিবে এবং চাষিগণ এখানে ছেলে মেয়েদের পাঠাইয়া ধন্য হইবে এবং নিজেরাও সময়মত আসিয়া তাহাদের কার্য্য দেখিয়াও শিখিয়া তৃপ্তিলাভ করিবে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম কথা এই যে ছেলেরা কৃষির মর্ম্ম বুঝিলে এবং জীবনে ইহার প্রয়োগ শিখিলে—ইহারা সহজেই ইহাতে অনুরক্ত হইবে। অনুরাগ একবার জন্মিলে আর জল মাটি লইয়া কার্য্য করিতে বিরক্তি হইবে না বরং তাহাতে আমোদ অনুভব করিবে।

নিতান্ত শিশুকালে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া বা জমি কোবান কঠিন। জমি নিড়ান, গাছে জল দেওয়া ঐ কালেরই কার্য্য। বয়স বৃদ্ধি হইলে এবং অন্যকে কঠিন কার্য্য করিতে দেখিয়া অভ্যস্ত হইলে ভবিষ্যতে ঐ সকল কার্য্যে সে ভয় পাইবে না। এই থানে বালকবালিকাগণের আর একটা অভ্যাস হয়—তাহারা এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে শিখে, কাজ বিভাগ করিয়া লইয়া কাজ করিতে শিখে প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান হইয়াও কাজ করিতে পারে, অপর অপেক্ষা নিজের কাজ ভাল হউক এইরূপ উদ্যম উৎসাহ দেখাইয়া থাকে।

৮ম কথার আলোচনা আমরা বারান্তরে করিব এবং কি প্রণালীতে স্কুল উদ্যান রচনা করিতে হইবে তাহাও দেখাইব।

রসায়ন চর্চ্চা দ্বারা ভারতীয় শিল্পের কতদূর

উন্নতি সম্ভব

সর্ব্বজনপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ রসায়নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্প্রতি একটি আভাস দিয়াছেন--

তিনি বলেন যে ভারতের মত সুবিস্তৃত স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন শিল্পের প্রাদুর্ভাব হওয়া সম্ভব। হুগলী নদীর উপকূলে পাটের কল স্থাপিত হইতে পারে, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে কাপড়ের কল চালাইবার অনেক সুবিধা আছে, রঙ্গপুর, কুচবিহার, ত্রিহুত ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে ব্যবহার ও ব্যবসায়ের উপযোগী তামাক প্রস্তুত করা যাইতে পারে ও খনির নিকটবর্ত্তী প্রদেশে ধাতুদ্রব্য নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন সম্ভব।

টাটার কারখানা ইহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। এতৎপ্রদেশে কারখানা চালাইবার উপযুক্ত কয়লা, চূর্ণাপাথর ও জল যথেষ্ট আছে।

ডাক্তার রায়ের কথাগুলি প্রণিধান করিবার সময় উপস্থিত। ভারতে কৃষিজাত ও খনিজ অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কাঁচা মাল বিদেশে না পাঠাইয়া যদি আমরা সে গুলিকে কল কারখানায় ব্যবহার-উপযোগী পণ্যে পরিণত করিয়া রপ্তানি করি, তবে আমরা শতগুণ অধিক লাভ করিতে পারি। বর্ত্তমান সময়ে আমরা ভারত হইতে কাঁচামাল রপ্তানি করি এবং শিল্পজাত পাকামাল আমদানী করি। যতদিন না এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, ততদিন দেশের দৈন্য ঘুচিবে না।

আমাদের দেশে কাঁচা চামড়ার অভাব নাই এবং চামড়ায় কস্ দিবার মত, চামড়া সংস্কার করিবার মত ফল বা গাছের ছাল এখানে অপ্রতুল নহে। ভারত হইতে প্রায় ১৪ কোটী টাকার কাঁচা চামড়া রপ্তানি হয়, কস, ছাল ও ফল যেমন বাবলাছাল, হরিতকীও বিস্তর টাকার রপ্তানি হয়। এখানে চামড়া সংস্কারের কোন ভাল কারখানা নাই— দেশী ছোট খাঁট কারখানা যাহা আছে সে গুলি সবই অজ্ঞলোকদ্বারা পরিচালিত। ঐ সব কারখানায় চামড়া ভাল সংস্কৃত হয় না বরং চামড়া খারাপ হইয়া যায়। যদি আমাদের কারখানাগুলি সুবিজ্ঞ রসায়নতত্ত্ববিদ্‌গণ দ্বারা পরিচালিত হইত, তাহা হইলে ভারত প্রতি বৎসর ৫০ কোটীর উপর লাভ করিতে পারিত।

কাপড়ে ও কাগজে মাড় দিবার জন্য শ্বেতসার বা ষ্টার্চ আবশ্যক। সাধারণতঃ আমরা গম, তুলা, চাউল কিম্বা আলু হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ষ্টার্চ প্রাপ্ত হই। এই সকল কৃষিজাত শস্য যথেষ্ট পরিমাণে ভারতে উৎপন্ন হয়। আমরা কাঁচা শস্য রপ্তানি করি এবং ষ্টার্চ আমদানী করি ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে। মনে করিলে আমরা এত শ্বেতসার বা পালো প্রস্তুত করিতে পারি যে আমাদের অভাব মোচন হইয়া যথেষ্ট রপ্তানিও চলিতে পারে।

আমাদের উদ্ভিজ্জ আহারের মধ্যে শ্বেতসার বা পালো একটি প্রধান জিনিষ। আমরা বিলাতী বার্লি (যবচুর্ণ), বিলাতী এরোরুট, ভুট্টার পালো (corn flour) জৈয়ের পালো (oat meal) যথেষ্ট আমদানী করি, কিন্তু ভারতে এইগুলি পর্য্যাপ্ত পরিমাণ প্রস্তুতের অভাব দেখিলে মনে দারুণ ব্যথা অনুভব হয়। *

পটাস ও পটাসজনিত ক্ষার সাবান প্রস্তুত করিতে আবশ্যক। বস্ত্রাদি রঙ করিতে পটাস একটি উপাদান। পটাস জমির একটি প্রধান সার। পঞ্জাবে লবণাক্ত ভূমিভাগে পটাস সঞ্চিত আছে, কিন্তু ইহার ক্ষার তাদৃশ ভাল নহে। আজকাল বাঙলাদেশের খাল, বিল, জলা জমিতে কচুরী নামে এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ জন্মিতেছে। ইহার

* আবশ্যক হইলে আমরা পালো প্রস্তুত প্রণালী বলিয়া দিতে পারি। কৃঃ যঃ—

ভস্ম ক্ষারের পরিমাণ সমধিক দৃষ্ট হয়। ইহা খুব সহজ প্রাপ্য ও সুলভ, তবে সব আবশ্যক মিটিবার মত পর্য্যাপ্ত পটাস ইহা হইতে পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। কলিকাতায় সা, ওয়ালেস কোং ইহার ভস্ম কিনিতেছেন। তাহারা যে সার প্রস্তুতের কারখানা খুলিয়াছেন তাহার কাজে ইহা লাগাইতেছেন। দেশীয় লোকগণ কিন্তু এই কার্য্যে উদাসীন জার্ম্মাণীতে পটাস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এতাবৎকাল তাঁহারা সমগ্রপৃথিবীময় পটাস সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন।

কার্ব্বাইড অব ক্যাল্‌সিয়ম—যাহার গ্যাস এক্ষণে আলো জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ঢালাই কার্য্যে ইহার গ্যাস অতীব প্রয়োজন। ভারতে প্রায় ২০ হাজার ৮ হন্দর কার্ব্বাইড প্রতি বৎসর আমদানী হয়। সস্তায় বৈদ্যুতিক বলে কাজ চালাইতে পারিলে ভারতে কার্ব্বাইড অব ক্যালসিয়ম উৎপন্ন করা কিছু কঠিন ব্যাপার নহে।

সুরা—জাভা হইতে বহু টাকার সুরা রপ্তানি হয়। চিনির কল হইতে যে মাতগুড় পরিত্যক্ত হয়, সেই গুড় হইতেই মদ্য প্রস্তুত হইতেছে। ভারতবর্ষে পরিমাণমত আখ চাষও নাই—চিনির কারখানাও নাই। উপযুক্ত চিনির কারখানা স্থাপিত হইলে আমাদিগকে সুরা সার (Industrial alchohal) বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় না। সুরা সার পরের কথা, ভারতকে কত টাকার চিনিই আমদানী করিতে হয়। ইক্ষুচাষের উপযোগী অনেক জমিই ভারতে আছে এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি এবং চিনির কারখানা স্থাপনের যথেষ্ট অবসর আছে। চিনির কারখানার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা মহুয়া হইতে যথেষ্ট মদ্য প্রস্তুত করিতে পারি। যাহা কিছু মহুয়ামদ প্রস্তুত হয়, তাহা দেশী নিকৃষ্ট প্রথা এবং নিকৃষ্ট মদই উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে আমরা অনেক টাকার মহুয়া বিদেশে রপ্তানি করি এবং বিদেশ হইতে মদ কিনিয়া ঘরে আনি। আমাদের দেশে চাউল ও গুড় পচাইয়া মদ প্রস্তুত হয়।

বিলাতে নিম্নলিখিত প্রণালীতে মদ প্রস্তুত হয়—

যব প্রথমতঃ জলে সিক্ত করিয়া স্তূপাকার করিয়া রাখিলে তাহা অঙ্কুরিত হয়। ২ভাগ অঙ্কুরিত যবের সহিত ভাগ গম, মকাই, চাউল প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া পেষণ করা হয়। এই চূর্ণ এক কিম্বা দুইবার গরমজলে চট্‌কাইয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়। ঐ জলে ঈষ্টনামক উদ্ভিদমু সংযোগ করিয়া ৪০ ডিগ্রি উত্তাপ বিশিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিলে ঐ জল পচিয়া মদিরায় পরিণত হয়, তখন ইহা চোলাই করিলে সুরা পাওয়া যায়। আঙ্গুর ফলের রস হইতেও সুরা প্রস্তুত হইতে পারে। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যথেষ্ট আঙ্গুরের আবাদ আছে। ইহার চাষ আরও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু উৎকৃষ্ট সুরা প্রস্তুতের ব্যবস্থা ডাক্তার রায় তাঁহার হিন্দুরসায়নতত্ত্বের ইতিবৃত্ত (History of Hindu Chemisrty) নামক পুস্তকে ভারতে রসায়ন তত্ত্বের কি প্রকার আলোচনা ছিল

তাহা দেখাইয়াছেন। এখন সে সব আলোচনা লোপ পাইয়াছে। আমরা এখন সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি।

পূর্ব্বকালে ধাতুতত্ত্ববিদ্য ভারতীয়গণ কেমন বুঝিত তাহা পুরীর মন্দিরের লৌহের কাজ, কনরকের ধাতু নির্ম্মিত স্তম্ভাদি দেখিলে স্পষ্ট প্রমাণ হয়। ঐ সকল শিল্প বংশপরম্পরায় শিল্পগণকর্ত্তৃকপরিচালিত হওয়ায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করিবার লোক জন্মে নাই, কেন এবং কেমন করিয়া ধাতু শিল্প এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা বুঝাইবার লোক তখন ছিল না—এখনও নাই। বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা না হইলে শিক্ষার চূড়ান্ত হয় না ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

পত্রাদি।

রবার—

শ্রীললিত মোহন ঘোষ, সিমলা, কাঁশারিপাড়া, কলিকাতা।

প্রশ্ন—সিংভূম অঞ্চলে রবারের আবাদ হইতে পারে কি না? রবার বিক্রয়ের সুবিধাইবা কি প্রকার? সিংভূমে হলুদপুকুর পরগণায় আমি কিছু জমি সংগ্রহ করিয়াছি।

উত্তর—বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটে রবারের আবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—আপনি ইচ্ছা করিলে ফলাফল তাঁহার নিকট জানিতে পারিবেন। হলুদপুকুর ময়ূরভঞ্জসীমানার খুব কাছা কাছি এবং উভয় স্থানের জল মাটি আমরা যতদূর জানি প্রায় সমান। রবারের কাটতি খুবই আছে—পোষাক পরিচ্ছদ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘর, দরজায়, কল কব্জায় লাগান পর্য্যন্ত অনেক কাজেই আজকাল রবার আবশ্যক। রবারের রপ্তানিও ক্রমশঃ বাড়িতেছে—বিশেষতঃ যুদ্ধ বাঁধিবার পর হইতে ইহার কাট্‌তি খুবই বাড়িয়াছে। ১৯১৭।১৮ শালে ৮,৪৩০,০০০ পর্য্যন্ত রবার রপ্তানি হইয়াছে। মান্দ্রাজ ও ব্রহ্মদেশে রবার অধিক উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ভারতে প্রায় ৬০,০০০ একরে রবারের আবাদ আছে।

প্রশ্ন—অনেকেই জানিতে চান যে ভারতবর্ষে কতগুলি চিনির কারখানা আছে এবং তাহা হইতে কি পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয়।

উত্তর—সরকারী শিল্প-বাণিজ্যবিভাগের হিসাব হইতে দেখা যায় যে ভারতে সর্ব্বসমেত ৪৬টি চিনির কারখানা আছে। ইহার মধ্যে ৩০টি কারখানায় খবর পাওয়া গিয়াছে! ঐ কয়টি কারখানা হইতে প্রতিদিন ২২ ঘণ্টা কাজ করিয়া ১৪,৪৫৬ মণ চিনি এবং ৭,০৯৯ মণ গুড় উৎপন্ন হইতেছে।

ছানা—শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ, জেনাপুর, কটক।

প্রশ্ন—আমি এখানে আসিয়া খুব সস্তায় দুধ পাইতেছি। বাটিতেও কয়েকটি গাভী দুধ দিতেছে। দুধ হইতে কি প্রকারে ভাল ছানা প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং ছানার উপকারিতা ও অপকারিতা জানাইয়া সুখী করিবেন।

উত্তর—ফুটন্ত দুধে ছানার বা দধির জল যোগকরিয়া নাড়িতে থাকিলে দুধ কাটিয়া ছানা হইবে ও দুধ পৃথক হইয়া পড়িবে। অতঃপর কটাহ নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ছানা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া বন্ধন করিয়া কিছুক্ষণ রাখিলেই উত্তম ছানা প্রস্তুত হইবে। জানিয়া রাখা ভাল যে মাখনতোলা দুধের ছানা শক্ত হয়। মাখন তোলা না হইলে ছানা নরম হয়। এই ছানাই অপেক্ষাকৃত অধিক সুস্বাদু।

ছানা একটি বিশিষ্ট খাদ্য ইহাতে

প্রোটিড	শতকরা	২২ ভাগ	
ঘৃত	,,	১৯ ,,	
লবণ	,,	১২ ,,	
জল	,,	অবশিষ্ট	,,

মাখন তোলা দুধের ছানায় ঘৃত শতকরা ২।৩ ভাগ মাত্র থাকে।

ছানার জলও সুপেয়। ছানার জলের সহিত যৎসামান্য ঘৃতের ভাগ থাকে। সামান্য লবণ ও শর্করা সংযোগে ইহা অতিশয় রুচিকর পানীয় হয়। ইহা লঘুপথ্য এবং রোগীর ব্যবহার উপযোগী।

প্রশ্ন—কাল জামের সির্কা—

কয়েকজন কাল জামের সির্কা প্রস্তুত প্রণালী জানিতে চাহিয়াছেন।

উত্তর—আখের রসের সির্কা যেরূপে প্রস্তুত হয়, ইহাও সেই রকমে প্রস্তুত হইবে। কেহ কেহ ইহার রসের সহিত আখের সির্কা মিশ্রিত করিয়া সির্কা প্রস্তুত করেন। টুক্‌রস মৃৎ পাত্রে রাখিয়া ২০.২৫ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া অন্ধকার ঘরে রাখিয়া দিলেই কিছু দিনের মধ্যে গাঁজিয়া অম্লরসাত্মক সির্কায় পরিণত হয়। ইহাকে ভিনিগার বলে।

মৃৎ পাত্রের মুখ সর্ব্বদাই পাতলা কাপড় দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখা আবশ্যক। সির্কা প্রস্তুত হইয়া গেলে বোতলে ছিপি আঁটিয়া রাখা যায়। কাল জামের সির্কাও ঐরূপে প্রস্তুত হইতে পারে। এক সের কাল জামের রসের সহিত এক সের ভিনিগার মিশাইলে এই সির্কা শীঘ্র প্রস্তুত হয় এবং অপেক্ষাকৃত অধিক মুখরোচক ও উপকারী হইয়া থাকে। এই প্রকার এক সের রসের সহিত এক সের চিনি সংযোগ করিয়া মৃদু জ্বালে ফুটাইয়া লইলে অতি সুপেয় সিরাপ প্রস্তুত হয়। খাদ্যতত্ত্বনামক পুস্তকে খাদ্য বস্তু সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। ইহা কৃষক অফিসে পাওয়া যায়।

কাল জামের রস অজীর্ণের উত্তম ঔষধ এবং অগ্নিবর্দ্ধক। জামের সময় ইহা প্রস্তুত করিয়া রাখিলে অসময়ে বিশেষ উপকার দর্শে।

পোকার উপদ্রবের প্রতিকার

সরকারী কীটতত্ত্ববিদ অনেক জিলায় পোকার উপদ্রবের প্রতিকার চেষ্টা করিতেছেন।

ময়মনসিংহ জিলার জামালপুর মহকুমার কয়েক গ্রামে উরচুঙ্গা ছোট পাটের গাছ কাটিয়া বিশেষ ক্ষতি করিয়াছিল। উহার প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল :—

(১) গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া মারিয়া ফেলা ;

(২) রাত্রে আলো জ্বালাইলে উহারা বাহির হইয়া তাহাতে পড়িয়া পুড়িয়া যাইবে ;

(৩) বৃষ্টি হইলে ইহাদের গর্ত্তে জল ঢুকে ; কাজেই ইহারা তথা হইতে বাহির হয়। সেই সময় কাক প্রভৃতি পাখী ইহাদিগকে ধরিয়া খায়। তখন ইহাদিগকে ধরিয়া মারাও খুব সহজ।

ঢাকা, ২৪-পরগণা, বরিশাল, যশোহর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জিলার অনেক স্থানে ধানে পামরী পোকা লাগিয়া বিশেষ ক্ষতি করিয়াছিল, পোকা ধরা থলে দ্বারা উহাদিগকে মারিতে হয় ইহা কৃষকদিগকে দেখান হইয়াছিল।

নোয়াখালী জিলার ফেণী মহকুমায় এক প্রকার লেদা পোকা ধানের পাতা খাইয়া বিশেষ ক্ষতি করিয়াছিল। কাপড়ের থলে দ্বারা এইরূপ ছোট ছোট পোকাগুলিকে ধরিয়া মারিতে হয়, এই নিয়ম দেখান হইয়াছিল। আক্রান্ত ধানের জমির নিকটে ঘাসের জমিতেও লাঙ্গল দিয়া চাষ করা হইয়াছিল ; ইহাতে পোকা মরিয়া যায়।

ত্রিপুরা জিলার কোন কোন স্থানে অন্য এক প্রকার লেদা পোকা ধানের পাতা খাইয়া বিশেষ ক্ষতি করিয়াছিল। আক্রান্ত ক্ষেত্রে চূণ ও কেরাসিন তৈল (১৯ ভাগ চূণ ও এক ভাগ কেরাসিন তৈল) মিশাইয়া ছিটাইবার জন্য কৃষকদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

রংপুর ও ফরিদপুর কৃষিপ্রদর্শনীতে পোকার বিবরণ সহ ছবি এবং পোকা ধরিবার কাপড়ের থলে, দমকল ইত্যাদি দেখান হইয়াছিল। ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা পোকার জীবন বৃত্তান্ত ও প্রতিকারের উপায়, অর্থাৎ কাপড়ের থলে দ্বারা কিরূপে পোকা ধরিতে হয় আলোক ফাঁদে কিরূপে মারিতে হয়, ক্ষেত্রের উপর দড়ি টানিয়া কিরূপে পোকাগুলির খাওয়ার ব্যাঘাত জন্মাইতে হয়, আক্রান্ত ক্ষেতে দমকল দ্বারা কিরূপে পোকা মারিবার ঔষধ ছিটাইতে হয় ইত্যাদি দেখান হইয়াছিল।

পাটের পোকা সম্বন্ধে এক খানা ছোট বহি লেখা হইতেছে। ইহা শীঘ্রই ছাপাইতে দেওয়া হইবে।

উদ্ভিদানুরোগ নিবারণ

সহকারী উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ্ অনেক স্থানে পরিদর্শন করিয়াছেন। এই বিভাগে ধানের উফ্রা, ডাক কিম্বা খোরমরা রোগের পরীক্ষা ও তাহা নিবারণের উপায় বাহির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। এক জাতীয় কৃমি দ্বারাই এই রোগ জন্মে; গত বৎসরের কৃষি সমাচারে উহার জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ফসলের এই রোগের প্রতিকার করিবার জন্য ঢাকা জিলায় কুর্মিটোলা ও পুবাইল এবং ত্রিপুরা জিলায় লাকসাম গ্রামে কতকগুলি ভূমিতে পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এই জমিতে ক্রমাগত ৩।৪ বৎসর ধরিয়া এই রোগ হইতেছে। ধান কাটা শেষ হইলেও নাড়াতে এই রোগ থাকিয়া যায় এবং পর বৎসর বৃষ্টির জলে জমি ডুবিয়া গেলে ইহা বৃদ্ধি পায় ও ধান নষ্ট করিয়া ফেলে। উহা নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য :—

(১) ক্ষেত্রের নাড়া খুব ভাল করিয়া পোড়াইবে;

(২) পুনঃ পুনঃ জমি চাষ করিবে এবং ইহাতে রৌদ্র ও বাতাস লাগাইবে ও জমির দোষ নষ্ট করিবে;

(৩) লবণ জলে বীজ ধান ভিজাইবে।

নাড়ার ন্যায় হালকা ধানেও (চিটায়) এই রোগ থাকে। বীজ ধান চিটাশূন্য করিলে ভাল হয়। বীজ ধান লবণ জলে ভিজাইলে চিটা ভাসিয়া উঠামাত্র ফেলিয়া দিতে হয়। ভাল ধান জলের নীচে ডুবিয়া যায়। উহারই বীজ বুনিতে হয়। ৪।৫ সের জলে আধ পোয়া লবণ দিলেই চলিবে।

উপরোক্ত কুর্মিটোলা ও লাকসাম পরীক্ষার ভূমিতে গত বৎসর উফ্রা রোগ জন্মে নাই ; কিন্তু পুবাইল পরীক্ষা ক্ষেত্রে এই রোগ জন্মিয়াছিল।

এই বৎসর এই রোগ প্রতিকারের জন্য ঢাকা ও ফরিদপুর জিলায় আরও বেশী পরীক্ষা চলিতেছে। ঢাকা বিভাগের কৃষি পরিদর্শক ইহাতে সাহায্য করিতেছেন।

ঢাকা জিলায় কুর্মিটোলা, পুবাইল, নাগরি ও বিক্রমপুর এবং ফরিদপুর জিলায় গোপালগঞ্জে পরীক্ষা চলিতেছে।

লাকসামের শ্রীযুক্ত রায় আনন্দ চন্দ্র রায় বাহাদুর তাহার নিজ জমিতে গত বৎসরের মত নিজেই পুনরায় পরীক্ষা করিতেছেন।

কয়েক রকম দীঘা ধানে এই রোগ লাগে না বলিয়া শুনা যায়, ইহা কতদূর সত্য তাহারও পরীক্ষা চলিতেছে এই জন্য যে ধানগুলিতে অধিক উফ্রা লাগে উহার পাশাপাশি দীঘা ধানের চাষ করা হইতেছে।

পূর্ব্ব বঙ্গে অনেক স্থলে এক প্রকার 'পচা রোগ' (Rhizoclonea) জন্মে, উহাতে অনেক ক্ষতি হয়। এই রোগ নিবারণের জন্য পাটের জমিতে নানা প্রকার সার ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা চলিতেছে।

খুলনা হলদিবাড়ী এলাকায় সুপারি গাছে এক প্রকার উদ্ভিদ রোগ ফোমেস লুসিডাস্ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মরে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা প্রতিকারের জন্য এবারও পরীক্ষা করা হইয়াছে।

এ বৎসর কলা গাছের ধসাধরা বা হাইতা মরা রোগের (বোধ হয় ফিউজেরিয়াম) পুনরায় পরীক্ষা হইবে।

সংবাদ

বাঙ্গালী বালকের রাসায়নিক আবিষ্কার—ব্যারিষ্টার মিঃ পি, সি, দত্ত মধ্যপ্রদেশে বাস করেন, তাঁহার পুত্র সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক মিঃ ই, দত্ত রসায়ন-বিজ্ঞানে কয়েকটি অদ্ভূত আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইউরোপীয় সন্ধির পর যখন এই আবিষ্কারবার্ত্তা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে, তখন এই যুবক

সমগ্র জগতেই খ্যাতি লাভ করিবেন। এই যুবক বাঙ্গালী, সুতরাং তাঁহার গৌরবে প্রত্যেক বাঙ্গালীরই গৌরব।

যুবকের স্বাস্থ্য তত ভাল নহে, বাল্যজীবনের অধিকাংশ সময় বিলাতেই অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া রসায়ন-বিদ্যা শিখেন নাই; পিতার খণি হইতে পাথর কুড়াইয়া ও অন্যান্য সহজপ্রাপ্য দ্রব্যের রসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া তিনি এই সকল আবিষ্কার করিতেছেন। গবর্মেণ্ট চারি বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে জব্বলপুর কলেজের রসায়নাগারে রাসায়নিক পরীক্ষার অধিকার দেন। মার্শ গ্যাস নামে এক প্রকার বাষ্প কয়লার খনিতে প্রায়ই উঠে; অতি সহজে এই বাষ্প তিনি তৈয়ার করিতেছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে ইহা আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে পাছে জর্ম্মণগণ ইহা জানিতে পারে, তাই গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে এতদিন নীরব ছিলেন। এই গ্যাসের কল্যাণে মোটর শক্তি বাহির করা সহজ। ইহা ছাড়া বিশুদ্ধ গন্ধক, সোডা, কার্ব্বনেটঅফ সোডা, এলুমিনা, এবং পাথর হইতে পটাস বাহির করিবার উপায়ও তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই আবিষ্কারের ফলে বড় বড় সওদাগর "পেটেণ্ট" ক্রয় করিয়া লইয়া এদেশে ব্যবসায় চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। —হিন্দুস্থান।

দারুণ দুর্ভিক্ষ—দেশের সর্ব্বত্রই দারুণ দুর্ভিক্ষ প্রকট হইয়াছে। কোন্ স্থানের নাম করিব? পঞ্জাব হইতে আরম্ভ করিয়া বোম্বাই, গুজরাট,মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা এবং বঙ্গদেশ ও আসাম সর্ব্বত্রই ঘোর দুর্ভিক্ষের ভেরী বাজিয়াছে। পুরীর দুর্ভিক্ষ অধিক প্রকট। সেখানকার নেতৃস্থানীয় অধিবাসীরা দরিদ্রগণের দুঃখ নিবারণের জন্য যত্নপর হইয়াছেন। পুরীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও এবিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগী। তিনি সভা করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। শস্য ভালরূপ জন্মে নাই, ইহাই এই অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের কারণ। বঙ্গের বাঁকুড় জেলার দুর্ভিক্ষের মাত্রা অধিক। তাহা ছাড়া, রাজসাহী, রঙ্গপুর, ঢাকা, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলের সাধারণ লোকের অশেষ কষ্ট হইয়াছে। বস্ত্র কষ্টও ইহার সহিত যোগ দিয়া দরিদ্র নরনারীর যাতনার মাত্রা চরমে চড়াইয়াছে। ইহার উপর আবার রোগ আছে। ফলে, লক্ষ লক্ষ প্রজার হাহাকার উঠিয়াছে। বিহার-উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট দারুণ বস্ত্রকষ্টের সময়ে জেলায় জেলায় কাপড়ের দোকান খুলিয়া সস্তা দরে কাপড় বিক্রয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এবার অন্নকষ্টের সময়েও সেই ভাবে প্রতিকারপরায়ণ হইয়াছেন। বঙ্গেও সরকার পক্ষ হইতে যে একেবারে কোন ব্যবস্থা হইতেছে না, তাহা নহে। ঢাকার কলেক্টর মিঃ এস, জি, হার্ট, আই-সি-এস অতি সজ্জন শাসনকর্ত্তা। তিনি প্রজার কষ্ট

বুঝিবামাত্র সত্তাদরে ধান সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশন চাউলের দুর্ম্মূল্যতার কথা জানাইয়া বঙ্গের গভর্ণরের মারফৎ ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট যে দরখাস্ত প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার ফল ফলিতে বিলম্ব হইতেছে কেন? বিভিন্ন জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টরগণের নিকট তথ্য অবগত হইয়া গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে নিজেই একটা প্রতিকার ব্যবস্থা করুন না। —বাঙ্গালী, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ।
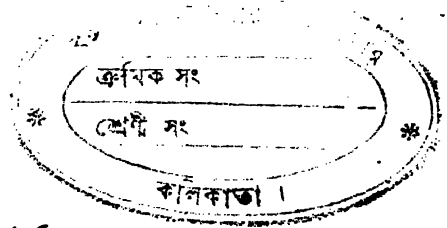
বাগানের মাসিক কার্য্য।

আষাঢ় মাস

সব্জীবাগান—শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুনের তলা ফেলিতে হইবে। এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা, শীতের শসা, লাউ; বিলাতী বেগুণ, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই সালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ বপন করিতে হইবে

পালম শাক ও টামাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতি সব্জী বপনের এখনও সময় হয় নাই।

মকাই (ছোট মকাই) এবং দে-ধান চাষের এই সময়।

হলুদ,, আদা, জেরুজালেম আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলি জলে গোড়া আল্গা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুলবাগিচা।—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারস্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (Sunflower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান—বর্ষা নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত; যেন

গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, লিচু, কুল, পিচ, নানা প্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এই প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের মোকা বা মোথা (শীর্ষ) বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বর্ষার জল খওয়াইবার এই সময়, কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি খোঁড়া উচিত, এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ, যথা শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচুড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এইসময় বপন করা উচিত।

যাহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুর মত গজাইয়া উঠিবে।

শস্য ক্ষেত্রে—কৃষকের এখন বড় মরশুম, বিশেষতঃ বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানে কৃষকেরা এখন আমন ধান্তের আবাদ লইয়া বড়ই ব্যাস্ত। পাট বোনা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে পাট তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। তথা হইতে নূতন পাট এই সময় বাজারে আমদানী হয়। দক্ষিণ বঙ্গে পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু এখানেও পাট বুনিতে আর বাকি নাই। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে হইয়া যায়।

বর্ষাকালে ঘাস এবং আগাছা ও কুগাছার বৃদ্ধি হয় সুতরাং এখন সব্জী ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে নিড়ানী দেওয়া উচিত। ক্ষেত্রে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। ফলের বাগানের আগাছা কুগাছাগুলি উপড়াইয়া তুলিয়া দিলে ভাল হয়। আগাছাগুলির বীজ পাকিয়া মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বে তাহাদের বিনাশ করিতে পারিলে তাহাদের বংশ বৃদ্ধির সম্ভবনা থাকে না।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কপি চারা ক্ষেত্রে বসান হইতেছে। পূজার পূর্ব্বেই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় কপি, কড়াইশুঁটী প্রভৃতি আমদানি হয়।

এই সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কস্মকোম্ব, কেপ গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হইতেছে।
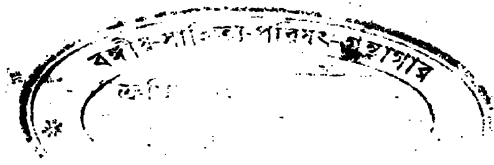
কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

২০শ খণ্ড। | আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩২৬। | ৩।৪র্থ সংখ্যা।

গো-বিজ্ঞান

(এগ্রিকলচারল এণ্ড ডেয়ারি ষ্টুডেণ্ট লিখিত)

হান্সি হিসার বা হরিয়ানা গাভী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দোষ—পালান গণ্ডের প্রদাহ হয় ও ইহাদের বাটে কখন কখন দানা পাওয়া যায় সে জন্য ক্রয়কালে বিশেষ পরিস্কার প্রয়োজন, পালান গণ্ডের অধিকাংশ মাংসল ও চর্ব্বী যুক্ত ও কুকুদ সময়ে সময়ে বড় হইয়া থাকে।

সমালোচনা—হান্সীর মত বৃহদাকার, শক্তিশালী, পরিপুষ্ট ও মানান সই অঙ্গ প্রতঙ্গ যুক্ত গোজাতী আর দুইটী দেখা যায় না, যেমন শক্তি সামর্থে সেইরূপ দুধের পরিমাণ ও গুণে ইহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদের কোন দোষ প্রবল নহে, পুংসন্তানগুলি পরিশ্রমী ও অলস নহে, কিন্তু দ্রুতবেগে চলিতে পারে না, দুধের ব্যবসায়ী গো জননে, কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধানে এই জাত সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবার উপযোগী।

মণ্টগোমারি গাভী বা সাইওয়াল (১নং ও ২নং চিত্র দেখ।)

দোষ—সম্মুখের পা ছোট বলিয়া, ইহারা মাথা নীচু করিয়া থাকে। বোধ হয়, গোজাতির উচ্চতার অনুপাতে ইহারা অধিক বলিষ্ঠ, পালান গণ্ডের উপর লক্ষ্য না রাখিলে ইহাদের প্রদাহ হইবার আশঙ্কা থাকে, পালান গণ্ড মাংসল ও ঝোলান।

সমালোচনা—এই জাত ভিন্ন দেশে গমন করিলে দুধের মাত্রা হ্রাস করে না, বাঙ্গালার জল বায়ুর পক্ষে এই জাত সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহাদের পুংসন্তান যখন কৃষি কার্য্যের উপযোগী বলিষ্ঠ ও ইহারা দুগ্ধবতী, তখন ইহারা দুধের ব্যবসায় সম্পূর্ণ উপযোগী ইহা বলা যায়।

সিন্ধি গাভী (৩নং চিত্র দেখ।)

কলিকাতায়—এই জাতের যথেষ্ট আমদানী দেখা যায়। অনেকে ইহাদের মুলতানী গাই বলেন, সিন্ধি গাভীর সহিত ইহাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। সিন্ধি গাভী অপেক্ষা ইহাদের মাথা ছোট।

প্রাপ্তি স্থান—পাঞ্জাব প্রদেশের মণ্টগোমারী জেলার জঙ্গিবার তহশীলে ইহাদের জন্মস্থান।

বর্ণ—সাদা ও পাঁচলাল ও কখন কখন, "আবলক" ঘোড়ার মত দুইটি রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

শিং—ছোট ও প্রায়ই সোজা, ইহাদের শিং এত ছোট যে ইহারা ভারতের শিং বিহীন জাত বলিয়া অভিহিত।

গুণ—ইহাদের প্রকৃতি শান্ত, চারণ অপেক্ষা ঘরে বসিয়া খাইতে ভালবাসে, দুগ্ধবতী বলিয়া সমগ্র ভারতে ইহারা প্রসিদ্ধ—পাঞ্জাবে উদ্ধসংখ্যা ১৮ সের ও নিম্ন সংখ্যা ৭।৮ সের দুগ্ধ প্রদান করে ও কলিকাতায় ১০।১২ সের দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে, ভিন্ন দেশে নীত হইলে, দুধের পরিমাণ অত্যাধিক হ্রাস হয় না, ও বৎসরে ছয়মাস ছাড়ন্ত থাকে, স্ত্রীসন্তান যেমন দুগ্ধবতী পুংসন্তান গুলিও কৃষিকার্য্যের উপযোগী, ইহারা অল্প বয়সে ঋতুমতী হইয়া থাকে।

গড়ন—মাথা ছোট, পাছা উচু—পাছা হইতে কাধের দিক পর্য্যন্ত নিচের দিকে নামিয়া আসে, গলার ঝুল পেটের নিচে চর্ম্মের সহিত সংযুক্ত, নাভীর নীচে পেটের নীচে ঝোলা চর্ম্মের আধিক্য দৃষ্ট হয় ও সম্মুখের পা এত ছোট ও পিছনের পা বড় হাড়গুলি মোটা ও মাংসল, পালান ঝোলা, পাছা মাঝারি, কৃষ হইলেও মাংসল। কাণ ছোট ও উপর দিক সরু না হইয়া গোলাকৃতি। সময়ে সময়ে ইহাদের পালানে গুল বসান থাকে

গির গাভী

(৪নং)
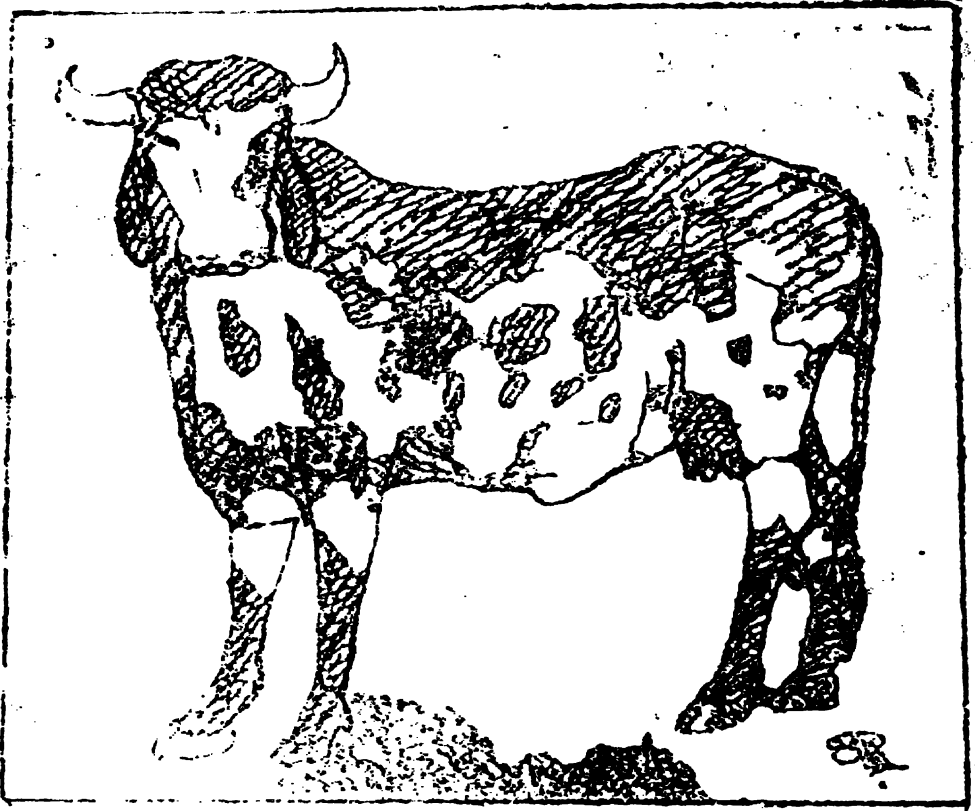
প্রাপ্তিস্থান—করাচিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাদের জন্ম সিন্ধু দেশে।

বর্ণ—সাদা বা গাঢ় লাল।

সিং—ছোট।

গুণ—ইহারা কাহাকেও দেখিলে ভীত বা চঞ্চল হয় না, চোখে মাতৃভাব প্রতিফলিত, ঘরে বসিয়া খাইতে পাইলে ইহারা অধিক দুগ্ধ প্রদান করে ও ইহারা শক্তিশালী বলিয়া সহজে গোবসন্তরোগে আক্রান্ত হয় না। করাচি হাইদ্রাবাদে ইহারা ১২ হইতে ১৫ সের দুগ্ধ প্রদান করে ভিন্ন স্থানে নীত হইলে দুধের পরিমাণ হ্রাস হয়। বোম্বাইয়ে ১৭ সের দুগ্ধ প্রদান করে ও বৎসরে শুধু দেড় মাস ছাড়ান্ত থাকে, ইহারা যেমন দুগ্ধবতী, পুংসন্তানগুলি বলিষ্ঠ ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী কিন্তু গাড়ী টানিতে পারে না। ইহারা অল্প বয়সে ঋতুমতী হইয়া থাকে।

গড়ন—প্রশস্ত কপাল মুখ সরু, গলা কুকুদ, ঝুল মানান সই, দীর্ঘ পুচ্ছ, প্রশস্ত পাছা, দেখিতে যেমন মানান সই সেইরূপ সুশ্রী, পাগুলি মোটা ও জঙ্ঘ মাংসল, পালান গণ্ড মাংসল, ও ঝোলা, নাভীর নীচে ঝোলা চর্ম্ম সামান্য দৃষ্ট হয়।

দোষ—এই গাভীর দোষ এই যে প্রসবের ৭।৮দিন পূর্ব্বে ইহাদের পালান গণ্ডে দুধ জমীয়া প্রদাহ উপস্থিত করে, পালান গণ্ড যেমন বড় সেইরূপ মাংসল, পরিষ্কার তত উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না।

সমালোচনা—যে সকল গুণ থাকিলে বাস্তবিক গাভী পালনের উপযোগী হয় সেই সকল গুণ এই জাতের মধ্যে বিদ্যমান কিন্তু পালানে প্রদাহ হইলেই দুধের গোলযোগ হয় এই এক দোষ ভিন্ন অপর কোন দোষ নাই, ও যখন ইহাদের পুংসন্তান গুলি কৃষি কার্য্যের উপযোগী, তখন ইহারা ডেইরী ফারমের সম্পূর্ণ উপযোগী। পালানের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া জনন ক্রিয়া সম্পাদন করিলে ইহারা অতি অল্পকালমধ্যে দুধের ব্যবসার জন্য উৎকৃষ্ট গাভী বলিয়া উচ্চমূল্যে বিক্রিত হইবে। করাচির মূল্য ৬০৲ হইতে ৮০৲, বোম্বাইয়ে ৪০৲ হইতে ৬০৲।

গুজরাটি গাভী

প্রাপ্তিস্থান—গুজরাটের কাথিওবার জুনাগড় ষ্টেটে ইহাদের জন্মস্থান।

বর্ণ—মেটে রঙের সহিত সাদা মিশ্রিত ও কালোর ছিট, বর্ণ দেখিবামাত্র চেনা যায়

শিং—শিং মোটা ও বড় সম্মুখ হইতে পিছনে গিয়া বক্র হইয়া পুনরায় সম্মুখে আসে।

গুণ—কাথিওবারে ইহারা ১৪ হইতে ১৬ সের দুধ প্রদান করে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নীত হইলে কমিয়া যায়, বোম্বাইয়ে ১২ সেরের অধিক দুগ্ধ প্রদান করে না। ইহাদিগকেও অত্যধিক মোটা হইতে দেখা যায় না; ইহাদের দুধের মধ্যে মাখনের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক; ইহারা যেমন চারণ সেইরূপে ঘরে বসিয়া খাইতে পারে, পালান খুব বড় নহে কিন্তু দুধ শিরা পরিপুষ্ট।

গড়ন—দেখিতে সুশ্রী নহে, দেহ অনুপাতে পাগুলি যেমন লম্বা সেইরূপ মাংসল নহে, পিঠ ঘোড়ার মত বক্র ও গলার নিচে দোদ্দুল্যমান চর্ম্মের আধিক্য দৃষ্ট হইলেও ঝোলা চর্ম্ম ইহাদের পালান নাভীর নীচে সমান থাকে ও পিঠের উপরে কুকদটী ষাড়ের মত বড়।

দোষ—পালান ও গণ্ড মাংসল এবং বাঁটগুলি কঠিন, দোহনে অসুবিধা হয়, ইহাদের মেজাজের ঠিক নাই, সামান্য ত্রুটিতে ক্রোধ প্রকাশ করে, ইহাদের কাণ লম্বা ও ভিতর মুখী। ৪।৫ বৎসরের না হইলে ঋতুমতী হয় না।

সিন্ধি গাভী

(৩নং)

নেলোর গাভী

(৫নং)
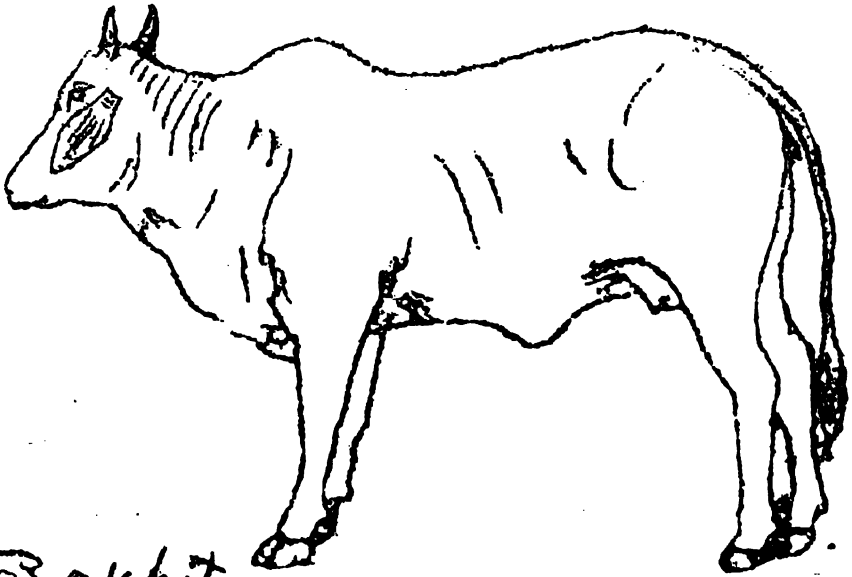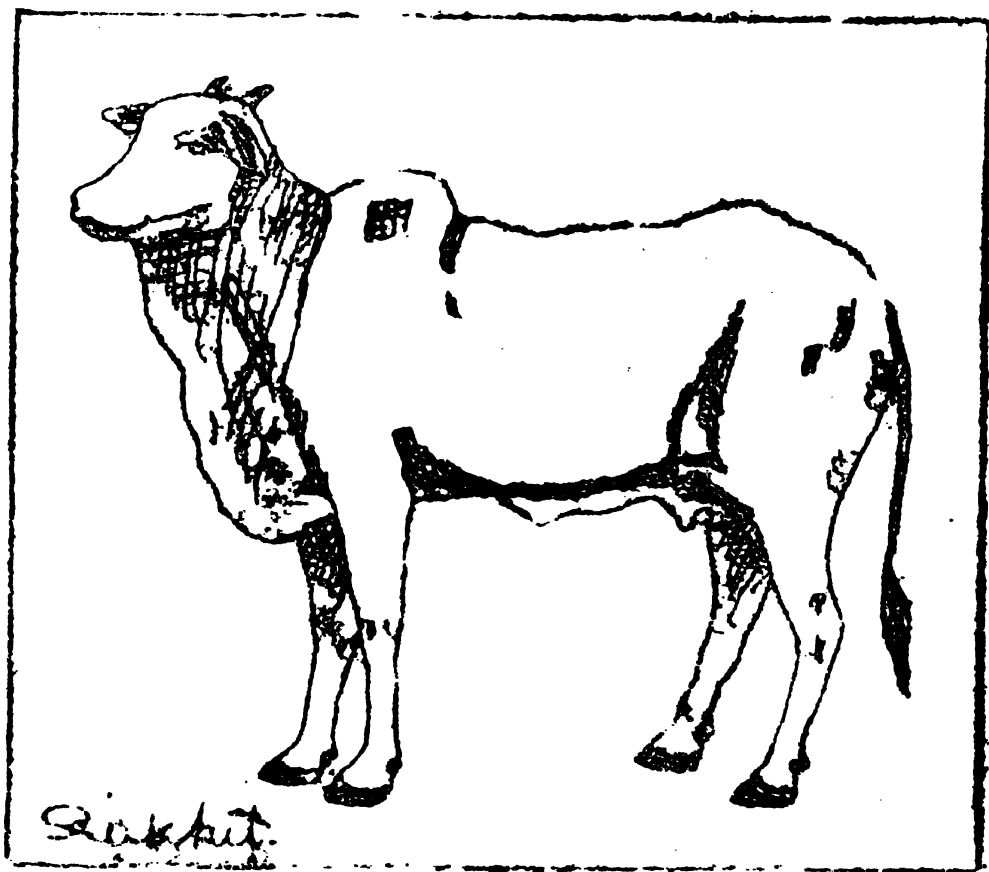
সমালোচনা—গাভীর প্রকৃতি চঞ্চল হইলে সকল সময়ে সহজে দোহন ক্রিয়া সমাধা হইতে পারে না কিন্তু দুধের পরিমাণ ও মাখনের পরিমাণ অধিক দেখিলে লোভ হয়। ইহাদের পুংসন্তান গুলি কৃষিকার্য্যের উপযোগী ও বৎসরের অর্দ্ধেক দিন ছাড়ন্ত থাকে বলিয়া ডেইরী ফারমের উপযোগী, কিন্তু ইহাদের পায়ের ক্ষুর নরম বলিয়া বিনা নালে পাকা রাস্তায় চলিতে পারে না ও বয়স হইলে অলস হইয়া থাকে। দেশের মূল্য ৬০ হইতে ১০০৲ টাকা।

নেলোর গাভী (৫নং চিত্র দেখ।)

প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ।

বর্ণ—শাদা।

শিং—ছোট।

গুণ—নেলোর গাভীর প্রকৃতি শান্ত, ইহারা খুব বেশী দুধ দিতে পারে না, উর্দ্ধ সংখ্যা ১২ সের, সচরাচর ৬।৭ সের দুগ্ধ প্রদান করে কিন্তু ইহাদের পুং সন্তানগুলি খুব তেজস্বী, কি কৃষি কার্য্যে কি গাড়ীটানা উভয়ের উপযোগী, পালান গণ্ড খুব বড় নহে।

গড়ন—কপাল প্রশস্ত ও খুতনী চ্যাটাল, চক্ষুর চারধারে দাগ আছে দোদুল্যমান ঝুল নাভীর সহিত সংযুক্ত ও কুকুদ পরিপুষ্ট, দেহের গড়ন মানানসই বলিয়া দেখিতে সুশ্রী।

দোষ—পায়ের ক্ষুর নরম।

সমালোচনা—ডেইরী ফারমের পক্ষে উৎকৃষ্ট না হইলেও ইহারা গৃহস্থের পালনের উপযোগী। এই জাতের বলদ অতীব শক্তিশালী।

এডেন গাভী

প্রাপ্তিস্থান—বোম্বাই।

বর্ণ—হরিণের গায়ের রঙের সহিত সামান্য হরিদ্রাভ থাকিলে দেখিতে যেরূপ হয়, এডেন গাভীর বর্ণ সেইরূপ।

শিং—ছোট।

গুণ—এডেন গাভী দেখিতে ছোট হইলেও ইহাদের পালান গণ্ড উৎকৃষ্ট, দুগ্ধশিরা পরিপুষ্ট। ইহারা শান্ত, ও নুতন লোক দেখিলে চঞ্চল হয় না ও ভিন্নদেশে নীত হইলে দুধের পরিমাণ অতি অল্প হ্রাস কখন করে কখন বা করে না। ইহারা আয়তন হিসাবে অধিক দুগ্ধবতী ও ৮।৯ সের দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে, ইহারা ষণ্ড জনন ক্রিয়ার জন্য উৎকৃষ্ট ও পুং সন্তান কৃষিকার্য্যের উপযোগী, অল্প বয়সে ঋতুমতী হইয়া থাকে ও এবং

বিয়ানে খুব জোর মাসখানেক ছাড়ন্ত হয় ও কোন কোন গাভী প্রসবের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ প্রদান করে।

গড়ন—মাথা ছোট ও ঈষৎ বক্র ও দুইটী শিঙের মাঝখানে স্থান অল্প, কাণ ছোট ও ডগার দিকে কোণযুক্ত, কাণ মাথার সমান ভাবে থাকে। দোদুল্যমান গলায় ও নাভীর ঝুল না থাকার মধ্যে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাদের পা ছোট, আয়তন ছোট, অনেকটা দেখিতে হরিণের মত।

দোষ—গোবসন্তে ইহারা বাঁচে না, ও পুং সন্তানগুলি অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে পারে না।

দিল্লি মহিষ (৬নং চিত্র দেখ।)

প্রাপ্তিস্থান—রোহতক জেলায় ইহাদের জন্মস্থান হইলে, হান্সি হিসার, দিল্লি জেলায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বর্ণ—মিশ কালো, ঠিক যেন যমের বাহন।

শিং—ছোট ও ঘোরান, অনেকটা ফেড়ার মত।

গুণ—এই মহিষ যেমন অধিক পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে সেইরূপ ইহাদের দুগ্ধে মাখনের ভরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ইহারা সহজে পীড়িত হয় না, ইহাদের অতিশয় ক্ষীর ও গালবন গণ্ডটী যেমন আঁটা সেইরূপ বাঁটগুলি বিস্তৃতভাবে অবস্থিত, ইহারা আধমণ দুধ দিতে পারে।

গড়ন—মাথা ছোট প্রশস্তবুক পায়ের অত্যন্ত মোটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমাবেশ বিসদৃশ, কাধ হইতে পাছার দিক, অনেকটা চতুষ্কোণ। ইহারা দেখিতে কদাকার হইলেও ভীষণ নহে।

সমালোচনা—ঘৃত বা মাখনের অভাব মোচন করিতে হইলে ইহাদের মত ডেইরী ফারমের উপযোগী প্রাণী আর দ্বিতীয় দেখা যায় না, আমাদের দেশের অনেক জেলায় ইহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে সুতরাং একেবারেই লোকসান নাই।

গাভীর জাতের অনুরূপ আকৃতি—গড়ন বর্ণ প্রভৃতি দেখিয়া উহাদের জাতির বিশুদ্ধতা চিনিতে হইবে ও দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া—যেটি পালনের উপযোগী সেই জাতীয় গাভী ও ষণ্ড ক্রয় করিতে হইবে।

ডেয়ারি ফার্ম্মের স্থান

যদি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ও প্রতি জেলায় ডেইরী ফার্মের সংস্রবে সবজী ও ঘাসের চাষ করা যায় ও ঐ সকল ফার্মের উৎকৃষ্ট গো বৎস গুলিকে স্থানান্তরে আর একটি বৃহৎ ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া প্রতিপালন করা যায় ও ক্ষেত্র হইতে নানাবিধ শস্যাদি ও ফলমূল প্রভৃতি চাষ করা যায় তাহাহইলে যেমন অল্প ব্যয়ে গো বৎস

গুলির ভরণ পোষণ হইবে সেই রূপ সহজে নির্ব্বাচন করিয়া উহাদের বংশ বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন সহজ হইবে।

যত বিজ্ঞান সম্মত ডেইরী ফার্ম স্থাপিত হইবে নির্ব্বাচিত ষণ্ড ও গাভীর আদর ও মূল্য হইবে। নির্ব্বাচন—আমাদের দেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কলিকাতার নিকটে এক লপ্তে ১০০ এক শত বিঘা জমির উপর ডেইরী ও সবজী ফার্ম স্থাপন করিয়া চল্লিশটী গাভী ও একটী ষণ্ড পালন, ও কিছু জমিতে প্রাত্যাহিক ব্যবহার্য্য শাক সবজী উৎপন্ন ও অবশিষ্ট জমিতে গো খাদ্য শস্যাদি ও কাঁচা ঘাসের চাষ করা যায় তাহাহইলে দুধ ও তরকারী বিক্রয় করিয়া ফর্মের যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে ও ঘাসের চাষ করিয়া সময়ে রোপন, কর্ত্তন ও উন্নত প্রনালিতে সংরক্ষণ করিলে যেমন উহাদের প্রতিপালনের ব্যয় হ্রাস হইবে সেইরূপ ঋতু ভেদে খাদ্যের পরিবর্ত্তন, পরিষ্কার টাটকা কাঁচা ঘাস ভক্ষণে গাভীর স্বাস্থ্য রক্ষার সহিত দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। গাভীর খাদ্য যেমন ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইবে সেইরূপ উহাদের গোবর চোনা সারে পরিণত করিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করিলে বিনা ব্যয়ে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া প্রচুর পরিমাণে গোখাদ্য—শস্য প্রভৃতি উৎপন্ন করিবে। গোশালা হইতে উৎপন্ন সারের শক্তি গাভীর খাদ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে;—গাভীর খাদ্য যত উৎকৃষ্ট হইবে ততই উহাদের স্বাস্থ্য—দুগ্ধ বৃদ্ধি —ও মূল্যবান সার প্রস্তুত হইবে। গো সম্পদ ও কৃষি সম্পদের সহিত মানুষের পরস্পর সম্পর্ক এতদূর ঘনিষ্ঠ যে এক কে ছাড়িয়া অপরের উন্নতি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, কৃষি জাত খাদ্য সামগ্রী উৎপন্ন করিতে মানুষ ও গরুর প্রয়োজন যতটুকু; মানুষের জীবন রক্ষা ও পুষ্টি সাধনে কিম্বা গো সেবায় অপর দুই এর অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন্য নহে কৃষি সম্পদের সহিত প্রাণী সম্পদের—সহযোগীতা না থাকায় আমাদের দেশের কৃষির দুর্দ্দশার একটি অন্যতম কারণ তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

কৃষির দুর্দ্দশা হইলে সর্ব্বাগ্রে কৃষকের ক্ষতি ও তৎপশ্চাৎ গো জাতির ও অন্যান্য গৃহ পালিত পশু পক্ষির দুর্দ্দশা ও অবনতি, ও তাহার সহিত সমগ্র দেশবাসীর কষ্টের পরিসীমা থাকে না। কৃষির দুর্দ্দশা ও কৃষকের দুরাবস্থা হইলে গোজাতি অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। যদি ডেইরি ফারম গুলির সংশ্রবে স্থানান্তরে একটি বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া উহার পরিসর ক্রমশ বিস্তৃত করা যায় তাহাহইলে সেইখানে আমাদের প্রয়োজন উপযোগী পশু পক্ষী পালন, নির্ব্বাচন ও উন্নতি বিধানের সহিত নানাবিধ প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য (গম যব, মটর ছোলা মুসুর মুগ কলাই অড়হর সরিষা তিষি তুলা আলু আক আদা হলুদ আনারস কলা খেজুর পেপে) উৎপন্ন করিলে লাভের জন্য বিক্রয় করা যায়— তাহা হইলে পশুপালন হইতে—বিশুদ্ধ দুগ্ধ, ঘৃত, মাখম, ছানা, মাংস চামড়া ও উৎকৃষ্ট সার,—

গম হইতে		ময়দা, সুজী ভুষী ভুষা
যব হইতে		শস্য ছাতু ভুষা
মটর, কলাই অড়হর, ছোলা মুগ, মসুর	হইতে	ডাল, ডালের খুদ, ভুষা ও ইন্ধন।
সরিষা তিসি		তৈল, খৈল, ইন্ধন।
তুলা		তুলা তুলাবীজ (বাঙ্গা) ইন্ধন,

প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত আলু, আক, আদা হলুদ আনারস কলা পেপে খেজুর আম লিচু ইত্যাদি অতি সহজে ও সল্পব্যয়ে উৎপন্ন হইবে এই ক্ষেত্রে প্রথম বৎসরে কিছু লাভ না হইলেও দ্বিতীয় বৎসর হইতে লাভের অংশ ক্রমশ বৃদ্ধি হইয়া সপ্তম বৎসরে পূর্ণমাত্রা লাভের পথ উন্মুক্ত করিবে। এই ক্ষেত্রে বিস্তৃত চারণ, ও ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে খেজুর গাছ রোপণ ও বাছাই করিয়া কতকগুলি শস্য ফল মূল কন্দ উৎপন্ন করিয়া বলদ চালিত ছোট ছোট কল সাহায্যে ব্যবসায়ের পণ্যসম্ভারে পরিণত করিলে সে সকল পরিত্যক্ত ভুষি ভুষা খইল প্রভৃতি মানুষের অব্যবহার্য্য অংশগুলি পাওয়া যাইবে, তাহার মূল্য এত অল্প হইবে যে ইহার সহিত চারণ ঘাসের সহযোগীতায় প্রাণীসম্পদের প্রতিপালন অতি সহজ ও স্বল্প ব্যয় সাধ্য হইবে এই ক্ষেত্রে পঞ্চম বৎসরের পর হইতে নির্ব্বাচিত ষণ্ড ও নির্ব্বাচিত গাভী দ্বিতীয় বৎসর হইতে হৃষ্টপুষ্ট ছাগল ভেড়া শূকর উৎপাদ করিয়া বিক্রয় করিতে সমর্থন হইবে। এই প্রকারের কৃষিক্ষেত্র প্রতি জেলায় একটি করিয়া স্থাপিত হইলে ধুয়াবাদী শূন্য সুজী ময়দা খাটি সরিষা ও তিসির তৈল বিশুদ্ধ ঘৃত আবর্জ্জনা শূন্য গুড় প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি যেমন উৎপন্ন করিবে সেইরূপ খাদ্যে ভেজাল নিবারণে সমর্থন হইবে। এই ক্ষেত্র প্রতিবৎসর নূতন ডেইরী ফারম্ স্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে ও হাতে কলমে কাজ শিখিবার উন্মুক্ত করিবে ও ক্ষেত্র চালাইবার উপযুক্ত লোক ও বিশুদ্ধ দুগ্ধ ঘৃতাদীর অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

গোরক্ষা ও আমাদের কৃষি

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার M. R. A. S., Vakil H. C. Calcutta, লিখিত।

(১)

বিগত ১৩১৪ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ এবং ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা "কৃষক" পত্রিকায় তিনটি পত্রে আমাদের দেশের গোজাতি রক্ষা ও উন্নতির বিষয় এবং আমাদের কৃষির অবনতির বিষয়ের চিত্র খানা পাঠক পাঠিকাগণের সমক্ষে ধরিয়াছি। আমরা পরাধীন পরমুখাপেক্ষ জাতি, রাজার কৃপাদৃষ্টি বিনা আমরা কোন কাজই করিতে পারি না, পারিবার চেষ্টাও করি না, আমরা এমনই অবসাদগ্রস্ত। এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা কি করিয়াছি তাহার একটু আলোচনা করা দরকার। অখিল ভারতীয় গো-কনফারেন্সে মাননীয় সারজন উড্‌রোফ বিগত ২ বৎসরে গোরক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টকে আবেদন পত্র পাঠাইবার জন্য ভারতে গোপ্রচার দুগ্ধদাত্রী গাভী হত্যার সংখ্যার তালিকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন শুনিয়া আমরা কতকটা আশান্বিত হইয়াছি। বিগত ২৭।৫।১৯ সালের সাধারণ অধিবেশনে সাহেব বাহাদুর প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছেন যে সমগ্র ভারতে প্রতিবৎসর কত গোহত্যা হইয়া থাকে তাহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই দুরূহ! কেবল ১৯১৮ সালে কলিকাতা নগরের তালিকা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

কলিকাতা ও সোণাডাঙ্গার হত গাভী মহিষ ও বৎসের তালিকা।

	মহিষ	গাভীও বলদ	বৎস
১৯১৭	৭৪৬৮	১১০১৮৪	৬৪৬৮
১৯১৬	৬২৪৫	৮৯৮৯৮	৯৩১৫
১৯১৫	৬২২০	৮৭৭৫১	৯৬৭৬
১৯১৪	৮৯৫১	৯৪৭৫৭	৯৬৯০
১৯১৩	...	১০১৫৭৩	৯০৬২

গত ৫ বৎসরের গড়—৭২২১—১০১৫৭৩—৯০৬২

বোম্বাই নগরের হত মহিষ গাভী বলদ ও বৎসরের গত ৫ বৎসরের তালিকা—

মহিষ ও গাভী	বলদ	বৎস
৪৩৬৪৯	১০৯৫০	১৮৬৭

মাদ্রাজ নগরের ১৯১৬ সালের হত গাভী ও বলদের সংখ্যা—১৯১৬—১৫৮৬০, ১৯১৫ সালে—১৬৮৬৩ হইতেছে। তাহা ছাড়া লাহোর, মুলতান, কাশী, গয়া এলাহাবাদ, ঢাকা প্রভৃতির মত শত সহস্র নগর ও ক্যাণ্টনমেণ্ট সমূহে হত

গাভী মহিষ ও বলদদের তালিকা আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া তাহা আমরা পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিলাম না। ব্রহ্মদেশে যে প্রতিবৎসর ২ কোটী টাকার শুষ্ক গোমাংসের জোর ব্যবসা চলিতেছে, তাহা ভারতীয় দুগ্ধ দাত্রী গবাদি পশুর অবাধ হননের উপর প্রতিষ্ঠিত। কয়েক বৎসর গত হইল মিঃ কানারবানজি সাপুরজি জাসাওয়ালা বিলাতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া সম্রাট সমক্ষে এই ব্যবস্থা রহিত জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। বিলাতি বা মার্কিণ দেশীয় টিনেবদ্ধ গোমাংসের দ্বারা সৈনিক বিভাগের খাদ্য সরবরাহ জন্য আবেদন পত্রিকা পাঠাইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তখনকার ও এখনকার ব্যবহারিক ও ও ব্যবসায়িক অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ভারত দিন দিন নিস্ব হইয়া পড়িতেছে, ভারতবাসীগণ কৃষি ও গো পালন, গোরক্ষা ভুলিয়া গিয়া অপর বিলাসী ব্যবসায়ে মন দিয়া সাধারণের দৈন্য আনিতেছে ; শিক্ষিতসম্প্রদায় লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরী না পাইয়া অপর কোন অর্থকরী ব্যবসায়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না বলিয়া দেশে অশান্তির স্রোত ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে।

জীবন সংগ্রাম দিন দিন তীব্র হইতে তীব্রতর আকার ধারণ করিয়াছে। কৃষির ক্রমিক অবনতি ঘটিয়াছে, কৃষক পুত্রেরা সামান্য ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়া শ্রমের সার্থকতার অবহেলা করিয়া চাকুরী চাকুরী করিয়া নগরে সমবেত হইতেছে, তাহার ফলে নৈরাশ্য ও দৈন্য লইয়া ঘরে ফিরিয়া বিলাসিতার স্রোতে নিমজ্জমান হইতেছে।

"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি,
ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব।"

প্রাচীন ঋষিবাক্য এখন বদলাইয়া গিয়াছে, কাজেই না খেতে পাইয়া ইনফুলুয়েঞ্জা রোগের প্রকোপে তিনমাসে অর্দ্ধশনে ৬০লক্ষ ভারতবাসী মরিবে না ত মরিবে কে ? স্বর্গের ন্যায় সুখকর হর্ম্ম সৌধাবলী নিবাসী, রাজভোগ্য ছানা ননী, মাখম রুটী মুর্গী মাংস জীর্ণকারী, স্বচ্ছন্দ বিচরণকারী যাঁহারা, তাঁহাদের নিকট যমরাজ সহজে ঘেঁসিতেও ভয় পান। বাল্যকাল হইতে আমরা কৃষিকার্য্যকে ঘৃণা করিতে শিখি, "লেখাপড়া শিখ নচেৎ চাষ করে খেতে হবে বাল্যকালে গুরুজনের ও পাঠাশালায় গুরুমহাশয়ের এই তাড়না আজীবন আমাদের মনে থাকে। আমরা পরিশ্রমের মর্য্যাদা জানি না। শারীরিক পরিশ্রম মাত্রকেই নিন্দার কার্য্য মনে করি। শ্রমজীবী লোক ভদ্রসম্প্রদায়ের বহির্ভূত—এই আমাদের ধারণা। পাশ্চাত্য সভ্যদেশ সমূহে আজকাল শ্রমজীবী দলকে সমাজের নিম্নস্থানে পড়িয়া থাকিতে হয় না। ইংলণ্ডে এই সম্প্রদায় (Labour party) রাজ্যের একটি প্রধান অঙ্গ। মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড

এই সম্প্রদায়ের একজন প্রধান নেতা হইতেছেন। তিনি ৩ নং লিঙ্কন ইন্‌স্‌ফিল্ড (লণ্ডন) বসিয়া ভারতের জন্য অশেষপ্রকার সাহায্য করিয়া থাকেন, মিঃ বার্ণস্, তিনি এবং অন্যান্য শ্রমজীবীদিগের নেতারা ভারত বন্ধু। বিলাতের গভর্ণমেণ্টকে এই দলের মতামত মানিয়া চলিতে হয়। বিলাতের কমন্স সভায় শ্রমজীবীদলের নেতারা সভ্যপদ পাইয়া থাকেন। শ্রম মর্য্যাদা জ্ঞানের অভাব বশতঃই আমরা কৃষিকার্য্যকে ঘৃণা করিয়া থাকি। গোপালন, পক্ষি পালন, গোচিকিৎসা, সাক্ সবজি উৎপাদন, ফল উৎপাদন, মক্ষিকা পালন প্রভৃতি কৃষির প্রধান অঙ্গ তাহা পূর্ব্ব ২ বৎসর "কৃষক" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেইগুলি প্রত্যেক শিক্ষিত কৃষককুলের এবং ভদ্রমণ্ডলীর যত্ন সহকারে পাঠ করা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া আমার মনে হয়। অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যকে কেহ ঘৃণা করিত না। পণ্ডিতগণ "আর্য্য" শব্দের বুৎপত্তি হইতে অনুমান করেন যে যাহারা ভূমি কর্ষণ করিতেন তাঁহারাই আর্য্যনামে অভিহিত হইতেন। ভগবান শিব স্বয়ং জীবকে কৃষিপদ্ধতি সকল শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাজর্ষিজনক, পরাশরাদি বহু ঋষিগণের অনুসেবিত কৃষিকার্য্যকে আমরা ঘৃণ্য মনে করিতে পারি না। আমাদের কৃষিশিক্ষার প্রকৃত ব্যবস্থা নাই। সেই জন্য বঙ্গে মাহিষ্য প্রমুখ কৃষক সম্প্রদায় সমূহ দেশে পাশ্চাত্য অনুকরণে কৃষিশিক্ষা প্রবর্ত্তন জন্য বার বার আবেদনপত্র গভর্ণমেণ্ট সমক্ষে পাঠাইতেছেন। তাঁহারা কৃষির উন্নতির জন্য গোরক্ষা "নিয়ামক বিধির প্রচার চাহেন। এ বিষয় উপেক্ষা করিবার নহে। যদি গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আশু মিমাংসা না করেন, তাহা হইলে অচিরে পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের সুখের দেশে পাশ্চাত্য দেশের মত "কর্ষককুলের অশান্তি' দেখা দিয়া নিম্ন প্রজাদের ও শাসকবৃন্দকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে। ইহার একটি প্রধান কারণ যে এই বিশাল কৃষিপ্রধান দেশে কৃষককুলের শাসনতন্ত্রে প্রতিনিধিত্ব নাই ; নিম্ন কৃষকদের হইয়া কথা বলিবার কেহ যাই। তাই এই নব শাসন বিধানে বঙ্গের বিশাল মাহিষ্য সম্প্রদায় বিগত ৬।৭ বৎসর হইতে দেশের শাসনতন্ত্রে প্রতিনিধিত্ব পাইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়া বহু আবেদনপত্রিকা গভর্ণমেণ্ট সদনে পাঠাইয়াছেন।

আমার মনে হয় যে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায়, ভারতীয় কৃষিকুলের মধ্যে কৃষি শিক্ষা বিস্তার, গোবল রক্ষা, গোপ্রচার রক্ষা, গো-নয়ন শুল্ক সমীকরণসূচক বিধির আশু প্রবর্ত্তন বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের দেশের অজ্ঞ গোপ-কুলের মধ্যে "দুগ্ধ" ব্যবসায়ের বৈজ্ঞানিক নীতি সকল প্রচার ও শিক্ষাপ্রদান বিশেষ আবশ্যক। দুঃখেরবিষয় বঙ্গ সাহিত্য সকলদিকে পরিপুষ্ট হইলেও এ বিষয়ে কাহারও অদ্যাবধি দৃষ্টি পড়ে নাই। আমি "গোপাল বান্ধব" পুস্তকে এ বিষয়ে যতদূর সম্ভব আলোচনা করিয়াছি। তাহা বঙ্গবাসী মাত্রেরই যত্নে পাঠ করা আবশ্যক। আমা-

দের এমনই রুচিবিকৃতি উপস্থিত হইয়াছে যে এই নভেলী বিলাসিতার যুগে, নভেল গল্প, উপন্যাসাদি, পুস্তকের সহস্র সহস্র পাঠক পাঠিকা জুটে, কিন্তু অন্ন চিন্তা যে বিদ্যায় দুর হইবে, যে শিক্ষায় আমাদের এই বর্ত্তমান যুগের তীব্র জীবনসংগ্রামের হাত হইতে অব্যাহতি পাইব তাহা কেহই শিক্ষা করে না এবং দুঃখের বিষয় এরূপ পুস্তক আমাদের সাহিত্যে কমও বটে। ডাক্তার রায় চুণীলাল বসু মহাশয় "হাবড়া সাহিত্য সম্মিলনের" অধিবেসনে "বাঙ্গালীর খাদ্য" শীর্ষক যে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাহা "সাহিত্যসংবাদ" পত্রিকায় অষ্টমবর্ষের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত ভদ্রকোকের পাঠকরা কর্ত্তব্য। ইহার স্থূলমর্ম্ম এই যে আমাদের খাদ্যের মধ্যে "প্রোটীড" বা পেশী সংগঠনকারী উপাদান সমূহের সম্পূর্ণ অভাব পরিদৃষ্ট হয়, শরীরের বলবর্দ্ধন, হৃষ্টপুষ্টতা এবং কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি পক্ষে পুষ্টিকর এবং উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন। স্বাস্থ্য এবং শক্তি খাদ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সাধারণের স্বাস্থ্য ও শক্তির অনুপাতে সমাজ শরীরের স্বাস্থ্য ও শক্তি পরিমিত হয়। অধুনা সাধারণের আর্থিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও অর্থ নৈতিক অবস্থায় পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে স্বাস্থ্যোন্নতির উপর অর্থোন্নতি বিশেষরূপ নির্ভর করে। স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে খাদ্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। বিগত ৪।৫ মাসে জগৎব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের আক্রমণ যে খাদ্যক্লিষ্ট নিস্ব ভারতবাসীর উপর অতি তীব্ররূপ পতিত হইয়াছিল তাহা কে অস্বীকার করিবে, কে বলিবে এই মহামারীর আক্রমণে খাদ্যপীড়িত নিস্ব ৬০ লক্ষ ভারতবাসী অকালে কালকবলে পতিত হয় নাই। আমাদের সুযোগ্য শাসকবৃন্দও এই প্রকারে আপদ্ প্রতিকারের কি করিয়াছেন বা করিতেছেন? তাই বলি, আপনারা যে আমাদের দেশে সংস্কার আইনের বলে নব শাসন পদ্ধতি আরব্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহাতে দেশের নিস্ব কৃষকদের স্থান দিন, এই বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের শতকরা ৯০ জন কৃষিজীবী সম্প্রদায়কে উত্তমর্ণ এবং অত্যাচারী জমীদার বর্গের হস্তে ক্রীড়া পুত্তলী করিয়া পদদলিত হইবার পথ আর অধিক উন্মুক্ত করিবেন না। যাহাতে আমাদের দেশের কৃষকেরা তথা পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে জমীদার পুত্রেরা কৃষিবিদ্যা অনুশীলন করিয়া অধিক পরিমাণে খাদ্যোপযোগী শস্য উৎপাদন করিতে পারেন, দেশের খাদ্য দৈন্য দুর করিতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষা দেশে প্রবর্ত্তন ও প্রচার করুন। এ সম্বন্ধে "বঙ্গের প্রধান কৃষক সম্প্রদায়" 'বঙ্গীয় মাহিষ্যগণ" বিশেষ উদ্যোগী হইয়া রাজসদনে আবেদন করিতেছেন। বঙ্গের অপর কৃষকসম্প্রদায়গণেরও তাহা আশু অনুকরণ করা ও সমবেত চেষ্টায় শক্তির সমাবেশ করা প্রয়োজন হইয়াছে।

আমাদের শরীর রক্ষণ করিতে হইলে আবশ্যকমত প্রেটীড্ এবং তৈল বা মেদময় উপাদান ঘটিত খাদ্য আবশ্যকমত খাইতে হইবে। যে খাদ্য আমরা সচরাচর খাইয়া থাকি তাহাতে এ উপাদানগুলি আবশ্যকমত পরিমাণে থাকে না বলিয়া আমরা ক্রমশ অলস, স্ফুর্ত্তিহীন ও স্থূল হইয়া অকেজ হইয়া পড়ি, রোগগ্রস্ত হই এবং অকালে মরি।

গোরক্ষা ও আমাদের খাদ্য

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার M. R. A. S., Vakil H. C. Calcutta., লিখিত।

(২)

ইহা সকলের জানা বিশেষ প্রয়োজন যে ডেনিষ ও জার্ম্মাণ ডাক্তারদের মতে (এবং এই মত মার্কিণ দেশীয় বিশেষজ্ঞগণ সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন) একটী পূর্ণ বয়স্ক প্রতিদিন ১২৩৫ হইতে ১২৪০ গ্রেণ প্রোটিড বা পেশী সংগঠনকারী উপাদানের প্রয়োজন; সেই জন্য ছেলেদের পরিপাকশক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ এবং গম যব, মক্কা, ডাল প্রভৃতি পেশী সংগঠনকারী খাদ্য খাইতে দিবে। ডাইলে শতকরা ২৪ ভাগ প্রোটিড বর্ত্তমান। এখন দুধটাই আমদের প্রধান আলোচ্য বিষয় কারণ ইহা হইতে আমাদের দেহের পুষ্টি-সাধক ঘৃতাদি তৈলময় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং গো-বল আমাদের শষ্যাদি খাদ্য সম্ভার উৎপাদনের একমাত্র সহায়। ডাঃ হচিন্‌সন, পার্কার ব্যাঙ্গ, পাল-শুপ্‌লী, অষ্টারট্যাগ্ প্রভৃতির মতে ডিম্ব ও দুগ্ধ মনুষ্যের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকার অন্তর্গত হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম নানা অভাবনীয় কারণে আমাদের দেশে কৃষি ও দুগ্ধ সংকট উপস্থিত হইয়াছে। ইহা নিবাণের করিবার কি উপায় আছে তাহা আমাদের এখন চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে, দেশের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি রাজা প্রজা সকলেই এই ইকনমিক্ প্রশ্নের সামঞ্জস্য ও মিমংসা করিবার জন্য মাথা ঘামাইতেছেন। কেহ বলিতেছেন, গোজাতির উন্নতি আবশ্যক, কেহ

বলেন, গোপ্রচার রক্ষা করা বা নববিধির দ্বারা রচনা করা, কেহ বলেন গো খাদ্য উৎপাদন করা, কেহ বলেন কৃষিশিক্ষা বিস্তার করা, কেহ বা বলেন অবাধ গোহত্যা বিধির দ্বারা রহিত করা এবং কেহ কেহ বা বলেন বিশুদ্ধ পানীয় জলের ও গোচিকিৎসা বিধির বহুল প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা। হাওড়ার উকীল মবন্ধু বাবু নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায় বোম্বাই হিউম্যানিটেরিয়ান লীগের নেতা ও প্রবর্ত্তক মিঃ জীনরাজ দাস, অখিল ভারতীয় গোকনফারেন্সের সম্পাদয়ক মাননীয় সারজন উর্ডরোফ্ ধূলীয়ানের প্রাণীরক্ষক সংঘের প্রবর্ত্তক, মোজফর নগরের মাননীয় লালা সুখবীর সিংহ, গো কনফারেন্সের অবৈতনিক সেক্রেটারী পণ্ডিত ভোলানাথ শর্ম্মা, 'কৃষক' সম্পাদক, "কৃষি সম্পদ" সম্পাদক প্রভৃতি বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি এ বিষয়ে, একটা সামঞ্জস্য করিয়া গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবার জন্য চিন্তা করিতেছেন। এই লেখকও ১৯০২ সাল হইতে অদ্যাবধি বহু মাসিকপত্র, দৈনিক সংবাদপত্র ও ইংলিশম্যান, বেঙ্গলী, অমৃত বাজার পত্রিকায়ও বসুমতী, আলোচনা কৃষকাদি পত্রিকারস্তম্ভে এ বিষয়ে নিজ কার্য্যকরী ৩৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকাগণ তাহা পাঠ করিতে পারেন। পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশ সমূহের অবস্থা ও আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নিস্বঃ ভারতীয় প্রজাবর্গের আয় ও অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া এই সকল বিষয়ের সংস্কার করিতে হইবে। সে কথা সরকার সমক্ষে "কৃষক" দলের পক্ষ হইয়া বলে কে? তাই আমাদের বলার লোক বা 'প্রতিনিধি চাই।', সেইজন্য গোপ, সদ্গোপ, সুবর্ণ বণিক, সাহাবণিক, উগ্র ক্ষত্রিয় আদি সকল কৃষক জাতি সমবেত হউন। আপনারা কৃষি ও গো-রক্ষার দিকে মন দিন। রাজাকে বলুন যে তাঁহারা কৃষি শিক্ষায় দেশে পাশ্চাত্য অনুকরণে প্রচুর ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং মহিষ্যগণের আবেদনে যাহাতে সাফল্য হয় তাহাতে শক্তি প্রদান করুন। মিশর বিলাতের মত গোহত্যা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করা হউক।

এখন দেখা কর্ত্তব্য যে গো জাতির উন্নতি কি উপায়ে হইতে পারে? এ সম্বন্ধে নীলানন্দ বাবু ইণ্ডিয়ান রিভিউ ও সাহিত্য সম্বাদ পত্রিকায় সার গর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া ছেন। বিলাতের "ডেয়ারিষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়ান "সমিতির মুখপত্র" ডেয়ারিং এবং ডেয়ারিফার্ম্মিং পত্রিকায় লিখিত সারগর্ভ প্রবন্ধ সকল "কৃষক" সম্পাদক দেশের লোকের অবগতির জন্য ধারাবাহিকরূপে কৃষক স্তম্ভে প্রকাশ করিয়া দেশের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন ও হইতেছেন। গোপাল বান্ধবে আলোচিত সকল জ্ঞাতব্য বিষয় এই গুলিতে আছে। আমি নীলানন্দ বাবুর প্রবন্ধ গুলি ও কৃষক স্তম্ভে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে পড়িতে অনুরোধ করি।

নানা অভাবনীয় কারণে বর্ত্তমান ভারতীয় গোজাতির অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই বলিতে হইবে যে আমাদের বর্ত্তমান "দুগ্ধ সংকট" একদিনে হয় নাই। ইহা আমাদের বহু বৎসরের অবহেলা ও অবিমৃষ্যকারিতার ফল। অবাধ গোহত্যা নব বিধির দ্বারায় বন্ধ করিতে হইবে। গো অর্থে গো এবং মহিষ উভয়কেই বুঝিতে হইবে। আমাদের দেশের গাভীকূলের দুগ্ধ প্রদান ক্ষমতা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। তাহার কারণ আমার মনে হয় যে বৈজ্ঞানিক গো উৎপাদন যাহা ঋষিগ্রন্থে আমরা দেখিয়াছি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। "নির্ব্বাচন" ও "পৃথক করণ" বিধিগুলির প্রতি আর আমরা লক্ষ্য করি না। এমন আবশ্যকীয় ও দায়িত্বপূর্ণ বিষয়টীকে আমরা এক অশিক্ষিত অজ্ঞ সম্প্রদায়ের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া আছি!! অন্নাভাবে আমরা মরিব না ত মরিবে কে? গোয়ালাদিগের দুর্ব্বুদ্ধিতা, অত্যধিক লোভ ও অন্যান্য কারণ বশতঃ উৎকৃষ্ট জাতীয় গরু ও বাছুরের অবাধ হত্যা দ্বারা ভাল ভাল জাতীয় গরু এক প্রকার সমূলে ধ্বংস হইবার পথে চলিয়াছে। কৃষি প্রধান ভারতে ঘৃতের মণ ৮০৲ টাকা এবং দুগ্ধ টাকায় তিনসের দরে বিকায়, এবং গো-খাদক বিলাত ও মার্কিণ ও দীনামার দেশে গো দুগ্ধ টাকায় ৮ হইতে ১০ সের! ১৯১৪৩১৯১৫ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষি সমিতিতে আমি এই সকল অত্যাবশ্যকীয় বিষয় গুলি উপস্থিত করিয়াছিলাম; মাননীয় যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, সার সুরেন্দ্র নাথ রায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, সুরেদ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রতি দেশের বহু! নেতাগণকে ধরিয়া লাট সভায় এই কথা উপস্থিত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু এই হতভাগ্য দেশের স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক কোন নেতাই এই সর্ব্ব প্রধান ও আবশ্যক বিষয়ে মনোযোগ দিলেন না; কেবল মাত্র মিঃ বিজয়রাঘব চারিবার এবং দেশ পূজ্য সুব্রহ্মণ্য ও লোকমান্য তিলক মহারাজ এই বিষয়ে বিশেষ কাজ করিতেছেন ও কাজ করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন।

এ বিষয়ে কোন কোন দিক হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সমগ্র মানব সমাজের স্থায়িত্ব ও ভাবি কল্যাণের দিকে সংযত দৃষ্টি পাত করিলে, মুষ্টিমেয় লোকের ক্ষুদ্র দৃষ্টি সম্ভূত আপত্তি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য বহু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গণ বলিয়াছেন যে গো-মাংস ভক্ষণ মানব দেহের বিশেষ অকল্যাণকর!!! আমাদের প্রাচীন ঋষি গ্রন্থ সমূহেও এইরূপ বহু বচনেরও অভাব নাই। পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশ এবং বিহার প্রদেশ হইতে প্রতি মাসে দুই বার করিয়া তথাকার উৎকৃষ্ট গাভী কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন হাটে জমায়েত হইয়া থাকে। তথা হইতে গোয়ালাগণ দুগ্ধের হিসাবানুসারে দাম দিয়া অথবা ধারে মহাজনদিগের নিকট খরিদ করে

গৃহস্থ ক্রেতাগণ বা গোয়ালাদিগের মধ্যে যাহারা একটু ধর্ম্মভাবাপন্ন, তাহারা কসাইদের বৎস বিক্রয় করে না সত্য, কিন্তু বাছুরগণকে আদৌ দুধ খাইতে না দিয়া এবং দুধের পরিবর্ত্তে বাছুরগণের অপর কোনরূপ খাদ্যের সুব্যবস্থা না করিয়া দিয়া, দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই খাদ্যাভাবে সমন ভবনে প্রেরণ করিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। সদ্য জাত বৎসের কিরূপ খাদ্য প্রয়োজন তাহা উল্লিখিত গোপালবান্ধব পুস্তকে বিস্তৃতভাবে বিবৃত আছে। ফলে উভয়েরই কার্য্য একপ্রকারই দাঁড়ায়। উত্তম শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর গাভীর ভবিষ্যৎ বংশ এইরূপে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত গোহত্যার ভয়াবহ তালিকা দেখিলে স্পষ্টই অনুমিত হইবে। অপর নগরের কথা থাক, কেবল মাত্র কলিকাতা নগরে প্রত্যহ অন্যূন ৪৫০ শত সকল প্রকারের পশু (গো, বলদ, বৃষ গাভী মহিষাদি) প্রতিদিন সোনাডাঙ্গা ও ট্যাংরা আদি পশু হত্যাশালায় খাদ্যের জন্য হত্যা হইয়া থাকে। কলিকাতা কর্পোরেসানের চেয়ারম্যান মিঃ পেইন, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি ও অখিল ভারতীয় গোকন্ফারেন্সের সভাপতি সারজন উড্‌রোফ্, ঐ সমিতির অনারারি সম্পাদক, পণ্ডিত ভোলানাথ শর্ম্মা,শ্রীকৃষ্ণ গোশালার নিয়ন্তা বাবু হাসানন্দ বর্ম্মণ, এই লেখক, মিঃ মোরিণো এবং অপর কয়েকটি ভদ্রলোক আমরা সকলে যে দিন কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ট্যাংরায় হত্যাশালা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম, সেই দিন ২০টী মহিষী (শুষ্ক হইলেও এখনও বহু বৎস উৎপাদনে সক্ষম) এবং ৮১টি উত্তম জাতীয় দ্রোণদুগ্ধা গাভী (শুষ্ক হইলেও বহু বৎসের মাতা হইতে পারে এবং বৃদ্ধা নহে) হত্যার জন্য রাখা হইয়াছে দেখিলাম। এই সকল প্রথম বা দ্বিতীয় বিয়ানের (Prime cows) সম্ভবতঃ কলিকাতার নিস্বঃ গোয়ালাদের নিকট হইতে আসিয়া অকালে প্রাণ দিতে এইখানে উপস্থিত হইয়াছে ! ! ! এই সকল গাভী ৮।১০ বিয়ান এখনও প্রদান করিতে পারে, কিন্তু নৃশংস গোয়ালা সবৎসা গাভীটি ক্রয় করিয়া ২।৩ দিন মধ্যে বৎসটিকে কসাইকে বিক্রয় করিয়া ফেলিল, তখন গাভীটি বৎস হীনা হইয়া পূর্ণমাত্রায় দুগ্ধ দিতে একটু ইতঃস্তত করিলে ফুঁকাদি নৃশংস উপায়ে তাহার শেষ ফোঁটা দুগ্ধ বাহির করিয়া লইয়া শুষ্ক হইবার পর সামান্য মূল্যে কশাইকে বিক্রয় করে। এইরূপ নৃশংস গোহত্যায় দেশের অশেষবিধ অহিত সাধিত হইতেছে। প্রথমতঃ আমাদের দুগ্ধাদি গব্য খাদ্য সামগ্রীর উৎস বা মূল উদ্ভবের উপায়টি চিরতরে নষ্ট হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে হৃষ্টপুষ্ট ও তেজস্বী হল বৃষের ও জনন বলিবর্দ্দের অভাব হওয়ায় ক্রমশই কৃষির অবনতি ঘটিতেছে। মূল্য [illegible]দন দিয়া গোয়ালা পুনরায় মহাজনের নিকট ধারে নূতন গাভী খরিদ করিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় প্রণালী পুনরায় যথাবিধি অনুসৃত হইল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে গোয়ালাগণ দুগ্ধহীন গাভী কসাইতে অল্পমূল্যে বিক্রয় না করিয়া পুনরায় প্রসব হওয়া পর্য্যন্ত পালন করে না কেন ?

ইহার কয়েকটি কারণ আছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি প্রধান বলিয়া আমার মনে হয় এবং নীলানন্দ বাবুও আমার মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন।

১। গোয়ালারা নিস্ব; অর্থাভাব প্রযুক্ত শুষ্ক গাভী পুষিতে পারে না।

২। ফুঁকা দিলে সে গাভী পুনরায় গর্ভিনী হওয়া কঠিন।

৩। দুগ্ধহীন অবস্থায় গোরু পোষায় কোন লাভ নাই। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় নগরে দুগ্ধহীন গাভী পুষিতে হইলে তাহাতে যাহা খরচ হইবে, তাহা অপেক্ষা অল্পমূল্যে একটি সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করা লাভ জনক। এই সকল কারণে নিস্বঃ গোয়ালাগণকে নিস্বতার তাড়নে বাধ্য হইয়া শুষ্ক গাভী বিক্রয় করিতে হয়। এই অস্বাভাবিক গোজাতির ধ্বংস নিবারণ করিতে হইবে।

১। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে গোরক্ষা সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ করাইতে হইবে।

২। রাজা জমিদার ও জন সাধারণের পরস্পর সহযোগে দেশের মধ্যে যথেষ্ট গোপ্রচারভূমি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ডিষ্ট্রীক্‌টবোর্ড ও কর্পোরেশান সমূহের যে সকল অফিষাদির কম্পাউণ্ড বা মাঠ আছে এবং কলিকাতাদি বড় বড় নগরের সীমার মধ্যে যে সকল সাধারণ ময়দান আছে তাহা গোরু চরিবার জন্য বিনা অর্থে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই জন্য কলিকাতা মিউনিসিপাল এক্‌ট্ ও বর্ত্তমান ডিষ্ট্রীক্‌ট বোর্ড য়্যাক্‌ট এমন ভাবে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে এই সম্বন্ধে সংকীর্ণতা দূর হয় এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ গোপ্রচার রচন ও রক্ষণের জন্য আবশ্যকীয় অর্থব্যয় করিতে পারেন এইরূপ প্রত্যেক গ্রামে বা নগরের উপকণ্ঠে আবশ্যক মত গোপ্রচার রচনা করিতে হইবে; তজ্জন্য সরকারের সম্পূর্ণ সাহায্য প্রয়োজন। পুনশ্চ দূর পার্ব্বত্য বা জঙ্গলী দেশে শুষ্ক গাভীদের লইয়া যাইবার নয়ন শুল্ক পাশ্চাত্য অনুকরণে সমীকরণ জন্য বিধি প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক। এ জন্য প্রাদেশিক কৃষিসমিতি, রেলওয়ে বোর্ড এবং প্রাদেশিক ও ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট সদনে বহু আন্দোলন ও আবেদন পত্র দিয়া কোন কাজ হয় নাই। গাভীর দুগ্ধ প্রদান ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিতে হইলে আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ প্রদর্শিত বৈজ্ঞানিক বিধিতে গোজনন ও উৎপাদন করিতে হইবে। তজ্জন্য সকলেরই উল্লিখিত গোপাল বান্ধব পুস্তক যত্নে পাঠ করা কর্ত্তব্য।
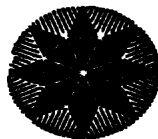
আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩২৬ সাল

বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা

জ্ঞানার্জ্জনের জন্য আমরা বালক বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাই কিন্তু তাহাদের জ্ঞানার্জ্জনের সুবিধা হইতেছে কিনা তাহার বিশেষ কোন খোঁজ লই না। প্রত্যেক বিষয়ের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করাই জ্ঞানার্জ্জনের প্রকৃত উপায়। প্রকৃতির নিয়ম আলোচনা করিলে এই কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। ঘরের কোণে বসিয়া কেবল পুস্তকপাঠে জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে না—কোন বস্তু বা বিষয় তত্ত্বতঃ বুঝিতে গেলে তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বুদ্ধিদ্বারা বিচারে প্রতিপন্ন করা আবশ্যক।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, জ্যামিতি, পরিমিতি, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, যে কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বাহিরের বস্তু জগতের সহিত পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। মন দর্পণে যাহার প্রতিবিম্ব না পড়িবে তাহা লইয়া বিচার করা সম্ভব নহে, তাহা বুদ্ধি গ্রাহ্য হইতে পারে না।

প্রকৃত বস্তু দর্শনে যেমন শিক্ষা হয় কেবল পুস্তক পাঠে তেমন হয় না। যেখানে প্রত্যক্ষ দর্শনের অভাব হয় তথায় আলেখ্য বা আদর্শ দ্বারা কাজ চলে। ভুগোল আলোচনার জন্য মানচিত্র ও ভুগোলকের আবশ্যক। শিক্ষার্থীগণের জন্য এইগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। ভারতীয় স্কুল কলেজগুলির সাজ সরঞ্জম ক্রমশঃ এইভাবে করিয়া লওয়ার চেষ্টা হইতেছে। শিশুকাল হইতে ছাত্রছাত্রিগণকে এই প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইলে বড়ই সুখকর হয়।

বিদ্যালয় সংলগ্ন ক্ষেত্রে বা উদ্যানে উদ্যানচর্চ্চা বা কৃষিতত্ত্বালোচনার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ছেলে মেয়েরা ঐ সকল তত্ত্বালোচনার বিশেষ সুবিধা পায় ও আলোচনাকালে অতিশয় সুখানুভব করে এবং দেখা যায় যে এই প্রকারে শিক্ষাদ্বারা বাল্য জীবনের শিক্ষার স্মৃতি তাহাদের ভবিষ্যত জীবনটি সুখকর করিয়া রাখে এবং উহা কাজের সময় কাজে লাগাইতে পারা যায়। উন্মুক্ত বায়ুতে উদ্যানমধ্যে বসিয়া বিদ্যাভাসের সুযোগ পাইলে শিশুকাল হইতে ছেলেরা কত বিষয় শিখিতে পায় তাহা গণনা করা যায় না।

তাহারা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের গতি স্থিতির একটা মোটামুটি ধারনা করিতে পারে। গাছ তলার ছায়া দেখিয়া উত্তরায়ন দক্ষিণায়নের সন্ধান পায়। কি প্রকারে আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়, কি প্রকারে বৃষ্টি হয় এবং কেমন করিয়াই বা ভূগর্ভে জল সঞ্চিত হয় তাহা তাহারা বুঝিতে পারে। তাহারা ঋতুর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পায়। মৃত্তিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে উহার প্রাকৃতিক গঠন বুঝিয়া লয় এবং কুপাদি খনন কালে তাহাদিগকে ভূস্তরের সন্ধান দিতে পারা যায়। বৃক্ষ লতাদির বিস্তার চলাফেরা, আহার আচরণ লক্ষ্য করিতে করিতে তত্ত্বৎ বিষয়ে স্বভাবত একটা জ্ঞান জন্মে। বিদ্যামন্দিরের পথ ঘাট প্রস্তুত করা, কূপ বা পুষ্করণী খনন, গৃহ নির্ম্মাণ দেখিতে দেখিতে তাহাদের পরিমাণ বিদ্যার জ্ঞান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রকারে শিক্ষা দিবার মত আমাদের দেশে বহুসংখ্যক শিক্ষক আজিও তৈয়ারি হয় নাই বা এইরূপে শিক্ষার উপযোগী আয়োজন ক্বচিৎ কোথাও আছে। ব্যবহারোপযোগী শিক্ষার স্থূলমর্ম্ম ছেলেমেয়েদিগকে সমাজ এবং সংসারের উপযোগী কাজের মানুষ তৈয়ারি করা। এইরূপ স্বাভাবিক অবস্থায় শিক্ষা পাইলে তাহারা শীতাতপ সহিষ্ণুও হয়। গাছ ঘরের আওতায় যে সকল বৃক্ষ লতা তৈয়ারি হয় সেগুলি বাহিরের রৌদ্রাতপ বাতাস সহ্য করিতে পারে না। আমাদের ছেলেমেয়েদের গাছ ঘরের গাছের মত লালনপালন করা উচিত নহে। কামার, কুমার, ছুতার ও চাষীর ছেলেদিগকে বাহিরের কাজের জন্য অভ্যস্থ করা চাইই এবং ধনী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেদের ভিন্ন স্তরের লোকের সহিত মেলামেশার অভ্যাস করিয়া না দিলে, তাহারাও সংসারের উপযুক্ত হইবে কিপ্রকারে? প্রকৃতির পীড়ন জীব, জন্তু, উদ্ভিদ, মানুষ সকলের উপর আধিপত্য করিতেছে -জড় ঝঞ্ঝা শীতাতপে যে আত্মরক্ষা করিতে পারেনা, তাহার বাঁচিয়া থাকা অতিশয় কষ্ট সাধ্য। গাছ ঘরের কয়েকটা সাজান বৃক্ষলতা লইয়া সংসারের কতক্ষণ কাজ চলিবে—চাই প্রকৃতির সহিত সম্মুখ সংগ্রামে অভ্যস্থ দৃঢ় কর্ম্মঠ, পশু পক্ষী বৃক্ষলতা মানুষ।

আমরা বিদ্যালয় সংলগ্ন উদ্যানের একটি চিত্র দিয়া দেখাইতে চাই যে আদর্শ বিদ্যালয় কিরূপ হওয়া উচিত। আমরা ধরিয়া লইলাম যে বিদ্যালয় গৃহটি অন্ততঃ ৩ বিঘা জমির উপর স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের জমির অভাব হইবে না বলিয়া আশা

আমরা করিতে পারি। চাষী শিল্পী জমিদার সকলের যদি বিদ্যালয়ের উপর আস্থা থাকে এবং সকলের যদি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনে আগ্রহ হয় তাহা হইলে কাজের, মত, আবশ্যক মত স্থানের অপ্রতুল কখনই হইতে পারে না। যাহা হউক আমরা এক্ষণে ছোটখাঁট উদ্যান সংযুক্ত বিদ্যামন্দিরের কথাই বলিতেছি। ইহাকে যখন মন্দির বলিয়া কল্পনা করিতেছি তখন তাহার গঠন আকৃতি সজ্জা অনুরূপ হওয়াই উচিত। উদ্যানটিও মনোরম হওয়া প্রার্থনীয়। যেখানে প্রবেশ করিলে মন প্রফুল্ল হইবে, চিত্ত আকৃষ্ট হইবে উহার সৌন্দর্য্য অনুরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ১০ দশটি গ্রামের মাঝে এইরূপ এক একটী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং উহাকে সুন্দর করিবার সকলের চেষ্টা থাকিলে ইহা যে নিশ্চয় সুন্দর হইবে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রামগুলির মধ্যস্থলে যে স্থানটি স্বভাবত মনোরম এমত স্থলে ইহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিলে উহার সৌন্দর্য্যের আরও বৃদ্ধি হয়।

কল্পনা করা হউক স্কুল গৃহটি নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের উত্তরাংশে অবস্থিত। ক্ষেত্রটির দক্ষিণে সরকারী প্রশস্ত রাস্তা। উহা দৈর্ঘ্যে ২৫০ ফিট, প্রস্থে ১৭৪ ফিট এবং উহার বর্গফল কিঞ্চিদধিক ৪৩৫০০ বর্গ ফিট। ইহার মধ্যস্থলে একটি কুয়া খনন করা হউক। কুয়াটি সুগভীর ও সুপ্রশস্ত হইলে ভাল হয়, পার্শ্বে দুইটি চৌবাচ্চা ও একটি চৌতারা থাকিবে। দক্ষিণ দিকের সদর রাস্তা হইতে একটি পথ (৮´ ফিট লম্বা) কুয়া, চৌতারা বেষ্টন করিয়া উত্তর দিকের স্কুলগৃহটি পর্য্যন্ত চলিয়া আসিবে এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ৬ফিট একটি পথ থাকিবে। উহাও কুয়া বেষ্টন করিয়া যাইবে। উদ্যানের দুই পাশে দুটি ঘরে মালি ও স্কুলের ভৃত্য ও বাগানের যন্ত্রাদি থাকিবে। প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার জন্য খুব প্রশস্ত আয়তন গৃহের আবশ্যক নাই, গৃহটি ৬০´´ × ১৬´´ ফিট ও তাহার বারান্দা ৬০´´ × ৮´´ ফিট হইলেই চলিবে। যদি আবশ্যক হয় ঘরটি পূর্ব্বদিকে পশ্চমদিকে বাড়ান যাইতে পারিবে। স্কুলে দুই একজন শিক্ষকের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন দেখা যায়। ক্ষেত্রটির পূর্ব্ব দক্ষিণ এবং পশ্চিম দক্ষিণ কোণে আমরা প্রধান ও অন্য একজন শিক্ষকের বাস গৃহ নির্ম্মানের স্থান দিতে পারি। উত্তর দক্ষিণে লম্বা রাস্তার উভয় পাশে ৩॥ ফিট চওড়া সারা রাস্তা জুড়িয়া ফুলের কেয়ারি রচিত হইবে। ক ও খ ক্ষেত্রে ফলের বাগান হইবে। ক ক্ষেত্রে কিন্তু ছেলেদের খেলার জন্যও ড্রিল শিক্ষার জন্য ১০০' × ৪০' ফিট একটি খোল জায়গা থাকিবে। খ অংশের কোনখানে একটি নর্সারি বা চারা তৈয়ারির হাপর থাকা চাই। ইহার জন্য ৩০´ × ৪০´ স্থ ন নির্দ্দিষ্ট থাকিলে চলিবে। স্কুলের উত্তরা সীমানায় শ্রেণীবদ্ধ দেবদারু বৃক্ষ থাকিলে ভাল দেখায়, স্কুল গৃহের সন্নিহিত পূর্ব্ব সীমানায় শীরিশ, কৃষ্ণচুড়া ও চাঁপা গাছ রোপণ করিলে ছাওয়া, ফুলের শোভা দুইই পাওয়া যায়। স্কুল সংলগ্ন পূর্ব্ব এবং পশ্চিমাংশ ঘর বাড়াইবার জন্য ফাঁকা ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই অংশে রাস্তা ফুলের কেয়ারি গৃহ ও গৃহনির্ম্মানের স্থান বাদে অবশিষ্ট

১০০'×৭৯' ফিট স্থান ৮টি সমান অংশে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর ছেলেদের বাগান করিবার জন্য এক খণ্ড নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

৪র্থ অংশ ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহা Trial ground বা পরীক্ষা ক্ষেত্রের জন্য রক্ষা করিতে হইবে। এই অংশগুলিতে নূতন নূতন বিবিধ সবজী ফুল ফলের চাষ হইবে। প্রকৃতপক্ষে স্কুলের উদ্যানক্ষেত্র কতিপয় গ্রাম সমষ্টির পরীক্ষাক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে।

আম গাছ সকল জায়গায় প্রতিবৎসর ফলে না এই জন্য স্কুলের উদ্যানে আমগাছ না রাখাই ভাল। ফলের মধ্যে কাঁঠাল, গোলাপজাম, জামরুল, বাতাবী, লিচু লকেট সপেটা গাছ রোপণ করায় লাভ আছে। কয়েকটা কলাগাছ, পেঁপেগাছ, সবজীক্ষেত্রে ও ছেলেদের জন্য নির্দ্দিষ্ট চৌকায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রোপণ করা চলিতে পারে। স্কুলের বাগানে যাহা কিছু রোপণ করা হউক না কেন বেশ স্থানিয়াম রোপণ করিতে হইবে। যেন বাগানটি সর্ব্বদাই শোভন দর্শন থাকে।

বিদ্যালয়েরপ্রাঙ্গনটি (school compound) ঘেরা আবশ্যক। তিন বিঘা জমি চতুর্দ্দিক ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত করিতে ব্যয় অনেক। তাহার পরিবর্ত্তে ডুরাণ্টা বা ইঙ্গা ডল্‌সিসের কাঁচা-বেড়া দেওয়াই শ্রেঃয়। যত্ন করিয়া এই সকল বেড়া নির্ম্মাণ করিতে পারিলে এবং ছাঁটিয়া কাটিয়া সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিলে প্রাচীরের মতই দেখায়। বাগানে গরু ছাগল বন্যশুকর, শৃগাল এমন কি মোরগ প্রভৃতি পক্ষী প্রবেশের উপায় থাকে না। বেড়ার মাঝে শুপারিগাছ বসাইতে হয়, সেগুলি খুঁটির কাজ করে। বেড়ার গাছগুলি শুপারি চারার সহিত ভিতর বাহিরে বাঁশের বাখারি দ্বারা বাধিয়া রাখিলে বেড়া অতিশয় সুদৃঢ় হয়। অতি কম খরচে এই বেড়া নির্ম্মান করা যায়।

পাতকুয়া ও চৌবাচ্চার চারিদিকে কতকগুলি নারিকেল চারা বসাইলে গাছগুলি ভাল হইবে এবং গুচ্ছাকারে জন্মিলে বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে। বাগানের চারিভিতে মাঝে মাঝে নারিকেল চারা রোপণ করিলে বাগানটিকে আয়কর বাগানে পরিণত করা যায়। যেখানে নারিকেল হয় না তথায় তাল, খর্জ্জুর রোপণ করা বিধেয়। স্কুলের বাগানে বাতাবী লেবু গাছ কতকগুলি থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। ইহার পুষ্পগন্ধ—অতি মনোহর, শোভাও সুন্দর এবং ইহার দুষ্ট বাষ্পের দোষ নাশ করিবার ক্ষমতা আছে।

বাগানের চারিপাশে খাত বা পগার কাটা থাকিলে এবং পগারের পাহাড়ের উপর বেড়া থাকিলে বাগান আরও অধিক সুরক্ষিত হয়। জন্তু জানোয়ারের উপদ্রব ত নিবারিত হয়ই উপরন্তু দুষ্ট লোকেও বাগানে সহজে ঢুকিতে পারে না ও কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

বাগানের সমস্তক্ষেত্রে জল যোগাইবার ব্যবস্থা করা চাই। পাতকুয়া হইতে লাট বসাইয়া চৌবাচ্চায় জল সঞ্চয় করিতে হইবে। চৌবাচ্চা হইতে ফুলের কেয়ারির ধার দিয়া যে পর নালী থাকিবে তাহার সাহায্যে সমুদয় উদ্যানে জল যোগান যাইতে পারিবে এই জন্যই কুয়াটী আমরা গভীর ও প্রশস্ত করিতে বলিয়াছি। ইহা হইতে পানীয় জলও সংগ্রহ হইবে।

স্কুলের গৃহ পাকা না হইলেও ক্ষতি নাই—তবে পাকা মেজে ও পাকা দেওয়াল হইলে প্রথমে কিছু খরচ অধিক পড়ে বটে কিন্তু ভবিষ্যতে মেরামতের খরচ অনেক বাঁচিয়া যায়। ছাদ নির্ম্মান করিবার খরচ অনেক—ছাদের পরিবর্ত্তে উলুখাষ বা খড়ের ছাউনি ভাল। ঘর যত কম খরচে হয় চেষ্টা করা উচিত—বাগানে যাহাতে জায়গা বেশী থাকে এবং উহা আয়কর হয় ততই মঙ্গল। অধিকাংশ সময়ে বাজার ছাত্রেরা ফাঁকা গাছের তলায় বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতে পারে এবং তাহাতে তাহাদের শিক্ষা ও অভ্যাস ভাল ব্যতীত মন্দ হয় না। বাগানটিকে আয়তনে যত বড় করা যায় ততই ইহাকে আয়কর করিবার সুবিধা হয়। ইহাতে গ্রামের লোকেরও লাভ। গ্রামগুলির মাঝখানে স্কুলের সংশ্রবে সাধারণের একটি কৃষিক্ষেত্র থাকিলে চাষী, জমিদার, সাধারণ গৃহস্থ প্রত্যেক্ষে ও পরোক্ষে অনেক উপকার পাইবার আশা করিতে পারা যায়।

বাগানে আহার্য্য ফল; মূল সবজী ব্যতীত ফুলের গাছ থাকিবে। অনেকে বলিতে পারেন যে যখন আয় ব্যয়ের এত কড়াকড়ি খতিয়ান করা হইতেছে তখন ফুলগাছ বসাইয়া সময়, পরিশ্রম ও জায়গা জোড়া করিবার উদ্দেশ্য ভাল বুঝা যায় না। ফুলের ও শোভন বৃক্ষের আবশ্যক—কেনানা বাগানটি শোভন ও চিত্তাকর্ষক করিতেই হইবে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ কেবল কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে না, এই জন্য তাহাদের বিনোদনের জন্য রকমওয়ারি কিছু করিতে হয়। আমাদের শরীর পোষণের জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন—চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণে ইন্দ্রিয়েরও খাদ্য আবশ্যক। এই জন্য বাগানে সুগন্ধ পুষ্প, সুদৃশ্য বৃক্ষলতা ও বাগানে পাখীর কুজন ও ফুলে ফুলে ভ্রমরেরও গুঞ্জন নিরর্থক নহে। ইন্দ্রিয়গণ অভিমত ভোগ্যবস্তু পাইলে ইন্দ্রিয়ের রাজা মন প্রফুল্ল হয় তাহাতে মনের উৎসাহ বাড়ে ও শরীরের স্বাস্থ্য ও বল বৃদ্ধি হয়।

তবে আমরা বিলাতী মরসুমী ফুলগাছ বসাইবার পক্ষপাতী নহি কেননা সে গুলি প্রায়ই গন্ধহীন—আমাদের দেশে এত সুগন্ধ, সুশোভন ফুল থাকিতে কেন আমরা সেগুলির এত আদর করিব! আজকাল কিন্তু লোকের মনের গতি অন্য রকম হইয়াছে সখের বাগানে এই সকল ফুলেরই ছড়াছড়ি—দেশী ফুলের যেন আদর নাই। কিন্তু দেখা যায় যে মানুষের সখ চিরকাল আছে, সকল দেশেই আছে কেবল কাজের কথা, কেবল কাজের জিনিষ লইয়া মানুষ থাকিতে পারে না—মন তৃপ্ত থাকে না, এই জন্য মানুষ বাজে কথা অনেক কহে, বাজে জিনিষ লইয়া থাকিতে অনেক

সময় ভালবাসে। সৌখিনের সখ মিটাইবার জন্য যদি আমরা বৃক্ষলতা ফুল তৈয়ারি করিতে পারি তাহা হইলেও অর্থাগম হয়। তা যখন হয় তখন যে তাহা করা একেবারে নিরর্থক তাহা বলা চলে না। সেই জন্য বলি স্কুলের বাগানে ফুল জন্মাইয়া বেচিতে দোষ কি? কিন্তু এই অন্ন সমস্যার দিনেস অন্নসংস্থানের দিকে বেশী ঝোঁক দিতে নিশ্চই হইবে।

বাগানের মধ্যস্থলে রাস্তা ও ফুলের কেয়ারি, ফুলের কেয়ারির পশ্চাতে পাতাবাহার গাছের অনতিউচ্চ এক বেড়া নির্ম্মান করিতে পারিলে বাগানটি আরও সুদৃশ্য হয় এবং সকল ক্ষেতের ও ফলের বাগান ফুলের কেয়ারি পৃথক করিবার জন্য ইহাদের মাঝে মাঝে একটি ব্যবধান হয়।

বাগানটি আয়তনে বড় করিতে পারিলে তাহার ভিতর পুষ্করিণী, ঝিল প্রভৃতি খনন করা চলে এবং তাহাতে আয় বৃদ্ধি হয় নিশ্চয়ই। আমাদের উদ্দেশ্য একটি কতকগুলি গ্রামের মাঝে এক একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, একটি আয়কর বাগান একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করা। অবস্থানুসারে ব্যবস্থা সকলই করা উচিত এবং তাহাই হইয়া থাকে। সম্ভব হইলে বাগানের আয়কর ১০ বিঘা, ৩০ বিঘা, ১০০ বিঘা পর্য্যন্ত হইতে পারে। বাগানটি স্থানীয় লোকের সমবেত চেষ্টায় নির্ম্মিত হইবে, সকলের সমবায়ে ইহার কার্য্য চলিবে এবং স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষাগণের তত্ত্বাবধানে ইহা থাকিবে। সাধারণের সম্পত্তি এবং ইহার আয়ে স্কুল চলিবে ও উদ্বৃত্ত হইলে সাধারণ শুভ কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

কতকগুলি গ্রামের মাঝখানে এরূপ একটি স্কুল স্থাপনের আরও একটা উদ্দেশ্য যে তত্রস্থ অধিবাসী বর্গকে সম্বদ্ধ করা। লোকে একই উদ্দেশ্যে সাধারণের কল্যানার্থ একত্র পুনঃ পুনঃ মিলিত হইলে পল্লী সমূহের প্রভূত মঙ্গল হয়। আমরা পল্লীগ্রামের স্কুলের কথাই আলোচনা করিতেছি। পল্লী সমূহকে পুনর্গঠন করিয়া লওয়া আমাদের অভিপ্রায়। আগে পল্লীসমূহের এত দুরবস্থা ছিল না তাহারা সাবলম্বী ছিল এবং যে এক যোগে অনেক কাজ করিত।

গ্রামের সব কাজ তাহারা আপনারাই করিত, বাহিরের রাজকর্ম্মচারীরও সে সকলে হস্তক্ষেপ করিবার কোনও প্রয়োজনও হইত না। কেন না, গ্রামের সামাজিক, শিক্ষাসম্বন্ধনীয়, স্বাস্থ্যবিষয়ক সব ব্যবস্থা গ্রামের লোক করিতেন। গ্রামে জলসংস্থানের কাজ করিয়া গ্রামের ধনীরা পুণ্য সঞ্চয় করিতেন—আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন। যে গ্রামে তেমন ধনবান্ থাকিতেন না, সে গ্রামে সমবেত চেষ্টায় পুষ্করিণী খনন, পথ গঠন, খালকাটা প্রভৃতি গ্রামের হিতকর কাজ হইত। যে যেমন পারিত—অর্থ ও সামর্থ্য প্রদান করিয়া সমবায়নীতিতে দেশের কাজ দশে মিলিয়া সম্পন্ন করিতেন। ধনীর চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসিত—গুরুশিষ্যে টাকার লেনদেন সম্বন্ধ ছিল না—ছাত্রেরা

যেমন করিয়া পারিত, গুরুর অভাব মোচন করিত, গুরু নিশ্চিন্ত হইয়া শিক্ষাদান করিতেন। লোকের অভাব অল্প ছিল, কেন না, আশা ও আকাঙ্ক্ষা অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া উঠে নাই। গ্রামবাসীদের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা গ্রামের মাতব্বরদিগের দ্বারাই হইত।

সকলে একত্র হই পালপার্ব্বনে উৎসবের সৃষ্টি করিত, ধনীগৃহে উৎসবাদিতে সকলে বিনা সঙ্কোচে যোগদান করিতে পাইত।

আমরা একএকটি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া গ্রাম গুলিকে সেই প্রকার পুরাতন ভিত্তিকে পুনরায় গঠন করিতে চাই। লিলি নামক জনৈক বিদেশী লেখক এইপ্রকার পল্লী ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন:—

Every village is a sort fo tiny republic, administering its own municipal affairs by means of rude but perfectly effective institutions."

গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন পাড়া ছিল; যে, যাহার পাড়ায় আপনার কাজ করিত। জাতি বলিতে আমরা আজ বিলাতী মতে যাহা বুঝি, তাহা নহে। বিলাতেও ব্যবসার হিসাবে জাতি বিভাগ হইতেছে। এই বর্ণভেদে কেবল যে শিল্পনৈপুণ্য পুরুষানুক্রমে উন্নত হইয়া শেষে স্বভাবের অঙ্গীভূত হয়, এমনই নহে; ইহাতে লোকের মনে সন্তোষ বিদ্যমান থাকে। ইহাতে শিল্পের ও অর্থনীতির হিসাবে যেমন লাভ—সমাজেরও তেমনই লাভ। য়ুরোপেও মধ্যযুগে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল—"each trade was placed under a guild with powers of self-managment and internal control". উটজ শিল্প ভাল কিম্বা কারখানা হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার আলোচনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমরা কেবল আমাদের প্রাচীন পল্লীগ্রামের গঠনকথা বলিতেছি। গ্রামের কোন পাড়ায় কর্ম্মকার লৌহ অগ্নিতে তপ্ত করিয়া গ্রামবাসীর নিত্য প্রয়োজনের জাঁতি, বঁটী হইতে লাঙ্গলের ফাল পর্য্যন্ত গড়িত, কোন পাড়ায় তন্তুবায় সপরিবারে সূতা মাজা হইতে তাঁতে বস্ত্র বয়ন পর্য্যন্ত নানা কাজ করিত; কোন পাড়ায় স্বর্ণকার তাহারই চারি দিকে লতাপাতা ফুল হইতে আদর্শ লইয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করিত। কোন পাড়ায় বা কুম্ভকার চক্র ঘুরাইয়া হাঁড়ি কলসী গড়িত—গ্রামের আগাছা কাটিয়া আনিয়া পোয়ানে সেই সব মৃৎপাত্র পোড়াইত। গ্রামবাসীর নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রামেই পাওয়া যাইত। কোন গ্রামের কোন জিনিষ প্রসিদ্ধিলাভ করিলে অন্যান্য গ্রামেও তাহার গ্রাহক হইত—ব্যবসার প্রসার বৃদ্ধি হইত। গ্রামের দেবায়তন, গ্রামের পাঠগোষ্ঠী, এ সব গ্রামবাসীরা প্রত্যেকেই আপনার মনে করিত।

পল্লী সমূহের একটি কেন্দ্রে এইরূপ এক একটি স্কুল স্থাপন করিতে পারিলে এবং তাহার স্থান একটু প্রশস্ত হইলে তাহাতে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা ব্যয় সাপেক্ষ। যাহা হউক কৃষি এবং কৃষি কার্য্যের সম্বন্ধীয় শিক্ষার যেন সেখানে ত্রুটী না হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পশুপক্ষী পালনের, মৎস্যতত্ত্ব শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে খুব ভাল হয়।

বলা বাহুল্য বিদ্যালয় গৃহটি ও তৎসংলগ্ন উদ্যান সাধারণের সম্পত্তি হইবে। তাহার আয়ব্যয় সাধারণের। যদি সুবিধা হয়, যদি আয় বৃদ্ধি হয় এবং এই সংস্রবে একটি শস্যগোলা ও গোশালা স্থাপিত হয় এবং এইরূপ বিদ্যালয়ের সহিত সরকারী কৃষি বিভাগ, শিক্ষাবিভাগের যোগ থাকে এবং পল্লীবাসীগণ তাঁহাদের সমবায় শক্তি ইহাতে নিয়োগ করেন তাহাহইলে তাঁহারা আশানুরূপ ফল লাভে কখনও বঞ্চিত হইবেন না।

ফ্রিমাণ্টাল্ সাহেব এইরূপ একটি আদর্শ বাগানের উদ্দেশে বলিয়াছেন—

Such is the kind of garden which I should like to see attached to all central schools. I recognize that the scheme is somewhat elaborate, that it requires the co-operation with the local authority of the educational, agricultural and horticultural authorities to bring it into effect, that it will further require, in order that the best use be made of the land, a special inspector or superintendent in each district. And more important than all, it will require the whole-hearted support of one or more of the teachers in the school. A competent educationist indeed expressed to me his doubts, based on English experience, as to the possibility of doing anything useful through the agency of our present teachers, and feared that the only result of stimulating the laying out of gardens would usually be an untidy and neglected plot which would be an object-lesson of the worst type. He said that "it requires a teacher of exceptional qualities, physical and moral, to carry on a garden successfully." But circumstances are different in this country where school teachers are themselves villagers and brought up in an agricultural atmosphere. Experience in Allahabad, where portions of the scheme outlined above have been in force for several years past, show that many teachers are naturally keen on having a garden and only require guidance to make it a success, while the approval of inspecting officers, the competition between different schools for the best garden and an annual exhibition of

produce provide sufficient stimulus for the large majority. And, indeed, if we are to wait till the perfect teacher arises before we take this first step towards introducing an agricultural atmosphere into our schools, we shall have to wait for generations.

গোরক্ষা ও গোখাদ্য, গোপ্রচার।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার M. R. A. S., Vakil H. C. Calcutta, লিখিত।

(৩)

'শস্যধন', 'অর্থধন' যেমন আমাদের একপ্রকার ধন, তেমন 'গোধন' ও আমাদের একপ্রকার অত্যাবশ্যকীয় ধন। এ সম্বন্ধে অনেক কথা কয়েক বৎসর ধরিয়া সংবাদ পত্রাদিতে লেখালেখি হইতেছে। গোসেবা হিন্দুজাতির শাস্ত্রসিদ্ধ ধর্ম্ম, গোদান হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান পুণ্যকর্ম্ম; গোদুগ্ধ না হইলে হিন্দুর পূজা পার্ব্বণ, ব্রতনিয়ম চলে না; কিন্তু হিন্দুর বাস্তু হইতে এখন গোশালা উঠিয়া যাইতেছে কেন তাহার বিষয় আমি কতক কতক পূর্ব্বে পূর্ব্বে পত্রে সাধারণের অবগতির জন্য বিদিত করিয়াছি। মুসলমান ভারতে আসিয়া গোখাদক হইলেও হিন্দুর সংসর্গে গোসেবা শিখিয়াছিল। ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় মুসলমান সম্প্রদায় এখনকার মত এত পরিমাণে গোমাংস ভোজন করিত না, গোহত্যায়ও এত অধিক প্রাদুর্ভাব ছিল না। এখনও গোপূজক হিন্দুর গৃহ অপেক্ষা গোভক্ষক মুসলমানের গৃহে অধিক সংখ্যক গোপালিত হইয়া থাকে; পূর্ব্ববঙ্গ ইহার প্রমাণ। মুরগী, হাঁস ও ছাগল পোষার ন্যায় ডিম্ব বা মাংসের লোভে তাহারা গোরু পোষে না, দুধ ও চাষের জন্যই তাহারা গোরু পোষে। হিন্দু মুসলমানের পোষা গোরুর দুধ কিনিয়া খায়, মুসলমান ভাই আমার ক্ষেত চষিয়া ধান জন্মায়, তাহাতে হিন্দু বাবুদের প্রাণ বাঁচে। কিন্তু চাষাদের হয়ে ২টা কথা বলিবার কোন হিন্দু ভাই দাঁড়ান তাহা ত দেখিতে পাই না। সেই জন্য আমাদের দেশের চাষাভায়েদের অভাব অভিযোগ মোচন করার জন্য, তাহাদের বিবাদ আপোষে ভঞ্জন জন্য, তাহাদের চাষের জমীতে কায়েমী যোতসত্ব অক্ষুন্ন করিবার জন্য কলিকাতা নগরে ১৫২ কলেজষ্ট্রীটে এলবার্ট হলগৃহে লেঃ কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিন নায়কত্বে ও অত্র লেখকের সহকারিত্বে 'শস্যধন',

যেমন আমাদের একপ্রকার ধন, তেমন 'গোধন' ও আমাদের একপ্রকার অত্যাবশ্যকীয় ধন এই সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল।

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু যাহারা স্বহস্তে চাষবাস করে, বা গাভীর দুধ বাজারে লইয়া বিক্রয় করে, তাহারা সরং গোজাতির প্রতি এখনও ভক্তি ও যত্নবান রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় গোপালন যাহাদের জাতিগত ব্যবসায়, সেই নন্দ ঘোষের বর্ত্তমান বংশধরগণ গোজাতির প্রতি যে নৃশংসতা দেখাইয়া থাকেন তাহা কতকটা আমার পূর্ব্ব পত্রেই বিদিত আছে। ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া আমরা জীবনের সুখ সুবিধার দিক লক্ষ্য রাখিয়াই এবং utility ও Economyর দিক হইতে আমাদের গোসেবাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এই দিক হইতে গোসেবা গোপালন দেখার মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতার ১০নং এণ্ড পোষ্টাপিষষ্ট্রীটে সারজন উড্রোফের কর্ত্তৃত্বে "অখিল,—ভারতীয় গো-কন্ফারেন্স" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

গোপালন, গোরক্ষন ও গো জননে হাবড়া, ধুলিয়ান, বোম্বাই উত্তর পশ্চিম প্রদেশের জীবদয়াসমিতিগুলি বেশ কাজ করিতেছেন। কলিকাতার ভদ্রলোকদের শুষ্কগাভী স্বল্পব্যয়ে পালনের জন্য মহদ্ধু হাইকোর্টের উকীল বাবু চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার জমীদারীতে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রত্যেক গৃহস্থ ভদ্রলোক, গোয়ালা ও কৃষকের এই "শুষ্ক গোরক্ষণী সমিতিতে সাহায্যদান করিয়া চারুবাবুকে উৎসাহদান করা কর্ত্তব্য। তাঁহার ঠিকানা "উকীল হাইকোর্ট" কলিকাতা। এইরূপ বহুল গোপালনী সভা দেশে প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। যদি "গোনয়ন শুল্ক" আমার প্রস্তাবিত মত কোন দপ্তরের কৃপাবলে গোবৎসল মেম্বর মহোদয় বিধিপ্রবর্ত্তিত করাইতে পারেন (যেরূপ বিধি পাশ্চাত্য দেশে প্রবর্ত্তিত আছে) তাহা হইলে আমি স্বল্পব্যয়ে মার্কিণ বা দিনামার দেশের অনুকরণে সমবায় ভিত্তির উপায়ে গো-বীমা কোম্পানি প্রবর্ত্তিত করিয়া অনূন্য বিশ সহস্রগাভী পালন করিতে পারি। পালামৌ জেলায় আমার এরূপ গাভী রাখিবার স্থান আছে; কেবল লোকের সহানুভূতি সাহায্য ও বিশ্বাস ও ২।৪ জন কর্ম্মী লোকের প্রয়োজন। এইরূপ চারণ ভূমি বা দূর চারণে সহজে লইয়া যাইবার সুবিধা থাকিলে শুষ্ক বা দুগ্ধহীন গাভীবৃন্দ কশাই হস্তে যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। গো-নয়ন শুল্ক বিধি প্রবর্ত্তন আমার বিবেচনায় সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বিগত ২৭।৫।১৯ তারিখের অধিবেশনে অখিল ভারতীয় গো-কনফারেন্সে আমার এ বিষয়ে প্রস্তাব সভাপতি সারজন উড্রোফ্ সাহেব বাহাদুর অনুমোদন ও গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত কয়টি প্রশ্ন ভারতে প্রচার করিয়াছেন। ইহার উত্তর তিনি সকল স্থান হইতে কনফারেন্সের আপিস ১০ নং ওল্ড পোষ্টাপিষ ষ্ট্রীট অনঃ সেক্রেঃ মহাশয়ের নামে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

১। আপনার অঞ্চলে গবাদি দুগ্ধদাত্রী পশুর এবং বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যকর দুগ্ধ সরবরাহের অবস্থা, আপনার মতে সন্তোষজনক কি না?

(২) যদি আপনার বিবেচনায় সন্তোষজনক না হয়, তাহা হইলে ইহার কারণ-গুলি এক এক করিয়া উল্লেখ করুন এবং কি কারণে ইহা সন্তোষজনক নহে তাহা লিখুন অর্থাৎ পশুসংখ্যা তাহাদের উৎকর্ষ বা অপকর্ষতা বিবেচনা করিয়া, জাতি, জনন বংশ (breed) গোচর, খাদ্য, দুগ্ধ বা অপর আনুসঙ্গিক বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়া সকল উত্তরগুলি বিশদভাবে দিন।

৩। যে অভাব ও অভিযোগগুলি উল্লেখ করিলেন সেইগুলি সংশোধনের কি উপায় ও বিধি আপনি চিন্তা করিয়াছেন। আমরা আশা করি অতি সত্বরই বঙ্গের যাবতীয় রাজা মহারাজা জমিদার, প্রজা কৃষক, মহাজন, জোতদার, গাঁতিদার বর্গাদার যিনি যে ভাষায় পারেন উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর যথাসম্ভব সত্বর ১০ ওল্ড পোষ্টাপিষ ষ্ট্রীটে অখিল ভারতীয় গো-কনফারেন্স আপিষে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। বঙ্গীয় কৃষক সমিতিও গোরক্ষা, কৃষির উন্নতি, গোপালন, গোচিকিৎসা প্রজার স্থায়ী জোৎসত্ব প্রাপ্তি ও রক্ষণাদি সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে যাহার যাহা জানিতে ইচ্ছা হয়, তিনি সেক্রেটারি অত্র লেখক সমক্ষে সডাক পত্র লিখিলে যথাযোগ্য উত্তর পাইবেন।

ভারতের মধ্যে অঙ্গোল, বুন্ধ, মথুরা, হঁসি, গুজরাট্, সাহিত্তয়াল জাঞ্জিবার বহাত্তয়াল পুর (পাঞ্জাব) প্রভৃতি স্থানের গোজাতি উত্তম বলিয়া পরিগণিত তাহা আমি প্রথম ভাগ গোপালবান্ধব পুস্তকে বিশদরূপ বিবৃত করিয়াছি তাহা সহৃদয়ে পাঠক পাঠ করিবেন। ভারতের মধ্যে বাঙ্গালীই গো সেবায় অধিকতর উদাসীন, বাঙ্গালায় গোজাতির অবস্থা অতি শোচনীয়, বাঙ্গালীর খাদ্যে গব্য অংশ ক্রমশই কমিতেছে। বাঙ্গালীর ছেলের "দুধে ভাতে খাওয়া একরূপ উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই প্রপিতামহের আমলের স্বাস্থ্যবল আর বাঙ্গালীর শরীরে নাই। স্বাস্থ্য হানি হইতেছে, বালমৃত্যুর অনুপাত এদেশে পৃথিবীর সকল দেশাপেক্ষা অধিক বলিয়া দেশে রোল উঠিয়াছে, কিন্তু স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্ত কার্য্যতঃ আমরা কি আয়োজন বা ব্যবস্থা করিয়াছি? আমরা কাজে কিছুই করি নাই, করিবার চেষ্টাও করি নাই কেবল চিৎকার করি; স্বার্থান্বেষী বাঙ্গালী যবে তাহার মাতাকে ভুলিয়াছে সেই দিনই সে সব হারাইয়াছে। ভারতীয় গোজাতির উন্নতি করিতে হইলে দেশে চারণ বহুল রচনা ও রক্ষা করা চাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে গোপ্রচারের ব্যবস্থা ছিল তাহা মনু যাজ্ঞবল্ক্য, উষণা প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ পাঠে জানিতে পারি, পুরাণ ও তন্ত্রেও ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা দিন দিন যেরূপ ধর্ম্মচ্যুত হইতেছি, তেমনি গোপ্রচার ভূমির দিকে আমাদের লোভ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গোপালবান্ধবে

করিয়াছি তাহার পুনশ্চল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে যে সকল গোচরভূমি ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে অর্থ লোলুপ জমীদারগণকর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া প্রজাবিলির দ্বারা চাষাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। অন্যান্য দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় তথাকার অধিবাসীগণ গোপ্রচার ভূমির উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই, পরন্তু চাষের জমিরই বৈজ্ঞানিক সারাদি প্রদানে উর্ব্বরতাশক্তির বৃদ্ধি করিয়া অধিক পরিমাণে ফসল জন্মাইয়া অধিক লাভবান হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের এই অভিশপ্ত, বিলাসিতা পূর্ণ নভেলীযুগে নিমজ্জিত দেশের অধিবাসীগণের সে দিকে কোন চেষ্টাই নাই। গোপালন, গোচিকিৎসা সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ পুস্তক পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্য মধ্যে নাই। গোগ্রাসাভাবে গোজাতির অনিবার্য্য ধ্বংস ও অবনতির দ্বারা চাষের যে কি বিষম ক্ষতি ও হানি দিন দিন ঘটিতেছে তাহা কেহ সম্যক অনুভব করিতেছেন না ইহাই বড় দুঃখের বিষয়!! আমাদের দেশের কৃষককুল নিস্ব ও দরিদ্র। তাহারা খাইতে পায় না পেট ভরিয়া, মহার্ঘ্য বৈজ্ঞানিক সার কি দিয়া কিনিবে? দেশের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা না বুঝিয়া বাবুরা "বৈজ্ঞানিক কৃষি" প্রবর্ত্তনকরা "কল কব্জা দিয়া চাস-বাস করা," ক্রমাগত এই উপদেশ দেশের কতলোক সেইজন্য সিরেন্ শিষ্টারে গেলেন, মার্কিণ মুল্লুকে গেলেন, তাঁরা ফিরেও এলেন, এসে কয়জন স্বতন্ত্র ভাবে কৃষি অনুশীলন করিতেছেন? কৃষিবিদ্যা অনুশীলন করিতে পাশ্চাত্য দেশে কয়জন কৃষকের সন্তান গিয়াছেন, গভর্ণমেণ্ট কয়জন এই শ্রেণীর ছাত্র পাঠাইয়াছেন? গোচরভূমির অভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেশের কৃষির অবস্থাও মলিন ও লাভশূন্য হইয়া দাঁড়াইতেছে, বস্তুতঃ একটি অপরটির সহিত অবিচ্ছিন্ন ও ওতঃপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ও জড়িত, উভয়ের উন্নতি পরস্পর সাপেক্ষ্য। পশ্চাত্যদেবাসীগণ এই বিষয় স্পষ্ট অনুভব করিয়া, গোপ্রচার ভূমির যথাযোগ্য সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের তালিকা দেখিলেই স্পষ্টই প্রতীমান হইবে।

আমাদের দেশে গোখাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা তেমন সুচারুরূপ আদৌ নাই। ইংরাজ শাসিত ভারতে মোট ৬১৭ লক্ষ একর ভূমির মধ্যে কেবলমাত্র ২৬১ লক্ষ এক ভূমি কর্ষিত হয়; তন্মধ্যে ৬৪ লক্ষ একর ভূমিতে গবাদি শশু খাদ্য উৎপাদিত হয় অর্থাৎ মোট জমির শতকরা ১ অনুপাতে গোখাদ্য জন্মিয়া থাকে এবং প্রতি একরে ২২ টি গো বা গাভী প্রতিপালিত হয়। মার্কিণ যুক্ত প্রদেশে গো খাদ্য মোট জমির ৩০৫ লক্ষ একর ভূমির উপর উৎপাদিত হয় অর্থাৎ ১০১৬ গজ পরিমাণ ভূমির উপর প্রতি পশু প্রতিপালিত হইয়া থাকে। অতএব উপরোক্ত তালিকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে আমাদের দেশে যে সংখ্যক গবাদি পশু আনুমানিক আছে, তাহাতে চারণ ও গোখাদ্য উৎপাদন যোগ্য ভূমি উভয়েরই অনুপাত নগণ্য। যদি ভারতীয় গোজাতির উত্তম ও বৈজ্ঞানিক বিধির দ্বারায় উন্নতি ও জনন্ন করা যায়

তাহা হইলে তাহাদের দুগ্ধ দায়িকা শক্তির বিশেষ উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের—স্বাস্থ্য-কমিশনার কর্ণেল ম্যাক্‌টেগার্ট সাহেব বলেন যে এই দেশে অনেক শিশু মাতৃ দুগ্ধ আবশ্যক পরিমাণে না পাওয়ায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; সেই জন্য যদি আমাদের দেশের গো জাতির দুগ্ধ দায়িকা শক্তি উন্নত করা যায় তাহা হইলে শিশু মৃত্যুর তালিকা অনেক পরিমাণে হ্রাস করা যাইতে পারে। এদিকে দেশের লোকের দৃষ্টি পাত করা উচিত নহে কি?

উপসংহারে আমি আমার স্বদেশবাসীগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা দেশের শিশুগণের ও আতুরদের হিতের জন্য বঙ্গমাতার ভাবী কল্যাণের জন্য, বঙ্গের নিস্ব অসহায় এবং বন্ধুহীন কৃষককুলের হিতের জন্য এই ভারতবাসী করভার প্রপ্রীড়িত প্রজার জন্য এইদিকে মনোযোগ ও দৃষ্টি প্রদান করিয়া গোকুলকে রক্ষা করেন,আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা এই সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলির সুচিন্তিত উত্তর সত্বর তাঁহার নিকট পূর্ব্ব লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন এবং এই বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য গোপালবান্ধব পাঠ করেন এবং ইহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশে ধনী দরিদ্র সকলেই এই লেখককে সাহায্য দান করেন। তাঁহার ঠিকানা—

বঙ্গীয় ও যুক্তরাজ্যের কর্ণেলের কৃষি সমিতির সদস্য শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার এম আর এ এস ৩১নং এলগীন রোড, কলিকাতা।

বিদেশের গো-প্রচারের তালিকা হইতে বেশ দেখা যাইতেছে গো-ভক্ষক প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য দেশে ½ হইতে ⅓, পর্য্যন্ত ভুমি গো-চারণের জন্য স্থায়ী ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হয়। আমাদের দেশেও এককালে এইরূপ ছিল। হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালে ইহার ভুরি ভুরি নিদর্শন পাওয়া যায়। গোপ্রচার সঙ্কট প্রতিবিধানের জন্য সদাশয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিগ্রামে ও নগরে উপযুক্ত গোচরভূমির ব্যবস্থা করুণ। এ সম্বন্ধে মল্লিখিত গোপাল-বান্ধব পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছি। গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত বাঙ্গলা দেশের পশুর আদম সুমারী (ceusus of cattle in Bengal by J. R. Blackwood Sqr. I. C.S, Director of Agricnlture Bengal. হইতে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে এখন বাঙ্গালা দেশে যত গোচরভূমি আছে, তাহাতে প্রত্যেক বিঘায় গড়ে ১৫টি গরু চরিতে পারে। ইহা অতি নগন্য; প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ দশমাংশ পতিতজমী গোচরের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। প্রাচীন হিন্দু বৌদ্ধ ও মুশলমান যুগে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। গোচর বাজেয়াপ্ত জমী ও নূতন জমি সংগ্রহের দ্বারা এই জমী সংগৃহীত হইতে পারে; এ সম্বন্ধেও মল্লিখিত পুস্তকে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। পাশ্চাত্যদেশের মত এই সকল গোচরভূমির চাষও ঘাস উৎপাদনের জন্য আবশ্যক মত পাট করিতে হইবে। ১৯১৮ সালে গো কন্‌ফারেন্সে বাৎসরিক সুন্দর কার্য্য বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে অনেক

আবশুক বিষয় জানা জাইবে। আমাদের পাঠকগণ নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন যে গবাদি পশু ও অধিবাসী সংখ্যায় এদেশে ও মার্কিণ দেশে কি অনুপাত।

		ভারত	মার্কিণ
১।	পশু ও অধিবাসীর অনুপাত	৪:৯	২:৩
২।	দুগ্ধদাত্রী পশু ও অধিবাসীর অনুপাত	২:১৩	৩:১৩
৩।	হল এবং শকট বৃষ ও অধিবাসীর অনুপাত	১:৪	
৪।	হল ও শকট বৃষ এবং কর্ষিত ভুমি	১:৫	

আমি পূর্ব্ব পত্রে সংযোজিত গোহত্যার তালিকা হইতে দেখাইয়াছি যে আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে কি ভয়াবহ অধিক মাত্রায় প্র তবৎসর গোহত্যা হইয়া থাকে, কেবল দৈনিক খাদ্যের জন্য নহে, বরং বর্ম্মায় শুষ্ক ও টীনে রক্ষিত মাংস ব্যবসায়ের এবং চামড়ার কারবারের জন্যও বটে। গভর্ণমেণ্টের ক্যাণ্টনমেণ্ট ও বড় বড় মিউনিসিপালটী হত্যাশালার সংগৃহীত তালিকা হইতে এবং Dy-controllor of Hides এর পত্র হইতে জানা যায় যে সমগ্র ভারতে প্রতিবৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ২০লক্ষ গো মহিষ গোবৎস, গাভী, বৃষ, বলদাদি হত্যা ও সহজ মৃত্যুতে মরিয়া থাকে। যুদ্ধের ২ বৎসরে গড়ে রপ্তানি চর্ম্মের ব্যবসা কিরূপ জোর চলিয়াছে তাহা মিলাইয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

১।	১৯১২—১৩হইতে ১৯১৬—১৭ ৫বৎসরের গড়	১৩২০৯৪৮০
২।	যুদ্ধের ২ বৎসর (১৯১৪-১৫ হইতে-১৯১৬-৭)	১১৮৪৭০০১
৩।	যুদ্ধের ২বৎসরের পূর্ব্বে ১৯১২-১৩ হইতে ১৯১৩—১৪	১৫২৪৮৬৮০

মৌমাছি পালন

কোন্ অবস্থায় মৌমাছিরা বেশী মধু যোগাড় করে।

১। মোমাছির দলটি খুব বড় হইবে অর্থাৎ দলে অনেক দাসী থাকিবে। ছোট দলে এত কম মধু যোগাড় করিতে পারে যে, ইহা হইতে প্রায় কিছুই মধু পাওয়া যায় না।

২। মৌচর গাছ সকলের ফুলে খুব বেশী মধু থাকা চাই।

৩। আব্-হাওয়ার অবস্থা ভাল হওয়া চাই, যাহাতে মৌমাছিরা বাহিরে যাইয়া মধু যোগাড় করিতে পারে এবং বাসায় ফিরিয়া আসিতে পারে। ঝড় ও বৃষ্টি হইতে

থাকিলে কিম্বা অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইলে মৌমাছিরা কাজ করিতে পারে না। গরম থাকিলেও যদি জোরে বাতাস বয়, তাহা হইলে অনেক মৌমাছি নষ্ট হয়। ইহাতে দলের ক্ষতি হয়।

এই অবস্থাগুলি যদি সমস্ত ভাল থাকে, তাহা হইলে মৌমাছিরা অনেক মধু যোগাড় করিতে পারে। (২) ও (৩) দফার অবস্থার উপর মৌমাছি পালকের হাত নাই। কিন্তু চেষ্টা করিলে সে মধুকালের সময় দলটিকে বড় করিয়া রাখিতে পারে। ইহার জন্য কোন্ সময় মধুকাল আরম্ভ হয়, তাহা জানা উচিত। আমরা দেখিয়াছি যে, ডিম পাড়ার সময় হইতে প্রায় ২০।২১ দিনে দাসীরা জন্মে এবং জন্মের ১০।১৫ দিন পরে মধু আহরণে বাহির হয়। অতএব মধুকাল আরম্ভ হইবার প্রায় এক মাস আগে দেখা উচিত, যেন রাণী প্রচুর ডিম পাড়িতে থাকে এবং অনেক বাচ্ছা পালা হয়। যদি বাহির হইতে মধু ও পরাগ না পায়, তাহা হইলে মৌমাছিরা বেশী বাচ্ছা পালে না। অতএব যদি বেশী বাচ্ছা না পালে, তাহা হইলে এই সময় হইতে মধু অথবা চিনির সরবত খাইতে দিতে হয় এবং যদি বাহির হইতে পরাগ না পায়, তবে সাদা সরিষার গুঁড়া, কিম্বা মটরের ছাতু কিম্বা যবের ছাতু অথবা গমের আটা দিলে পরাগের কাজ করে। ইহা সরবতের সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পারা যায়। রোজ রোজ যদি খাবার পায়, তাহা হইলে বেশী বাচ্ছা পালিতে থাকিবে এবং মধুকালের সময় কালে অনেক দাসী হইয়া বেশী মধু যোগাড় করিবে। এই সময় দলকে খালি মৌচাক যোগাইতে পারিলে অনেক কাজ হয়। দল বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে খালি মৌচাক পাইলে রাণী বেশী ডিম পাড়িবে। মৌমাছিরাও যখন বেশী মধু যোগাড় করিবে দেখা যাইবে, তখন খালি মৌচাক্ পাইলে ইহারা আরও বেশী কাজ করিবে ও বেশী বেশী মধু যোগাড় করিয়া ভরিবে। যদি এইরূপে দলকে বড় করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে দুইটি কিম্বা তিনটি ছোট ছোট দল মিলাইয়া একটি বড় দল করিয়া দিতে হয়। এইরূপে "মিলনের" উপায় নিম্নে বলা হইতেছে। আবার দল বড় হইলে হয় ত মৌমাছিরা দলভঙ্গের চেষ্টা করিতে পারে। সেই জন্য যাহাতে দলভঙ্গ না করে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপায় করিতে হয়। দলভঙ্গ নিবারণের উপায়ও নিম্নে বলা হইতেছে।

মিলন—যে দুইটি দল মিলাইতে হইবে, তাহাদের ঘর দুইটি সরাইয়া আনিয়া কাছাকাছি একেবারে ঠেকাইয়া বসাইতে হয়। একটিকে সরাইয়া অপরটির কাছেও লইয়া যাইতে পারা যায়। দুইটিরই দরজা যেন একদিকে থাকে। যে দিনে রোদ আছে এবং মৌমাছিরা বেশ উড়িয়া বাহিরে যাইতেছে ও আসিতেছে, এমন এক দিন দুপুর বেলা প্রথমে দুইটী দলকে ধোঁয়া দাও এবং মৌমাছিদের উপর মধু কিম্বা চিনির সরবত ছিটাইয়া দাও। এই সরবতে সামান্য কর্পূর, পিপারমিণ্ট, দারুচিনির

আয়ক অথবা কোনরূপ গন্ধওয়ালা জিনিষ দিয়া গন্ধ করিয়া দিতে হয়। অতি অল্প দিতে হয়, যাহাতে মাত্র সামান্য গন্ধ হয়। ইহাতে দুইটি দলের নিজের নিজের গন্ধ ঢাকিয়া যায়। তবে এইরূপ গন্ধ না দিলেও ক্ষতি হয় না। তারপর একটিকে সরাইয়া একটু দূরে রাখ এবং দ্বিতীয়টিকে একটু সরাইয়া যেখানে দুইটি ঘর ছিল, তাহার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় বসাও। এখন প্রথম ঘর হইতে এক একটি মৌচাক উঠাইয়া দ্বিতীয় ঘরের মৌচাকগুলির মাঝে মাঝে বসাইয়া দাও। একটি দ্বিতীয় ঘরের মৌচাক, তারপর একটি প্রথম ঘরের মৌচাক, পুনরায় একটি দ্বিতীয় ঘরের মৌচাক এবং তার একটী প্রথম ঘরের মৌচাক, এই নিয়মে সাজাইয়া রাখ। দুই দলেরই মৌমাছি যাহারা উড়িয়া বাহিরে গিয়াছিল, তাহারাও আসিয়া এই দ্বিতীয় ঘরে ঢুকিবে এবং সব মৌমাছি একদল হইয়া থাকিবে। দুই দলের দুইটী রাণীর মধ্যে মৌমাছিরা নিজেরাই বাছিয়া একটিকে রাণী করিয়া রাখিবে এবং অপরটিকে মারিয়া ফেলিবে। দুইটির মধ্যে যদি কোনটি অপরটির চেয়ে ভাল হয় এবং ইহাকেই যদি রাখিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ইহাকে "রাণীর খাচায়" বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। কিরূপে "রাণীর খাঁচা" করিতে হয়, পরে বলিতেছি।

যখন মৌমাছির ঝাঁক ধরিয়া ঘরে ঢুকান হয়, দুই তিনটি ছোট ঝাঁককে মিলাইয়া একটি বড় দল করিতে পারা যায়। দিনের মধ্যে এক সময়ে যে সকল ঝাঁক ধরা যায়, তাহাদিগকে মিলাইয়া এক ঘরে পুরিলেই হইল। দুই তিনটি রাণীর মধ্যে মৌমাছিরা বাছিয়া একটি রাণী রাখিবে। যদি একটি ঝাঁককে আবদ্ধ করিবার অনেক পরে আর একটি ঝাঁক এই ঘরে মিলাইবার দরকার হয়, তাহা হইলে প্রথমে দুইটিকেই ধোঁয়া দিয়া তারপর মিলাইতে হয়।

রাণীর খাঁচা—পৌনে তিন কিংবা তিন ইঞ্চি লম্বা ও চওড়া এক টুকরা পাতলা তারের জাল লও। এমন জাল লও, যেন এক ইঞ্চিতে যে কোন দিকে ১২টি ছিদ্র বা ঘর থাকে। ইহার চারি কোণ হইতে ৪ পৌনে ইঞ্চি করিয়া চৌকণা টুকরা কাটিয়া ফেলিয়া দাও এবং চারিধার হইতে কয়েকটি তার খুলিয়া দাও। এখন মুড়িয়া চৌকণার মত খাচা কর। ইহার মাপ হইবে সওয়া ইঞ্চি কি দেড় ইঞ্চি লম্বা ও চওড়া এবং পৌনে ইঞ্চি উঁচু। রাণীকে মৌচাকের উপর এই খাচার ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। খাচাটি চাপিয়া অর্দ্ধেক আন্দাজ মৌচাকে ঢুকাইয়া বসাইয়া দিতে হয়। রাণী ইহার ভিতর থাকে বলিয়া মৌমাছিরা তাহাকে বিঁধিতে পারে না। খাচাটি মৌচাকের মাঝামাঝি জায়গায় বসাইতে হয়, যেন রাণী গরমে থাকিতে পায়, এবং যেন ইহার ভিতর অন্ততঃ ৫।৭টি কোষে মধু ভরা থাকে এবং এই কোষগুলির মুখ খোলা থাকে। রাণী যেন ইচ্ছা মত মধু খাইতে পায়। মধু-ভরা কোষের মুখ খোলা না থাকিলে মুখ খুলিয়া দিয়া তাহার উপর খাচা বসাইতে

হয়। রাণীকে এইরূপে আবদ্ধ রাখিয়া একদিন (আন্দাজ ২৪ ঘণ্টা) পরে দেখিতে হয় যে মৌমাছিরা তাহার উপর সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট। যদি অনেকে খাচার উপর রাগান্বিতভাবে ঘোরা ফেরা করে এবং রাণাকে বিঁধিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে রাণাকে আরও এক দিন এইভাবে বদ্ধ রাখা উচিত। তাহার পর ইহারা সহজেই রাণীকে গ্রহণ করিবে। রাণীর উপর সন্তুষ্ট থাকিলে মাত্র দুই পাঁচটা খাচার উপর বসিয়া রাণীকে শুঁকিবে এবং জিব বাড়াইয়া তাহাকে খাওয়াইতে চেষ্টা করিবে। তখন খাচাটি উঠাইয়া লইয়া রাণীকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

যদি কোন মৌচাকের কোষ হইতে দাসী মৌমাছিরা পুত্তলি অবস্থার পর বাহির হইতেছে দেখা যায়, তাহা হইলে রাণীকে এই মৌচাকের উপর আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায়। তবে এস্থলে বড় খাচার দরকার। ৫॥ কি ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ৩॥ কি ৪ ইঞ্চি চওড়া জাল লইয়া ইহার চারি কোণ হইতে পৌনে ইঞ্চি টুকরা কাটিয়া দিয়া ঠিক উপরের ছোট খাচার মত মুড়িয়া আন্দাজ চারি ইঞ্চি লম্বা দুই ইঞ্চি চওড়া ও পৌনে ইঞ্চি উচু খাচা করিতে হয়। এই খাচা এমন ভাবে বসাইতে হয়, যেন ইহার ভিতর এক দিনের মধ্যেই অনেক নূতন দাসী জন্মে এবং অনেক মুখ খোলা মধুভরা কোষ থাকে, যাহা হইতে রাণী ও নূতন দাসীরা খাইতে পায়। নূতন দাসীরা বাহির হইয়া রাণীর সেবা করে। এক দিন কি দুই দিন পরে রাণীকে ছাড়িয়া দিতে পারা যায়। এইরূপে নূতন দাসীর সহিত আবদ্ধ করিতে না পারিলে বড় খাচা ব্যবহার করা উচিত নয়। রাণীকে হাতে করিয়া উঠাইতে হইলে কেবল ডানায় ধরা উচিত। পেট চাপা যাইলে ডিম পাড়িবার শক্তি নষ্ট হইতে পারে।

দলভঙ্গ নিবারণ—দলটি খুব বড় হইলে এবং সমস্ত মৌচাক্ মধু, পরাগ ও বাচ্ছার ভরিয়া যাইলে মৌমাছিরা দলভঙ্গ করে। ঘরটি মৌমাছিতে ভরা হইলে গরম হয়। ইহার জন্যও শীঘ্র শীঘ্র দল ভাঙ্গে। অতএব দেখা উচিত, যেন সব সময়েই রাণীর ডিম পাড়িবার জন্য এবং মধু রাখিবার জন্য যথেষ্ট খালি মৌচাক্ থাকে। হয় নূতন খালি মৌচাক্ দিতে হয়, না হয় শীঘ্র শীঘ্র মধু বাহির করিয়া মৌচাক্ খালি করিয়া দিতে হয়। মৌমাছিরা ঘেসাঘেসি করিয়া থাকিলে বেশী গরম হয়। বেশী মৌচাক্ থাকিলে ইহারা হাত পা ছড়াইয়া ফাঁক ফাঁক বসিতে পারে এবং গরম কম হয়। নূতন খালি মৌচাক্ ভরা মৌচাক্ সকলের মাঝে মাঝে দিতে হয়। ইহাই দলভঙ্গ নিবারণের প্রধান উপায়।

সমস্ত মৌচাক্গুলি পাঁচ ছয়দিন অন্তর অন্তর দেখিতে হয় এবং যদি নূতন রাজকোষ গড়া হয়, সেইগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। আরম্ভ হইতে না হইতেই রাজকোষ ভাঙ্গিলে তবে ফল হয়। রাজকোষে কীড়া বড় হইবার পর ভাঙ্গিলে কোন ফল হয় না।

দল বড় হইয়া মত্ত দেখা দিলেই সুবিধা হয়, রাণীকে ঘরের পশ্চাতে আটক দ্বারা

৫।৬টি মৌচাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। এই সকল মৌচাক্ মধু বা বাচ্চায় ভরিয়া যাইলে উঠাইয়া ঘরের সাম্‌নের দিকে আটকের আগে রাখিতে হয় এবং খালি মৌচাক্ রাণীকে দিতে হয়। রাণীর কাছে যেন সব সময়েই অন্ততঃ দুই একটি খালি মৌচাক্ থাকে, ইহার উপর নজর রাখিতে হয়।

অনেক সময় মৌমাছিরা দল ভঙ্গ ছাড়া কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। তখন মৌমাছি-পালক নিজের "ইচ্ছামত দলভঙ্গ" করিতে পারে; কিরূপে করিতে হয়, নীচে বলা হইতেছে।

দল বাড়ান—দল বাড়াইতে ইচ্ছা হইলে দুই উপায়ে করিতে পারা যায়—

(১) দলভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করিলে—মৌমাছিদিগকে দলভঙ্গ করিতে দিতে হয়। তাহা দল বাহির হইয়াই কাছাকাছি কোন জায়গায়, দেওয়ালেই হোক কিম্বা কোন গাছের ডালে বা এইরূপ কোন জায়গায় বসে। প্রায় আধ্ ঘণ্টার পর পুনরায় উড়িয়া যেখানে বাসা করিবে, সেই খানে চলিয়া যায়। যখন কাছাকাছি জায়গায় বসে, সেই সময় ধরিতে হয় এবং যে ঘর হইতে বাহির হইয়াছে তাহা হইতে পাঁচ হাতের বাহিরে যেখানে ইচ্ছা নূতন ঘরে ঢুকাইয়া রাখিতে পারা যায়। পুরাতন দলটি যাহাতে পুনরায় দল না ভাঙ্গে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হয়। ইহাতে নূতন রাণী জন্মিলেই যদি রাণী ভাল হয়, খোঁড়া বা বিকলাঙ্গ না হয়, তাহা হইলে আর সমস্ত রাজকোষ যদি মৌমাছিরা নিজে না ভাঙ্গে, ভাঙ্গিয়া দিতে হয় এবং আর নূলন রাজকোষ যাহাতে না গড়ে, তাহার উপর নজর রাখিতে হয়। এই উপায়ে একটি দলের স্থানে দুইটি হয়। তবে যদি ভাঙ্গা দলটি সময় মত ধরিতে না পারা যায়, উড়িয়া পলায়। সেই জন্য মৌমাছিপালক নিজের ইচ্ছামত দলভঙ্গ করে। দেশী মৌমাছির পক্ষে নিজের ইচ্ছামত দলভঙ্গ করাই ভাল।

(২) ইচ্ছামত দলভঙ্গ করিয়া—মৌমাছিরা দলভঙ্গ করিবার জন্য যখন বন্দোবস্ত করে, তখনই ইচ্ছামত দলভঙ্গের উত্তম সময়। কোন কোন রাজকোষে যখন কীড়া প্রায় বার আনা রকম বড় হইয়াছে, তখন একদিন, রোদ আছে এবং মৌমাছিরা বেশ উড়িয়া যাইতেছে ও আসিতেছে এমন সময় একটি নূতন ঘর লও। মনে কর, যে দলকে ভাঙ্গিব, তাহার নম্বর দিলাম ১ এবং নূতন ঘর ২নং ধরিলাম। ২নং ঘরে ৩।৪টি নূতন ফ্রেম লও এবং ইহাদের উপরের কাঠির নীচে মোম লাগাইয়া দাও। ইহা ছাড়া পর্দ্দা ও লেপ লও। ১নং ঘর হইতে রাণী যে মৌচাকটিতে আছে, সেইটি রাণী সহিত ২নং ঘরে রাখ। ইহা ছাড়া আরও ৩।৪টি মৌচাক মৌমাছি সহিত উঠাইয়া ২নং ঘরে রাখ। যে মৌচাকগুলি ২নং ঘরে রাখা হইল, তাহাতে যেন রাজকোষ না থাকে। রাজকোষগুলি যেন ১নং ঘরেই থাকে। এখন ২নং ঘরটি ১নং ঘরের

জায়গায় বসাইয়া ১নং ঘরটি অন্ততঃ পাঁচ হাত দূরে যেখানে ইচ্ছা বসাও। যে সব মৌমাছি উড়িয়া বাহিরে গিয়াছিল, তাহারা আসিয়া ২নং ঘরে ঢুকিবে ও কাজ করিতে থাকিবে; নূতন ফ্রেমে মৌচাক্ গড়িবে। ২নং ঘরে দরজার কাছেই একটি খালি ফ্রেম, তার পর ১নং ঘর হইতে যে মৌচাক্গুলি ইহাতে রাখিয়াছ সেইগুলি, তার পর অপর খালি ফ্রেমগুলি সাজাইয়া পরে পর্দ্দা রাখিয়া লেপ ঢাকা দাও। দুই পাশের দুই খালি ফ্রেমে প্রথমে মৌচাক্ গড়িবে। তার পর হয় খালি ফ্রেম কি পত্তন লাগান ফ্রেম মাঝখানে রাখিতে পারা যায়।

১নং ঘরে ঠিক সময়ে রাণী জন্মিবে এবং বিবাহের পর ডিম পাড়িতে থাকিবে।

মধুকালে এইরূপ দলভঙ্গ করিয়া দিলে দলটি ছোট হয় বলিয়া বেশী মধু যোগাড় করে না। ১নং ঘরে যখন নূতন রাণী ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে, তখন আবার দুইটিকে মিলাইয়া এক করিয়া দিতে পারা যায়। দুইটি ঘর কাছাকাছি আনিয়া এক দিন ২নং ঘরের রাণীকে অর্থাৎ পুরাতন রাণীকে সরাইয়া দাও। তার পর দিন মিলাইয়া দাও। এইরূপ করিলে দলভঙ্গ নিবারণ করা হইল এবং দলটিও বড় রহিল।

রাণী বদল—আমরা জানি রাণী প্রায় তিন বৎসর বাঁচে। প্রায় দুই বৎসর সতেজ থাকে এবং বেশ ডিম পাড়ে। তৃতীয় বৎসরে কমজোর হইয়া পড়ে এবং তাহার পর মরিয়া যায়। অতএব দলকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে রাণী যখন বুড়ো হয় কিম্বা মরে, তখন নূতন রাণী দিতে পারা যায়।

ইতালীয় মৌমাছি (বিলাতী সব রকম মৌমাছি) যে দেশে পালা হয়, সেখানে রাণী কিনিতে পাওয়া যায়। যখন দরকার হয় রাণী কিনিয়া দলে দিতে পারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো রাণীকে সরাইয়া দেওয়া হয়।

দেশী মৌমাছি প্রত্যেক বৎসর দল ভাঙ্গে। ভাঙ্গা দলের সঙ্গে পুরাতন রাণী বাহির হইয়া যায় এবং দলে নূতন রাণী হয়। দলভঙ্গ করিতে দিলে সব দলই এইরূপে নূতন রাণী করিয়া লয়।

রাণী বুড়ো হইলে মৌমাছিরা তাহা বুঝিতে পারে এবং সময় থাকিতে থাকিতে বুড়ো রাণী মরিবার পূর্ব্বে রাজকোষ গড়িয়া নূতন রাণী জন্মাইয়া লয়। অনেক সময়, বিশেষ করিয়া যদি রাণীর বয়স জানা না থাকে, তাহা হইলে মৌমাছিরা দলভঙ্গের জন্য রাজকোষ গড়িতেছে, কি বুড়ো রাণীকে বদলাইবার জন্য গড়িতেছে, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। যদি বুড়ো রাণীকে বদলাইবার জন্য হয় এবং তখন যদি রাজকোষ সকল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দল শীঘ্রই রাণীহীন হইয়া পড়ে। অতএব ঠিক বুঝিতে না পারিলে রাজকোষ গড়িতে এবং নূতন রাণী জন্মাইতে দেওয়াই ভাল। সঙ্গে সঙ্গে দলভঙ্গ নিবারণের অন্য উপায় সকলের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রথম রাজকোষের মুখ বন্ধ করিলেই পুরাতন রাণীকে সরাইয়া দিতে হয়।

এইরূপে পুরাতন রাণীকে যদি সরাইতে সাহস না হয় তাহা হইলে মৌমাছি পালকের ইচ্ছামত দলভঙ্গ করিয়া দুই দল করিয়া দিতে পারা যায় এবং নূতন দলে রাণী হইয়া ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিলেই পুরাতন রাণীকে সরাইয়া দিয়া আবার দুই দলকে মিলাইয়া এক করিয়া দিতে হয়।

দলভঙ্গের সময় হইতেছে মধুকাল। মধুকাল আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বেও দল বড় হইলে কোন কোন দল কখনও কখন দলভঙ্গ করে, ইহা ছাড়া অন্য সময় রাজকোষ গড়িলে বুঝিতে হইবে রাণী বদল করিতেছে।

প্রথম হইতেই মধু বাহির করিয়া বা খালি মৌচাক যোগাইয়া যদি বাচ্ছা পালা ও মধুভরার জন্য সব সময়েই যথেষ্ট জায়গা রাখা হয় তাহা হইলে দলভঙ্গ নিবারণ হয়। মধুকালের শেষাশেষি রাজকোষ গড়িতে পারা যায় এবং নূতন রাণী জন্মাইয়া পুরাতন রাণীকে বদল করিয়া দিতে পারা যায়।

দল রাণীহীন হইয়া পড়িলে কি করিতে হয়—রাণী হঠাৎ নষ্ট হইলে প্রথমে দেখিতে হয়, কোন মৌচাকের দাসী-কোষে ডিম আছে কি না কিম্বা একদিন কি দুইদিন ডিম হইতে ফুটিয়াছে এমন দাসী-কীড়া আছে কি না। যদি থাকে তাহা হইলে কয়েকটি ডিম অভাবে ঐরূপ ছোটদাসী-কীড়ার ঠিক নীচে মৌচাকের কতকটি কাটিয়া এক ইঞ্চি কি দেড় ইঞ্চি ছিদ্র করিয়া দিতে হয়। এইরূপে ছিদ্র করিয়া দিলে শাস্ত্র রাণী পালিয়া যাইবে। আমরা দেখিয়াছি, রাজকোষ মৌচাকের ঠিকানায় গড়া হয়, কেননা ইহার জন্য জায়গার অভাব হয় না। ঐরূপে ছিদ্র করিয়া দিলে ঐ সকল ডিম বা কীড়ার জন্য রাজকোষ গড়িতে জায়গা পায় এবং ক্রমে মৌমাছিরা রাণী করিয়া লইবে।

যদি এই দলের কোন মৌচাকে ডিম বা ঐরূপ ছোট কীড়া না থাকে, তবে অপর কোন দল হইতে, ডিম আছে এমন মৌচাক্ (কেবল মৌচাক্টি, মৌমাছি নয়) লইয়া, ঐরূপে ছিদ্র করিয়া দিতে পারা যায়। ইহা হইতে রাণী করিয়া লইবে।

যদি অপর কোন দলে রাজকোষ গড়িয়া রাণী পালিয়াছে এবং রাজকোষের মুখ বন্ধ করিয়াছে এবং তাহা হইতে রাণী বাহির হয় নাই, তাহা হইলে একটি বন্ধ রাজকোষ রাণী হীন দলকে দিতে পারা যায়। বন্ধ রাজকোষটির গোড়া ঘেঁসিয়া না কাটিয়া একটু উপরের মৌচাক্ সহিত কাটিয়া লইতে হয় এবং আলপিন দিয়া ঘরের মাঝখানের কোন মৌচাকে গাঁথিয়া দিতে হয়। ইহা হইতে রাণী বাহির হইবে এবং এই রাণী দলের রাণী হইয়া থাকিবে। তবে দল রাণীহীন হইবার অন্ততঃ দুইদিন পরে এইরূপ বন্ধ রাজকোষ দেওয়া উচিত। ইহার পূর্ব্বে দিলে মৌমাছিরা রাজকোষ কাটিয়া রাণীকে নষ্ট করিয়া দেয়। অনেক সময় যখনই দেওয়া হউক নষ্ট করে, সেই জন্য বন্ধ রাজকোষটি মৌচাকে গাঁথিয়া দিয়া রাণীর খাঁচা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে পারা যায় এবং একদিন কি দুইদিন পরে খাঁচাটি উঠাইয়া লইতে পারা যায়। খাঁচা দিয়া ঢাকা থাকিবার সময় রাণী বাহির হইতে পারে,

সেইজন্য এমন ভাবে ঢাকা দিতে হয়, যেন রাজকোষের মুখের কাছে যথেষ্ট জায়গা থাকে এবং রাণী সহজে কোষ হইতে বাহির হইতে পায়।

ইহা মনে রাখা উচিত যে, উপরের যে কোন উপায়েই হউক, রাণী জন্মাইলেও যদি সেই সময় এই দলেই হউক, কি অপর দলেই হউক, নর না থাকে, তাহা হইলে নূতন রাণী জন্মাইয়া কোন লাভ নাই। নূতন রাণীর বিয়ে না হইলে কোন কাজের হইবে না। এরূপ অবস্থায় রাণীহীন দলটিকে অপর কোন দলের সহিত মিলাইয়া দেওয়া উচিত। দলে কিছু দিন রাণী না থাকিলে যদি দাসী রাণী হয় তাহা হইলে দলটিকে অপর দলের সহিত মিলাইয়া দিতে হয়।

মধুর যত্ন—মধু ভালরূপে ঢাকা না দিয়া খুলিয়া রাখিলে বাতাস হইতে জল টানিয়া লয় ও পাতলা হয় এবং পরে ঢাকা দিলেও মাতিয়া বা গাঁজিয়া উঠিবে এবং টক্ হইবে। ইহাতে খারাপ গন্ধও হইতে পারে। চিনামাটি, কাচ এবং টিনের পাত্রে মধু বেশ থাকে, পাত্রের মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, যাহাতে হাওয়া ঢুকিতে না পারে। মধু ভিজা বা সেঁতসেঁতে জায়গায় না রাখিয়া শুকান খট্‌খটে গরম জায়গায় রাখিতে হয়। যে জায়গায় ও যে অবস্থায় লবণ জল না হইয়া ভাল থাকে, মধুও সেখানে ভাল থাকিবে। অনেকেরই ধারণা, মধু বেশী দিন ভাল থাকে না। ইহার কারণ, ভাল মধু পাইলেও এবং ইহা বোতলে রাখিলেও বোতলের মুখ প্রায় বন্ধ করা হয় না। মাটির পাত্রে মুখ বন্ধ রাখিলেও মধু কখনও ভাল থাকিতে পারে না। ভাল করিয়া রাখিলে মধু যত দিন ইচ্ছা, ভাল রাখিতে পারা যায়।

সব ভাল মধু বেশী দিন রাখিলে জমিয়া যায়। যেখানে বেশী শীত, সেখানে এইরূপে জমিয়া শক্ত হইতে পারে। কোন কোন দেশে এইরূপ শক্ত মধু ইটেরমত কাটিয়া কাগজে মুড়িয়া বিক্রয় করা হয়। জমা মধু রোদে কিম্বা গরম জলে বসাইয়া রাখিলে গলিয়া পাতলা হয়। যখন গরম জলে বসাইয়া মধু গলান হয়, তখন দেখা উচিত, যেন জলটি না ফুটে। ফুটন্ত জলে গরম করিলে মধুর গুণ নষ্ট হইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, মধুর কতকটা জমিয়া গিয়াছে এবং কতকটা পাতলা আছে। এইরূপ হইলে সমস্তটি গলাইয়া মিশাইয়া তবে পাত্র হইতে মধু বাহির করা উচিত। পাতলা ও জমাট্ অংশের গুণে কিছু তফাৎ হয়। মধু বিক্রয় করিবার জন্য ছোট ছোট জ্যাম ও জেলির বোতল ভাল, যাহাদের মুখে প্যাঁচওয়ালা টিনের ঢাক্‌না থাকে কিম্বা এরূপ পাত্র বা বোতল যাহাদের মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করা যায়। বোতল সহিত বিক্রয় করিতে হয়।

মৌমাছি পালনসম্বন্ধে অনেক জানিতে চাহিতেছেন সেইজন্য আমরা পুষা এগ্রিকাল্‌চারেল বুলেটীন হইতে কতকটা সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ বি, এ প্রণীত "মৌমাছি পালন" পুস্তক খানি বিশেষরূপে পাঠ করা কর্ত্তব্য। উহার দাম ৵৶০ চৌদ্দ আনা। কৃঃ সঃ

রেশম শিল্পের উন্নতিকল্পে রেশম কীট জাতিসম্বন্ধে পরীক্ষা

শ্রীমন্মথনাথ দে,
সেরিকাল্চার এসিষ্ট্যাণ্ট, পুষা, বিহার।

আজ কয়েক বৎসর হইতে ভারতের কোনও কোনও স্থানে রেশম-শিল্পের অবনতি হইতেছে; আবার অন্যত্র যেমন জম্বু ও কাশ্মীরে এই শিল্পের বেশ উন্নতি দেখা যাইতেছে। মহীশূর কৃষি বিভাগও রেশমের উন্নতি কল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালায় রেশম শিল্পের অবনতি দেখিয়া অনেকেই নিরাশ হইতেছেন। বিশেষজ্ঞ-দিগের মত এই যে বাঙ্গালায় রেশম-শিল্পের উন্নতি না করিতে পারিলে ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যেই এই শিল্প বাঙ্গালা দেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে। রেশমসূত্র কাটাই করিবার জন্য বাঙ্গালায় ইউরোপীয় কোম্পানি চালিত কুঠীগুলিতে ক্রমেই রেশমসূত্র কাটানের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। পূর্ব্বে রেশম-শিল্পে যেরূপ লাভ হইত, আজ কাল আর তেমন হয় না; বড় বড় কুঠীর জন্য গুটি ও কাটানী যোগাড় করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং কুঠীয়ালেরা কাজ বন্ধ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছেন। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, বীরভূম ও বগুড়া প্রভৃতি বাঙ্গার রেশম-প্রধান জেলাগুলিতে আজকাল আবার রেশমসূত্র কাটাই করিবার জন্য দেশী লোক পরিচালিত ছোট ছোট কুঠী স্থাপিত হইতেছে। সুখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালায় রেশম-শিল্পের অবস্থা এখনও অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয় নাই। সরকারী কৃষি বিভাগ এই শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আশা করা যায় যে বাঙ্গালার রেশম-শিল্প শীঘ্রই পুনর্জ্জীবিত হইবে।

কোনও সময় ভারত হইতে প্রায় ১,৫৫, ৩২, ২৯০৲ টাকা মূল্যের রেশম প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি হইত, কিন্তু আজকাল প্রতি বৎসর প্রায় ৫০, ৫৫, ২৪৪৲ টাকা মূল্যের রেশম বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে; অপর পক্ষে ভারতে রেশমের আমদানি বৎসরে প্রায় ৫৮,৫০,০০০৲ টাকা হইতে ৩,০০,০০,০০০৲ টাকায় উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর প্রায় ১২,০০,০০০ সের রেশমসূত্র উৎপন্ন হয়, এবং ৬,৬০,০০০ সের রেশমসূত্রের জিনিষ ভারতবাসীর প্রয়োজনে লাগে। আজ কাল কৃত্রিম রেশমের কাট্‌তি ক্রমেই বেশী হইতেছে এবং প্রতিবৎসর ইহা বেশী পরিমাণে বিদেশ হইতে আসিতেছে; কিন্তু তাই বলিয়া খাঁটি রেশমের আদর কমে নাই।

রেশম-শিল্প কুটীর-শিল্পের পক্ষে বেশ উপযোগী; ইহা মুখ্য শিল্প না হইয়া গৌণ শিল্প ভাবে চালিত হওয়া উচিত; কৃষকেরা কেবল ইহার উপর নির্ভর না করিয়া অন্যান্য চাষবাসের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পের দ্বারাও কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতে পারে। কেবল রেশমের উপর উপজীবিকা নির্ভর করিলে কোনও কারণ বশতঃ রেশম ভাল উৎপন্ন না হইলে কৃষকদের দুরবস্থার সীমা থাকে না; সুতরাং অন্যান্য কার্য্যের সঙ্গে এই শিল্প করাই শ্রেয়ঃ। এই শিল্প অনায়াসসাধ্য ও ইহাতে ব্যয় অল্প এবং স্ত্রীলোক ও বালকবালিকারা অবসর সময়ে অনায়াসে করিতে পারে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে অবরোধ প্রথা চলিত থাকায় স্ত্রীলোকেরা কারখানায় কাজ করিতে আসিতে পারে না এবং তাহাদের বাড়ীতেও সর্ব্বদা বেশী কাজ থাকে না; সুতরাং ইহারা অক্লেশে এই শিল্প করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে। কুটীর-শিল্পের পারিশ্রমিক ধরা হয় না, যদিও বড় বড় কুঠীতে সেই কাজ করাইয়া লইতে অনেক ব্যয় হয়। এক জন স্ত্রীলোক তাহার কন্যা বা পুত্রের সাহায্যে এক মাসের মধ্যে এক আউন্স (প্রায় ৪০,০০০) রেশম-কীটের ডিম ফুটাইয়া লইয়া অনায়াসে পালন করিয়া লইতে পারে। এক আউন্স ডিম হইতে প্রায় এক মণ রেশম-গুটি পাওয়া যাইতে পারে এবং ইহার মূল্য প্রায় ২৫৲ টাকা হয়; খরচ বাদে এক মাসে প্রায় ১৭৲ ১৮৲ টাকা লাভ দাঁড়ায় (এই স্থানে তুঁত পাতার খরচ ধরা হয় নাই)। রেশম-শিল্পে লাভ খুব কম; সুতরাং পরিমিত ব্যয় না করিলে লাভ করা সুকঠিন। এই ব্যবসায় চাকর নিযুক্ত করিয়া লাভ করা কষ্টসাধ্য। সূতা কাটাই প্রভৃতি কাজ চাকর দ্বারা করাইয়া লইলে বেশ ভাল হয় বটে, কিন্তু রেশম-কীট পালন নিজেরা করিয়া না হইলে লোকসান হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

ভারতবর্ষে এই শিল্পের বহুল প্রচার সম্ভবপর বলিয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। রেশম-কীট "ফার্ণহীট" তাপমান যন্ত্রের ৭০ ডিগ্রীতে (অর্থাৎ ফাল্গুন অথবা অগ্রহায়ন মাসের সকাল বেলা যেরূপ ঠাণ্ডা হয়) বেশী বৃদ্ধি পায়। ভারতের সর্ব্বত্রই এই উত্তাপ কোনও না কোনও সময়ে হইয়া থাকে, কোনও জেলাতে এই উত্তাপ কার্ত্তিক মাসে হইয়া থাকে, কোনও জেলাতে মাঘ মাসে, আবার কোনও জেলাতে ফাল্গুন মাসে হইয়া থাকে; সুতরাং প্রতি জেলাতে উপযুক্ত সময় ঠিক করিয়া লইয়া রেশম-কীট পালন আরম্ভ করা উচিত; নতুবা সুফল পাইবার আশা করা যায় না। রেশম-কীট পালনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই ঠিক সময় নিরূপিত করিয়া দিতে পারেন। অসময়ে রোগ সংযুক্ত রেশম-কীটের ডিম অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা পালন করার দরুণ অনেক স্থানের রেশম-শিল্পের অধঃপতনের মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নূতন স্থানে তুঁত রেশম-কীট পালন করিতে হইলে প্রথমে এণ্ডি রেশম-কীট পালন করিয়া স্থানীয় লোকদিগকে শিখাইয়া লওয়া উচিত; এণ্ডি রেশম-কীট কিছু বলবান বলিয়া

রোগ প্রতিরোধ করিতে পারে এবং ইহাদিগকে তেমন যত্ন না করিলেও বেশ গুটি দিয়া থাকে। এগুলি রেশম-কীট পালনে অভিজ্ঞ হইলে তুঁত রেশম-কীট পালন আরম্ভ করা উচিত। অনেক প্রকার রেশম-কীট তুঁত পাতা খাইয়া রেশম প্রস্তুত করিয়া থাকে। বিলাতি পলুর (ইতালি, জাপান, চীন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বর্ষএকজাত রেশম কীট) ডিম সাধারণতঃ বৎসরে একবারমাত্র ফুটে এবং স্বদেশে প্রায় দশমাসকাল ডিম অবস্থায় থাকে; কিন্তু আমাদের দেশে কৃত্রিম উপায়ে শীত খাওয়াইয়া ইহাদিগকে বৎসরে দুই তিন বার ফুটাইয়া লওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষে (কাশ্মীর ও জম্মু ব্যতীত) সাধারণতঃ বর্ষবহুজাত (নিস্তারি, ছোট পলু, চীনা পলু ও মহীশূরজাত পলু ইত্যাদি) রেশম-কীট পালন করা হয়; এই জাতীয় রেশম-কীট বৎসরে প্রায় ৫ বার গুটি প্রস্তুত করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে রেশমের পরিমাণ বর্ষএকজাত গুটির ⅓ অংশ অর্থাৎ বর্ষজাত রেশম-কীট হইতে তিনবার পালন করিয়া যে সূত্র পাওয়া যায়, বর্ষএকজাত রেশম-কীট হইতে এক বার মাত্র পালন করিলে সেই পরিমাণে রেশম পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে বর্ষবহুজাত রেশম-কীট পালন প্রথা বহুকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে; আসাম ও বীরভুম অঞ্চলে বড় পলু নামে যে বর্ষএকজাত রেশম-কীট জাতি দেখা যায়, তাহাও দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া কম রেশম উৎপাদন করিতেছে। বর্ষএকজাত রেশম-কীটের ডিম পাঁচমাস পর্য্যন্ত "ফার্ণহীট" তাপমান যন্ত্রের ৪০°—৪৫° ডিগ্রী তাপে (অর্থাৎ খুব ঠাণ্ডা জায়গায়) রাখিয়া দিতে হয়, নতুবা ডিমগুলি ২০—২৫ দিনে ফুটে, পলুও দুর্ব্বল হয় এবং অনেক ডিম নষ্ট হইয়া যায়; এই স্থানে মনে রাখিতে হইবে যে ডিমগুলি একত্রে না ফুটিলে রেশম-কীটগুলি অসমান হইয়া যায় এবং ইহাদের পৃথক পৃথক পালন করিতে হইলে বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। বাঙ্গালার বসনীরা (রেশম-কীট পালনকারীরা) রীতিমত শীত খাওয়াইতে পারে না বলিয়া বিলাতি পলু পালনে ইহাদের তেমন আস্থা দেখা যায় না। বিলাতি পলুর ডিম অগ্রহায়ণ মাসে পালন করিতে হইলে চৈত্র মাসে বরফের কলে শীত খাওয়ানের জন্য পাঠাইতে হইবে এবং মাঘ মাসে পালন করিতে হইলে ভাদ্রমাসে কোনও পার্ব্বত্য স্থানে পাঠাইতে হইবে। ডিম পাঠাইবার ৫ মাস পর যে কোনও সময় অল্প অল্প করিয়া ডিম আনাইয়া পালন করা যাইতে পারে; সুতরাং বিলাতি পলু কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত যতবার ইচ্ছা পালন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ডিম পাড়ার ১২ মাসের মধ্যে ফুটাইয়া না লইলে ডিমগুলি নষ্ট হইয়া যায়। আমরা কয়েক বৎসর যাবৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি যে বাঙ্গালাদেশে বিলাতি পলু কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে এবং মাঘ ও ফাল্গুন মাসে বড় তুঁত গাছের পাতা ও বাঙ্গালার ঝোঁপ তুত গাছের কিছু কড়া পাতা খাইয়া বেশ রেশম প্রস্তুত করিয়া থাকে; ঝোঁপ গাছগুলি ৬।৭ হাত বড় হইতে দিলে কড়া পাতা পাওয়া যাইতে পারে। এই জাতীয় রেশম-কীট গ্রীষ্মকালে পালন করা যায় না। বর্ষ্যবহুজাত রেশম-কীটের মধ্যে

মহীশূর জাতীয় রেশম-কীট ও বাঙ্গালার নিস্তারি পলু সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ; নিস্তারি পলু চৈত্র ও বৈশাখ মাসে পাতা থাকিলে পালন করা উচিত এবং তৎপরে জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মহীশূরজাত রেশম-কীট পালন করিলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে। রেশম-কীট শীতাধিক্য ও গ্রীষ্মাধিক্য সহ্য করিতে পারে না; সুতরাং গ্রীষ্মকালে উহাদিগকে পালন করিলে ভাল ফল পাওয়া যায় না। শীতকালে উত্তাপ দিয়া ঘর গরম রাখা যাইতে পারে, কিন্তু খুব বেশী শীত হইলে তাহাতে ব্যয়বাহুল্য হয়।

নিস্তারি স্ত্রী	}	পুং	}	পুং
মহীশূরজাতিস্ত্রী	}	মহীশূর জাতি স্ত্রী	}	মহীশূর জাতি স্ত্রী

এই সঙ্কর জাতির এক মণ কাঁচি গুটি হইতে /২ সের ৯ ছটাক বানকী সুক্ষ্ম রেশম বা /৩ সের ৯ ছটাক খংরু রেশম পাওয়া যায়। এক আউন্স ডিম হইতে প্রায় এক মণ কাঁচি গুটি পাওয়া যায়। প্রায় ১২০টী প্রজাপতির ডিমে এক মণ কাঁচি গুটি পাওয়া পাওয়া যায়। ৭০০,৮০০ কাঁচি গুটি ওজন করিলে এক সের হয়, নিস্তারির প্রায় ১২০০।১৩০০ গুটিতে এক সের হয়। এক মণ নিস্তারি কাঁচি গুটি হইতে প্রায় ২৪০সের খংরু রেশম পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা, আসাম এবং ব্রহ্মদেশে যে সকল জাতি সাধারণতঃ পালন করা হয়, উহা অপেক্ষা ভাল ও বড় গুটি এই কয়টী সঙ্কর জাতি হইতে পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু ইহারা এখনও খাঁটি বর্ষবহুজাত জাতিতে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কারণ শতকরা কএকটি প্রজাপতির ডিম বর্ষএকজাত রহিয়া গিয়াছে ; কোনও পুরুষে প্রায় সব প্রজাপতির ডিম বর্ষবহুজাত হয় আবার তৎপরবর্ত্তী পুরুষে শতকরা ৮।৯টী প্রজাপতির ডিম বর্ষএকজাত হয়। আমাদের মনে হয় যে এই সঙ্কর জাতিগুলি হইতে প্রত্যেক পুরুষে সব প্রজাপতির ডিম বর্ষবহুজাত হইবে না ; অন্ততঃ কএকটি প্রজাপতির ডিম প্রায় প্রত্যেক পুরুষেই বর্ষএকজাত হইবে। কিন্তু এই সঙ্কর জাতিগুলিতে বেশী রেশম পাওয়া যায়। সুতরাং উক্ত বর্ষএকজাত ডিমগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলেও তেমন ক্ষতি হইবে না। আমরা আশা করি যে, এই সঙ্কর জাতি হইতে সর্ব্বত্রই বেশী রেশম পাওয়া যাইবে, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, বসনীদের এই জাতীয় ডিম পালন করিবার জন্য এখনও দেওয়া যাইতে পারে না। ভারতের নানা স্থানে আমরা এই জাতীয় ডিম বিতরণ করিয়াছি এবং সকলেই সুফল প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া খবর দিয়াছেন।

উদ্ভিদের অনুভব শক্তি

উদ্ভিদগণের যে প্রাণ আছে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। তবে ইহাদের যে আমাদের মত অনুভবশক্তি আছে এবং ইহারা ক্ষেত্র বুঝিয়া কার্য্য করিয়া থাকে সে কথা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ব্যতীত অতি অল্পলোকেই জানেন। জীবনধারণ করিবার জন্য, নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবার জন্য, আত্মরক্ষা করিবার জন্য, বংশরক্ষার জন্য ইহারাও যে প্রাণীদিগের ন্যায় কত প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেতাহা আলোচনা করিলে বাস্তবিকই মোহিত হইতে হয়। এইরূপ কৌশল অবলম্বন যে জীবদিগের একচেটিয়া নহে তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব থাকে না।

জীবের যেমন চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক বলিয়া পাঁচপ্রকার ইন্দ্রিয় আছে উদ্ভিদের ঠিক সেইরূপ কিছু আছে কিনা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। তবে এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সহিত উদ্ভিদ-শরীরের কোন কোন অংশের তুলনা করিতে পারি। কিন্তু জীবে যেমন ইন্দ্রিয়গুলি পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থিত, উদ্ভিদে সেরূপ কিছুই নাই। কার্য্য দেখিয়া একএকটি উদ্ভিদ-শরীরাংশকে ইন্দ্রিয়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে মাত্র। জীবের পাঁচপ্রকার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেমন বহির্জগতের সকল তথ্য মস্তিষ্কে নীত হইতেছে এবং তথা হইতে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়া জীবকে ঠিক পথে চালিত করিবার উপায় আছে, উদ্ভিদজগতে ঠিক এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে কিনা তদ্বিষয়ে আমরা ঠিক অবগত নহি। তবে উদ্ভিদের অনুভবশক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

উদ্ভিদের অনুভবশক্তি (Sonsitiveness) সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত ডারউইন প্রথমে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা আরম্ভ করেন। সান-ডিউ (Sundew) নামক কীটাশী (Insectivorous) বৃক্ষই প্রথমে এই বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি দেখিলেন যে উক্ত বৃক্ষের পাতায় কতকগুলি গ্রন্থিযুক্ত শুঁয়া (Glandularhair) আছে। মক্ষিকা বা অন্য কোনও কীট অসিয়া পাতার উপর বসিলে এই শুঁয়াগুলি উত্তেজিত হয়; তাহার ফলে গ্রন্থিগুলি স্ফীত হইতে থাকে, পাতাটি ক্রমে একটি পাত্রের আকার ধারণ করে এবং এই গ্রন্থিগুলি হইতে পাচক রসের ন্যায় একপ্রকার আঠাল রস নিঃসৃত হইয়া দুর্ভাগ্য জীবের ইহলীলা শেষ করিয়া দেয়।

এই ব্যাপার দেখিয়া ডারউইন উদ্ভিদের অনুভবশক্তি আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি আরও দেখান যে এই শুঁয়াগুলিকে অনৈসর্গিক উপায়ে উত্তেজিত করা যাইতে পারে, তাহাতে কিন্তু পাচকরস নিঃসৃত হয় না।

ডারউইন এই তথ্য প্রচার করিলে (Wiesner) উইজনার প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভিদের সকল স্থান সমভাবে অনুভব করিতে পারে কিনা তাহার আলোচনা আরম্ভ

করিলেন। তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েকটি পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিলেন যে উদ্ভিদের সমস্ত অংশ সমভাবে অনুভব করিতে পারে না।

(১) প্রথমে তাঁহারা (Passiflora) পাসীফ্লোরা নামক উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এই লতার শুণ্ডের (Tendril) উপর $\frac{1}{৩৮}$ গ্রেন পরিমিত সূতার টুকরা চাপাইলে সমস্ত লতাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত লতার অন্য কোনও স্থান এইরূপ উত্তেজনায় এত অধিক উত্তেজিত হয় না।

(২) (Dionea) ডায়োনিয়া-পত্রের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৈশিক শুঁয়া (Sensitive hair) অতি অল্প উত্তেজনায় সমস্ত পত্রটিকে স্পন্দিত করিতে থাকে।

(৩) বিছুটীর (Deadnettle) পত্রের উপর অতি সামান্য আঘাত লাগিলেই উহার উপরে যে বালুকাত্মক (Silicous) পদার্থ থাকে তাহা খসিয়া পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ কাঁটাটি আক্রমণকারীর শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিষাক্ত তরল পদার্থ ঢালিয়া দেয়।

(৪) দুপাটীর বীজাধারের বা ফলের উপর অতি সামান্য আঘাত লাগিলেই বীজাধারটি ফাটিয়া এমন হঠাৎ গুটাইয়া যায় যে বীজগুলি চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে।

(৫) Venus's Flytrap, Sundew প্রভৃতি কীটাশী বৃক্ষ ও লতার শুঁয়া-গুলি অতি অল্পেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে।

এইরূপ কতকগুলি পরীক্ষার পর ইহা নির্দ্ধারিত হইল যে উদ্ভিদের অনুভবশক্তি সকল স্থানে সমভাবে নাই। জীবশরীরে যেমন স্পর্শানুভূতিস্থান, শৈত্যানুভূতিস্থান (Touchspots, coldspots) প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট আছে, উদ্ভিদ-শরীরেও ঠিক সেইরূপ কতকগুলি অনুভবকেন্দ্র (Sensory areas) আছে। সেই স্থানগুলি অতি অল্প উত্তেজনায় স্পন্দিত হইতে থাকে, অন্য স্থানে সেরূপ উত্তেজনায় কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

যখন প্রমাণিত হইল যে উদ্ভিদের সকল স্থান সমভাবে অনুভব করিতে পারেনা তাহারই আলোচনা আরম্ভ হইল। ডারউইন প্রথমে এই পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রমাণ করিলেন যে নবজাত উদ্ভিদের শিকড়ের সূক্ষ্ম অগ্রভাগের বা ডগের (tip) অনুভবশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনি এই কথা প্রচার করিলে (Cisielski) সিজিলস্কী কতকগুলি সূক্ষ্মাগ্রভাগ (tip) কাটিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি এইরূপ বহু পরীক্ষার পর নির্দ্ধারণ করিলেন যে যতদিন এইগুলি আঘাতমুক্ত না হয় অর্থাৎ সুস্থ না হইয়া উঠে ততদিন ইহাদের অনুভবশক্তি থাকে না। সম্প্রতি (Pfeffer) পেফারও নানা প্রকার পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বাহ্যতঃ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহাদের যে অনুভব করিবার জন্য কতকগুলি কেন্দ্র আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় আর নাই। ভবিষ্যতে এই কেন্দ্রগুলিকে আমরা "অনুভব-কেন্দ্র" বলিয়া উল্লেখ করিব।

জীবজগতের স্নায়বিক স্পন্দনের বিশেষত্ব এই যে উত্তেজনা ও স্পন্দনের মধ্যে একটি সম্বন্ধ আছে। একটি স্নায়ুকে যখনই একভাবে উত্তেজিত করা যাইবে তখনই সে একই প্রকারে স্পন্দিত হইবে। তাড়িৎ বা অন্য কোনও প্রকার উত্তেজকের সাহায্যে একটি স্নায়ু উত্তেজিত হইলে তাহা চিরকালই একই প্রকারে স্পন্দিত হয়। উদ্ভিদজগতেও আমরা সেই সম্বন্ধ দেখিতে পাই। অনুভবকেন্দ্রগুলি বিভিন্নপ্রকারে উত্তেজিত হইলে বিভিন্ন প্রকারে স্পন্দিত হইতে থাকে। কোনবার আমরা একরূপ ভাবাত্মক সাড়া (Positive curve) পাইয়া থাকি ; কোনবার অন্যরূপ অভাবাত্মক সাড়া (Negative curve) পাইয়া থাকি। তবে যে প্রকারে উত্তেজিত হইলে ভাবাত্মক (Positive curve পাই, সেই প্রকারে যখনই পরীক্ষা করি-না চিরকালই সেইরূপই ভাবাত্মক সাড়া পাইব। এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, অন্য অন্য সমস্ত সর্ত্ত পরীক্ষাকালে ঠিক থাকা আবশ্যক ; তাহা না হইলে অবশ্য অন্য প্রকার ঘটিতে পারে।

এক্ষণে আমরা এক সময়ে যদি দুইটি ঠিক বিপরীত ভাবের উত্তেজক দিয়া পরীক্ষা করি তাহা হইলে কি ফল হইবে ? বিপরীতভাবের উত্তেজক অর্থে একটিতে ভাবাত্মক সাড়া (Positive curve) এবং অপরটিতে (Negative curve) অভাবাত্মক সাড়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন উত্তেজকের কথা বলা যাইতেছে। যদি দুইটি উত্তেজকের শক্তি তুল্য হয় তাহা হইলে আমরা কোন প্রকার স্পন্দনের লক্ষণ দেখিতে পাইব না। বাস্তবিক অতিসূক্ষ্ম তাড়িৎমান যন্ত্রের (delicate galvanometer) সাহায্যেও এই স্পন্দনের কোন লক্ষণই ধরিতে পারা যায় না। কিন্তু যদি দুইটি উত্তেজক তুল্য না হয় অর্থাৎ একটি অপরটির অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে যেটি প্রবল হইবে সেটির অনুসারেই বৃক্ষটি স্পন্দিত হইবে।

উপরে যে পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা গেল উহা সাধারণ লোকের দ্বারা সাধিত হওয়া দুষ্কর। উত্তেজনা অনুসারেই যে স্পন্দন ঘটিয়া থাকে তাহার গুটিকতক সাধারণ।উদাহরণ দেওয়া যাউক। এইগুলি সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

(১) শিকড় মাটির নিম্নে নামিতে নামিতে যখন কোন বাধা পায় তখন যাহাতে সহজে নিজ গন্তব্যস্থানে পৌছিতে পারে এমনিভাবে বাঁকিতে আরম্ভ করে।

(২) আবার যদি কখন এমন কোন স্থানের উপর আসিয়া পড়ে যাহা আর

ভেদ করিয়া যাইবার উপায় থাকে না তখন ইহা সেই বাধাপ্রাপ্ত জমির উপর দিয়া সমান্তর (parallel) ভাবে চলিতে থাকে। পরীক্ষা করিবার জন্য ফুলের টবের মধ্যে একটা কাচের টুকরা রাখিয়া তাহার উপর মাটী চাপাইয়া দিয়া একটি গাছ পুঁতিয়া দেওয়া যাইতে পারে। মাখমসীমের ও তেঁতুলের বীজ হইতে অতি শীঘ্র গাছ হয় এবং শিকড়ও দ্রুতভাবে মাটির নিম্নে নামিতে থাকে। ছোলা সরিষা প্রভৃতির দ্বারাও এই পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

(৩) উদ্ভিদের জলশোষণকারী শক্তির (hydrotropism) কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মাটি হইতে রস পাইবার জন্য উদ্ভিদের শিকড় চিরকালই মাটির নীচে গিয়া থাকে।

(৪) যে দিকে আলোক পায় সেই দিকেই গাছ বাঁকিতে থাকে, ইহা হইতেও উত্তেজনা ও স্পন্দনের নিয়ম অতি সহজেই প্রমাণিত হয়। একটি মাখমসীম বা কুমড়ার বীজ একটি টবে পুঁতিয়া একটি ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলে এবং সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া কেবলমাত্র একটি আলোক প্রবেশের পথ উন্মুক্ত রাখিলে দেখা যাইবে যে গাছটি জন্মাইয়া এই আলোকপ্রবেশের পথের দিকে আসিতেছে। কিছুদিন পরে এই পথটি বন্ধ করিয়া দিয়া এই পথের বিপরীত দিকে অপর একটি পথ করিয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে গাছটি আবার সেইধারে বাঁকিয়া চলিয়াছে। সীম, কুমড়া, শসা প্রভৃতি গাছে এই পরীক্ষা করা সুবিধা, কেননা ইহারা অতি শীঘ্র বাড়িতে থাকে। সমস্ত গাছেই এইরূপ পরীক্ষা করা যাইতে পারে, তবে উহা সময়-সাপেক্ষ।

এতক্ষণ উদ্ভিদের কার্য্যকরী ও অনুভব-শক্তির কথা বলা হইল। সকল ক্ষেত্রেই কার্য্যের পর অবসাদ লক্ষিত হয়। কোন মাংসপেশীকে আমরা যদি ক্রমাগতই তাড়িৎ দিয়া (electrically) উত্তেজিত করি তবে কিছুক্ষণ পরে ইহা আর স্পন্দিত হয় না। তখন ইহার বিশ্রাম আবশ্যক। কিছুক্ষণ ইহাকে উত্তেজিত না করিলে ইহার স্পন্দনশক্তি ফিরিয়া আসে। জীবজগতের ন্যায় উদ্ভিদজগতেও "অবসাদ" (fatigue) লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

ডাইয়োনিয়ার সূক্ষ্ম কৈশিক গ্রন্থিগুলিকে উত্তেজিত করিলে সমস্ত পত্রটি মুড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়। যদি কোন কৌশলে আমরা পত্রটিকে মুড়িতে না দিয়া একটি গ্রন্থিকে বারবার উত্তেজিত করি তবে কিছুক্ষণ পরে এই গ্রন্থির অনুভবশক্তি লোপ পায়, তখন পাতাটি ছাড়িয়া দিলেও আর মুড়ে না। জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের Response in Living and Nonliving নামক পুস্তকে এইরূপ অনেকগুলি পরীক্ষা বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

ক্লোরোফরম, ঈথার প্রভৃতি বিষাক্ত অসাড়-করিবারশক্তিসম্পন্ন বাষ্পগুলি যেমন

জীবজগতে স্নায়ুমণ্ডলীর উপর নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া অবসাদ ও অসাড়ভাব আনয়ন করে, উদ্ভিদজগতেও ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকে। আচার্য্য বসু গাজর, মূলা, ফুলকপির ডাঁটা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। এই সমস্ত উদ্ভিদের অবসাদ সহজে লক্ষিত হয় না। কিন্তু ক্লোরোফরম বা ঈথারের বাষ্প লাগিবামাত্র ইহাদের অনুভবশক্তির হ্রাস হয়। তখন ইহাদিগকে উত্তেজিত করিলেও ইহারা স্পন্দিত হয় না। তবে এই বাষ্পের প্রভাব হইতে সরাইয়া রাখিলে কিছুক্ষণ পরেই ইহাদের এই অবসাদ দূর হয় এবং পুনরায় যথানিয়মে স্পন্দিত হইতে থাকে।

জীবজগতে যেমন (narcotic) অবসাদক বিষের সাহায্যে একেবারে স্পন্দন লোপ করা যাইতে পারে উদ্ভিদজগতেও তাহাই হয়।

স্নায়ুমণ্ডলীকে আমরা মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। কতকগুলির সাহায্যে বহির্জগতের সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত অনুভূত হয়। অপরগুলির দ্বারা স্পন্দনকার্য্য সমাধা হয়। তৃতীয়টির কার্য্য এই যে বহির্জগতের ঘাতপ্রতিঘাত বুঝিয়া কিরূপ স্পন্দিত হওয়া কর্ত্তব্য তাহারই নির্দ্ধারণ করা। মোটের উপর এই তিনটিকে অন্তর্মুখ প্রবাহ, বহির্মুখ প্রবাহ, ও মস্তিক বলিতে পারি।

স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্যকলাপ আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাউক। সাধারণের বোধগম্য একটি উদাহরণ লইয়া তাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝিলে ইহা অতি সহজেই বুঝা যাইবে।

মনে করুন রাজ্যের কোন একস্থানে যুদ্ধ বাধিয়াছে। রাজ্যের প্রধান প্রধান মন্ত্রীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে পারেন না, তাঁহাদের রাজ্যেই থাকিতে হয়, কিন্তু সমস্ত রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যুদ্ধের সমস্ত সংবাদাদি জ্ঞাত হওয়া চাই। একারণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দিবারাত্রিই তাড়িৎবার্ত্তার সাহায্যে যুদ্ধের সকল সংবাদই মন্ত্রীগণের নিকট পৌঁছিতেছে। তাঁহারা পাঁচজনে পরামর্শ করিয়া সেক্ষেত্রে কি করা আবশ্যক তাহার উপদেশ দিয়া পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে সংবাদ পাঠাইতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রেরিত তাড়িৎবার্ত্তা যেমন মন্ত্রীগণকে যুদ্ধের আভ্যন্তরিক অবস্থার বিষয় জ্ঞাত করায়, অন্তর্মুখ স্নায়বিক প্রবাহও তেমনি বহির্জগতের সকল তথ্যই মস্তিষ্ককে জ্ঞাত করায়; মন্ত্রীগণের পরামর্শানুযায়ী যেমন যুদ্ধ চলিতে থাকে তেমনি মস্তিষ্কের (nerve cell) স্নায়ুকোষের নির্দ্দেশানুযায়ী স্পন্দনকার্য্য ঘটিয়া থাকে।

জীবজগতের উচ্চস্তরে এই তিনটি বিশদ বিভাগ স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া থাকি, কিন্তু উদ্ভিদজগতে ঠিক এইরূপ তিন প্রকার স্নায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারি না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জীবে ইন্দ্রিয়গুলির সহিত মোটামুটিভাবে অনুভবকেন্দ্রগুলির (Sensory areas) তুলনা করিতে পারি। জীবজগতের উচ্চস্তরে চক্ষুর আলোক-অনুভব করিবার শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু যতই নিম্নস্তরে নামিতে থাকি

ততই দৃষ্টির প্রাখর্য্য কমিতে থাকে, ক্রমে এমন ক্ষীণ হয় যে নিম্নস্তরের অনেক জীবকে কেবল আলোক অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হয়। উদ্ভিদজগতে চারা গাছগুলিরও আলোক অনুভব করিবার শক্তি অত্যন্ত প্রবল। জীবগণ যেমন ত্বকের দ্বারা স্পর্শন অনুভব করিয়া থাকে, উদ্ভিদগণ সেইরূপ লতাতন্তু (tendril) ও শিকড়ের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ (root-tip) দ্বারা অনুভব করিয়া থাকে; কাজেই ত্বকের সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। জীবের ভারবোধশক্তির সহিত উদ্ভিদের ভূকেন্দ্রাভিমুখে (force of gravity) গমনের তুলনা করা যাইতে পারে। ক্লোরোফরম, ঈথার প্রভৃতি নানাপ্রকার উত্তেজক নানাপ্রকার স্পন্দন দেখাইয়া থাকে; তাহা হইতে ইহাদের স্বাদগ্রহণের ও ঘ্রাণের শক্তি পরিচয় পাই।

মোটের উপর উদ্ভিদ ও জীবজগতে স্নায়বিক প্রবাহের যে পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহার স্থূল কারণ এই যে উদ্ভিদগণ অজড়জগতের নিম্নস্তরে অবস্থিত আমরা যতই উচ্চস্তরে উঠিতে থাকি স্নায়বিক স্পন্দনের ক্রমবিকাশ স্পষ্ট হইতে থাকে। কোন কোন উদ্ভিদের যেরূপ অনুভবশক্তি আছে তাহা জীবজগতে দুষ্প্রাপ্য। পাসীফোরা (Passiflora) এত অল্প আঘাতে স্পন্দিত হয় যে জীবের সর্ব্বাপেক্ষা স্পর্শানুভবক্ষম ইন্দ্রিয় জিহ্বাও তাহা অনুভব করিতে অক্ষম। আমাদের চক্ষু যে সমস্ত সূক্ষ্ম আলোকরশ্মি অনুভব করিতে পারে না। (Phalaris) ফালারিসের ক্ষুদ্র চারাগুলি তাহাও অতি সহজেই অনুভব করিয়া থাকে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে উদ্ভিদের অনুভবশক্তি অনেকস্থলে অধিক হইলেও জীবের তুলনায় তাহাদের স্পন্দনশক্তি অতি অল্প। উদ্ভিদের স্পন্দিত হইতে অনেক সময় লাগে এবং একবার স্পন্দন আরম্ভ হইলে উত্তেজনার অভাবেও অনেকক্ষণ স্পন্দিত হইতে থাকে। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবাসী
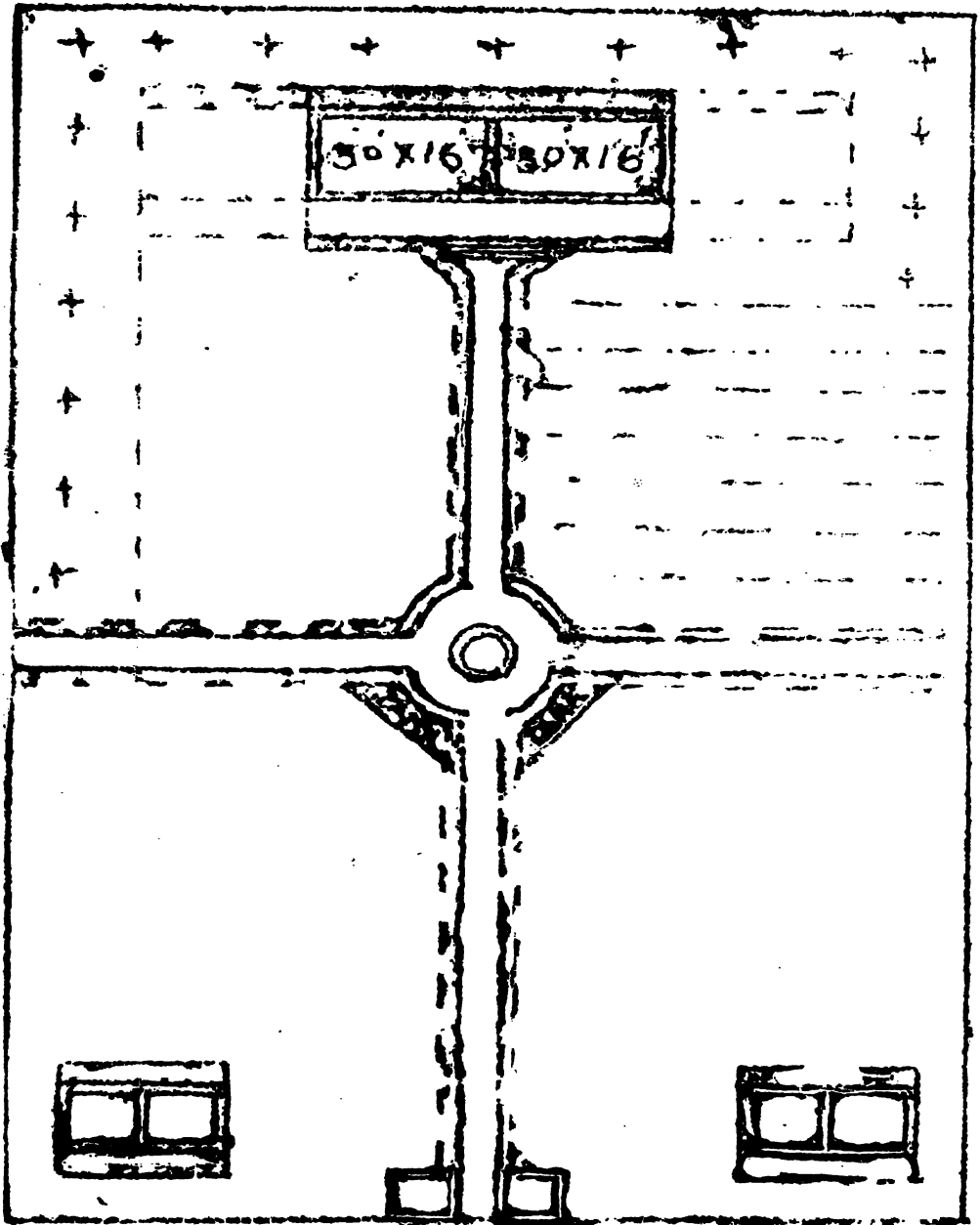
আদর্শ স্কুল উদ্যানের নক্সা

উত্তরাংশে স্কুলের পাঠগৃহ, মধ্যস্থলে কুয়া চৌবাচ্চা ও চৌতারা। চারি চৌকায় যথাক্রমে—

(ক) ফলের বাগান ও ব্যায়াম শিক্ষার স্থল। (খ) ছেলেদের সব্জী ক্ষেত্র। (গ) পরীক্ষা ক্ষেত্র। (ঘ) ফলের বাগান। দৈর্ঘপ্রান্তে মধ্যস্থলে রাস্তা; রাস্তার দুধারে ফুলের কেয়ারি।

চাউলের মুল্য বৃদ্ধি ও পল্লীর অবস্থা—অশীতি বর্ষ বয়স্ক ব্যাক্তিগণও বলিতেছেন, এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ তাঁহারা জীবনে কখনও দেখেন নাই। সমস্ত খাদ্য দ্রব্যই অগ্নি মুল্যে বিক্রিত হওয়ায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দুর্দ্দিনে নিরন্ন পল্লিবাসীর যে কি ভীষণ কষ্ট হইতেছে তাহা ভাবিলে হৃদয় বেদনাচ্ছন্ন হয়। অনেকে সহরের ঐশ্বর্য্য বৈভব দেখিয়া সেই হিসাবে সাধারণ বঙ্গবাসীর জীবন যাত্রার অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করেন। সহরের চতুরশ্ব-চালিতশকট ও মোটর গাড়ী দেখিতে যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহারা কিরূপে পল্লীর দুঃখ দৈন্যের কথা ভাবিতে সমর্থ হইবেন? বহু দিন যাবৎ পল্লীবাসিগণ এক বেলা আহার করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছে, কিন্তু আর তাহারা পারিয়া উঠিতেছে না। দুর্ভিক্ষ ক্রমেই করাল মুর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছে। অর্দ্ধাশনে যাহারা এতদিন কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিতেছিল চাউলের মণ ১০৲ টাকা হওয়ায় তাহারা এখন অনশনে দিনপাত করিতে বাধ্য হইতেছে। মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণী যথাসাধ্য দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদের অবস্থাও সচ্ছল নয়। পল্লীর অবস্থা ক্রমেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে। আমরা অতি কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, উচ্চ রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া স্বচক্ষে অসহায় ক্ষুৎপীড়িত পল্লীবাসীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করুন। বর্ষাকাল উপস্থিত; এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের বর্ষাপ্লাবিত পল্লীতে নিরাশ্রয় দরিদ্র প্রজাকুল স্ত্রীলোক ও সন্তান-সন্ততিকে লইয়া দাঁড়াইবার স্থান পাইবে না, ইহার উপর ইনফ্লুয়েঞ্জাদি নানাবিধ ভীষণ ব্যাধির প্রকোপ ও অভাবিতপূর্ব্ব দুর্ভিক্ষের নিস্পেষণ—স্বচক্ষে দর্শনত দূরের কথা, এ চিত্র কল্পনাতে আঁকিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। বিশ্ববর্ত্তা—ঢাকা ১১ই শ্রাবণ।

পিঁয়াজের গুণকীর্ত্তন—ডাক্তারেরা বলেন, "দেহের ভিতরকার বিষ ও রোগের বীজাণু প্রভৃতি নষ্ট করে বলিয়া, যাহারা পেঁয়াজ খায় তাহাদের অসুখ বিসুখ অনেকটা কম হয়। রোগীর ঘরে কাঁচা পেঁয়াজ কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া রাখিয়া দিলে নানা সংক্রামক রোগের বীজাণু, চম্বুকের টানে লোহার মত সেই পেঁয়াজের ভিতরে গিয়া সঞ্চিত হয়। দুষ্ট বাতাস সাফ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। এই জন্য যে-সব কাটা পেঁয়াজ বেশীক্ষণ খোলা বাতাসে পড়িয়া থাকে, তাহা খাইতে নাই,—কারণ, তাহার ভিতরে তখন বাহিরের বিষ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কাঁচা পেঁয়াজের অন্যান্য গুণ—হজমশক্তি বাড়ায়, ইন্‌সমনিয়া রোগ নাশক, বাত রোগীর উপকারী খাদ্য, গাত্র চর্ম্মের রঙ পরিষ্কার করে। বোল্‌তা প্রভৃতির হুল-ফোটানোর জ্বালা পেঁয়াজের রসে একেবারে কমিয়া যায়।

রেশম ব্যবসায়ে জীবিকা—রেশম ব্যবসায়ে জাপানী কারিগরেরা রোজ মাহিনা পায় সাড়ে পাঁচ আনা হইতে এগারো আনা পর্য্যন্ত; সে ক্ষেত্রে ইংরেজ কারিগরেরা ঘণ্টায় এক টাকা দুই আনা হইতে এক টাকা পাঁচ আনা পর্য্যন্ত রোজগার করে।

ইংলণ্ডে রেশমের ব্যবসায়ে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

পত্রাদি

হাঁস ও মুরগীর চাষ—শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাঁচড়াপাড়া।

'কৃষক' আপনার রচিত, 'পক্ষী ও মুরগীর চাষ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, তৎসম্বন্ধে আরও অধিক জানিবার জন্য আমি বড়ই উৎসুক হইয়াছি। আপনি লিখিয়াছিলেন, যে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের ঔৎসুক্য নিবারণার্থ, আপনি আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করিতে কুণ্ঠীত হইবেন না—তাহাতেই আশান্বিত হইয়া, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি, আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জ্ঞাত করিবার জন্য, আপনাকে অনুরোধ করিতে সাহসী হইয়াছি। জ্ঞাতব্য বিষয়—

১। হাঁসেদের মধ্যে কোন কোনগুলি উৎকৃষ্ট জাতীয়?

(ক) তাহাদের কোথায় পাওয়া যায়?

(খ) তাহাদের কি রকম দর?

(গ) কিরূপে তাহাদের পালন করিতে হয়?

উত্তর—পেকিন, ম্যালার্ড, ইণ্ডিয়া রাণার, আইলবরি, রাউয়েন ও মস্কভীগুলিই উৎকৃষ্ট জাতীয়। ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে ভারতেই পাওয়া যায়। যেমন দেশী পাঁতী হাঁস পালন করিতে হয় সেইরূপ ইহাদেরও পালন করিতে হয়। এদের পালন সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। দেশীয় হাঁসেরা 'গুগ্‌লি খাইতেই অধিক ভালবাসে, কিন্তু অধিক সংখ্যক হাঁসের খাদ্যোপযোগী 'গুগ্‌লি' সকল সময়ে পাওয়া অসম্ভব। তাহাদের ধান দিলেও চলে, কিন্তু, অধুনা ধানের মূল্য এরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে যে ধান খাওয়াইয়া হাঁসের চাস করিলে লাভ করা বোধ হয় অসম্ভব।

৩। অতএব ধানের পরিবর্ত্তে, কোন্ দ্রব্য (কি পরিমাণে) তাহাদের খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে? যাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও হয় এবং আমাদেরও সুলভে হয়?

উত্তর—জন্তুও উদ্ভিদ্ খাদ্য ইহাদের প্রয়োজন। চূণ, পাথর কয়লা, নোনামাটী, রক্ত, নারীভূঁড়ি, কাটা ছাগলাদি দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা ছাড়া মক্কা, ডাল ইত্যাদির ঝাড়ানি, ধানের কোণা ঝাড়্নী, খইছড়া, ছোলা মুগ, গমের ভুষী ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে। মাছের কাঁটা পোঁটা ভুক্তাবশেষ ভাত ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে।

জ্ঞাতব্যবিষয়—৪। মর্দ্দা হাঁসগুলার কিরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত অর্থাৎ কয়টা মাদীতে কয়টা মর্দ্দা রাখিতে হইবে, মাদী মর্দ্দা একসঙ্গে রাখা যাইতে পারে কিনা, যদি একসঙ্গে না রাখা হয়, তাহা হইলে তাহাদের কয়দিন অন্তর একসঙ্গে ছাড়িতে হইবে, ইত্যাদি।

উত্তর—৪।৫টা মেদীর সহিত একটি তেজস্কর অসম্পর্কিত মর্দ্দা সংযোগ করিবে। মাদী মর্দ্দা একসঙ্গে রাখা উচিত নহে। আমাদের দেশে সেটা সদা সর্ব্বদা সম্ভব নহে বলিয়া এক সঙ্গে রাখা যাইতে পারে কিন্তু মর্দ্দা গুলিকে মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া দিতে হইবে।

(খ) পাঁচমাস বয়স্কা হাঁসীদের প্রথমবারের ডিম্ব বাচ্চা তুলিবার জন্য বসান যাইতে পারে কিনা ?

উত্তর—হাঁ পারে।

৫। বৎসরে, কোন্ কোন্ মাসের ডিমে ভাল বাচ্চা হয় ?

উত্তর—(খ) কোন কোন মাসের ডিম বসাইলে নষ্ট হয় ?

শীতের ডিমে ভাল বাচ্চা হয় না। খুব গ্রীস্ম ও বর্ষায় ডিম ভাল ফুটে না।

৬। হাঁসের ব্যবসা আরম্ভ করিতে হইলে কত মূল ধনের আবশ্যক ?

(খ) মাসে ১০০৲ টাকা লাভ করিতে হইলে কতগুলা হংসহংসীর আবশ্যক।

উত্তর—৫।৬ শত টাকাতে একরূপ চলে তবে নিজের বিল বা পুকুর চাহি।

৩ হইতে ৪ শত হাঁসী সদা ডিম্বদাত্রী চাহি।

৭। রাজহংসের ডিম্ব ভক্ষণের অপকারিতা কি ? উপকারিতা আছে কিনা ?

(খ) উহাদের অল্প খরচে কি খাওয়ান যাইতে পারে ?

উত্তর—বড়র বেশী এলবুমেন। সহজ পথ্য নহে। খেতেও সুখবোধ হয় না। তাই লোকে বড় খায় না। তাহা ছাড়া আর অপকারিতা জানা নাই।

মক্কা গম ভাত, ঘাস ইত্যাদি চিনা, মেওয়া জোয়ার কদাচ নহে।

৮। পাতি ও রাজ হংসদের একসঙ্গে রাখা যাইতে পারে কিনা ?

(খ) রাখিলে কি ক্ষতি হয় ?

উত্তর—মারামারি করে, ডিম ভাঙ্গে।

জ্ঞাতব্য বিষয়—৯। হাঁসেদের বাসস্থান কিরূপ হওয়া বিধেয় ?

উত্তর—উচ্চস্থানে, দক্ষিণ খোলা স্বাস্থ্যকর, জলাশয়ের কাছে ও সুরক্ষিত স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। একখানি Rough plan পাঠাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

এসে দেখা করে সব কথা বলে নিয়ে যাবেন।

সবুজ সার সয়বীন বা সোয়াসীম—শ্রীরামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোণামুখী।

প্রশ্ন—সোয়াসীম বিঘাপ্রতি কত ছড়াইতে হয়, পাওয়া যাইবে কিনা? অন্য কিছু তাহার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা চলে কিনা? জমিতে সার প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন বই আছে কিনা?

উত্তর—সোয়াসীম প্রতি বিঘায় দশ সের ছড়াইতে হয়। এ বৎসর উহা বাজারে আমদানী নাই। যাহা পাওয়া যায় তাহার দাম ১৫৲ টাকা হইতে ১৮ টাকা মণ। ধঞ্চে বা পাট বীজ বুনিয়া তুল্য ফল পাওয়া যায়। শণ ও পাট বীজের মণ ১২৲ টাকা প্রতি বিঘায় ৫ সের পাট বা শণ বীজ ছড়াইলে চলিতে পারে।

জাহাজ নির্ম্মাণ।—ভারত গবরমেণ্টের ইণ্ডিয়ান মিউনিশন্ বোর্ডের পরিচালনে এদেশে আবার জাহাজ নির্ম্মাণ হইবে। বিলাতের নৌসেনা বিভাগীয় কার্য্য পরিচালন সমিতির এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ইহার তত্ত্বধানের জন্য ভারতে আসিতেছেন। এই কারখানার সদর আড্ডা হইবে কলিকাতায়। প্রথমে "পাইয়োনীরে" এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর "ইংলিশম্যান" এই সংবাদ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া বলিতেছেন,—সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য, এডমিরালটি কনষ্ট্রাকশন ব্রাঞ্চের কর্ণেল ম্যাকগ্রেগর সাহেব এই কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য এদেশে আসিতেছেন। এ সংবাদে এদেশের অনেকেই আনন্দিত। এক সময় ভারতে বহু প্রকারের জাহাজ প্রচুর পরিমাণেই নির্ম্মিত হইত;—এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়ান শিপিং" নামক বহু প্রশংসিত গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবরণর লর্ড কারমাইকেল ইহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকারকে পত্র লিখিয়াছেন। ম্যাক গ্রেগর সাহেব যদি এ পুস্তক না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ পুস্তক পড়া তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

বাগানের মাসিক কার্য্য

শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস

কৃষিক্ষেত্র।—যে সকল জমিতে শীতকালের ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়া চষিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

সার মিশ্রিত গামলা বা কাঠের বাক্সে কপিবীজ বপন করিয়া এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। মৃত্তিকার সমপরিমাণ পাতাসার মিশ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়।

জলদি ফসলের জন্য ইতিপূর্ব্বেই চারা প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর একটি কথা এস্থলে আবশ্যক যে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাক্সে বা গামলায় বীজ বপন করিয়া পোষায় না। উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাঁধিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা আবশ্যক মত হোগলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কোন কোন সুনিপুণ চাষী থেঁতো বাঁশের মাচান করিয়া তাহার উপর ৬।৮ ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়া বীজ বপন করে।

অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বোমা বা বিচালী গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজক্ষেত্রে জল ছিটাইতে হয়।

আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যাহাতে আলু বসাইবে সে সকল জমিতেও এই সময় উত্তমরূপে চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে।

শীতকালের জন্য লাউ, কুমড়া বীজ এই সময় বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ ২।৩ দিন হুকার জলে ভিজাইয়া বপন করিলে বীজগুলি পোকায় নষ্ট করিতে পারে না।

ওল ও মানকচু তুলিবার এই সময়। এই সময় তাহারা খাইবার উপযুক্ত হয়।

এই মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানে কপির চারা ক্ষেত্রে বসান শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশে ভাদ্র মাসের শেষে কার্য্য আরম্ভ হইবে। পাটনাই ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান ভাদ্রের শেষ পর্য্যন্ত হইয়া যাওয়া উচিত।

সেলেরী (Celery), এসপারেগস্ (Asparagus) ও দুই এক জাতীয় টম্যাটোর (Tomato) চাষ এই সময় হওয়া উচিত।

লাউ, কুমড়া, শাঁকালু, বীট, পাটনাই শালগম ও গাজর, পালম, নটে প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সব্জী, শসা প্রভৃতি দেশী সব্জী তৈয়ার করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

মুলা, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া চষিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখিতে হইবে।

সব্জীবাগান—এই সময় শাকাদি সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুঁই, বরবটি, বেগুণ, শাঁকালু, টেঁপারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই, শালগম, ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জী বীজ—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই।

এ বৎসর বর্ষা জলদি, তথাপি মোকাই (ছোট) এবং দে-ধান চাষের এখনও সময় যায় নাই।

ফুল বাগিচা—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা,) এমারন্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, (sun-flower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুল বীজ

লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাত্‌লা করিয়া তাহা হইতে দুই একটি গাছ লইয়া অন্যত্র রোপণ করিয়া নূতন ঝাড় তৈয়ারি করা যায়।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল কটিং করিয়া পুতিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ক্যানা, লিলি প্রভৃতির পট বা গাম্‌লা বদলাইবার সময় বর্ষারম্ভ, কেহ কেহ সময় না পাইলে আষাড় শ্রাবণ পর্য্যন্ত এই কার্য্য শেষ করেন। মুলজ ফুল গাছের মূল বর্ষায় বসাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। কতকগুলির মূল বর্ষাকালে গামলায় তুলিয়া না রাখিলে জল বসিয়া পচিয়া যায়। ডালিয়া এই শ্রেণীভুক্ত।

কলিয়স, ক্রোটন, আমারান্থাস, একালিফা, প্রভৃতির ডাল কাটিয়া পুতিয়া এই সময় বসাইতে পারা যায়।

ফলের বাগান—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টি হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের গাছের ফেঁকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার শ্রাবণ ভাদ্রই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

ভরা বর্ষাতেই পেঁপে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু চারা তৈয়ারী করিয়া ভাদ্র মাসের আগেই চারা নাড়িয়া না পুতিলে ভাদ্রমাসের রৌদ্রে চারা বাঁচান দায় এবং জমিতে ঘাস পাতা পচানি হেতু জমি অম্লাক্ত হওয়ায় তখন চারার অনিষ্ট হয়। চারাগুলি তিন চারি পাতা হইলে, যখন বৃষ্টি হইতে থাকে তখন নাড়িয়া বসান উচিত।

শস্যক্ষেত্র—কৃষকের এখন বড় মরসুম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধানের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার দক্ষিনাংশ পাট নাবি হয়। ধান্য রোপণ শ্রাবনের শেষে শেষ হইয়া যাইবে। আষাঢ় মাস ধান্য রোপণের উপযুক্ত সময়। বর্ষারম্ভ হইলেই বীজতলাতে ধান বুনিয়া বীজধান (ধান্য চারা) তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ায় মাটি বিচালিত করা কর্ত্তব্য। সুপারি গাছের গোড়ায় এই সময়ে গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময়ে ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামন্য পরিমাণ কাঁচা গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। ফলের গাছে হাড়ের গুঁড়া এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুণ, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন আবশ্যক।

সব্জী ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয় দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক করিয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাও, কোন লতা গুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জলসরিয়া যায়। কলার তেঁউড় শ্রাবণমাসে পুতিলেও চলিতে পারে। বেগুণ, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুতিবে। শ্রাবণ মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতে হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল হয় না। যে দোয়াঁস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটী করিয়া শাঁক আলুর বীজ পুতিবে। শাঁক আলুর ক্ষেত সর্ব্বদা আল্গা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষ কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউস ধান কাটে।

বাগানের বেড়া—যাঁহারা বেড়ার বীজের দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুরমত গজাইতে পারে। চিরস্থায়ী বেড়ার জন্য অনেকে ডুরোন্টা বা মেহদী ত্রিপত্রা বা চিতার বেড়া দেন। ডাল পুতিয়া হউক বা বীজ ছড়াইয়া হউক বেড়া প্রস্তুত করিতে হইলে বর্ষাকালই উপযুক্ত সময়। জ্যৈষ্ঠ হইতে এই বিষয়ে যত্নবান হইতে হয়, শ্রাবণ পর্য্যন্ত চেষ্টায় বিরত হইতে নাই। পচা ভাদ্রে বা নিতান্ত শীত কিম্বা গ্রীষ্মে বেড়া প্রস্তুত করা চলে না।

দিল্লি মহিষ

(৬নং)

মণ্টগোমারি গাভী বা সাইওয়াল

(১নং)

(২নং)
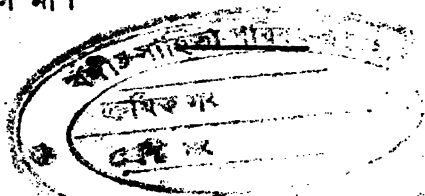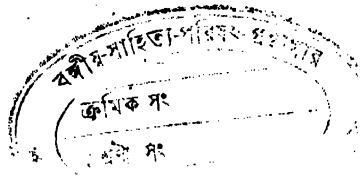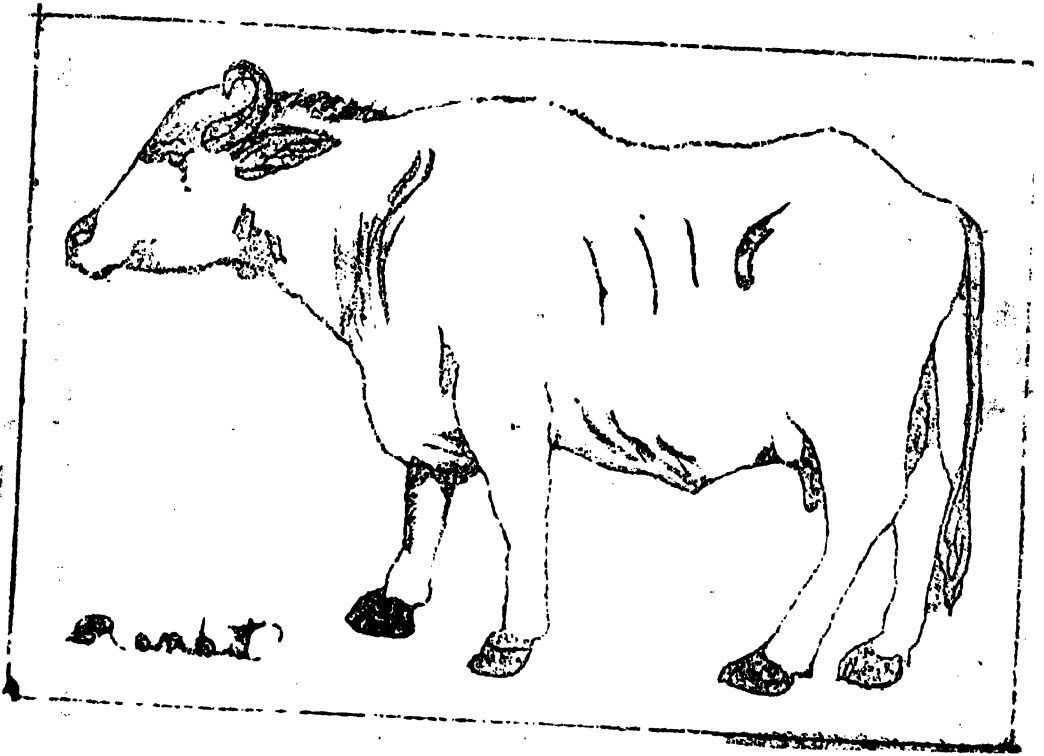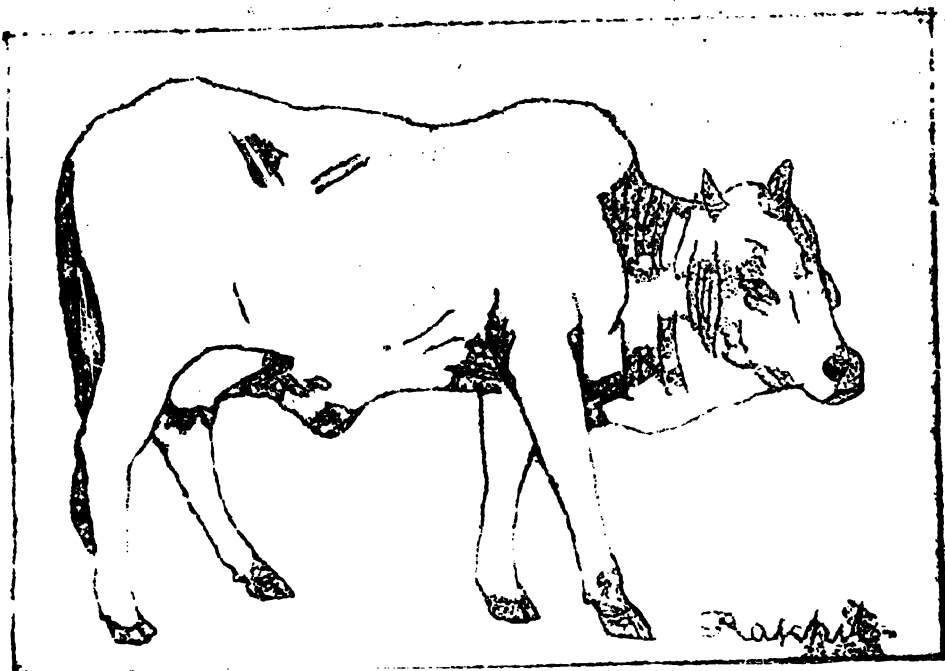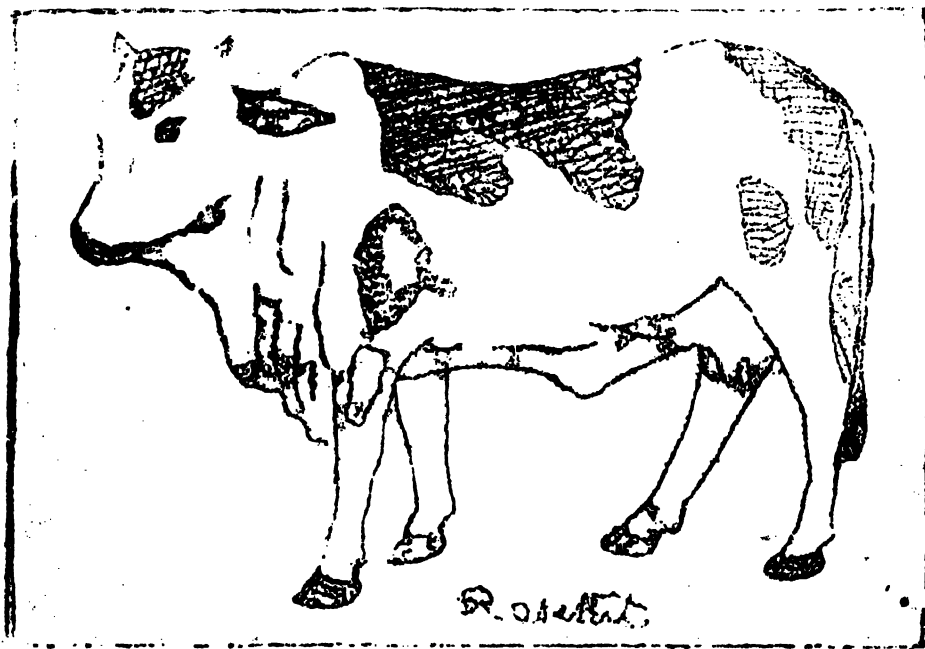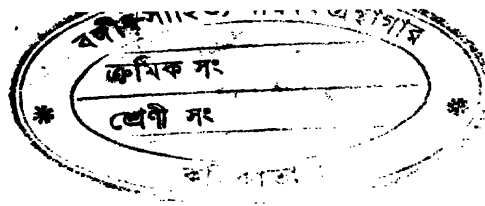
কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

২০শ খণ্ড । ভাদ্র, ১৩২৬ সাল। ৫ম সংখ্যা ।

ভাল ষাঁড় আবশ্যক

(দুগ্ধ-ব্যবসায়ী গোপ লিখিত)

গাভীর দুধ পাইতে হইলে ভাল ষাঁড়ের নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল ভাল জাতীয় গাভী পালন করিলেই উপযুক্ত পরিমাণে দুধ পাওয়া যায় না। উপযুক্ত বা সারবান ক্ষেত্র পাইলেই যেমন উপযুক্ত বীজ অভাবে ফসল আশানুরূপ হয় না তেমনি ভাল গাভী পাইলেই দুধের আশা করা যায় না।

অনেকে বলেন গাভীর মুখে দুধ অর্থাৎ গাভীকে উত্তম আহার দিলে গাভীর দুধ বাড়ে। এ কথার ভিতর অনেক কথা উহ্য থাকিয়া যায়। উত্তম গাভীর সহিত উত্তম ষাঁড়ের সংযোগ হইলে, সেই গাভী উত্তম আহার পাইলে তবে আশানুরূপ দুগ্ধবতী হইবে। নতুবা গোড়ার দুটী কথা বাদ দিলে ঐ বাক্যের এক বর্ণও সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যাইবে না। সুবীজ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে এবং উত্তমরূপ তদ্বির হইলে তবে ফসল ভাল হইবে নতুবা নহে।

গোপাল বান্ধবে এই সম্বন্ধে সদালোচনা আছে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আমি উল্লেখ করিতেছি—

গাভীর যে সকল শুভাশুভ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, ষাঁড়েরও সেই সেই লক্ষণ জানিবে। যে ষাঁড়ের মুষ্ক স্থূল ও অতিশয় লম্বা, ক্রোড়দেশ শিরাজালে পরিব্যাপ্ত, গণ্ডদেশে স্থূল,

শিরাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্বদাই অত্যন্ত জোর শ্বাস বহে, শৃঙ্গ স্থূল, উদর শ্বেতবর্ণ কিন্তু শরীরের অপরাংশের রঙ্ কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায়, সেই ষাঁড় অত্যন্ত অশুভ-সূচক। যে সকল ষাঁড়ের চক্ষু কৃষ্ণ-পীতবর্ণ ও আবরণ স্থূল, গতি অশ্বের ন্যায়, উদর মেষের ন্যায় নীলবর্ণ, শরীরের রঙ্ সাদা, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, শৃঙ্গ তাম্রবর্ণ, তাহারা শুভ-ফলদায়ক। যে ষাঁড়ের কুকুদ লাল এবং শরীরের রঙ্ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত, যাহার একটি চরণ সাদা, অপর চরণ ও শরীর নানা রঙের, তাহা অত্যন্ত শুভ-ফলপ্রদ। ভাল ষাঁড় হইতেই ভাল গাভী উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্য উত্তম ষাঁড় কৃষকের সর্ব্বদা রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

আইসা টুইড্ ভাল ষাঁড়ের এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন :—

"He m be deep and wide in the chest, long and broad in the back and round in the barrel, well-ribbed up and strong in the shoulders, and have massive but not very long legs; large joints, and legs fairly apart to support the body, compound and solid-looking carcass, short face, with large, prominent eyes, set far apart and broad forehead and muzzle. His neck must be short and stout rising well over the withers into a large hump. The head should be carried erect. The dewlap should be long, but the ears should not be very long."

বাছুর অবস্থা হইতে পালন করিয়া ষাঁড় তৈয়ারী করিতে পারিলে অনেক সময় মনোমত ফল পাওয়া যায়। ভাল জাতীয় ষাঁড়ের বাছুরই পালন করা কর্ত্তব্য। এই জন্য ডেয়ারি ষ্টুডেণ্ট আমাদিগকে প্রথম হইতে সাবধান করিতেছেন। ভাল ষাঁড়ের অভাবে আমার কত গাভী যে এখন দুগ্ধহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। আমার মত এই প্রকার অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হন অথচ কারণ খুঁজিয়া পান না। কখন অদৃষ্টের দোষ, কখনও জল বায়ুর দোষ দিয়া মনকে প্রবোধ দেন। অনেক সময় প্রকৃত কারণই কেহ অনুসন্ধান করেন না। ডেয়ারি ষ্টুডেণ্টের কথাগুলি এখানে আমি উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

বৎসগণ, প্রথম নির্ব্বাচনের পর ইহাদিগকে যথা সময়ে যথোচিত খাদ্য পানীয় প্রদান ও যথা সময়ে প্রয়োজন মত পরিশ্রমের কার্য্য প্রদান ও যথা সময়ে ইহাদের প্রসাধন করিয়া আদর, যত্ন ও মমতার সহিত পালিত হইলে ইহারা অত্যধিক দুষ্ট বুদ্ধি বা ভীষণ প্রকৃতির হইতে পারে না। যে পুং-সন্তানগুলি ষণ্ডের জন্য নির্ব্বাচিত হইবে, প্রতি বৎসর ইহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পরীক্ষা ও অপরের সহিত তুলনা করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়া পালন করিতে হইবে। যে নিয়মে পুং সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পরীক্ষিত হয়

সেই হিসাবে ষণ্ডের ককুদ, গলার ও কাঁধের মাংস পেশীর পরিপুষ্টতা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রখিতে হইবে। একটী প্রবল পরিপুষ্ট ষণ্ডের ককুদ বৃহৎ ও ঈষৎ হেলিয়া অবস্থিত থাকে ও গলার মাংস এত পরিপুষ্ট হয় যে গলার উপরিভাগে বিস্তৃত হইয়া একটী মানুষের বসিবার স্থানের মত স্থূল হইয়া মাংসপেশীগুলি যেমন বড় সেইরূপ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। ষণ্ডের পশ্চাৎভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিপুষ্ট ও পিছনের পা দুটীর মাঝখানের গ্রন্থির কোণ বড় ও পায়ের গড়ন সোজা হইয়া থাকে। পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বে কোনরূপে গাভীর সহিত সংযোজিত না হইলে ইহাদের জনন ক্রিয়া শক্তি বহুকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। গো বৎসের আকৃতি, আয়তন ও শক্তি বংশানুক্রমে পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় ও পিতার প্রচ্ছন্ন দুগ্ধ দায়িকা শক্তি সন্তান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিলাতের নির্ব্বাচনকারীরা প্রাণি-সম্পদের যে সকল গুণাবলী মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করে সেগুলি, সংখ্যায় যত
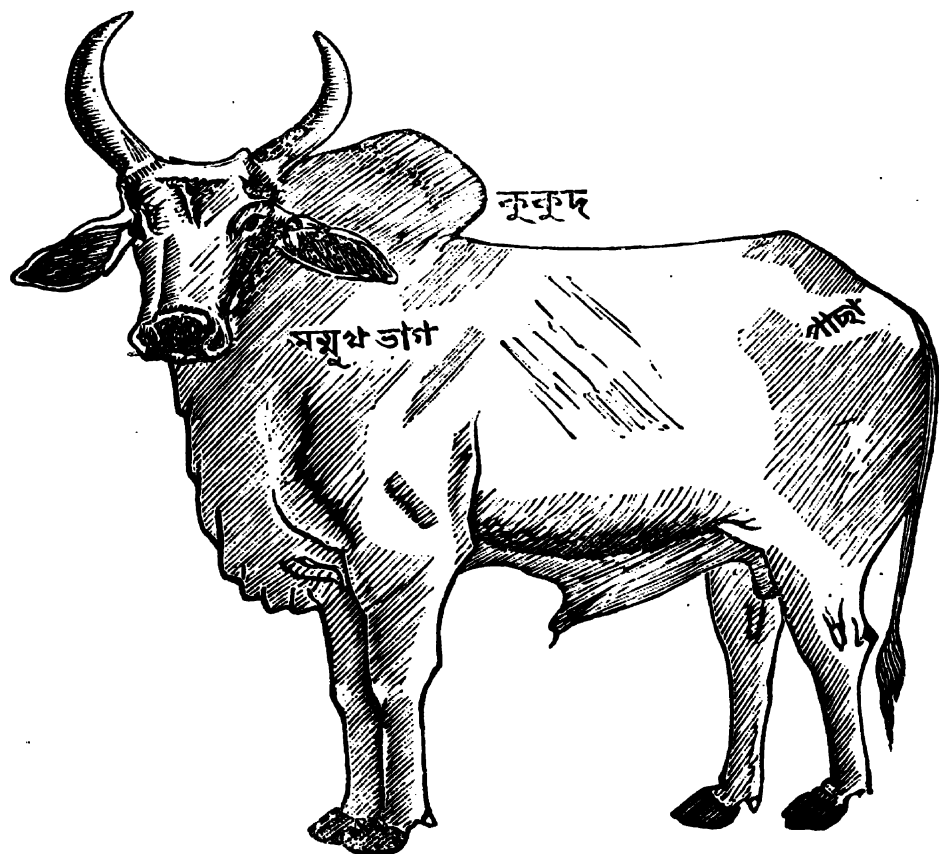
অধিক হয় তাহার বৃদ্ধির চেষ্টায় থাকেন, এজন্য ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। যথোচিত খাদ্য, পানীয়, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোহালে বাস ও সময়োপযোগী পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইলে উহাদের গুণাবলী এক শোণিতের

মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া যত পুরাতন হইতে থাকে ও যদি ভিন্ন নূতন নূতন শোণিত মিশ্রিত না হইয়া জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় তাহা হইলে উহাদের গুণাবলী যেমন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে সেইরূপ স্থায়ীভাবে রক্ষিত হইয়া বংশানুক্রমে সংক্রামিত হইলে গো জাতি উন্নতির দিকে ধাবিত হইবে, ও উহাদের গুণাবলীর ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে না। ষণ্ডকে গাভীর খাদ্য প্রদত্ত হইলে উহার প্রচ্ছন্ন দুগ্ধদায়িকাশক্তি উত্তেজিত হইয়া ঐ ভাবে সন্তানে সংক্রামিত হইবে, ও পিতামাতার এই শক্তি সমভাবে সংক্রামিত হইয়া একযোগে ইহার বিকাশ হইলে দুগ্ধদায়িকা শক্তি বৃদ্ধি হইবে। যে খাদ্য গাভী প্রাপ্ত হইবে সেই খাদ্য দেহের ওজন অনুসারে ষণ্ডকে প্রদান করা একান্ত বিধেয়। নির্ব্বাচিত ষণ্ড ঘেরার মধ্যে বাস করিয়া, যাহাতে গাভীগুলিকে দেখিতে পায় তাহার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। বয়সকালে গাভী দেখিয়া ষণ্ডের উত্তেজনা না হইলে সেই ষণ্ড জনন ক্রিয়ার অনুপযোগী হয়, যাহাতে ষণ্ডের এই বৃত্তি উত্তেজিত থাকে তাহার উপায় বিধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

গোপাল-বান্ধব সত্য কথাই বলিয়াছেন—প্রচুর দুগ্ধবতী গাভীর পাইতে হইলে কৃষক প্রচুর দুগ্ধবতী গাভীর গর্ভজাত উত্তম ষাঁড় এবং বক্‌নার সংযোগে সঙ্কর উৎপাদন করিবে, নতুবা তাহার সব যত্ন বিফল হইবে। একজন ইংরাজ ক্ষেত্রস্বামী বলিয়াছেন—"If one wants to breed good milch cows, he will have to select cows and especially bulls descended from good milkers. Good bulls of a good milking strain—superior in health condition and built—should be paired with cows for breeding better animals. The prepotency of bull to transmit good milking power which lies in a latent state in him, on the offspring will greatly influence the character of the offspring. But it will not be advisable to pair cows with good cross bulls on account of the uncertainty of the result and also of the tendency in the offspring to reversion, but in any case if substantial improvement is wanted selection combined with greater attention and better treatment of the animals is needed. In crossing, the best specimens should be used; and the bulls and cows to be paired in no case should be less than 3 or 4 years old, the latter age to be greatly preferred; the bulls ought not to be more than 6 years of age. ইংরাজ ক্ষেত্রস্বামীর শেষ কথাটি ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ষাঁড় যত্নে প্রতিপালিত হইলে ১০।১২ বৎসর

বয়স পর্য্যন্ত বেশ জননক্ষম থাকে এবং তাহার উত্তেজনার কোন অভাব দেখা যায় না। বোধ হয় ৬ বৎসরের স্থানে ১৬ বৎসর হইবে।

তিনি যে বলিয়াছেন—ষণ্ডের খাদ্য গাভীর অনুরূপ হওয়া আবশ্যক কিন্তু খাদ্যের নাম বা পরিমাণ স্বতন্ত্রভাবে বলিয়া দেন নাই। "গোপাল-বান্ধব" ষণ্ডের খাদ্যের যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

গাভীর ন্যায় ষাঁড়কেও যত্ন পরিচর্য্যা করিবে। তাহাকে প্রচুর ঘাস দিবে এবং সদাসর্ব্বদা গাভীর সহিত থাকিতে দিবে না, কারণ তাহা হইলে সে সর্ব্বদা ভীরু বক্না এবং নব গর্ভিনী বক্না বা গাভীগণকে বিরক্ত করিবে কিম্বা সদাসর্ব্বদা স্ত্রীসংসর্গে থাকার দরুণ তাহার শুক্রতারল্য রোগ জন্মিয়া সে অকালে ব্যাধিগ্রস্ত হইবে। আমাদের দেশে এই নিয়ম বড় যত্নেরসহিত প্রতিপালন করা হয় না বলিয়া উক্ত ভারতীয় গোজাতির অবনতির অন্যতম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। ষাঁড়কে গাভীর ন্যায় লবণ এবং গন্ধক নিয়মিত খাওয়াইবে। তাহাকে নিম্নরূপ জাবের নিত্য সকাল এবং সন্ধ্যা এই দুইবার ব্যবস্থা করিবে। ইহা একটি বড় হান্সি বা হারিয়ানা ষাঁড়ের খাদ্যের তালিকা :—

সরিসার খইল	...	...	২	সের
গমের ভুষী (চোকর বা ব্রাণ)	...	...	২	"
কাঁচা ঘাস	...	...	৪	"
খড়কাটা চাফ্ বা ভুষা (ছোলা, গমগাছ আদি মাড়ান)		...	৪	"
লবণ	...	...	১	ছটাক
গন্ধক	...	...	¼	

এবং আহারান্তে প্রচুর নির্ম্মল পানীয় জল দিবে।

ইয়র্কশায়ার-নিবাসী Mr. Wright of Sigglesthrone Hall তাঁহার ষাঁড়কে নিম্নলিখিতরূপ খাওয়াইয়া বেশ আশা প্রদ ফল পাইয়াছেন—

যব কিম্বা সীম চূর্ণ	...	...	৪	পাউণ্ড।
টার্ণিপ্ কাটা	...	...	৮	"
হে ঘাস	...	...	২	"
খইল	...	...	২	"
			১৬	

স্মরণ রাখা উচিত জননকার্য্যে নিযুক্ত ষাঁড়কে বেশী খইল দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু অধিক খইল ভোজনে জননশক্তি হ্রাস হয়।

পরিশেষে আমার বক্তব্য জননক্ষম ভাল ষাঁড় পাইতে হইলে ভাল জাতের বাছুর লইয়া প্রতিপালন করা চাই এবং তাহার স্বচ্ছন্দ বিচরণের ব্যবস্থা থাকা চাই। স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিতে না পাইলে তাহার শরীর গঠন সম্পূর্ণ হইবে না বলিয়া আমার মনে হয়। আমার গোশালার যে সকল বাছুর আমি ছাড়িয়া দিয়া মাঠে চরাইয়া প্রতিপালন করিতে পারিয়াছি তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও গঠন আবদ্ধ গোবৎসাদি অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চরিয়া খাইয়া বেড়াইতে পাইলে তাহারা স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ তেজস্বী ও শান্ত প্রকৃতি হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে সকল ষাঁড় সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকে তাহাদের মেজাজ খীটখীটে ও প্রকৃতি অশান্ত হয় এবং ঐ সকল ষাঁড়রের রক্ষণা বেক্ষণ কিছু কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। বাঙ্গালা দেশে ২৪ পরগণায় আমার গোশালা। গোপালনে আমি আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। মুলতানী, ভগলপুরী মথুরাপুরী গাভী আনাইয়া আমি কতবার বিফল মনোরথ হইয়াছি। তাহারা আসিয়া প্রথম বিয়ানে বেশ দুধ দেয় তারপর জনক ষাড়ের দোষে এবং জল হাওয়ার পরিবর্ত্তনে দ্বিতীয় বারে আর সে রকম দুধ হয় না এবং ক্রমশঃ আরও কমে। যাড় ভাল পাইলে ইহার কতকটা প্রতিকার হয়, কিন্তু জলহাওয়ার দোষ নষ্ট করা কঠিন। সহর বন্দরের নিকট যেখানে গবাদির থাকিবার খাইবার ও পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা চলে তথায় ভাল গাভী রাখায় লোকসান হয় না। পল্লীগ্রামে ভাল জাতের গাভী পালন করিতে হইলে খোলা মাঠে ফাঁকা জায়গায় গোশালা নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। এই মসামাছি জল কাদার দেশে তাহারা ভাল রকম সন্দচ্ছ পায় না। এক বেনে বেশী বেশী দুধ দেয় বটে পরের বেনে খারাপ হইয়া যায়। ভাল ষাঁড় পালন করিয়া এ দেশের ভাল জাতের গাভী বাছিয়া লইয়া সঙ্কর উৎপাদন করিতে পারিলে বাঙলায় গো-জাতির নিশ্চয়ই উন্নতি হয় ইহা আমার ধারণা। ডেয়ারি ষ্টুডেণ্ট এবং গোপাল-বান্ধব প্রণেতার এ বিষয়ে মতামত জানিতে পারিলে বিশেষ উপকার হইবে। ভাল জাতের ষাঁড়ের বাছুর কোথায় পাওয়া যায় তাহাও তাঁহারা বোধ হয় বলিয়া দিতে পারিবেন।

বিলাতে গাভী, বলদ, ষণ্ডকে ম্যাঙ্গোল্ড বীট খাওয়ান হয়। বিলাতের ক্ষেত্রস্বামীগণ এইজন্য ম্যাঙ্গোল্ড বীটের চাষ করেন, কারণ তাঁহারা ইহা গবাদির প্রয়োনীয় খাদ্য বলিয়া মনে করেন। আমাদের দেশে ঐ প্রকারের কোন খাদ্য আছে কিনা গবাদির খাদ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া দিতে পারিবেন।

অরণ্যের আবশ্যকতা।

অনেকের মনে এই ধারণা রহিয়াছে যে, অরণ্য, দুর্গম ভীতিপ্রদ স্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে সুতরাং উহার উচ্ছেদ করিয়া যতই জমি কর্ষণ করা যায় ততই মঙ্গল। অশিক্ষিত মনুষ্যের মনে যে এইরূপ ধারণার উদয় হইবে তাহা কিছু বিচিত্র নহে, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও অরণ্য সম্বন্ধে এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। কোন দেশের পক্ষে অরণ্য যে অতীব আবশ্যক এবং পুরাকালে যে সকল জাতি অরণ্য সংরক্ষণে অবহেলা করিয়াছে, আহারা কালক্রমে যে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা এই প্রকার লোকের ধারণায় আইসে না। আমরা আজকাল যে বালুকাময়, অনুর্ব্বর, প্রায় বৃক্ষ-লতা-প্রণী-বিহীন শাহারা মরুর বিবরণ পাঠ করি, তাহা এক সময় বহুল অরণ্যানীযুক্ত প্রাণীপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। রোমাকেরা উহার উপযুক্ত তত্ত্বাবধারণ না করায় প্রবল দাবানলে উক্ত অরণ্য স্থানে স্থানে দগ্ধীভূত হইত। অসংখ্য মেষপালের অত্যাচারে নবীন পত্রাঙ্কুর আর বিকসিত হইতে পারিত না। এইরূপ বহু বৎসর ব্যাপী অবহেলার ফলে শাহারা এমন মরুভূমি হইয়াছে। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পুরাকালে, ইজ্‌রেল, আথিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, কার্থেজ এবং বর্ত্তমান সময়ে, স্পেন, ইটালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অরণ্যের অভাব অবনতির অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্য জগতে যতই বিজ্ঞানের চর্চ্চা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ততই অরণ্যের আবশ্যকতা ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে উপলব্ধি হইতেছে।

অরণ্যের সহিত বারি প্রপাতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অবশ্য বিভিন্ন দেশের জল বায়ুর তারতম্যের একমাত্র কারণ অরণ্য নহে। (১) বিষুব-রেখা হইতে দূরত্ব (২) সমুদ্র, নদী, অথবা অন্যান্য বৃহৎ জলাশয়ের উপরিভাগ হইতে উক্ত দেশের উপরিভাগের উচ্চতা এবং তৎসমুদয় স্থান হইতে দূরত্ব (৩) প্রবাহমান বায়ু (৪) অরণ্যের অভাব অথবা প্রাচুর্য্য এবং (৫) মৃত্তিকার তারতম্য, প্রধাণতঃ এই কয়েকটি কারণই কোন দেশের জল বায়ুর স্বভাব নির্দ্ধারিত করিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত কারণ, পরস্পর এরূপ ভাবে জড়িত এবং উহাদের মধ্যে অরণ্যজনিত প্রভাবের মাত্রা এত সামান্য যে বহু দিবস পর্য্যন্ত অরণ্যের যে জল বায়ুর উপর কোন প্রভাব আছে তাহা অনেকেই ধারণা করিতে পারেন নাই। কালক্রমে জল বায়ু সম্বন্ধীয় বহু অনুসন্ধানের ফলে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জল বায়ুর সহিত অরণ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং দেশ মধ্যে অরণ্য থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু কি রূপে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন? সর্ব্বপ্রকারে সমভাবাপন্ন দুইটি স্থান নির্ব্বাচিত হইল। ঐ দুইটি স্থানের মধ্যে এই মাত্র

প্রভেদ রহিল যে, একটি অরণ্যের বহির্ভাগে এবং অন্যটি অরণ্যের অন্তর্ভূত। বহু স্থলে এইরূপ দুইটি স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া উহাদের জল বায়ুর অবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইল। ইহাতে দেখিতে পাওয়া গেল যে, উত্তাপের হিসাবে গ্রীষ্মকালে দিবা দ্বিপ্রহরে অথবা পূর্ব্বাহ্ণে অরণ্যের মধ্যে গড়ে ৭½ ডিগ্রি উত্তাপ কম। বসন্ত অথবা হেমন্ত কালে ৪ ডিগ্রি এবং শীতকালে ২ ডিগ্রি। যে সমস্ত স্থলে এইসকল পরীক্ষা হইয়াছিল তৎসমুদয় স্থানে গড়ে গ্রীষ্মকালে ৭৫ ডিগ্রি উত্তাপ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এতদপেক্ষা উত্তাপ অনেক অধিক। সুতরাং ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষে অরণ্যের বহির্ভাগ এবং অন্তর্ভাগের উত্তাপের তারতম্য অপেক্ষাকৃত বহুল পরিমাণে অধিক। এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, অরণ্য উত্তাপের মাত্রা হ্রাস করিয়া দেয় বলিয়াই বারি-প্রপাত, বায়ুমণ্ডলে শৈত্যের মাত্রা এবং জমি হইতে সূর্য্য-কিরণ দ্বারা জল শোষণের মাত্রার উপর ইহার প্রভাব এত অধিক। বস্তুতঃ নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা জল বায়ুর উপর অরণ্যের প্রভাব এরূপ নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সমস্ত স্থলে বারি প্রপাত কম, সে সকল স্থানে কেবল বারি-প্রপাতের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্যই যে অরণ্য আবশ্যক এরূপ নহে। উচ্চ পাহাড় সমুহ উত্তমরূপে অরণ্য দ্বারা আবরিত না থাকিলে নদী প্রভৃতিতে জলাভাব হয়, বাণ দ্বারা দেশ প্লাবিত হয়। পক্ষান্তরে অরণ্য থাকিলে, যে জল, বৃষ্টির সময় নগ্নপাহাড়ের গাত্র বহিয়া উপত্যকা প্লাবিত করিয়া শস্য ও জীবন ধ্বংশকারী বন্যায় পরিণত হইত তাহা অরণ্য দ্বারা শোষিত এবং সংরক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ নদীর কলেবর বৃদ্ধি করে। অধিকন্তু অনাবৃত স্থানে সূর্য্যতাপে যে পরিমাণ জল শোষিত হয়, গলিত-পত্রযুক্ত অরণ্যে তাহার কেবল শতকরা ২২ ভাগ মাত্র হইয়া থাকে। সুতরাং অবশিষ্ট ৭৮ ভাগ জল উদ্বৃত্ত হয়। উক্ত জল নদী, ঝরনা প্রভৃতির পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে।

উপত্যকা অথবা সমতল ক্ষেত্র অরণ্য বিহীন হইলে অনিষ্টের মাত্রা অর্দ্ধেক পরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে। কারণ তখনও নদীর জলবেগ সমান থাকে, পলী দ্বারা নদীস্রোত আবদ্ধ হয় না এবং খাল পয়োনালা প্রভৃতি দ্বারা জল সেচন চলিতে পারে। সিন্ধুনদ এবং গঙ্গা উভয়ই অরণ্যাবৃত পর্ব্বতাঞ্চল হইতে প্রবাহিত হইতেছে। এখনও উক্ত পর্ব্বত গাত্র সমূহে যথেষ্ট পরিমাণে পাদপ রাজি বর্ত্তমান সুতরাং এখনও জল প্রবাহ সমভাবে চলিতেছে। কিন্তু যে দেশে পর্ব্বত-গাত্রস্থ বৃক্ষরাজি নির্ম্মূল হইয়াছে, তদ্দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয়। বর্ষার প্রচুর বারিপাতে পর্ব্বত-গাত্র বিধৌত হইয়া যাইতেছে, জল স্রোতের ধীর অথচ অনব্যাহত গতিতে মৃত্তিকা স্থানচ্যুত হইয়া নদী গর্ভে পলীরূপে বিরাজ করিতেছে এবং কালক্রমে বৃহদাকার উপল খণ্ড সমূহ বিচ্যুত হইয়া পর্ব্বতের আয়তন ক্রমশঃ হ্রাস করিতেছে। পক্ষান্তরে যে স্থলে অরণ্য বর্ত্তমান, তথায় প্রকৃতির কার্য্য বিভিন্ন রূপে সাধিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অরণ্য সংযুক্ত স্থানে

বারিপ্রপাত হইলে তাহা অবাধে বহিয়া যাইতে পারে না। প্রথমতঃ উক্ত বারির শতকরা ২৫ ভাগ বৃক্ষ পত্র দ্বারা শোষিত হয় এবং ক্রমে বৃক্ষ অবয়ব দ্বারা মৃত্তিকায় নীত হয়। ২য়তঃ বৃক্ষের অনাবৃত মূল, গলিত শাখা এবং পত্র এতদ্‌সমুদয়ই জলের গতি রোধ করায় জল নিম্নগামী হইয়া নদী, ঝরণা প্রভৃতিতে ক্রমশঃ বারি-যোজনা করিয়া থাকে। ৩য়তঃ মৃত্তিকাস্থিত চতুঃপার্শ্বগামী মূল দ্বারা বৃক্ষ সমূহ মৃত্তিকাকে দৃঢ়ীভূত করে। এতদ্ভিন্ন বৎসরের পর বৎসর গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থের স্তর ক্রমশঃ স্থূলতর হইতে থাকে। এই সমস্ত কারণবশতঃ মৃত্তিকা স্থানচ্যুত হইতে পারেনা, সুতরাং নদী গর্ভে পলিও পড়িতে পারেনা। ৪র্থতঃ প্রবল নদী অথবা সমুদ্রতটস্থ যে আল্লা বালি এবং মৃত্তিকা স্থানভ্রষ্ট এবং নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে বায়ুবেগে বাহিত হইয়া প্রাণী এবং উদ্ভিদ উভয়েরই অনিষ্ট সাধন করিত, তাহা অরণ্যের প্রভাবে স্বস্থানেই আবদ্ধ থাকে।

জল সেচন এবং অরণ্য সংরক্ষণ, উভয়ই এক প্রকার না হইলেও উভয়ের ভাবীফল এক প্রকার। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক;—জল-সংবাহন দ্বারা ফসল উৎপাদন এবং মনুষ্যের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। খাল দ্বারা জল সেচন প্রণালীতে আমাদের দেশে যে কতদূর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। জল সেচন সমিতির অধিবেশন কালে অনেক দেশীয় এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞব্যক্তি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, খাল ও খালের জল দ্বারা জমির উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, উর্ব্বর জমি অনুর্ব্বর হইয়াছে, দেশে ম্যালেরিয়া জন্মিয়াছে এবং দেশের জল বায়ু অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদিগের স্বকীয় পর্যবেক্ষণের ফলও তাই। সুতরাং এরূপ স্থলে বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই যে অরণ্য সংরক্ষণের পক্ষপাতী হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? ডাক্তার রিনল্ট নামক সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক 'অরণ্য উচ্ছেদ এবং অবনতি' (Deboisement et Decadence) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে অরণ্যে উপকারিতা এবং আবশ্যকতা সম্বন্ধে অসংখ্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তৎসমুদয় পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, যে মেঘখণ্ড অনাবৃত উত্তপ্ত সমতল ভূমির উপর দিয়া এক বিন্দু বারিপাত না করিয়া চলিয়া যায় তাহা পাদপ পূর্ণ অরণ্যের উপর গিয়া অকাতরে স্বীয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। অবশ্য ডাক্তার রিনল্ট অরণ্য অর্থে ক্ষুদ্র বৃক্ষ অথবা গুল্ম বিশিষ্ট জঙ্গল বলেন নাই এবং আমরাও অরণ্য অর্থে বহুল পরিমাণ শাখা পল্লব সমন্বিত বৃহৎ পাদপ সমষ্টিই বলিয়া আসিতেছি। ডাক্তার রিনল্টের অভিমত যে প্রত্যেক দেশের আয়তনের অনুপাতে উপযুক্ত পরিমাণ অরণ্য থাকা আবশ্যক। সমস্ত সুসভ্য দেশে এই উক্তির বৈজ্ঞানিক যথার্থ্যতা অনুভূত হইয়া থাকে। ইটালী এবং ফ্রান্স উভয় দেশেই আয়তনের অনুপাতে অরণ্যের পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগ; জর্ম্মাণ ২৪ ভাগ এবং রুসিয়া ৪০ ভাগ; অস্মদ্দেশে ২২.২২ ভাগ। তুলনায় বুঝিতে পারা যায় আমাদের দেশে অরণ্যের পরিমাণ উপযুক্ত না হইলেও অত্যন্ত কমও নহে। কিন্তু কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে কোন

সুবিখ্যাত ইংরাজি দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে তত্ত্বাধায়ণের অভাবে এবং অত্যধিক পরিমাণ কর্ত্তণ ও গোচারণ প্রভৃতি দ্বারা আমাদের সংরক্ষিত অরণ্য সমূহের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হইতেছে এবং বর্ত্তমান সময় হইতে উহার প্রতীকার না করিলে ভবিষ্যতে উপযুক্ত পরিমাণ অরণ্য সংরক্ষণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

আমাদের প্রায় সকল পাঠকই অবগত আছেন যে গভর্ণমেণ্টের নিকট বন-বিভাগ রহিয়াছে। যথোপযুক্ত ভাগে অরণ্য সংরক্ষণ করাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য। দেশ মধ্যস্থ অনেকগুলি বড় বড় বন গভর্ণমেণ্টের খাসে রহিয়াছে। উপযুক্ত অবস্থায় এবং যথাবিধি নিয়ম অনুসারে এই সমস্ত অরণ্য বৃক্ষ কর্ত্তন অথবা পশ্বাদি চারণ করিতে অনুমতি দেওয়া যায়। অনেক নিঃস্ব ব্যক্তি বিশেষ অনুমত্যানুসারে বন হইতে বিনা ব্যয়ে কাট সংগ্রহ অথবা পশ্বাদি চারণ করিতে পারে। এই বিধান মহৎ উদ্দেশ্যে প্রকটিত হইলেও ইহার ফল অনেক সময় অনিষ্টকর হইয়া থাকে। অবশ্য জ্বালানি কাট, নানাবিধ গৃহসজ্জার জন্য পরিপক্ক বাঁশ এবং কাট প্রভৃতি বন হইতে উপযুক্ত অথবা স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। সুতরাং এতদ্‌সমুদয়কে সঙ্গত বলিয়া ধরিতে পারা যায় এবং গভর্ণমেণ্টও ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন না, কারণ বনবিভাগের সৃজনই এই নিমিত্ত। কিন্তু এতদ্ভিন্ন এবং ইহাদের সহিত জড়িত হইয়া যে কতকগুলি কাষ্ঠাহরণার্থ অসঙ্গত দাবিদাওয়া রহিয়াছে তাহাতেই অরণ্যের বিশিষ্ট অনিষ্ট সাধন হইয়া থাকে। তৎসমুদয়কে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায় (১) যথেষ্ট এবং অসমিচীনকর্ত্তন (২)পশ্বাদি চারণ (৩) অগ্ন্যুৎপাত।

(১) যে পরিমাণ কাষ্ঠ প্রয়োজন তাহাই সাবধানে কর্ত্তন এবং গ্রহণ পূর্ব্বক লোকে যদি সন্তুষ্ট থাকিত তাহা হইলে তাদৃশ অনিষ্ঠ হইত না। কিন্তু দেখা যায় যে একটি গাছ অথবা উহার এক অংশ লইতে হইলে লোক পার্শ্বস্থিত বহু সংখ্যক নবীন বৃক্ষ মারিয়া ফেলে, ৩।৪টি বৃক্ষ কর্ত্তন করিবার পর একটি বৃক্ষ অথবা উহার এক অংশ গ্রহণ করে এবং এরূপ ভাবে বৃক্ষ কর্ত্তন করে যে, উহার গোড়া হইতে আর উত্তম রূপ চারা বাহির হয় না। অবশ্য অনেক সময় অজ্ঞানতা এবং তাচ্ছিল্য বশতঃ এই সমুদয় সংঘটিত হয়, কিন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বক বৃক্ষের অঙ্গহানি করার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। (২) পশ্বাদি চারণ দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয়। ছাগল প্রভৃতিতে সমস্ত নবীন পত্রাঙ্কুর খাইয়া ফেলে। পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখা গিয়াছে যে ১৫ হইতে ৩৫ বৎসরের বনে ছাগল চরিতে দিলে আর বৃক্ষ বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং ১৫ বৎসর অপেক্ষা অল্প দিনের জঙ্গলে পশ্বাদি চারণে পুরাতন বৃক্ষও নাশ প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন পত্র, মুকুল, নবীন শাখা সমূহ ভগ্ন করিয়াই গো,মেষ প্রভৃতি যথেষ্ট গক্ষতি করিয়া থাকে। (৩) অরণ্যে অগ্ন্যুৎপাত নিবারণের জন্য গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট নিয়মাবলী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তথাপি অনবধানত বশতঃ সময়ে সময়ে উক্ত রূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

উপরোক্ত কারণ সমূহ ব্যতীত অরণ্যের উপযুক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণের আরও কতকগুলি অন্তরায় রহিয়াছে। স্থানাভাববশতঃ আমরা তৎসমুদয় এ স্থলে বিবৃত করিতে পারিলাম না। ফলতঃ আমরা অরণ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলাম তৎসমুদয় হইতে প্রত্যেক বিবেচক ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, অরণ্যের সহিত কৃষি-কার্য্যের কি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। গ্রাম অথবা বৃহৎ জনপদসমূহে জঙ্গল থাকা যেমন বাঞ্ছনীয় নহে, লোকালয় হইতে উপযুক্ত ব্যবধানে বৃহৎ পাদপ-বিশিষ্ট অরণ্য থাকা তেমনই প্রয়োজন। যে সমস্ত স্থানের অদূরে অরণ্য বর্ত্তমান তৎসমুদয় স্থানের জল বায়ু প্রায়ই স্বাস্থ্যকর, মৃত্তিকা রসযুক্ত অথচ আবদ্ধ জল সমন্বিত নহে এবং তথায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত অল্প। আমাদের অরণ্যের ধারণা জঙ্গলের ধারণার সহিত জড়িত। তজ্জন্য আমরা অরণ্যের নামে ভয় পাইয়া থাকি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাগুল্মযুক্ত স্থান স্বাস্থ্য এবং কৃষি উভয়েরই পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। উহার উচ্ছেদ করাই শ্রেয়। কিন্তু যে অরণ্যের প্রতি মহাকবি কালিদাসের 'তমালতালী বনরাজিনীলা' প্রযুয্য হইতে পারে, তাহা বাস্তবিকই প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি, দেশের মহৎ হিতসাধক এবং সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণীয়। বিশেষতঃ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, দুর্ভিক্ষ এবং অনাবৃষ্টির যুগে একবিন্দু বারিরও সংস্থান যাহাতে হয় সেই রূপ উপায় অবলম্বন করা শ্রেয়। পলী দ্বারা কত স্থানের নদী স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, সংস্কার অভাবে কত বৃহৎ জলাশয় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, অনাবৃষ্টির এবং অতিবৃষ্টির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে; উপযুক্ত পরিমাণ অরণ্য থাকিলে এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইত না। সুতরাং অরণ্য সংরক্ষণের উপর আমাদের দৃষ্টিনিক্ষেপ করা প্রয়োজন।

উপরন্তু অরণ্য হইতে আমরা আরও উপকার পাই তাহার গণণা করা যায় না, যেমন শাল, সেগুন, শিশু, মেহগ্নি, চাঁপ প্রভৃতি গৃহসজ্জায় উপযুক্ত অনেক মূল্যবান কাষ্ঠ আমরা অরণ্য হইতে সংগ্রহ করি।

ঘর বাঁধা বেড়া দেওয়া প্রভৃতি কাজে সুঁদরী, গরাণ প্রভৃতি কাষ্ঠের নিত্য প্রয়োজন।

বাঁশ, উলু, গোলপাতা, শর, নল অরণ্য এইতেই সংগ্রহ হয়। অরণ্য না থাকিলে আমরা এত রাশি রাশি হরিতকী, আমলা বহেড়া কোথায় পাইতাম। অরণ্য আছে বলিয়া আমরা পলাশ বনে লাক্ষা চাষ করিতে পারি। তুঁত, তুঁত, কুলপাতা খাওয়াইয়া রেশম পোকা পালন করিয়া গুটি রেশম প্রস্তুত করিতে পারি। অরণ্য হইতেই আমরা কুরচী, লোধছাল, গন্ধবেনা প্রভতি অসংখ্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাই। মানুষকেও বাস করিতে হইবে এই জন্য বাসস্থান কিছু ফাকা, পরিষ্কার থাকা আবশ্যক বটে কিন্তু অদূরে অরণ্য থাকাও নিতান্ত প্রয়োজন।

ফুলের চাষ ও কুঠি

উদ্যানতত্ত্ববিদ শশিভূষণ সরকার লিখিত।

ফুল অনেক রকমের আছে—কতকগুলি ফুলকে আদর করা যায় তাহা হইতে ফলের আশায়, আর কতকগুলির ফুলের জন্যই ফুলের আদর। কোন ফুলে গন্ধ ও সৌন্দর্য্য উভয়ই আছে, গন্ধ আছে তাদৃশ সৌন্দর্য্য নাই এমন ফুলও অনেক আছে গন্ধই তাহাদের মাধুর্য্য; আবার রূপের ছটায় অতুলনীয় অথচ গন্ধহীন এমন ফুলও রাশি রাশি দেখিতে পাওয়া যায়।

শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে বিচিত্র বর্ণের নয়নানন্দকর নানা ফুলের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার কোনটিতেই গন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা আজকাল বিলাতী মরসুমী ফুলে ঘর, দুয়ার প্রাঙ্গন উদ্যান সাজাইয়া থাকি,—সেগুলি দৃশতঃ অতি মনোহর কিন্তু অধিকাংশই গন্ধহীন, ভার্বিনা, মিগ্নোনেট, ভায়ালেট প্রভৃতি কতকগুলি ফুলের কিছু কিছু গন্ধ আছে বটে কিন্তু সে গুলি আমাদের দেশের ভূঁইচাপা, দুলালচাঁপ, রজনীগন্ধ প্রভৃতির গন্ধের তুলনায় কিছুই নহে। তৃণ বিথিকার মাঝে মাঝে মরসুমী ফুলের কেয়ারি ও তাহার মনোহারীত্ব ধরাতে অপার্থিব বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু যে মরসুমের যে ফুল সেই মরসুম ফুরাইলে অর্থাৎ শীত বা বর্ষা ফুরাইলে সব ফুরাইল—সৌন্দর্য্যের স্মৃতিটুকু রাখিয়া গেল মাত্র। কিন্তু ভারতের গন্ধ পুষ্প অনেক জিনিষ কাছে রাখিয়া যায়। যে পারে ফুলকে তাহার সঙ্গ ছাড়িতে দেয় না।

বঙ্গদেশ মধ্যে, ব্যবসার জন্য, ফুলের চাষ প্রায় দেখা যায় না। সমগ্র বিশাল ভারত রাজ্য মধ্যে জৌনপুর, কনোজ, গাজিপুর, কাশ্মীর এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত গুলবর্গা ভিন্ন আর কোনও স্থানে কেবল ব্যবসা বা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ফুলের রীতিমত রক্ষা ও চাষ হয় না। ভারতবর্ষ সাধারণতঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, সুতরাং এখানে বহুবিধ প্রসূন জন্মিয়া থাকে। ভারতের অপর নাম "কুসুম কানন"। অগণ্য ফুল রাশির মধ্যে অধিকাংশ এদেশ জাত, বাকি কতকগুলি বিদেশ হইতে আনীত হইয়া এদেশ জাত ফুলের মধ্যে গণ্য করিয়া লওয়া হইয়াছে। যে সকল পুষ্প, আতর, সুগন্ধি, সুগন্ধযুক্ত জল বা আরক, তৈল অথবা অন্যবিধ পদার্থ তৈয়ার করিবার জন্য এদেশে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে গোলাপ, বেল, মল্লিকা, হেনা, জুঁই, চম্পক, সহস্রদল কমল এবং লেবু ফুল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হেণা ও গোলাপ বিদেশীয় ফুল কিন্তু এদেশে অনেক কাল হইতে এই দুই ফুল প্রচুর পরিমাণে জন্মিতেছে। গোলাপ সর্ব্বত্র সুলভ। বঙ্গদেশে হেণার প্রচলন কম, কিন্তু পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ইহা অত্যন্ত

প্রচুর। বেল এবং জুঁই যাবনিক নাম, ইহাদের সংস্কৃত নামও আছে। বসন্তকালে লেবু গাছে যে ছোট ছোট ফুল বা কোরক দৃষ্টি হয় তাহাই লেবু ফুল। চম্পক ও সহস্রদল কমল সর্ব্বত্র সুলভ নহে, এই জন্য ইহাদের আতর বা তৈল বিশেষ মূল্যবান।

উপরে যে কয়েকটা পুষ্পের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, তন্মধ্যে গোলাপের আদর সকল স্থানেই অধিক। বাস্তবিক গোলাপ কুসুম অতি রমণীয় ফুল। ইহা ছোট বড় প্রভৃতি নানা আকারে দেখা যায়, এবং নানা বর্ণেরও গোলাপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সাধারণতঃ ঈষৎ লোহিতাভঃ গোলাপই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইহার সুগন্ধ ও বর্ণ সকলের নিকট প্রশংসিত। রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত সকলে গোলাপী রংএর পক্ষপাতী। গোলাপ ফুল বিদেশীয়; সম্ভবতঃ পারস্য দেশ হইতে এই পুষ্প ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল। এই জন্য অনেক বর্ষ পর্য্যন্ত ইহা হিন্দু দেব দেবীর মন্দিরে কিম্বা পুজা বা অন্যবিধ অধ্যাত্মিক ক্রিয়ায় অব্যবহৃত ছিল, ক্রমে ক্রমে ইহা মন্দিরাভ্যন্তরে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সিরাজ ও বশোরা এই দুই নগরের গোলাপ সর্ব্বাপেক্ষা আকারে বৃহৎ এবং বর্ণে ও সুগন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মুসলমানেরা সর্ব্ব প্রথমে গোলাপ ফুল হইতে সুগন্ধ জল প্রস্তুত করিত, এই জন্য এই ফুলের নাম হইয়াছিল গুল্×আব্; পারস্য ভাষায় গুল্ অর্থে ফুল এবং আব্ অর্থে জল বুঝায়। অপভ্রংশে এই পুষ্পকে গোলাপ কহা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এদেশে গোলাপের জল এবং গোলাপের আতর যে প্রকার প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, অপর কোন ফুলের আতর সেরূপ হয় না। গোলাপ ভিন্ন এদেশে আর কোনও পুষ্পের জল ব্যবহৃত হইতে দেখি নাই। জাপান দেশের কানাংগা ফুলের জল হইতেও ভারতের গোলাপ জল অধিকতর সুশীতল, উপকারী ও প্রীতিপ্রদ। ভারতবর্ষের গাজিপুর নগর গোলাপের চাষের জন্য পৃথিবীর অনেক স্থানে প্রসিদ্ধ। তথায় রীতিমত এই ফুলের কৃষিকার্য্য, ফুল গাছের রক্ষা, ফুলের কুঠি ও কারখানা এবং জল, তৈল, আতর, আরক প্রভৃতির প্রস্তুত জন্য ব্যবসাগার আছে। গাজীপুর অঞ্চলের অসংখ্য লোক এই ফুলের চাষে ও কারখানার সাহায্যে সুখ স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়া থাকে। ফুলের কুঠি ও কারখানার পরিমাণ, বিস্তৃতি এবং অর্থোপায়ের কথা ভাবিয়া দেখিলে, কনোজ ও জৌনপুর প্রভৃতি স্থান হইতেও গাজিপুর শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বোধ হয়। কাশ্মীর রাজ্যে গোলাপের কৃষি কম নহে, কিন্তু গাজিপুরকে কাশ্মীরের লোকেরাও প্রধান বলিয়া মান্য করে। গাজীপুর নগর গঙ্গাতটে অবস্থিত, ইহা পশ্চিমোত্তর প্রদেশের একটি প্রধান জিলা। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লাইনের দিলদার নগর ষ্টেশন হইতে টারী ঘাটে গিয়া গঙ্গা পার হইলে গাজীপুরে পৌছান যায়।

গাজিপুর নগরের একটু দুরে এবং বহির্দ্দেশে গোলাপের চাষ হয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালা অব্দে প্রায় অষ্টশত বিঘা পরিমাণ ভূমিতে গোলাপের চাষ হইয়াছিল এবং প্রায় ২৮০ জন কৃষক এজন্য পরিশ্রম করিয়াছিল। গোলাপের গাছ দুই ফিট আন্তর বসাইতে হয়;

তিন ফিটে এক গজ হয়, এক গজে দুই হাত। প্রত্যেক গাছে গড়ে চারিশত পুষ্প পাওয়া যায়; ফুলের আকার ছোট, বর্ণ লোহিত; গন্ধ মনোহর এবং চিরস্থায়ী। দুঃখের বিষয়, শতবর্ষ কাল পূর্ব্বে যে প্রথায় এই চাষ হইত, এখনও ঠিক সেই প্রথায় এই ইহার চাষ হয়; উন্নতি বা উদ্ভাবন নাই। চেষ্টা করিলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যথেষ্ট উন্নতি করা যাইতে পারে, কিন্তু কুঠিওয়ালা বা কৃষকের সেদিকে দৃষ্টি নাই। মার্চ্চ হইতে এপ্রেল মাসের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফুল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষকদিগের নিজের কুঠি বা কারখানা থাকে না, তাহারা কুঠিওয়ালাদিগকে ফুল বিক্রয় করে। যে সকল স্থানে কুঠিওয়ালদিগের নিজের চাষ হয়, সেখানে কুলি (মজুর) দ্বারা আবাদ, গাছ রক্ষা এবং ফুল তোলা হইয়া থাকে। গাছ খুব বড় হয় না এবং প্রায় এক বিঘা পরিমাণ ভূমি লইয়া এক একটা ক্ষেত্র তৈয়ার করা হয়। ফুলের মূল্য প্রতি বৎসর নূতন হারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, যাহাদের দ্বারা দর নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাদের সভা বা কমিটি অথবা বৈঠকের নাম "পঞ্চায়েৎ"। বর্ত্তমান বর্ষে গাজিপুরে ৮১ টাকায় এক লক্ষ গোলাপের মূল্য স্থির হইয়াছে। কোন কোন বর্ষে পূর্ব্ববর্ত্ত বৎসরের মূল্য অপেক্ষা অধিক বা কম দর নির্দ্দিষ্ট হয়, কোন বৎসরে পূর্ব্বের ন্যায় দাম একই প্রকার থাকে। আমরা গাজিপুরে এক লক্ষ্য গোলাপ ফুলের মূল্য গত ৩৫ বৎসরের মধ্যে বিয়াল্লিশ টাকার কমে দেখি নাই; ইহা নিতান্ত সুলভ দর। কুঠিতে ফুল সমূহ আনীত হইলে তাহা গুদাম ঘরে জমা করা হয়, তদনন্তর আতর ও গোলাপ জল প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গাজিপুরের ফুলের কুঠিওয়ালবর্গের মধ্যে লালা ডোণ্ডারাম সর্ব্বপেক্ষা ধনী, প্রসিদ্ধ ও বিস্তৃত কারখানার অধিকারী। ইং ১৮৮৩ অব্দে কলিকাতা প্রদর্শনী হইতে এই কুঠিওয়াল পুরস্কারের পদক ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ফুল সমূহকে শুকাইয়া লইয়া স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিতে হয়, তাহার পরে উৎকৃষ্ট কৃষ্ণতিল ঐ স্তরের উপরে, মধ্যে এবং নিম্নে প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। খুব ভাল সুগন্ধ তৈলের প্রয়োজন হইলে, প্রত্যেক পুষ্প স্তরের উপরে ও নীচে কৃষ্ণ তৈল ছড়াইয়া দিতে হয়। তাহার পরে প্রথানুসারে তৈল নিষ্পীষণ করিয়া লইতে হইবে। অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধ ও মনোরম তৈলের মূল্য প্রতিসের দশ টাকা। এক সহস্র মণ কৃষ্ণ তিলে গড়ে ৪৬২ মণ সুগন্ধ তৈল পাওয়া যায়। ডোণ্ডারামের কুঠিতে এক বৎসরে প্রায় পঞ্চশত মণ তৈল প্রস্তুত হয়; গাজিপুরে আর কাহারও কারখানায় গড়ে ১২০ মণের অধিক তৈল তৈয়ার হয় না। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে এবং ভারতের অন্যান্য অংশে গোলাপের তৈল বহু মূল্যবান বলিয়া, বেল ও চামেলীর তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। তৈল প্রস্তুতের সময় যত গোলাপের প্রয়োজন হয়, বেলা বা চামেলি ফুলের তত প্রয়োজন হয় না, এই জন্য এই দুই কুসুমের তৈলের মূল্য তুলনায় কম। গোলাপ ফুলের দাম বেলী এবং

তেলে ফুলের পরিমাণও অধিক লাগে। তদ্ব্যতীত গোলাপের ফুলের আরক, তৈলের সহিত অতি কষ্টে ও বিলম্বে মিশ্রিত হয়।

কুঠির প্রাঙ্গণে (উঠানে) গোলাপ জল তৈয়ার হইয়া থাকে। বক যন্ত্রের নিম্নে "হাপর" সংযুক্ত দেখা যায়। চোয়াইবার প্রথানুসারে নির্য্যাস নিঃসৃত হয়, যদি নির্য্যাসে জল মিশ্রিত না করা যায় তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত তীব্র গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে; এক তোলা নির্য্যাসের সহিত পাকা তিন পোয়া জল মিলাইয়া দিলে ভাল গোলাপ জল তৈয়ার হইতে পারে; অর্দ্ধ সের জল মিলাইলে উৎকৃষ্ট গোলাপ জল হয়। এক বোতল খুব উৎকৃষ্ট গোলাপ জলের দাম গড়ে আট টাকা। চারি সহস্র পুষ্পে এক বোতল উৎকৃষ্টতম গোলাপ নির্য্যাস প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবম্প্রকার এক বোতল নির্য্যাসে ২৪ বোতল গোলাপ জল তৈয়ার হয়; এই প্রকারের ২৪ বোতলের দাম দুই শত টাকা। বর্ত্তমান বাঙ্গালা বর্ষে গাজিপুরে প্রায় ৭৫ লক্ষ ফুল খরচ করিয়া পঞ্চ সহস্র বোতল গোলাপ জল তৈয়ার করা হইয়াছিল। বক যন্ত্র ব্যবহার করিয়া চোয়াইবার সময় একেবারে সমুদয় ফুল একত্রে না দিয়া ক্রমে ক্রমে দেওয়া ভাল। জলের গুণ যেরূপ করে। প্রয়োজন হয়, ফুল ও তৎপরিমাণে দিতে হয়। সাধারণ গোলাপ জলের এক বাতলের মূল্য আট আনা। বকযন্ত্রে তিনবার চোয়াইয়া লইলে উৎকৃষ্টতম গোলাপ জল প্রস্তুত হইয়া থাকে। গত বৎসর ডোগুারামের কারখানা হইতে ৬০ লক্ষ ফুল এবং দশ হাজার বোতল গোলাপ জল, ভারতবর্ষের বহির্দ্দেশে রপ্তানী হইয়াছিল।

আতর প্রস্তুত করার প্রথা অতি কঠিন *। চন্দনের তৈল না হইলে ভাল আতর তৈয়ার হয় না। "ভাপ্কা" প্রথাবলম্বন করিয়া আতর প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমে সাধারণতঃ ৫ সহস্র ফুল চড়াইতে হয় তদনন্তর দশ হাজার তাহার পরে পঞ্চদশ সহস্র, এইরূপ এক লক্ষ ফুল ক্রমে ক্রমে দিতে হইবে। জলের উপরে ফুলের তৈল ভাসে; অতি যত্নে ও সাবধানতার সহিত পেয়ালায় এই তৈলবৎ পদার্থ ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইতে হয়। কিয়ৎক্ষণ বায়ুতে রাখিয়া দিলে এই তৈলবৎ পদার্থ ঘন এবং মলিন বর্ণ হইয়া যায়। মলিন পদার্থ ক্রমে ক্রমে পেয়ালায় জমিয়া যায়; অনেকক্ষণ বায়ুতে রাখিয়া দিলে ঐ তৈলবৎ পদার্থ নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হইয়া উঠে; ইহাকে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিয়া দিতে হইবে; ইহাকে উঠাইবাব সময় দেখিতে হয় যেন ইহা পাত্রস্থ মলিনতার সহিত মিশ্রিত না হয়। এই তৈলবৎ পদার্থের নাম ঈতর্ (আতর)। উৎকৃষ্ট আতরের এক তোলার মূল্য ২৫৲ টাকা। যে সকল আতরে চন্দনতৈলের ব্যবহার হয় না, যাহা কেবল বিশুদ্ধ ফুলের সারাংশ (Pure essence) মাত্র, তাহা উৎকৃষ্টতম আতর; ইহার এক

---

* আতর শব্দ অপভ্রংশ। ইহা পারস্য শব্দ, ইহার প্রকৃত নাম ঈতর্। হিন্দুরা অন্যায় করিয়া ইহাকে আতর কহে।—লেখক।

তোলার মূল্য একশত টাকা হইতে ১৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কাপড়ে মাখাইলে বহু দিবস পর্য্যন্ত গন্ধ থাকিয়া যায়; গৃহে রাখিলে সমুদয় গৃহ সুগন্ধে আমোদিত হইয়া থাকে। এরূপ আতরের গন্ধ, মৃগনাভির গন্ধ হইতে কম নয়। ধনবান লোক ভিন্ন এবম্বিধ আতরের ব্যবহার অপরে করিতে পারেন না। এই জন্য এই প্রকারের আতর, কম পরিমাণে তৈয়ার করা হইয়া থাকে। যাহা হউক, ভারতবর্ষ বাস্তবিক ফুলের দেশ, এখানে ফুলের কৃপায় অনেকের অন্ন সংস্থান হয়, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নতি করিবার চেষ্টা করিলে কালে এবম্বিধ কারখানা বিশেষ লাভজনক হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়।—

মৎস্য-প্রসঙ্গ

বাঙলার মত স্থান— যে স্থান নদ, নদী, খাল, বিলে পূর্ণ সেখানেও দিন দিন মাছের অভাব অনুভূত হইতেছে। পূর্ব্বকালে গঙ্গা, পদ্মা, দামোদর, রূপনারায়ণ, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ নদী ছাপাইয়া প্রচুর জলরাশি খাল, বিল, সায়ের, (সাগর=বৃহয়াতন জলাশয়) দীঘি, পুকুর, ঝিল, নালা পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিত এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি মৎস্যপূর্ণ হইয়া উঠিত। এত প্রচুর মাছ জন্মিত যে লোকে খাইয়া, বিলাইয়া, বিক্রয় করিয়া ফুরাইতে পারিত না। এমন কি সময় সময় বড় বড় জলাশয়ের মাছ ভাসিয়া উঠিয়া খাবি খাইতে ও মরিবার উপক্রম হইতে দেখা যাইত। শত শত নরনারী ঐ সকল মাছ ধরিবার জন্য মহোল্লাসে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। কোন জলাশয়ে অত্যধিক মাছ জন্মিলে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। বর্ষাকালে মৎস্য ব্যবসায়ী ধীবরগণের এক মুহূর্ত্তও ফুরসৎ থাকিত না। এতদ্ব্যতীত ইতর ভদ্র অসংখ্য নরনারীকে সকাল সন্ধ্যা খাল, বিল, পুকুর, ডোবা, সামান্য সামান্য জল স্রোত, পয়োনালার ধারে মাছ ধরিতে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যাইত।

মাছ ধরার এ চিত্র, এ উল্লাস এখন অতি অল্প মাত্রই দেখা যায়। বাঙলার বহু খাল, বিল, জলস্রোত মজিয়া আসিয়াছে; মোহনাগুলি, নদীতে জল প্রবেশের পথগুলি রুদ্ধ-প্রায়। বাঙলার নদ-নদীর মাছের সংখ্যাও বোধ হয় কমিয়া আসিয়াছে। ডায়মণ্ড-হারবারে নদীর মোহনায়, টেংরা, গেঁয়োখালীর গাঙ্গে, মাতলার গাঙ্গে এখন আর তাদৃশ ভেট্‌কি, ভাঙ্গন, পার্শে, মোচাচিঙড়ির আমদানী কমই দেখা যায়। উলুবেড়ে, বজবজ, মেটে বুরুজে ইলিশ মাছের আমদানী সে কালের মত কৈ?
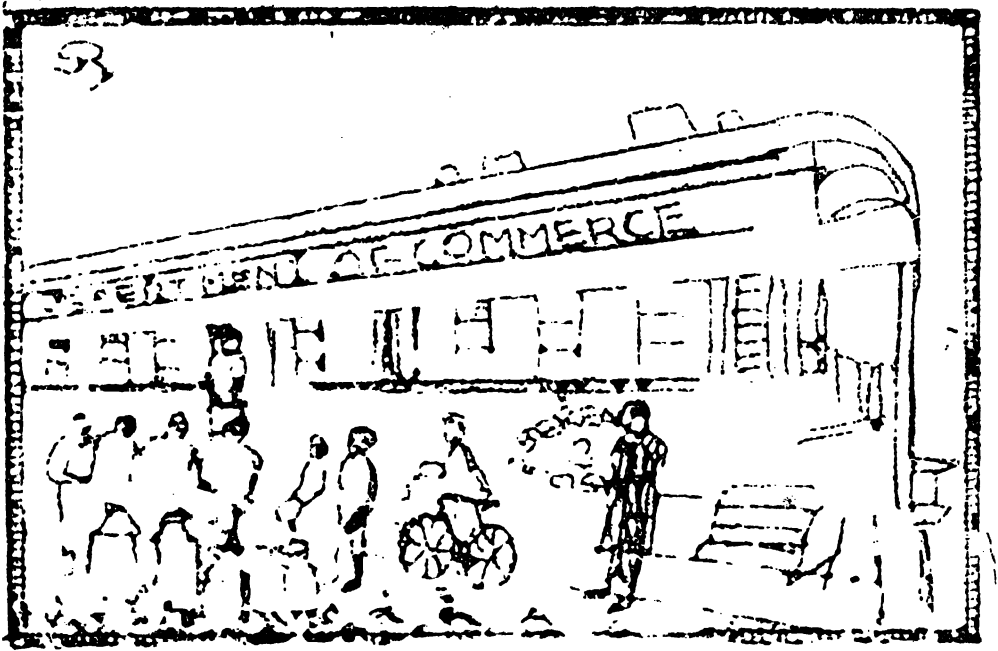
সরকারি পোনা মাছের গাড়ী গিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহার মাছের আবশ্যক তাহারা মাছ লইতে আসিয়াছে। তাহারা হাঁড়ি করিয়া মাছ লইয়া যায় না। ১০ গ্যালনের টীন পূর্ণ করিয়া তাহারা মাছ বহিয়া লইয়া যায়।

আমেরিকার জলাশয়ে মাছ ছাড়িবার পদ্ধতি

সরকারী লোকে সাধারণ জলাশয়ে মাছ ছাড়িতেছে। মাছ ছাড়িবার একটু কৌশল আছে। হাতায় জল তুলিয়া টিনে ঢালা হইতেছে জল যেমন উপছাইয়া পড়িতেছে তাহার সঙ্গে পোনাগুলি জলাশয়ে

সরকার হইতে মৎস্য রক্ষার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সেটা যথোপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। সরকারী মৎস্য বিভাগ গঙ্গা ও দামোদরের পোনা ধরিয়া আনিয়া বড় বড় চৌবাচ্চা বা জলাধারে জিয়াইয়া ঐ সকল পোনা গৃহস্থ ও মাছ ব্যবসায়ীগণকে বিক্রয় করিতেছেন। ইহা'ত নূতন কিছুই নহে। হাওড়া, আমতা লাইনের আমতা ও চাঁপাডাঙ্গায় পোনা বিক্রয়ের মরসুমের সময় খুব বড় হাট বসে, গঙ্গার পোনা কালনা, নৈহাটী, কলিকাতায় প্রচুর আমদানী হয়। আরও অনেকানেক ছোট ছোট পোনা আমদানীর স্থান আছে। এই সমুদয় স্থান হইতে হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া, ২৪ পরগণার বহুতর স্থানে পোনা লইয়া যাইয়া মিঠান জলে মাছের আবাদ করা হয়। সরকার হইতে মাছের আবাদের নূতন সুবিধা, সুযোগ কি করা হইল আমরা বুঝিতে পারি না। দূরতর স্থানে পোনা লইয়া যাইতে হইলে রেলে বা নৌকায় লইয়া যাইতে হয়। নৌকায় পোনা লইয়া যাওয়া সুবিধা, কিন্তু তাহাতে বিলম্ব হয়, ভাড়া অনেক পড়ে এবং সর্ব্বত্র নৌকার পথ নাই। রেলে পোনা শীঘ্র লইয়া যাওয়া যায় বটে কিন্তু রেলের ভাড়া আরও অধিক। এ দেশে ভারে ভারে মাছ লইয়া যাওয়ার বিধি প্রচলিত। ইহাতে সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধা অনেক। জলে চালা না পাইলে পোনা মরিয়া উঠে—সর্ব্বদা জলে চালা দেওয়া ব্যাপারটা বড় সহজ নহে, আবার মাটির হাড়ি হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাইতেও দেখা যায়, তাহাতে লোকসান সমূহ। রেল কোম্পানি কেরোসিন তৈলের ট্যাঙ্ক লইয়া গিয়া রেল পথের ধারে ধারে ডিপোতে তৈল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, মাছ লইয়া যাওয়ার ঐ প্রকার ব্যবস্থা অসম্ভব নহে এবং আবাদের জন্য মাছের পোনা লইয়া যাওয়ার ও খাইবার মাছ বহনাবহনের ভাড়া কমাইয়া দিবার ব্যবস্থা সরকার হইত করিলে বস্তুতঃ দেশের বড় একটা কল্যাণ করা হয়।

এইত গেল মিঠান জলের পোনা মাছের—রুই, কাতলা, মিরগেল, বাটা প্রভৃতি মাছের কথা। নোনা জলে মাছের কি উপায় হইবে? অনেকেই অনুমান করেন যে নদীতে বহুসংখ্যক জাহাজ ও ষ্টীমার যাতায়াতের দরুণ নদীর মাছের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে—মাছের পোনা ও ডিম নষ্ট হইতেছে, তাহাদের অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে, তাহাদের উপযুক্ত বংশ বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতেছে। মৎস্যকুলকে এই আপদ হইতে রক্ষা করার উপায় কি?

বঙ্গোপসাগরের মত এমন অনতি গভীর বিস্তীর্ণ জলরাশি থাকিতেও আমরা সামুদ্রিক মৎস্যের আমদানী অল্পই দেখিতে পাই। দুধ ও মাছ বাঙলা দেশের প্রধান খাদ্য। বাঙালী ক্রমশঃ এই দুইটি হইতেই বঞ্চিত হইতেছে। সরকার হইতে মৎস্য সম্বন্ধীয় কোন ব্যবস্থা না হইলে আর উপায়ন্তর নাই।

এমেরিকার মৎস্য-বিভাগ এ বিষয়ে কি প্রকার অসাধ্য সাধন করিতেছেন, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কাতলা মাছের মত আকৃতি বিশিষ্ট এক প্রকার

মাছ আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে ৩০০ হইতে ৬০০ ফিট গভীর জলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। সে গুলি ওজনে ৬।৭ সেরের অধিক হইত না। স্থানীয় লোকের ঐ মৎস্য ভক্ষণের বড় একটা আগ্রহ দেখা যাইত না। নানা প্রকার তদ্বির করিয়া মৎস্য-বিভাগ উহার গড় ওজন ২০ সের পর্য্যন্ত করিতে পারিয়াছেন এবং উহা এক্ষণে স্থানীয় অধিবাসীগণের প্রধান ভক্ষ্য হইয়াছে। এমেরিকার মৎস্য-বিভাগ সর্ব্বদা আলোচনা করিতেছেন যে কি প্রকারে মাছের বংশ বৃদ্ধি করা যায়, কি প্রকারে তাহাদের উপযুক্ত আহার প্রদান করা যায়, এক কথায় কি উপায়ে মৎস্য কুলের উন্নতি হয়।

শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হইবে যে ১৯১৬ সালে মৎস্য বিভাগ সমুদ্র উপকূল ও অন্যান্য নদনদী হইতে মাছের পোনা সংগ্রহ করিয়া নানা স্থানে গৃহস্থ ও ব্যবসায়ীকে বিতরণ করিয়াছেন। মাছের আবাদের উন্নতির জন্য ব্যবসায়ীগণকে কোন্ কালে কোন্ জাতীয় মাছের চাষ করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিতেছেন। ডিম ফুটাইবার স্বাভাবিক জলাশয় গুলির সংস্কার করিয়া লওয়া হইয়াছে—কৃত্রিম জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে—এইরূপ জলাশয়ের সংখ্যা লক্ষাধিক। এই ব্যবস্থার হেতু সমুদ্র ও নদনদী হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে নানা জাতীয় মাছের আর কোন অভাব নাই।

ডিম ফুটাইবার জন্য যে বিশিষ্ট জলাধার আছে তথা হইতে পোনা বিতরণের ব্যবস্থা অতি সুন্দর। এই জন্য ট্যাঙ্কযুক্ত ৬ খানা রেল গাড়ী নিযুক্ত আছে। এই গাড়ীগুলি যাত্রী ট্রেনের সহিত যুড়িয়া দেওয়া হয়। এই কয় খানা গাড়ী ৮লক্ষ মাইল রেলপথে ঘুরিয়া বেড়ায়। নিউইয়র্ক সহরে মৎস্য-বিভাগের প্রধান কেন্দ্র। ১৯১৬সালে মৎস্য-বিভাগের কার্য্য-তৎপরতা এত অধিক দেখা গিয়াছিল যে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। এক্ষণে এখানে শত শত ব্যবসায়ী ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং মৎস্য-বিভাগের অভিপ্সিত অধিকাংশ কাজ উক্ত ব্যবসায়ীগণ দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে।

মৎস্য বিভাগের কার্য্যতৎপরতার আর একটু পরিচয় দিলে কথাটা আরও সহজে বুঝা যাইবে। এক সময় আটলাণ্টিক উপকূলের মাছ ব্যবসায়ীগণ ছোট জাতীয় হাঙ্গরের (dog fishes) উৎপাতে বিব্রত হইয়াছিল। ঐ সকল দুষ্ট গ্রাহগণকে নষ্ট করিবার জন্য মৎস্য-বিভাগ উদ্যত হইলেন। এইরূপে ঐ সকল প্রাণী হত্যা করিয়া মৎস্য কূল রক্ষা করার সঙ্গে একটা লাভের ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। এই জন্তুর তৈল, জিলেটীন, চামড়া হইতে বিলক্ষণ লাভবান হইতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ স্থানীয় অধিবাসীবর্গকে তাহাদের মাংস খাওয়াইতে অভ্যস্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাও অনতিকাল মধ্যে একটি খাদ্য মধ্যে আদৃত হইতে আরম্ভ হইল। মৎস্য বিভাগ (Fish Bureau) আরও একটি ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমাদের দেশে যেমন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে শুঁটকি মাছ (আগুনের উত্তাপে ও ধোঁয়ায়

শুকতরা) ও হাঁড়িভরা নোনা ইলিস্ ইতস্তত চালান হয় তেমনি এমেরিকায় টীনে ভরা মাছ নানাস্থানে চালান হইয়া থাকে। এই ব্যবসা দ্বারা একটি নাইট্রোজেন প্রধান খাদ্য (Proteid Food) বাজারে সুলভ হইয়াছে। এমেরিকার বাজারে উহার এক পাউণ্ড বা আধসেরের মূল্য টীন সমেত ।• বা দশ আনা মাত্র।

আসামে ব্রহ্মপুত্র নদে কয়েক জাতীয় খুব বড় মাছ পাওয়া যায়। এখানে যে রকম কাত্‌লা মাছ মিলে তত বড় কাত্‌লা অন্যত্র হয় না। সুবৃহৎ চিতল ও মহাশোল মাছ আসামের এই নদে পাওয়া যায়। এই সকল সুবৃহৎ ও সুস্বাদু মাছ বরফে সংরক্ষিত হইয়া নানাস্থানে প্রেরিত হইতে পারে কিন্তু বরফ এখানে মিলে না। এমতাবস্থায় ঐ সকল মাছ টীন বন্ধ করিয়া পাঠাইলে ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা হয়।

এই মৎস্য-বিভাগ কেবল মাছধরিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না—ঝিনুকের বোতামের কার্য্য আরম্ভ হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে যুক্তরাজ্যে ঝিনুকের বোতাম বিদেশ হইতে আমদানী হইত। যেদিন হইতে তাঁহারা মিসিসিপি নদীতে ও অন্যান্য জলাশয়ে ঝিনুকের সন্ধান পাইলেন সেই সময় হইতে উহা জালদ্বারা সংগ্রহ হইতে লাগিল—বোতামের কারখানা বসিয়া গেল—সহস্র সহস্র নরনারী ও বালক বালিকা ঐ কারখানার কাজে লাগিয়া গেলেন। এখন ঐ সকল কারখানা হইতে কোটী কোটী টাকা আয় হইতেছে।

এমেরিকার দূরদেশে খাইবার মাছ পাঠাইবার জন্য ঠাণ্ডা গাড়ীর (Refrigarator car) ব্যবস্থা আছে। মার্কিণ মুল্লুকে রেল বা ষ্টীমার কোম্পানিসমূহ দূরদেশে মাছ, মাংস ফল বা সব্জী বহনাবহনের জন্য ঠাণ্ডা ঘর বা বরফ ঘরের ব্যবস্থা করেন। পচনশীল দ্রব্যাদি দূরতর স্থানে অবিকৃত অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিবার ভার তাঁহারাই লইয়া থাকেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা যে অধিক ভাড়া দাবী করেন তাহা জিনিষের মূল্য হিসাবে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। মৎস্য, মাংস বাক্সে প্যাক করিয়াও পাঠান হয়। বাক্সে বরফের কুচি দিয়া প্যাক করা হইয়া থাকে। বাক্সগুলি দূরতর স্থানে ৫।৬ দিনের রাস্তায় পাঠাইতে হইলে বরফ গলিয়া যায় আবার বরফ দিবার আবশ্যক হয়। রেল কোম্পানী পথে মাঝে মাঝে বরফ কুচীর অভাব পূরণ করিয়া দিয়া থাকেন।

গোয়ালনন্দ, সারাঘাট প্রভৃতি অনেক স্থান হইতে বরফ দিয়া প্যাক করিয়া কলিকাতার বাজারে মাছ আসিতেছে। এই বাক্সগুলি নানা আকারের এবং আমার মনে হয় যে ইহাতে মাছ প্যাকের সুবিধা হয় না। এমেরিকায় মাছ মাংস পাঠাইবার বাকসগুলি অধিক উপযোগী বলিয়া আমার মনে হয়। উহার মাপ—৪২" × ২০" × ১২"। নীচে উপর বরফ কুচী দিয়া প্যাক করা থাকে, মাঝে মাছ সাজান হয়।

মার্কিণ ফিস্-বুরো কেবল মাছ জন্মাইয়া এবং মাছ বিতরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। তাহারা মাছের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। মাছের জন্য নাইট্রোজেন প্রধান খাদ্য, পটাস প্রধান খাদ্য যোগাইবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত।

অনেকানেক জলজ উদ্ভিদ লইয়া তাঁহারা পরীক্ষা করিতেছেন। আমাদের দেশে আমরা দেখিয়াছি যে ১ বিঘা জলকরে ১ মণ শরিষার খৈল ছড়াইতে পারিলে সে জলাশয়ের মাছ বেশ বাড়িতে থাকে। ইহা নাইট্রোজেন প্রধান খাদ্য। পাটা সেওলা, অন্ত সেওলা, ঝাঁজি—ইহাতে পটাসের মাত্রা অধিক। এই সকল জলজ উদ্ভিদ মৎস্যগণের উপাদেয় আহার। পানা, কল্‌মি, কাঁচড়া দামের শিকড় খাইতেও ইহারা খুব ভালবাসে। গুড়ি পানা, ছোট চারা পোনার ভাল আহার। কোন জলাশয়ে চারা পোনা ছাড়িয়া তাহাতে ১।২ দিন অন্তর দুই এক ঝুড়ি গুঁড়ি পানা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় সেগুলি চারা মাছে অবিলম্বে খাইয়া ফেলে।

মাছের দ্বারা জাহাজ ধ্বংস

ভারতীয় কৃষি সমিতি সম্প্রতি ডায়মণ্ড হারবারের দক্ষিণে টেঙ্গরা হাটের নিকট একটি কৃষিক্ষেত্র খুলিতেছেন। উক্ত ক্ষেত্রের সন্নিকটে একটি খালে এক প্রকার মাছের একটি শুণ্ড পাওয়া গিয়াছে। উহা ১২ হাত লম্বা। বোধহয় আরও লম্বা ছিল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উহার আকৃতি করাতের মত। উহাদ্বারা সচ্ছন্দে নৌকার বা জাহাজের তলা বিঁধিয়া ফেলা যায়। হিন্দুস্থান পত্রিকা এই রকম একপ্রকার মৎস্যের খবর দিতেছেন, নাম কটল্ মৎস্য। আমাদের বোধ হয় ইহাও কট্‌ল জাতীয় মৎস্যের শুঁড়। আমরা সাধারণের দেখিবার জন্য ঐ মাছের শুঁড় কৃষক অফিসে আনাইয়া রাখিব।

বছরখানেক আগে আমেরিকার 'সাইক্লপ্‌স্‌' নামে একখানি জাহাজ ২৯৫ জন লোক সমেত মহাসাগরের মধ্যে গিয়া আর ফিরিয়া আসে নাই। সে সময়ে এই রহস্য-পূর্ণ ঘটনা লইয়া পৃথিবীময় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সে জাহাজের পরিণাম কি হইল, আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহা বলিতে পারে নাই। সম্প্রতি সকলে সন্দেহ করিতেছেন যে, সমুদ্রের কাট্‌ল মাছই (Cuttle fish) এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। কাট্‌লমাছ ৯ হইতে ১৮ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়,—তাহাদের যে শুঁয়া বা হাত থাকে, তাহার প্রত্যেকটি বেড়ে হয় এক থেকে দুই ফুট এবং লম্বায় হয় বিশ হইতে ত্রিশ ফুট। তাহাদের শক্তিও এত বেশী যে, অনেক সময়ে এই শুঁয়ার দ্বারা জাহাজের খোল জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া সমস্ত জাহাজ খানাকে তাহারা দেশলাইয়ের বাক্সের মত সহজেই চিরিয়া ফেলিতে পারে। খুব সম্ভব, সাইক্লপ্সের হতভাগ্য যাত্রীরা এই কাট্‌ল্ মৎস্যের উদর-গহ্বরে গমন করিয়াছেন।

ভাদ্র, ১৩২৬ সাল

কুটির শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

কুটির শিল্পই ভারতের বিশেষত্ব এবং এই কুটির শিল্পের জন্য ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কি উপায়ে এই শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে হইবে ইহাই বর্ত্তমান সমস্যা।

শত শত ক্রোশ ব্যাপিয়া আমাদের এ ভারতভূমি, ইহার লোকসংখ্যাও অসংখ্য। এই বিশাল ভারতের সর্ব্বত্র এই বিপুল জনসংখ্য প্রক্ষিপ্ত ভাবে বাস করে। এরূপ অবস্থায় কুটির শিল্পই ভারতের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারে।

অনেকে ভারতে ইউরোপীয় ধরণের কলকারখানার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেন। তাঁহারা বর্ত্তমান জগতের ধূমোদগীরণকারী কলকারখানা এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত। তাঁহাদের ধারণা অধুনা, বাঁচিতে হইলে এবং আর্থিক উন্নতি সাধন করিয়া অন্যান্য ব্যবসায় বহুল দেশের যথা জাপান জার্ম্মাণী ইত্যাদি, সমকক্ষ হইতে হইলে ভারতে বড় বড় চিমনি সংযুক্ত কল স্থাপন করিতে হইবে। অবশ্য কতক পরিমাণে এরূপ শিল্পের উন্নতি আমাদের দেশে সম্ভব এবং তাহা যে বিশেষ আবশ্যক সে বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। কিন্তু এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আমাদের অনেক দিক ভাবিয়া চলিতে হইবে। কোন্ স্থানে কি ভাবে চলিতে হইবে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। জাপানের অবস্থা সম্বন্ধে ভাবিলে এ বিষয়ে আমাদের অনেক শিখিবার আছে।

এই কলকারখানা জাপানে শ্রমজীবির জীবন কিরূপ বিষাদময় করিয়াছে তাহার চিত্র আমরা অধ্যাপক কুওয়াদার (Professor Kuwada) লিখিত এই বিবরণ পাঠে অবগত হইতে পারি। সেখানে শ্রমজীবি সমস্যা বাস্তবিকই ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। কুঠি শিল্পে যে সকল লোক নিযুক্ত হয় তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, হাজার করা ৮ জন কার্য্যাবস্থায় যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করে এবং শতকরা ৩০ জন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর এই রোগে কালের করালগ্রাসে পতিত হয়। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষ রোগ শোক, ব্যাধি এবং অকাল মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র। আর ভারতে রোগ, শোক ব্যাধি বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করা সমীচীন নহে। বাস্তবিকই যেদিন ভারতবর্ষ তাহার এই প্রাচ্যদেশীয় প্রতিবেশীর অনুরূপ কুঠি শিল্পের প্রবর্ত্তন করিবে সেদিন নিশ্চিতই ভারতের দুর্ভাগ্যের দিন বলিয়া গণ্য হইবে।

এ সব কথা ছাড়িয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এদেশে বড়বড় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক লাভজনক ব্যবসায় চলিতে পারে তথাপি কুটির শিল্পের আবাস ভূমি এ ভারতবর্ষ এরূপ শিল্প কখনই একেবারে ত্যাগ করিতে পারিবে না। এবং মিষ্টার চ্যাটারটনের (Chatterton) নিরূপিত প্রমাণ অনুসারে এরূপ শিল্পে দেশের উন্নতিও অনিবার্য্য। এরূপ শিল্পের বিনাশ কিছুতেই হইতে পারে না। কারণ এ প্রকার গৃহশিল্প ভারতের অস্থিমজ্জাগত।

যতপ্রকার উপায়ে কুটির শিল্পের সমধিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সহযোগিতা (Co-operation)। দেশের রাজশক্তি অবশ্য নানা উপায়ে পল্লীশিল্পের উন্নতি সাধনে সমর্থ। এরূপ শিল্পের উন্নতির পথরোধী বাধাপ্রতিবন্ধক কতকপরিমাণে দূরীভূত করিতে পারে, কতকগুলি বিশেষ অধিকার প্রদান করিতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শিক্ষা দিতে পারে—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে দেশের গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতে পারে না সহযোগিতা দ্বারা তাহাও সম্ভব। আমাদের চতুর্দ্দিকে আজকাল আমরা সহযোগিতার উপকারিতা সম্বন্ধে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। শৃঙ্খলা গঠন কার্য্যে, সার্ব্বজনিক ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা নির্ণয় বিষয়ে, এবং ব্যবসায় বিষয়ক নিয়মানুসারে অর্থ সরবরাহ করিতে এবং যাহাদিগকে অর্থ যোগান হয় তাহাদিগের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করিতে কেবলমাত্র সহযোগিতাই সমর্থ। ইউরোপের ব্যবসায় ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা এ সকল তথ্য সুন্দররূপেই জানিতে পারি।

সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে ভারতবর্ষে পুরুষপরম্পরাক্রমে লব্ধ শিল্প-নৈপুণ্য সাহায্যে বহুপরিমাণে ভারতীয় রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এমন কতকগুলি জিনিষ এখানে তৈয়ারি হয় যাহা সর্ব্বসাধারণের রুচিকর—যেমন, কতকগুলি রূপার পাত্র খেলানা ইত্যাদি। কিন্তু

এরূপে চলিলে কখনও কোনও ব্যবসায় উন্নতি হইতে পারে না। এমন সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করিতে হইবে যাহা নিজের দেশে ছাড়া বিদেশেও আদৃত হইতে পারে। অন্য দেশে যাহাতে সে সব পণ্যদ্রব্য সহজে বিক্রয় হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করা উচিত। দেশে প্রভূত ধন সমাগম করিতে হইলে বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজন। বিদেশের অর্থ স্বদেশে না আসিলে কখনও কোন দেশ অর্থশালী হইতে পারে না। যে সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রতিবৎসরই ভারত হইতে বহির্গত হইয়া যায় তাহার স্রোত কতক পরিমাণে এদেশের দিকে ফিরাইতে হইলে আমাদের উল্লিখিত পন্থাগুলি অনুসরণ করিতে হইবে। জাপানীরা বহুদিন হইতে এ সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তলাইয়া দেখিয়াছে এবং নিজেদের স্বভাব পরিচায়ক তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাহায্যে ইহা কাজে লাগাইয়াছে। লণ্ডনে যে কোনও বড় গুদামে যাইলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে সেখানে এক একটি করিয়া 'জাপানী দ্রব্যালয়' বলিয়া বিশেষ বিভাগ আছে। সেখানে নানারকমের জাপানী জিনিষ পাওয়া যায়। সবই ঐ দেশের দক্ষ কারিকরদের হাতে প্রস্তুত। সব গুলিই লোকের রুচি অনুযায়ী এবং সেইজন্য খুব সহজেই বিক্রয় হয়।

দেশের বড়ই শুভলক্ষণ যে আজকাল পল্লীশিল্পের প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বিশেষতঃ বোম্বাই প্রদেশে ও বঙ্গদেশে দেশের নেতৃবৃন্দ যে কয়েকটি স্বদেশী কো-অপারেটিভ্ ষ্টোরস্ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহাদ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন অনিবার্য্য।

দেশের পল্লী শিল্প মাত্রেই ইহার তত্ত্বাবধানে আসিতে পারে। ইহা দ্বারা দেশের সমস্ত শিল্পের উন্নতি সুনিশ্চিত। কাশ্মীর, পঞ্জাব ও বহরমপুরের রেশম, বোম্বাই ও নাগপুরের তসর ও মলমল, ঢাকাই ও বেনারসী কাপড় এখনও অতুলনীয়। দেশের এই সব পল্লীজাত দ্রব্যসমূহের একস্থানে সমাবেশ এবং কি উপায়ে তাহা সাধারণের মধ্যে আদৃত এবং সহজে বিক্রয় হইতে পারে ইহাই স্বদেশী সমবায়ের প্রধান লক্ষ্য।

বাঙ্গালার পল্লীশিল্প এখনও সজীব আছে। শিল্পী পুরুষানুক্রমে একই শিল্পে আত্মনিয়োগ করায় সেই শিল্পে তাহার নৈপুণ্যলাভ তাহার পক্ষে আজন্ম সংস্কার হইয়া দাঁড়ায়। দেশ ও কালোপযোগী করিয়া নুতন পল্লীশিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে বাঙ্গলার আবার সুদিন আসিবেই আসিবে। রেশমী ও সুতার কাপড়ই পল্লীশিল্পের মধ্যে প্রধান। পূর্ব্বে বাঙ্গলার রেশমী ও সুতী কাপড় যে বিদেশে রপ্তানী হইত তাহার এখনও যথেষ্ট প্রমাণ আছে—"মালদহের কাপড় ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে পারস্য উপসাগরের পথে রুসিয়ায় রপ্তানী হইয়াছিল। মালদহের বণিক সেখ ভিক সে মাল চালান দিয়াছিল।" পিত্তল, শাঁখা, শৃঙ্গের পণ্য, শঙ্খের কাজ, ঝিনুকের বোতাম, পাটের সুতার চট, বেতের বাক্স, বেতের পেটারা, ছুরী, কাঁচি প্রভৃতি লোহার অস্ত্রাদি মেদিনীপুরের মসলন্দ এখনও বিশেষ আদৃত। শান্তিপুরের মিহিধুতি, ফরাসডাঙ্গার কাঁচি কাপড়, জঙ্গীপুরের কম্বল, রংপুরের সতরঞ্চী, এখনও প্রসিদ্ধ।

সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবায়নীতিতে কাজ করিলে এই সব কুটির শিল্পের আবার প্রতিষ্ঠা হইবে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, দেশের লোকে আবার দুবেলা দুমুঠা খাইতে পারিবে, বাঙ্গলা আবার সোনার বাঙ্গলায় পরিণত হইবে।

মূলা

ইহা শর্ষপ জাতীয় উদ্ভিদ। শরিষার মতই ইহার শুঁটী হয়। বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতিও ঐ উদ্ভিদ জাতি অন্তর্ভুক্ত। ইহার শাস্ত্রীয় নাম Raphanus sativus এবং ইহা Cruciferae উদ্ভিদ্ শ্রেণীভুক্ত।

ভারতের সর্ব্বত্র ইহা জন্মিয়া থাকে এবং সর্ব্বত্রই ইহার চাষ হইতেছে। সমতল ভূমিতে প্রধানতঃ শীতকালে এবং বর্ষাকালে দুইবার জন্মিয়া থাকে কিন্তু শীতল পার্ব্বত্য স্থানে ইহা বারমাস জন্মে।

বর্ষার সময় যে মুলার চাষ হয় তাহাকে বর্ষাতি মূলা Rainy season Radish বলে। এই সময়ে মূলার মূল তাদৃশ বড় হয় না—শাক পাতা অধিক হয় কিন্তু অসময়ে পাওয়া যায় বলিয়া লোকে ইহা খুব আদর করিয়া ব্যবহার করে। পাটনার বর্ষাতি মুলা এবং হিজলী কাঁথির বর্ষাতি মুলায় কিছু প্রভেদ আছে। কাঁথির মূলা অধিক মিষ্ট, মুলার মূলও বড় হয়, পাটনায় মুলার পাতা অধিক, মূলা ছোট এবং আস্বাদ ঈষৎ ঝাল।

বর্ষাতি মূলার চাষ আষাঢ় মাস হইতে আরম্ভ হয়।

হৈমন্তিক বা পৌষে মুলা—ইহার চাষ আশ্বিনমাসে আরম্ভ হইয়া থাকে—কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে খাইবার উপযুক্ত হয়, পৌষ মাঘ মাসে ফসল শেষ হইয়া যায়। মূল সুপুষ্ট অথচ কচি থাকিলে তবে খাইতে সুস্বাদু—পাকিয়া গেলে জালি বাঁধে এবং শিকড় বহুল হওয়ায় খাইবার অনুপযুক্ত হইয়া থাকে।

ভারতীয় কৃষি সমিতি মূলা চাষের বিশিষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। হিজলী কাঁথি অঞ্চলে মূলা চাষ প্রচুর পরিমাণে হয় এবং ঐখানকার ক্ষেত্র সকল মূলা চাষের বিশেষ উপযোগী। মূলা জন্মাইয়া তাহাতে বীজ উৎপাদন করিলে সে বীজে তাদৃশ ভাল মূলা হয় না। মূলা পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইলে তাহার শিরাগ্রভাগ কাটিয়া লইয়া কর্দ্দমাক্ত ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বীজ উৎপাদন করিলে তবে সেই বীজে ফসল ভাল হয়। দো-কাট, তে-কাটের বীজ আরও ভাল হয়। লোকে এখন দো-কাট, তে-কাটের বীজ পাইয়া আশাতীত সুন্দর মূলা উৎপন্ন করিতে পারিতেছে। এইরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন ২টা মূলা এক জনের

বোঝা—তার রঙই বা কি সুন্দর এবং স্বাদ কি সুস্বাদু! এই প্রকার বীজকে খাসিকাটা মুলা বীজ বলে। মুল বা শীকড় ছাটিয়া যে সকল গাছ রোপণ করা যায় তাহা খুব তেজস্বী হয় এবং তাহা হইতে ভাল বীজ উৎপন্ন হয়। এমন অনেক উদ্ভিদ্ আছে যাহা শিকড় বা মুল ছাঁটা কাটা সহ্য করিতে পারে। খাসিকাটা মূলার বীজের পরিমাণ অধিক হয় না। যে ১ বিঘা মূলার ক্ষেতে ১৷৷০ মণ বীজ উৎপন্ন হইত, খাসিকাটিয়া আবাদ করিলে তাহা হইতে ৷৷০ আধমণ বীজ পাওয়াও কঠিন। খাসিকাটা মুলার দানাও দেখিতে সাধারণ মূলা বীজের মত সুগোল ও সুস্পষ্ট নহে কিন্তু গুণে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

মূলা ফ্রেঞ্চ-ব্রেকফাষ্ট
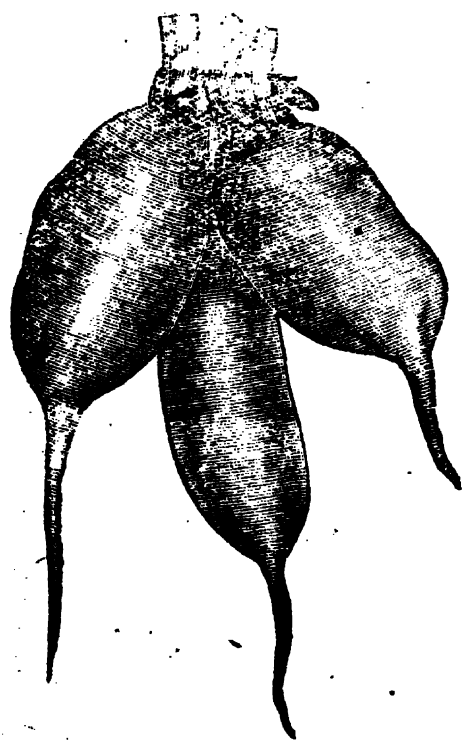
ভারতীয় মূলা—আশু বা আমন যে কোন জাতীয় হউক মূলা লম্বা হইয়া থাকে। দেশী গোল মূলা বা ডিম্বাকৃতি মূলা আমরা দেখিতে পাই না। বিলতী লাল গোল মূলা ইহারা আকারে তত বড় হয় না—কিন্তু লাল টুকটুকে আকৃতি হয়—অতি শোভনীয়। ইহা বিলাতী মূলা হইলেও ইহাকে চীনামুলা বলে। বিলাতী ফ্রেঞ্চ ব্রেকফাষ্ট (Fernch Breakfast (সাহেবী পসন্দ মূলা, ইহা তাহাদের Table Radish। দেশী লম্বা মুলা সাহেবরা বড় একটা পসন্দ করেন না—দেশীমূলা স্বাদে গন্ধে বিলাতীর মত বা তদপেক্ষা ভাল হইলেও বোধ হয় এদেশী বলিয়া তাঁহাদের নিকট উহার এতই অনাদর। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বিলাতী মুলার খোসা অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং তাহাতে দেশী মুলার মত এতসহজে জালি বাঁধে না। ভারতীয় কৃষি সমিতি দেশী গোল মুলার বীজ এদেশে তৈয়ারি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আর এক প্রকার মুলা পঞ্জাব অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাকে Rat-tail মুলা বলে। ইহার শুঁটির জন্য ইহার আদর—শুঁটিও খুব লম্বা হয় এমন কি ১৷৷০-২ ফিট

পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে। শুঁটি বেশ পুষ্ট রসাল হইয়া থাকে। স্থানীয় লোকে শুটিই খায়, শুঁটির জন্যই উহার চায করে মুলও খাওয়া চলে কিন্তু এতদঞ্চলে ঐ মুলা খাওয়ার তাদৃশ আগ্রহ দেখা যায় না। ঐ মুলা শুঁটি কড়াই শুঁটির মত সিদ্ধ করিয়া বা তরকারি রাধিয়া খাইতে হয়।

সিলেশ্চিয়াল মূলা

এক প্রকার এমেরিকান মুলা আছে তাহাও উল্লেখ যোগ্য—উহার নাম Celestial Radish; বাস্তবিক উহা দেবভোগ্য মুলা। উহার আকার চেপটা গোল—রঙ দুধে সাদা—খাইতে অতীব সুস্বাদু। আকারও বড় হয়—ওজনে ১॥-২ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই মুলার আকৃতি দেখিতে প্রকার শালগমের মত। এ দেশে ইহারও বীজ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। পরীক্ষায় যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় ফল আশাপ্রদ হইবে।

মুলার ব্যবহার—মুলার মুল ভক্ষ্য তাহা সকলেরই জানা আছে। সীম মটরের মত ইহা শুঁটিও খাওয়া যায়। মুলার দানায় যে তৈল হয় সেই তৈলের গন্ধ একটু তীব্র হইলেও খাওয়া ও জ্বালান বেশ চলে। ইহা বর্ণহীন এবং ইহাতে বিশিষ্ট পরিমাণে ঝাঁজ আছে সুতরাং শরিষার তৈলের সহিত ভেজাল করা চলে। আজকাল শরিষার তৈলে যে সকল কদর্য্য ভেজাল চলিতেছে ইহা তাহাদের মত কদর্য্য ভেজাল নহে। শরিষার তৈলের সহিত মিলিত হইলে ঐ তৈলের গুণেরও কিছু বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটায় না। মুলা হইতে উত্তম আচার, চাটনী ও অম্ল প্রস্তুত হইতে পারে। মুলার পাতা

ভাজিয়া বা সিদ্ধ করিয়া খাইতে উপাদেয়। ইহার পাতা ব্যঞ্জনাদি সুস্বাদু করিতে পট-হার্বের মত (Pot Herb) ব্যবহার করা চলে।

মুলা গবাদির প্রিয় খাদ্য এবং ইহাতে তাহাদের শরীরও পুষ্ট হয়। মুলা বড় হজমী—উহা সিদ্ধ বা কাঁচা খাইলে অজীর্ণ রোগ ও পেটের গোলমাল কমিয়া যায়। চাকা চাকা করিয়া কাচা শুষ্ক মুলার জল পান করিলে প্রস্রাবের দোষ প্রশমিত হয়। কর্ত্তিত কাঁচা মুলার রস, কর্ত্তিত বা আঘাত প্রাপ্ত স্থানে লাগাইলে বেদনা কমিয়া যায়।

মুলার জমি—দোআস মাটিতে মুলা পল্লীতে হউক, সমতলে হউক যেখানে সেখানে হইবে—পাহাড়ের উপরে ১৬,০০০ ফিট উচ্চে মুলার আবাদ হইতে পারে। ১॥। ২ ফিট পর্য্যন্ত মাটি চষিয়া খুড়িয়া মুলার জমি তৈয়ার করিতে হয়। মাটি খুব নরম তুলার পিঁজার মত হইবে। মুলা, শালগম, বীট, আলু প্রভৃতি মুলজ খন্দ মাত্রের জন্য মাটির বিশেষ পাইট আবশ্যক। মাটি সারবান হওয়াও চাই।

কপি শালগমের মত ইহাতে শরিষার খৈলই প্রদান করিতে হয়। বিঘাতে আবশ্যকানুযায়ী সোয়ামণ হইতে আড়াইমণ পর্য্যন্ত শরিষার খইল দিলে ফসল সুচারুরূপে হইয়া থাকে। খাসিকাটা বীজ উৎপন্ন করিতে হইলে ২-৩ বার খইল প্রদান করিতে হয়। ইহাতে বিঘায় ৫ মণ পর্য্যন্ত খইল আবশ্যক হয়।

বঙ্গে দুর্ম্মূল্যতা—অনারেবল রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের দুর্ম্মূল্যতার কথা তুলিয়া বলিয়াছিলেন,—"সরকারী ও বে-সরকারী সদস্য সমবায়ে এক কমিটি গঠন করিয়া খাদ্যশস্যের দুর্ম্মূল্যতার প্রতিকার সম্বন্ধে উপায় নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হউক।" আরও অনেকে এসম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অনরেবল মিঃ কমিং গবরমেণ্টের পক্ষে তাহার উত্তর দেন। তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতার শেষভাগে তিনি বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমান অবস্থায় বঙ্গে এখনও চাউল সরবরাহ হইতেছে। দরের উপর প্রাদেশিক গবরমেণ্টের কোন হাত নাই; কারণ, সারা পৃথিবীর বাজারের সহিত ইহার সংস্রব আছে। আগামী শস্যের সময় পর্য্যন্ত চলিতে পারিবে, এমন ধান-চাউল বঙ্গে রহিয়াছে। উচ্চ মূল্য যে একটা নিতান্ত খারাপ জিনিষ, তাহাও বলা যায় না। কারণ, বর্দ্ধিত পরিমাণের কিছু কিছু চাষীরাও পায়। আমি প্রজাদিগকে বলি, আতঙ্কের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। পক্ষান্তরে আমি ইহাও বলিতেছি, বর্ত্তমান অবস্থায়, কেহ যে লাভের জন্য অধিক পরিমাণে চাউল ধরিয়া রাখিবে, তাহাও গবরমেণ্ট সহ্য করিবেন না। যদি কেহ এইভাবে চাউল ধরিয়া রাখিয়াছে জানা যায়, তাহা হইলে, গবরমেণ্টের কর্ম্মচারীরা তখনই তাহার

প্রতিকার করিবেন। বোম্বাই প্রদেশে এবং বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে কোন কোন জেলায় এইরূপ অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। প্রস্তাবিত প্রকারের কমিটী ইহা করিতে পারিবেন না। সিবিল সপ্লাই বিভাগের ডিরেক্টর এই ব্যবসায় সম্পৃক্ত আমদানী-কারীদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। গবরমেণ্ট রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুরের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন; তবে শুধু প্রাদেশিক ব্যাপার হিসাবে গবরমেণ্ট এই বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, মৌলবী আবুল কাসেম এবং মৌলবী এ কে ফজলল হক কর্তৃক উত্থাপিত অপর কয়টি প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন। সে প্রস্তাব কয়টি এই,—(১) বঙ্গে চাউলের দর কমাইবার জন্য গবরমেণ্ট শীঘ্র কোন ব্যবস্থা করুন এবং অন্যান্য খাদ্য সম্বন্ধে ও কাপড়ের দর সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা করা হউক। (২) বর্দ্ধমান বিভাগে ধান-চাউলের এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, অতএব অবিলম্বে প্রজাদের বিশেষতঃ দরিদ্রদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করা হউক। (৩) আমদানি বৃদ্ধি করিয়া বা রপ্তানী বন্ধ করিয়া অথবা গবরমেণ্টের বিবেচনামত অন্য কোন ভাল ব্যবস্থা করিয়া গবরমেণ্ট অবিলম্বে অতি মহার্ঘ খাদ্য শস্যাদির দর কমাইয়া দিউন।” অতঃপর রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুরের প্রস্তাব ভোটে নষ্ট হইলে, উল্লিখিত তিন প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে পরি-গৃহীত হয়। আশা করি, প্রস্তাবমত কাজ করিতে গবরমেণ্ট বিলম্ব করিবেন না এইরূপ বিলম্বের ফলেই ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় বিক্রয় করিবার প্রস্তাব পাশ হইয়াও আজ পর্য্যন্ত ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় বঙ্গে আসিল না।

কিন্তু বাঙলার বাজারে রেঙ্গুণ চাল আমদানী হইয়া নির্দ্ধারিত দরে বিক্রয় ব্যবস্থা হওয়ায় লোকের মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইয়াছে।

বক্তা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে তিনি প্রশ্নের সকল দিক বিচার করেন নাই। খাদ্য শস্যের বা ফল মূল সব্জীর মূল্য বাড়িলে কৃষক স্বচ্ছল হইতে পারিত কিন্তু সাধারণতঃ উহারা দরিদ্র বলিয়া তাহাদের উৎপন্ন শস্য সস্তাদরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যাদি লইয়া ব্যাপার করিয়া ধনী ব্যাপারিগণ কত লাভ করে। তাহারাও আমাদের দেশের লোক সত্য, কিন্তু তাহাদের অতিরিক্ত লাভেচ্ছা হেতু সাধারণ প্রজার কষ্ট হয়। দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে ক্ষতি নাই যদি উক্ত মূল্যে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিবার লোক থাকে। আর একটা কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কেবল কৃষির উন্নতি করিলে দেশে সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা যাইবে না সঙ্গে সঙ্গে বয়ন ও অন্যান্য শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি করিলে তবে আশানুরূপ কাজ হইবে।

উচ্চ মূল্যে কৃষিজাত দ্রব্য বেচিয়া তাহা বিদেশীর হস্তে তুলিয়া দিলে কোন ফল হইবে। দেশের রপ্তানির উপরও দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ভর করে। রপ্তানি

বাড়িলে দ্রব্যের মূল্য বাড়ে সত্য কিন্তু তাতে আমাদের দেশের কয়জনের লাভ হয়—যদি হয় তুইজন ধনীর নতুবা সমুদয় লাভ বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের।

ইহার মীমাংসা সহজ নহে। দেশের রায়ত, জমিদার, ধনী, দরিদ্র সকলে একযোগে কাজ না করিতে পারিলে ইহার প্রতিকার কোন কালে হইবে না।

এ দেশের কৃষকের মঙ্গল কোথায়—তাহাদের নিজের বলিয়া একখণ্ড জমি নাই, তাহারা করভারে ঋণদায়ে প্রপীড়িত—তাহারা সম্পূর্ণ পরাধীন!—কৃঃ যঃ।

কচুরি বহিষ্কার—বঙ্গবাসী পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন যে—ত্রিপুরার জেলা মাজিষ্ট্রেট মিঃ প্রাই আদেশ করিয়াছেন, জেলার যেখানে যত 'কচুরি' হইয়াছে, সব তুলিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। জলে এক প্রকার আগাছা হয়, অনেকে ইহাকে 'বিলাতী পানা' বলে, পুকুর ডোবা ইহাতে ভরিয়া যায়,—ইহারই নাম 'কচুরী'।

এই বিলাতী পানার নাম Water Hycinth— ইহাতে ক্ষার ভাগ অত্যন্ত অধিক। ইহা পুড়াইয়া ইহার ছাই জমিতে দিলে সারের কার্য্য করে। ইহাতে পটাস ভাগ সমধিক পরিমাণে থাকায় ইহাকে পটাস প্রধান সার বলিয়া গণ্য করা যায়। পটাস বস্ত্রের ধোলাই কার্য্যেও উপযোগী এই জন্য সাবানের ইহা একটি উপাদান। জেলা মেজিষ্ট্রেট বাহাদুর ইহার বহিষ্কার ব্যবস্থা না করিয়া ইহার ব্যবহারের ব্যবস্থাও করিতে পারেন।

ঝিনুকের ব্যবসায়—বাঙ্গালাদেশে প্রচুর পরিমাণে ঝিনুক জন্মিয়া থাকে পূর্ব্বে ঝিনুক পোড়াইয়া লোকে চূণ প্রস্তুত করিত, কিন্তু পাথুরে চূণ প্রচলিত হইবার পর তাহা উঠিয়া গিয়াছে। এখনও পল্লীগ্রামে ও উড়িষ্যা প্রদেশে ঝিনুকের চূণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে বঙ্গদেশে ঝিনুকের বোতাম প্রস্তুত হইতেছে। চাম্পারণ ও নারায়ণগঞ্জে ঝিনুকের বোতাম তৈয়ার হয়। চাম্পারণের ত্রিহুত বটন ফ্যাক্টরী হইতে প্রতিমাসে ৬০ হাজার বোতাম তৈয়ার হইয়া থাকে।

১৯১৩।১৫ সালে বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রায় ৩১৪ মণ ঝিনুক বিলাতে চালান হইয়াছে।

খাল বিল শুকাইয়া যাইবার জন্য ঝিনুক দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে এক মণ ঝিনুকের মূল্য মাত্র চারি আনা ছিল, এক্ষণে ৩৲ তিন টাকা হইয়াছে।

বাখরগঞ্জ জেলায় এখনও প্রচুর পরিমাণে ঝিনুক পাওয়া যায়। উক্ত জেলায় একটি কারখানা স্থাপন করিলে লাভজনক হইতে পারে। নাইট্রিক এসিড ও কেরোসিন তৈল দ্বারা ঝিনুক পরিষ্কার করিয়া বোতাম তৈয়ার করিতে হয়।—বিজ্ঞান।

পত্রাদি

সব্জী চাষের উপযুক্ত জমি—

শ্রীমনমোহন ঘোষ—২নং দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ই-আই রেলের ব্যাণ্ডেল জংসনের অতি নিকটে—ষ্টেসনের লাগাও—৬০ বিঘা সব্জী বাগের উপযোগী জমি আছে। কপি, আলু, মূলা, বেগুণ যাবতীয় সব্জীই তাহাতে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। কলা, পেঁপে, আনারস প্রভৃতি ফলও উৎপন্ন করা যায়। বাগানের পরিমাণ বাড়াইতে ইচ্ছা করিলে এতৎসংলগ্ন আরও জমি মিলিবে। ফল তরকারি বিক্রয়ের কোন অসুবিধা নাই—সন্নিকটে অনেক ভদ্রলোকের বাস এবং য়ুরোপীয় ভদ্রলোকও অনেক এখানে বাস করেন।

কলিকাতায় মাল পাঠাইবারও সুবিধা আছে। ব্যাণ্ডেল হইতে কলিকাতা রেলে এক ঘণ্টার পথ।

১ মণ মালের মাশুল মাত্র তিন আনা। কলিকাতা তৃতীয় শ্রেণীর মাসিক ভাড়া ৭৲ টাকা মাত্র।

স্থান স্বাস্থ্যকর, জমিতে চাষের উপযোগী জলের সুবিধা আছে।

ব্যাণ্ডেল একটি বিশিষ্ট জংসন ষ্টেসন বলিয়া এখানে অনেক কুলী মজুর বাস করে। এই কারণে চাষের জন্ত মজুর যথেষ্ট পাওয়া যাইবে এবং মজুরীও খুব অধিক নহে।

জমি খাজনায় বিলি করা আমার অভিপ্রায় নহে। ভাগে বিলি করিতে আমার ইচ্ছা তাহাতে আমি আশা করি উভয় পক্ষের সুবিধা হইবে। যাঁহারা বিশেষ খবর জানিতে চান তাঁহারা কৃষক অপিসে অনুসন্ধান করুন।

চাষ যাঁহারা ব্যবসায়ের হিসাবে অবলম্বন করিবেন তাঁহাদের আবেদন সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য করা হইবে।

২০০ বিঘা ধান জমি—ভাসতাড়াতে বি, পি রেলের ধারে ২০০ বিঘা ধান জমি বিলি করা হইবে। ভাসতাড়া ষ্টেসনের নিকটেই জমি—১ বন্দে ২০০ বিঘা—নিকটে নদী আছে সুতরাং জল নিকাশ বা সেচন জলের সুবিধা আছে। বিশেষ বিবরণ কৃষক অফিস হইতে পাওয়া যাইবে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

আশ্বিন মাস।

ভাদ্র মাস গত হইল, বিলাতি সব্জী বপন করিতে আর বাকি রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে, সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা এবং নাবী বিলাতী সীম, সালগম, বীট, গাজর, পিয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখন তাহাদের চারা চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐসমস্ত বিলাতি বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসুর, মুগ, তিল, খেসারী প্রভৃতি রবিশস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবিফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

মসলাদি—সুলফা, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনি ইত্যাদি এতদ্দেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনের এই সময়।

কার্পাস গাছ—কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করে।

তরমুজাদি—তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। মাটি চাপা দিয়া রাখিলে তরমুজ বড় হয়। তরমুজ বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৫ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়; নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটা মাদায় তিন চার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও।

পটল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন অঙ্কুর বা কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুসিয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাস এই মাসে আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু—কল সমেত একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটীর "যো" হইলে খুসিয়া দিবে। এই মাসে পিঁয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেত্রের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া। আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকাকালে কলিচূণের ছিটা দিলে বিশেষ উপকার হয়। বাঙলাদেশের মাটি বড় রসা এই কারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

২০শ খণ্ড। আশ্বিন, ১৩২৬ সাল। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ক্ষেত্র প্রস্তুত

(জনৈক চাষী লিখিত)

বৈশাখে চাষ

শীতকালে এদেশে প্রায় বৃষ্টি হয় না। দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি পর ফাল্গুন চৈত্র মাসে খন্দ কাটিয়া সহসা ক্ষেত্রে চাস দিতে পারা যায় না, বৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতে হয়। তবে কোন কোন বৎসর মাঘ মাসের শেসেই এক পসালা বৃষ্টি হইতে দেখা যায়। সে বৃষ্টিতে কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ উপকার হয়। এই জন্য আমরা বলি, "ধন্য রাজার পূণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।" যাহা হউক, খন্দ কাটাইয়ের পর বৃষ্টি হইলেই বৈশাখী চাস আরম্ভ হয়। বৈশাখী চাষে প্রতি চাষের পর মৈ দেওয়া ও ঢিল ভাঙ্গার আবশ্যক করে না। ধান্যাদির বুনানীর পরে মৈ দিতে হয়।

বৈশাখী চাসের সময় ক্ষেত্রের হালি (১) কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আহারান্তে কৃষাণেরা বৈকালে লাঙ্গল বহন করে না। সে সময় তাহারা হালি কাটিয়া থাকে।

চাষে চাসে মাটি উত্তম মত তৈয়ারি না হইলে ধান্য বীজ বপন করা কর্ত্তব্য নহে। তবে শস্য সকল যাহাতে নামলা না হইয়া যায় সেইজন্য জ্যাট বুনানি করা হয়, সে বিষয়ে কৃষকের সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

কুড়ী ও বিলান ক্ষেত্র সকল ভর্ণার জলে নিমগ্ন হইলে বুনানি করা যায় না এবং নামলা বাতে ধান্য বীজ বপন করিলে নিম্ন ভূমি জল নিমগ্ন হইবারও আশঙ্কা থাকে।

(১) কেশে, কুশ, দুর্ব্বা, ইত্যাদি যে সকল খড় লাঙ্গলের মুখে এড়াইয়া যায়, তাহাদিগকে হালি খড় বলে। ক্যাওড়া কোদালে হালি কাটিবার সুবিধা হয়।

অগত্যা গাঁতির মধ্যস্থিত কুড়ী ও বিলান ক্ষেত্র সকল অগ্রে বুনিয়া শেষে উচ্চ ক্ষেত্র সকল বুনানী করা কর্ত্তব্য।

পচান জমিতে ধান্য কিছু কম জন্মে, তাহাকে "খিল জলা" বলে। লাল জমি হইতে পচান জমিতে চাষ কিছু বেশী লাগে। সুলাল জমি হইলে চার পাঁচ বার চাষেই বুনানী করা চলে; কিন্তু খিচা জমি ছয় সাত চাষের কম বুনানী করা হয় না। উচ্চ ভূমি মাত্রেই প্রায় এইরূপ নিয়ম। কুড়ি ও বিলান ক্ষেত্রে অত অধিক চাষ দেওয়ার আবশ্যক হয় না। কুড়ী ও বিলান ক্ষেত্র সুলাল হইলে দোয়ার কোথাও বা তেয়ার চাষেই বুনানী করা যাইতে পারে। পচান হইলে চারি চাষ পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকে। কিন্তু কোপানী জমিতে দোয়ারের অধিক চাষ লাগে না। তাহাতে মৈ কিছু বেশী দিতে হয়। রোয়ার জমিতে খরা শুকনার সময় দোয়ার চাষ দিয়া রাখিলে দোয়ারেই উত্তম কাদা হইতে পারে।

কার্ত্তিকে চাষ

বৈশাখ মাসে যে লাঙ্গলে দেড় বিঘা জমি চষিতে সক্ষম হয়, কার্ত্তিক মাসের চাষের সময় সেই লাঙ্গলে দিনমানে এক বিঘার অধিক জমি চষিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক মাসের দিন কিছু ছোট হইয়া যায়, এবং বর্ষার জলে মাটিতে কাঁচল ধরিয়া মাটি অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠে। বৈশাখি চাষের সময় পরিশুষ্ক মাটিতে জল পাইয়া চাষে চাষে মাটি যেমন গোলালো হইয়া যায়, কার্ত্তিক মাসের চাষে বর্ষা খাওয়া কাঁচল মাটি সেরূপ গোলালো হইয়া উঠে না। কার্ত্তিক মাসের প্রতি চাষের পর মৈ ঘর্ষণ করিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়; তথাপি মাটি বেশ সমান হয় না, অনেক গুটি থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ মেটেল মাটিতে অধিক ঢেলা হইয়া থাকে, তাহা কিছুতেই গুড়া হয় না। যাহা হউক, বৈশাখ মাসের চাষ হইতে কার্ত্তিক মাসের চাষে কৃষককে দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে হয়, তথাপি বৈশাখ মাসে এক লাঙ্গলে যত জমি বুনানী করা হয়, কার্ত্তিক মাসে তত হয় না। তবে যেখানে সেচনের সুবিধা ও ছিটানের উপায় আছে, সেখানে হইতে পারে, কিন্তু অন্যত্র নহে। কিন্তু আমাদের দেশে সেচনের সুবিধা নাই; যে বৎসর কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জল না হয়, সে বার উচ্চ ভূমি মাত্রেই পতিত থাকিয়া যায়। আশ্বিন মাসের মধ্যে যাহা বুনানী হয়, জলাভাবে শস্য ভাল জন্মে না।

ধান্য বুনানীর নিমিত্ত ফাল্গুন, চৈত্র, ও বৈশাখ মাসে যে সকল ক্ষেত্রে চাষ দেওয়া যায়, শীত ও গ্রীষ্ম প্রভাবে ঐ সকল ক্ষেত্র প্রায় পরিশুষ্ক অবস্থায় থাকে। সুতরাং এই দেবমাতৃক দেশে খন্দ কর্ত্তনের পর যোয়ের প্রতীক্ষা করিতে হয়। কিন্তু খন্দ বুনানীর চাষের সময় সে প্রতিক্ষা নাই। যে সকল ক্ষেত্রে রবি খন্দ বুনানী করা যায়,

তাহার কোন জমিতে আশু ধান্য ও কোন জমিতে আমন ধান্য বুনানী করা থাকে। প্রদেশ বিশেষে কোথাও বা কিছু পরিমাণে পচান জমিও থাকা সম্ভব। আর যে প্রদেশে ধান্য বুনানী করা হয় না, তথাকার সমস্ত জমিতেই প্রায় বারমেসে চাষ দেওয়া থাকে।

বর্ষার পর ভাদ্র আশ্বিন মাসে কুড়ী ও বিলান ক্ষেত্র সকল জলনিমগ্ন হইয়া থাকে এবং উচ্চ ভূমি মাত্রেই বেশ সরস থাকিতে দেখা যায়। ঐ সময় পচান ও বারেমেসে চাষের জমিতে অধিক পরিমাণে চাষ দিয়া রাখা যাইতে পারে। আর আশু ধান্যের জমিতে এক দিকে যেমন ধান্য কর্ত্তন করিতে হয়, অন্য দিকে তেমন সুবিধামত দোয়ার চাষ ও দুই পালা মই দিয়া রাখিতে হয়। ধান্য কর্ত্তনের পর ক্ষেত্রে একদিবসের জন্য গরুর পাল চরাইতে দেওয়া যাইতে পারে (১)। কিন্তু প্রত্যহ ঐ সকল ক্ষেত্রে গোরু বিচরণ করিতে দেওয়া উচিত নহে।

কাচল ধরা মৃত্তিকা গবাদি পশুর পদদলিত হইলে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। আমাদের চাষীর ভাষায়, ইতর ভাষায় তাহাকে "চেঙ্গটা" ধরা বলে। চেঙ্গটা ধরা মাটি লাঙ্গলের ফালে কাটিয়া উঠে না ও লাঙ্গল ভাল পরিচালিত হয় না ; এবং যে অত্যল্প মাটি পরিচালিত হয়, তাহা শিলাখণ্ডের ন্যায় কঠিন হইয়া থাকে, মৈ দিয়া ভাঙ্গা যায় না। চেঙ্গটা মাটিতে শস্য বীজ বপন করিলে গাছ অধিক তেজস্বী হয় না। অতএব কার্ত্তিকে চাষের মাটি পশুবর্গের পদদলিত হইয়া যাহাতে চেঙ্গটা না ধরে, তদ্বিষয়ে কৃষকদিগের দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

চেঙ্গটা ধরা মাটি উত্তমরূপে পরিশুষ্ক হইয়া পুনর্ব্বার জলসিক্ত হইলে চেঙ্গটা দোষ শুধরাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কার্ত্তিকে চাষের সময় এরূপ প্রতীক্ষা করা শুভকর নহে। বিশেষতঃ ধান্য কর্ত্তনের পর অনতিবিলম্বে ক্ষেত্রে দোয়ার চাষ দিলে মাটি যেমন "ওকড়" দেয়, গৌণকল্পে দশ ঘা চাষেও মাটি সেরূপ পরিচালিত ও পরিপাটি হয় না। ধান্য কর্ত্তনের পর ক্ষেত্রে যত শীঘ্র চাষ দেওয়া যায়, চাষের পক্ষে ততই সুবিধা হইয়া থাকে।

ধান্য বুনানীর সময় অগ্রে কুড়ী ও বিলান ক্ষেত্র বুনানী করিয়া পশ্চাৎ উচ্চ ভূমি সকল বুনানী করা হয় ; কিন্তু প্রকৃতির গতিক্রমে খন্দের নিয়মানুসারে অগ্রে উচ্চ ক্ষেত্র সকল বুনিয়া পরে নিম্ন ভূমি সকল বুনানী হইয়া থাকে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বিলান ও কুড়ী ক্ষেত্র মাত্রেরই প্রায় জলমগ্ন থাকা সম্ভব, ঐ সময়ের মধ্যে উচ্চ ক্ষেত্রের বুনানী

(১) ধান্য কর্ত্তনের সময় জমি যদি শুষ্ক অবস্থায় থাকে, তবেই গরু চরিতে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কর্দ্দমময় ভূমিতে গোরু নামিতে দেওয়া উচিত নহে। কাদা জমি গোরুদ্বারা দলাইলে মাটি এরূপ শিলাইয়া যায় যে তাহাতে লাঙ্গল দিতে পারা যায় না।

সমাপ্ত করিয়া রাখিতে হয়। তদনন্তর নিম্ন ক্ষেত্রের জল শুকাইয়া যেমন যেমন মৃত্তিকায় যো ধরিতে থাকে, অমনি দোয়াঁর তেয়ার চাষ দিয়া বুনানী করিতে সমর্থ হওয়া যায়। ঐ সময় যদি উচ্চ ক্ষেত্র বুনানী করিবার অপেক্ষা থাকে, তবে এক ক্ষেত্রের বুনানী করিতে করিতে অন্য ক্ষেত্রের যো উথরাইয়া যাইতে পারে। উথরান বা টানালো যোয়ে খন্দ বীজ বুনানী করিবার বিধি নাই। খন্দের বীজ ঠিক ভরাবাতে বুনানী করিতে হয়। কিন্তু জল সেচনের উপায় থাকিলে, তাহার যো, গর যো দেখিবার তত আবশ্যক হয় না। এদেশে জল সেচনের তত সুবিধা নাই এবং কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টিরও বড় অভাব হইয়া পড়ে, সেই জন্য কার্ত্তিকে চাষে কৃষকদিগকে বিশেষ সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হয়।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে ক্ষেত্রে যে চাষ দেওয়া যায়, তাহাতে যে কেবল মাত্র খন্দেরই উপকার হইয়া থাকে এমন নয়, উহাতে বৈশাখী চাষেরও বিস্তর আনুকূল্য হইয়া থাকে। হেমন্ত ও শীত ঋতুতে ক্ষেত্রে অধিক চাষ দেওয়া থাকিলে, বৈশাখ মাসে অতি অল্প চাষেই মাটি বিলক্ষণ গোলালো হইয়া উঠে। বিশেষতঃ আশু ধাঁন্যের ক্ষেত্র সকল হেমন্ত বা শীত কালে উত্তমরূপ চষা না থাকিলে, ধান্য ভাল জন্মে না। সুতরাং খন্দের এগ্রামে আশু ধান্যের ক্ষেত্র সকল পরিপাটি করিয়া চষিতে হয়; তাহাতে ধান্য খন্দ উভয়েরই উপকার দর্শে।

হৈমন্তিক ধান্য সুপক হওয়া পর্য্যন্ত যে সকল বিলান ক্ষেত্রের যো উথরাইয়া যাওয়া সম্ভব, ঐ সকল ক্ষেত্রের জল নিঃসরণ সময়ে ধান্য বর্ত্তমান থাকিতে, পলির উপর খন্দ বীজ [১] ছিটানী করা যাইতে পারে। পতিত মাত্রেই বীজ গুলি পলির মধ্যে অর্দ্ধভাগ বসিয়া যায়। এইরূপ যো পরীক্ষা করিয়া খন্দের বীজ ছিটান করা কর্ত্তব্য। ছিটানে যব, গম, ও ছোলা তত প্রশস্ত নহে। কিন্তু যো মত ছিটাইতে পারিলে, মসিনা, রাই, মটর, তেওড়া, মশুর কলাই প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে। বিলান ক্ষেত্র ও নুতন চরের মাঠ ভিন্ন অন্যত্রে ছিটান করিলে, বিশেষ ফল প্রদ হয় না। সুকোমল মৃত্তিকা হইলে কোন কোন কুড়ী ক্ষেত্রেও ছিটান করা যাইতে পারে; কিন্তু চূণে মোটেলে নহে। আর যে সকল ক্ষেত্রের ধান্য পরিপক হওয়া পর্য্যন্ত যো থাকা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তথায় ছিটান না করিয়া চাষ বুনানী করাই কর্ত্তব্য। নিম্ন ভূমিতে উৎকৃষ্ট গম জন্মে।

আবাদের তাৎপর্য্য

মৃত্তিকা, জল, তাপ, ও বায়ু সংযোগে বৃক্ষ লতাদির বীজ অঙ্কুরিত হইয়া একাংশ মূলরূপে ভুগর্ভে প্রবেশ করে, অপরাংশ উৰ্দ্ধ দেশ ভেদ করিয়া উঠিতে থাকে। তদনন্তর

[১] তেউড়ে প্রভৃতি কলাই বীজ।

মূলাংশ দ্বারা ভূগর্ভস্থ রস শক্তি আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষ লতাদির কাণ্ড দেশে উৎক্ষিপ্ত হয়, এবং ক্রমে ঐ শক্তি শাখা প্রশাখা ও পত্রাদি সর্ব্বত্রে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু অল্প আবাদি বা অ-কৃষ্ট ক্ষেত্রজাত উদ্ভিজ্জের মূল কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া শীঘ্র ভূগর্ভে বিস্তৃত হইতে পারে না। তজ্জন্য সম্পূর্ণ অবয়বের উপযুক্ত মত তেজাকর্ষণের ব্যতিক্রম ঘটিয়া, উদ্ভিজ্জ শ্রেণী নিতান্ত ক্ষুদ্র অবয়ব ধারণ করে। সুতরাং শাখা প্রশাখা সকল প্রসারিত হয় না ও পুষ্প ফলেরও বিস্তর অন্যথা ঘটে। আর ভিন্ন জাতির উদ্ভিজ্জ সকল একস্থানে বর্ত্তমান থাকিলে, পরস্পর তেজাকর্ষণের বিলক্ষণ বিরোধ উপস্থিত হয় ঐ দোষ পরিহারার্থ ক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট রূপ আবাদ করিয়া দিতে হয়।

আবাদের প্রধান অঙ্গ হল-প্রবাহ। পুনঃপুনঃ হল-প্রবাহে মৃত্তিকার কঠিনত্ব দূর হইয়া মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত কোমল হইয়া উঠে এবং তৃণাদি আগাছা সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। তথায় শস্য বীজ বপন করিলে, সুকোমল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া শস্যমূল মৃত্তিকার ভিতর বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং বিজাতীয় উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর অভাব প্রযুক্ত নির্ব্বিরোধে যথোপযুক্ত তেজাকর্ষণ করিয়া, আপনারা বর্দ্ধিত হইয়া উঠে ও সময়মত প্রচুর পরিমাণে শস্য প্রসব করিয়া থাকে। বীজ বপনের পর ক্ষেত্রে যে তৃণাদি বহির্গত হয়, তাহাও শস্যাদির পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। ঐ সকল নিপাতের জন্য মৈ, বিদে, নিড়ানী ইত্যাদি যন্ত্র সকল ব্যবহার করা যায়।

এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, গ্রামে, প্রান্তরে ও অরণ্যে যে সকল বৃক্ষ লতাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা প্রায়ই অনাবাদি ক্ষেত্রে জন্মিয়া থাকে, অথচ তাহাদের অবয়ব নিতান্ত নিস্তেজ নহে ও পুষ্প ফলেরও অত্যন্ত অভাব হয় না। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ আপত্তি অনায়াসে নিরাকৃত হইতে পারে। অনাবাদি ক্ষেত্রে যে সকল বৃক্ষ লতাদি জন্মে, তাহাদের মধ্যে অনেক জাতীয় উদ্ভিজ্জ দীর্ঘায়ু ওবৃহদাকার। তাহাদের সফলতার সময় তিন, চারি, বা ততোধিক বৎসর। ঐ কালের মধ্যে বৃক্ষলতাদির মূলাগ্র প্রথমতঃ অতি সঙ্কোচভাবে ভূগর্ভের কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া নিম্ন দেশে প্রবেশ করিতে থাকে। সূর্য্যোত্তাপে ভূপৃষ্ঠ যেরূপ পরিশুষ্ক ও কঠিন হয়, ভূগর্ভে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে না পারায় সেরূপ হইবার সম্ভব নাই। সূর্য্য রশ্মির অভাবে তথাকার মৃত্তিকা সর্ব্বদা সরস ও কোমল থাকে। ঐ কোমল মৃত্তিকায় অবতীর্ণ হইলে, বৃক্ষমূল তাহা অনায়াসে ভেদ করিতে সক্ষম হয় ও বহুস্থান বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন সম্পূর্ণভাবে তেজাকর্ষণ করিয়া বৃক্ষ সকল বিলক্ষণ তেজস্বী হইয়া উঠে, এবং ক্রমে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হয়।

বৃক্ষতলে তৃণ ও আগাছা যাহা জন্মে, তাহাদিগের মূল, বৃক্ষ মূলের সমস্থান-ব্যাপী নহে। জাতি বিশেষে ভূপৃষ্ঠ হইতে পাঁচ সাত বা ততোধিক হস্ত নিম্নতল পর্য্যন্ত বৃক্ষমূল অবতীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু তৃণ ও আগাছার মূল ভূপৃষ্ঠের অর্দ্ধ হস্ত হইতে দুই হস্তের

অধিক নিম্নে আর গমন করে না। সুতরাং মূল দ্বারা তেজাকর্ষণের পরস্পর কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। এইজন্য গ্রামে, প্রান্তরে ও অরণ্য মধ্যে আগাছা ও তৃণ সমাকীর্ণ অনাবাদি ক্ষেত্রে নানা জাতীয় দীর্ঘায়ু তরু লতাদি জন্মিতেছে। ঐ বৃক্ষতলের মৃত্তিকা যদি উত্তমরূপ আবাদ করিয়া দেওয়া যায়, তবে বৃক্ষের তেজ অনেক বৃদ্ধি পায় সন্দেহ নাই। বৃক্ষতলের মৃত্তিকা সর্ব্বদা কঠিন ও সমপৃষ্ঠ হইয়া থাকে, তথায় বৃষ্টি বারি পতিত মাত্রেই মৃত্তিকার গাত্র ধৌত করিয়া স্থানান্তরে নিঃসৃত হইয়া যায়। ঐ বৃক্ষতল খনন করা থাকিলে, মৃত্তিকার কঠিনত্ব দূর হয়; তদুপরে পতিত বারি রাশি অনায়াসে কোমল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং তৎসঙ্গে ভূপৃষ্ঠের কিয়দংশ তেজ অধোনিমগ্ন হইয়া বৃক্ষের তেজ বৃদ্ধি করিতে পারে।

আচট জমিতে যে সকল তৃণ ও আগাছা জন্মে, তাহাদিগকে আমরা আজন্মকাল সেই ভাবেই দেখিয়া আসিতেছি। আমরা তাহাদিগকে যে অবস্থায় অবলোকন করি, তাহাই তাহাদের পূর্ণ অবয়ব মনে করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ঐ সকল তৃণ ও আগাছা আবাদি জমিতে হইলে তাহারা দ্বিগুণেরও অধিক বর্দ্ধিত হইতে পারে। আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে যে সকল তৃণ আগাছা জন্মে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এবিষয় বেশ বুঝিতে পারা যায়।

তৃণ ও আগাছার মধ্যে ওষধি বাচক উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর প্রকৃতি বৃক্ষ লতাদির তুল্য নহে। তাহাদিগের জাতি বিশেষে আয়ুঃ পরিমাণ তিন মাস হইতে এক বৎসর; কচিৎ কাহারও বা কিঞ্চিৎ অধিককাল দেখিতে পাওয়া যায়। এই অল্প কালের মধ্যে তাহাদিগের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ফল প্রসব, ও জীবনান্ত পর্য্যন্ত সমুদয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ওষধিবাচক অচিরস্থায়ী উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর মূল সকল ভূগর্ভের যত দূর অধিকার করে, তাহার উর্দ্ধতম সীমা অর্দ্ধ হস্ত হইতে দেড় হস্ত মাত্র। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠ সূর্য্যোত্তাপে সর্ব্বদাই পরিশুষ্ক ও কঠিন হইয়া থাকে। সুতরাং ওষধিবাচক উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর মূলাধিকৃত মৃত্তিকা স্বভাবতঃ কোমল নহে বলিয়া, শিকড় গুলি আদৌ বিস্তৃত হইতে পারে না। এইজন্য স্বাভাবোৎপন্ন ওষধিবাচক উদ্ভিজ্জ সকল নিতান্ত অপূর্ণাবস্থায় অবস্থিতি করে। আর এই জাতীয় উদ্ভিজ্জ শ্রেণী অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখর হইতে সমুদ্রোপকুল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া আছে।

কৃষি ক্ষেত্রে, ধান্য, গোধুম তৈলখন্দ, দাইল খন্দ, কার্পাস, তামাকু, ইক্ষু, পাট প্রভৃতি যে সমস্ত শস্য উৎপন্ন হয়, তত্তাবতই প্রায় ওষধিবাচক এবং তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি সমুদয় তৃণ ও আগাছারই তুল্য। ঐ সকল উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর মূলও সমস্থান-ব্যাপী। তাহারা একস্থানে থাকিলে তেজাকর্ষণ করিতে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং কর্ষণের দ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকার কঠিনত্ব দূর করিয়া না দিলে, ধান্য, গোধুম ইত্যাদি কৃষি-জাত উদ্ভিজ্জ সকল, তৃণসমাকীর্ণ অনাবাদি ক্ষেত্রে মূল বিস্তার করিতে না পারিয়া,

নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। গাছ দুর্ব্বল হইলে, ফলোৎপাদনের বিঘ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন না হইলে, কৃষিকাদগের পরিশ্রমের পুরস্কার ও কৃষি কার্য্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। লাভের জন্যই কৃষি-কার্য্য কিন্তু ক্ষেত্রে ফসল না হইলে লাভ হওয়া ত দূরের কথা, বরং মুলধন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়।

যে কৃষক অনাবাদি ক্ষেত্রে শস্য-বীজ বপন বা রোপণ করে ও উপযুক্ত সময়ে শস্য ক্ষেত্রের পারিপাট্য সাধনে অসমর্থ হয়, সে আশানুরূপ ফল লাভে বঞ্চিত হয়, এবং লোকসানের দায়ে ও উৎসাহ-ভঙ্গ যন্ত্রণানলে তাহার অন্তর্দাহ হইতে থাকে। সে অনল কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় না। এ সম্বন্ধে কৃষকেরা একটি বচন বলে; যথা, "ভগ্ন কৃষি, হৃদয় রোগ, কুলটা ভার্য্যা, পুত্র শোক। বিমাতার কারণে বৈরি বাপ। সহনে না যায়, এ পঞ্চতাপ।"

এই নিমিত্ত পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেত্রের উৎকৃষ্টরূপ পারিপাট্য সাধন করিতে হইলে যদি ২০ বিঘায় স্থলে বার বিঘার ঊর্দ্ধ বুনানী না হয়, সেও বরং শত গুণে ভাল, তথাপি কোন কৃষক যেন অনাবাদি বা অল্প কর্ষিত ক্ষেত্রে শস্য বীজ বপন বা রোপণ না করে।

এই প্রবন্ধে যে সকল গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে,
সাধারণের বোধের জন্য নিম্নে কতকগুলি শব্দের
অর্থ দেওয়া হইল।

খন্দ কাটাইয়ের পর = শস্য, ক্ষেত হইতে উঠাইবার পর।

কৃষাণ = কৃষক; চাষীর মজুর।

নাম্‌লা = নাবী; সময় অতীত হওয়া।

জ্যাট = জল্‌দী; সময় মত, অগ্রে।

কুড়ী ও বিলান ক্ষেত = নিচু জমি; যে জমিতে অল্প বর্ষায় জল জমে।

গাঁতি = এক ঘেরির বা চৌহদ্দীর মধ্যে যে জমি থাকে।

পচান জমি = যাহার জল প্রায় শুকায় না; যাহাতে জলে কাদায় পচান চাষ দিতে হয়।

লাল জমি = যে জমি শুষ্ক হইয়া যায় এবং তাতে চাষ দেওয়া যায়।

খরা, শুক্‌নার সময় = যখন বৃষ্টি হয় না, বেশ রৌদ্র হয় সেই সময়।

কাঁচল ধরা = মাটী আঠাযুক্ত হওয়া; মাটী শক্ত হওয়া।

মেটেল = কর্দ্দমাক্ত মাটী।

জমির যো = জমি চাষের উপযুক্ত হওয়া ; অধিক রস থাকিলে মাটী ঢেলা বাঁধিবে এবং অত্যন্ত শুকাইয়া গেলে লাঙ্গল দিবার অসুবিধা হইবে।

শিক্লাইয়া = শক্ত হইয়া।

ওকড় = উৎরান, তৈয়ারি হওয়া।

খন্দ = কার্ত্তিকী ফসল ; কড়াই, সরিষা, মুগ, মসুর প্রভৃতি।

উথরাইয়া = যো টানিয়া ; যো নষ্ট হইয়া।

বাত = রসাল ; চাষের উপযুক্ত।

এয়ামে = মরসুমে।

বৈদিক যুগের উদ্ভিদ

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

(ভারতী হইতে)

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের কথা শুনিতে সকলেরই আগ্রহ এবং কৌতূহল আছে জানি ; কিন্তু সে ইতিহাস মনোহর আখ্যানরূপে না পাইলে অনেকেরই পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। অনেকেই ভুলিয়া যান যে, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা সংগ্রহ না করিলে ইতিহাস হয় না, এবং সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথার বিবরণ কেহই উপন্যাসের মত মনোহর করিয়া তুলিতে পারে না। ইতিহাসের প্রতি যদি যথার্থ শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে যে সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় ইতিহাসের যথার্থ ভিত্তি, সে গুলির প্রতি মনোযোগ না দিলে চলে না। অতি প্রাচীন আর্য্যনিবাসে কি কি বৃক্ষলতাদি ছিল, সে সকল কথা জানিতে পারিলে যে প্রাচীন আর্য্যনিবাসের ভৌগোলিক স্থিতি বিষয়ক জ্ঞান সুস্পষ্ট হয়, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে।

বৈদিক যুগে উদ্ভিদ জাতি দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইত, যথা (১) "বীরুধ" (Plant) এবং (২) "বনস্পতি" (tree)। বীরুধবর্গের মধ্যে যেগুলি ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারিত, কিংবা কোন বিশেষ গুণের জন্য আদৃত হইত, বা যাহা বৎসরকাল বা অনধিক কাল থাকিয়া ফল পাকিলে মরিয়া যায় তাহাদের নাম নাম ছিল "ওষধি"। বৃক্ষ বলিলে বীরুধ, বনস্পতি প্রভৃতি সকল শ্রেণীকেই বুঝাইত। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় plant অর্থে "ক্ষুপ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং অন্যান্য নূতন পারিভাষিক শব্দ সাহিত্যপরিষৎ-সভা কর্ত্তৃক প্রচারিত করিতেছেন

যোগেশ বাবুর অবলম্বিত নূতন শব্দগুলি যখন ব্যবহৃত শব্দ নহে, এবং ঐ শব্দগুলি যখন লোককে নূতন করিয়া মুখস্থ করিতে হইবে, তখন বৈদিক যুগের শ্রেণীবিভাগ অবলম্বন করিলে ক্ষতি কি ?

বৃক্ষ-শরীরের বিভিন্ন অংশের যে সকল নাম পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই এখনও পর্য্যন্ত ব্যবহৃত থাকিলেও অন্যান্য অপ্রচলিত শব্দের সহিত সে গুলিরও উল্লেখ করিতেছি। শিকড়ের নাম ছিল "মূল"; stem অর্থে "কাণ্ড" শব্দ প্রচলিত ছিল, এবং "শাখা", "পর্ণ", "পুষ্প" এবং "ফল" শব্দগুলিও সে যুগে উহাদের আধুনিক অর্থেই ব্যবহৃত ছিল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এবং একালে যাহাকে "পল্লব" বলে, তাহার নাম পাওয়া যায় "বল্‌শ", এবং বৃক্ষের "স্কন্ধ" corona অর্থজ্ঞাপক। ফলের অন্য নাম "বৃক্ষ্য" হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বড় গাছ হউক, লতা হউক, ওষধি হউক, সকলগুলিই বৃক্ষ সংজ্ঞায় পরিচিত ছিল। বট প্রভৃতি যে সকল বৃক্ষে বায়বীয় মূল দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল বৃক্ষের সেই মূলগুলি শাখা কিংবা মূল নামে অভিহিত হইত না, এবং উহার স্বতন্ত্র নাম ছিল "বয়া"। এই "বয়া" শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত নাই; অথচ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত "বয়া" বঙ্গদেশের কোন কোন প্রদেশে এখনও বট গাছের "ঝুরি" অর্থে ব্যবহৃত আছে। বয়া শব্দটি বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে "ব" নামেও প্রচলিত আছে।

যে শ্রেণীর উদ্ভিদ ঝোপ সৃষ্টি করে, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে bush বলে, তাহাদের বৈদিক নাম ছিল "স্তম্বিনীঃ"। বাঁশ, তাল, খেজুর, কচু প্রভৃতি যে সকল গাছে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটি করিয়া পাতা বাহির হইবার পর সেই পাতাটিরই খাপ বা আবরণের মধ্য হইতে আর একটি পাতা বাহির হয়, কিন্তু একসঙ্গে দুইটি পাতা নির্গত হয় না, তাহাদিগের নাম ছিল "একশুঙ্গাঃ"। "এক-কটিলিডন্" বুঝাইবার পক্ষে এ শব্দটি এখন ব্যবহৃত হইতে পারে কি ?

যদি একটি কাণ্ড বিভক্ত হইয়া বহু শাখায় পরিণত হইত, এবং শাখাগুলি আবার বিভক্ত হইয়া অনেক প্রশাখার সৃষ্টি করিত তবে ঐ শ্রেণীর বৃক্ষগুলির নাম হইত "অংশুমতীঃ"। অন্য দিকে আবার যে গাছগুলির কাণ্ড শাখায় পরিণত না হইয়া ঊর্দ্ধ সীমা পর্য্যন্ত সোজা উঠিয়া যাইত, তাহাদিগকে "কাণ্ডিনীঃ" বলিত। উদ্ভিদ বিদ্যা-বিদেরা দেখিতে পাইতেছেন যে Deliquescent এবং Excurrent শব্দদ্বয়ের অনুবাদের জন্য দুইটি চমৎকার শব্দ পাওয়া গেল। আশা করি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে এই শব্দ দুইটি নিশ্চয়ই গৃহীত হইবে। "কাণ্ডিনী"র মধ্যে যে বৃক্ষগুলিতে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত অনেক শাখা থাকিত, তাহাদের নাম ছিল "বিশাখাঃ"।

গাছে ফুল ফুটিলে গাছগুলিকে 'পুষ্পবতীঃ' বলিত বটে, কিন্তু যে সকল গাছে ফুল

ফুটে অর্থাৎ যাহারা flowering, তাহাদের নাম ছিল "প্রসূবরীঃ"। হয় ত এখন এ অর্থে "সপুষ্পক" শব্দ চলিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে না ; কিন্তু এই শব্দটি ব্যবহৃত হইলে একটি বিশুদ্ধ শব্দের প্রচলন হয়।

ডাঁটা বাহির হইয়া যখন ডাঁটার উপর ফুল ফুটে, তখন একটি অসংবদ্ধ প্রণালীতে ফুল ফুটিলে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকে panicle বলে। এই panicle এর খাঁটি বৈদিক নাম "তূল"। শব্দটি এ কালের ব্যবহারে না লাগিলেও আমরা সে কালের শব্দ সম্পদ দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি।

লতা অর্থে সাধারণ শব্দ ছিল "প্রতন্বতীঃ" ; এবং যে লতা গাছ বাহিয়া না উঠিলে বাড়ীতে পারে না, তাহার নাম ছিল 'ব্রততি' এবং যাহারা সাধারণতঃ মাটিতেই বিস্তার লাভ করে, তাহাদের নাম ছিল "অলসালা"। আমরা এখন অর্ব্বাচীন সংস্কৃতের "লতা" শব্দই সকল প্রাদেশিক ভাষাতেই ব্যবহার করিয়া থাকি ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রভেদ রক্ষা করিবার জন্য climber অর্থে 'ব্রততি' এবং creeper অর্থে "অলসালা" ব্যবহৃত হইলে মন্দ হয় না। শেষোক্ত শব্দটি কঠোর মনে হইলে অর্থ রক্ষা করিয়া "অলসা" শব্দ ব্যবহার করিলে ক্ষতি কি ?

কাঠ বুঝাইবার জন্য "ক্রমুক", "ক্রুমুক" এবং "দারু" শব্দ পাওয়া যায়। "পর্ণ" ভিন্ন পাতার অন্য কোন নাম পাওয়া যায় না। বাকলার নাম ছিল "বল্ক",— "বল্কল নহে। প্রাচীন প্রাকৃতে বর্ণব্যত্যয়ে "বল্ক" "বক্ল" উচ্চারিত হইত, এবং সংস্কৃত ভাষায় ঐ দুইটি শব্দের খিঁচুড়িতে "বল্কল" শব্দ হইয়াছিল। গাছের আঠা, রস প্রভৃতি সকলেরই নাম ছিল "নির্য্যাস"।

এখন বর্ণমালাক্রমে বীরুধ এবং বনস্পতিদিগের নাম দিতেছি। (১) অজশৃঙ্গী (সম্ভবতঃ বাবলা), (২) অপামার্গ (আপাঙ্গ, ঔষধে ব্যবহৃত), (৩) অমলা (আম্লা, আমলকী), (৪) আমূলা (গাছে ঝুলিত, শিকড় হইত না এবং শরের মুখ বিষাক্ত করিবার জন্য উহার রস ব্যবহৃত হইত বলিয়া অথর্ব্ব বেদে উল্লিখিত আছে ; একজন ইংরেজ পণ্ডিত এই অমূলাকে Methonica Superba বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন), (৫) অরটু (Colosanthes Indica—ইহার কাঠে গাড়ির চাকার "ধুরা" প্রস্তুত হইত), (৬) অরাটকী (সম্ভবতঃ অজ শৃঙ্গী হইতে অভিন্ন), (৭) অরুন্ধতী (এই ওষধি লতা বা ব্রততি বড় বড় গাছে উঠিত, এবং উহা "হিরণ্যবর্ণ" ছিল, এবং উহার ডাঁটায় হুল থাকিত অর্থাৎ "লোমশবক্ষণা" ছিল বলিয়া অথর্ব্ব বেদে উল্লিখিত ; ইহাও লিখিত আছে যে, উহার রস গোরুকে খাওয়াইলে গোরু বেশী দুধ দিত, এবং ঐ লতা হইতে লাক্ষা সংগৃহীত হইত) (৮) অর্ক (আকন্দ), (৯) অলাপু বা অলাবু (লাউ-) (১০) অবকা বা শীপাল (গন্ধর্ব্বেরা নাকি ইহার শাক খাইতেন ; ইহা জলে জন্মিত। পরবর্ত্তী সময়ে ইহাকে শৈবল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায় ; কেহ কেহ ইহাকে

Blyxa Octandra সংজ্ঞা দিয়াছেন), (১১) অশ্বগন্ধা (উহার অর্থ এই যে ঐ ওষধি প্রস্তরগন্ধি ; পরবর্ত্তী সময়ে ইহারই নাম হইয়াছে অশ্বগন্ধা), (১২) অশ্বত্থ, (১৩) অশ্ববার (এক শ্রেণীর নলবিশেষ), (১৪) আণ্ডীক (পদ্ম), (১৫) আদার (আমাদের আদা), (১৬) আবয়ু (অন্য নাম সর্ষপ বা সরষা), (১৭) আল (শষ্যক্ষেত্রের আগাছা), (১৮) উদুম্বর ডুমুর), (১৯) উর্ব্বারু (শসা), (২০) উশনা (শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে, সোমলতা না পাইলে উহা হইতে সোমরস বাহির করা হইত), (২১) এরণ্ড (খাঁটি বেদে উল্লেখ নাই ; অনেক পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ সাহিত্যেই নামটি পাওয়া যায়), (২২) ঐক্ষগন্ধি—ষাঁড়ের গায়ের গন্ধবিশিষ্ট অর্থ হইলেও কোন সুগন্ধি ওষধিবিশেষ ; ইহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

(২৩) কিয়াম্বু (কি প্রকারের শাক, তাহা জানা যায় না ; তবে যেখানে শবদাহ হইত, সেখানে জলের মধ্যে লাগাইবার নিয়ম ছিল ; মৃতের সৎকারের ইহাও একটি অঙ্গ ছিল যে, কিয়াম্বু এবং (২৪) পাকদূর্ব্বা শ্মশানে লাগাইতে হইত ; (পাকদূর্ব্বা এ কালের জোয়ার), (২৫) কুমুদ, (২৬) কুষ্ঠ (ইহার আর এক নাম বিশ্বভেষজ, অর্থাৎ ইহা প্রায় সকল রোগেরই ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইত ; এই বীরুধ হিমালয়ের উপরে পাওয়া যাইত, লেখা আছে, (২৭) জঙ্গিড় (ইহাকে Terminalia Arjuneya বলিয়া কেহ কেহ পরিচয় দিয়া থাকেন)।

(২৮) কর্কন্ধু (কেহ কেহ ইহাকে রক্তবর্ণ বদর বা কুল বলিতে চাহেন ; কিন্তু আমার মনে হয় যে ইহা লাল কুমড়া ; ওড়িয়াতে কুমড়াকে "কখারু' বলে, এবং হয়-ত বা পূর্ব্বে ছাঁচি কুমড়াকে কর্কন্ধু বা কধু বলিত বলিয়াই লাউ ঐ "কধু" নামে আখ্যাত হয়), (২৯) কাকম্বীর (কি বৃক্ষ, জানা যায় না)।

তৃণ এবং নলবর্গে কুশ, কাশ প্রভৃতি ব্যতীত (৩০) "কুশর" নামে একটি বড় নল-তৃণ উল্লিখিত দেখিতে পাই। এক সময়ে আক্‌কে অনেক স্থানে নলের মত তৃণ বলিয়া "কুশর" বলা হইত। এই বৈদিক কুশর শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত নাই ; অথচ একদিকে সম্বলপুরে এবং অন্যদিকে যশোহরে, পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গে "কুশারি' এবং "কুশর" শব্দ আক্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩১) কিংশুক, (৩২) খদির এবং (৩৩) খর্জ্জূর সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই, তবে "খর্জ্জূর"-এর দীর্ঘ-উকারটি লক্ষ্য করিবার জিনিষ। (৩৪) তিল আমাদের পরিচিত ; কিন্তু (৩৫) তিল্বক কি, তাহা জানি না। একজন পণ্ডিত উহাকে Symplocos Racimosa বলিয়াছেন ; কিন্তু তাহা ঠিক্ বলিয়া মনে হইতেছে না। (৩৬) তৌদী এবং (৩৭) ত্রায়মাণ কি, তাহা জানা যায় না। (৩৮) নারাচী বলিয়া যে বিষাক্ত ওষধির নাম জানা যায়, শরে উহার প্রয়োগ হইত বলিয়াই হয়ত "নারাচ" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। (৩৯) পাটা—এক প্রকারের জলজ শৈবল বলিয়া মনে

হয়। এখনও ঐ নামে শৈবল বা শৈবাল চিনি পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (৪০) পূতীক আমাদের পুঁই।

(৪১) ন্যগ্রোধ আমাদের বটগাছ; (৪২) পলাশও আমাদের পরিচিত। বেদে যে (৪৩) পিপুল শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ ক্ষুদ্র ফল—পিপুল নহে। (৪৪) পীতুদারু অথবা পূতুদ্রু হিমালয় জাত সরল বৃক্ষ বা দেবদারু। (৪৫) প্লক্ষ হইল পাকুড়, (৪৬ ও ৪৭) বদর এবং বিল্ব আমাদের পরিচিত। (৪৮) প্রস্থ কোন বৃক্ষ অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া মনে হয় না। সায়ণের টীকার অর্থ ধরিলে চারা গাছ বা তেউড় প্রভৃতি অর্থ হয়। ইংরাজি shoot কথাটিকে ওড়িয়ায় "গজা" বলিতে পারা যায়; বাঙ্গলায় কি বলিব? বঙলায় তেউড় বলা যায়।

(৪৯) বজ সম্ভবতঃ আমাদের এ কালের বচ, (৫০) বিম্ব ঠিক্ তেলাকুচ বা তিক্তলকুচ বটে, এবং অথর্ব্ব বেদের (৫১) ভঙ্গ ঠিক্ নেশা করিবার ভাঙ্গ।

(৫২) মঞ্জিষ্ঠা কি, তাহা আমরা জানি। (৫৩) মদুঘ (মধুঘ নহে) কোন মদ্য উৎপাদক বৃক্ষের নাম ছিল। (৫৪) বিষাঙ্কা কি প্রকার বিষাক্ত গাছ, তাহা জানা যায় না।

(৫৫) শন আমাদের শণ বা hemp; কিন্তু (৫৬) শফক কি, তাহা ধরিতে পারা গেল না। (৫৭) শালুক ঠিক পদ্মের গাছের অঙ্কুর বা তেউড়। পদ্মজাতী জলজ উদ্ভিদ শাপলা নহে কি?

(৫৮) শমী বৃক্ষের নাম বেদে যে ভাবে পাওয়া যায়, তাহাতে কোন কোন পণ্ডিত-নির্দ্দিষ্ট Mimosa Suma বলিয়া উহাকে বিবেচনা করা যাইতে পারে না। অথর্ব্ব বেদে উল্লিখিত আছে যে উহার পাতা চওড়া, এবং নির্য্যাস পান করিলে নেশা হয়। ধন্বন্তরীর নির্ঘণ্টতে আছে যে, উহার রস মাখিলে শরীরের কেশ-বহুল স্থান সম্পূর্ণরূপে কেশশূন্য হয়। এই গাছের ডালেই অর্জ্জুন তাঁহার গাণ্ডীব ঝুলাইয়া ছিলেন।

(৫৯) শল্মলি (শাল্মলী নহে) বা শিম্বল ঠিক্ আমাদের "শিমুল" বটে। প্রথম নামটিতে অতিরিক্ত আ-কার যোগ হইয়া সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়, এবং দ্বিতীয় নামটি হইতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের "শিমুল" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

বৈদিক যুগে যে সকল বৃক্ষের সহিত পরিচয় ছিল, তাহাদের সকলগুলির নামই হয়ত এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিতে পারিয়াছি। হয়-ত আরও দুই দশটি নাম পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সেগুলির পরিচয় বড় সহজ হইবে মনে হয় না। (৬০) সোমলতার নাম সকলেই শুনিয়াছেন বলিয়া বিশেষভাবে উহার নাম উল্লেখ করি নাই; কিন্তু উহা যে কি প্রকারের বীরুধ ছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারেন নাই।

মিঠা জলের মুক্তার ঝিনুকের অনুসন্ধান

বঙ্গীয় মৎস্য বিভাগ হইতে এই সকল ঝিনুকের বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। এই অনুসন্ধানের ফল আমরা ৭ নং বুলেটিনে, প্রকাশিত হইয়াছে। ঝিনুকে যে মুক্তা পাওয়া যায় সেই জন্য ঝিনুকের কাজ আবশ্যকীয় বোধে লোকে করিয়া থাকে। এক্ষণে ছোট ছোট ঝিনুকের খোলাগুলি কেবল পুড়াইয়া চুণ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহার করা যায় এবং বড় বড় ঝিনুকগুলি কেবল বোতাম এবং গহনা করিতে কাজে আইসে।

ঝিনুকের কারবার এরূপভাবে চলিতেছে যে তাহার পরিমাণ এবং মূল্য নির্দ্দিষ্ট করা এক প্রকার অসম্ভব। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে বিশেষতঃ ঢাকা জেলায় বোতাম তৈয়ারি করা অনেক গৃহস্থের একটা সাধারণ কাজের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। এবং ঐ সকল বোতাম বাজারে বিক্রয় করিয়া অনেকেই দৈনিক খরচার কিয়ৎ অংশ উঠাইয়া লয়। ইয়ারিং, মাকড়ি, নলক, ঘড়ির চেন এবং অনেক প্রকার জামার বোতাম প্রভৃতি অল্প ও বিস্তর পরিমাণে অনেক স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিহারে একটী কারখানা আছে তাহাতে আধুনিক বোতামের যন্ত্র এবং কল ব্যবহার হয়। বোতাম তৈয়ারির জন্য দুইপ্রকার ঝিনুক ব্যবহার হয় যথা:—Parraysia লম্বা রকমের ঝিনুক এবং Lamellioms অর্থাৎ ছোট কিন্তু মোটা খোলাযুক্ত ঝিনুক।

বঙ্গদেশে অনেক দিন হইতে ঝিনুকের কাজ কেবল মুক্তার জন্য চলিতেছে। ঝিনুক পুড়াইয়া চুণ করা তাহার পর প্রচলিত হয়। এবং ঐ ঝিনুক হইতে বোতাম করা কেবলমাত্র গত ১৫ বৎসর হইতে চলিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই কার্য্য খুব বেশী পরিমাণে চলিয়াছিল। তাহার পর এই ব্যবসা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার ভাণ্ডারদহের বিলে ঝিনুকের কারবার খুব বিস্তৃতরূপে ছিল এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। আমরা জানিয়াছি যে ঐ সময়ে এক বৎসরে প্রায় ৫০,০০০ মণ ঝিনুক ঐ বিল হইতে উঠান হইত। এক্ষণে ঐ ঝিনুকের কারবার প্রায় বিলুপ্ত এবং উহা হইতে ঐ বিলের তীরবর্ত্তী একখানি গ্রামে ১৫ ঘর বাগ্‌দি যাহারা এই কাজ করিয়া থাকে তাহাদের উপযুক্ত কাজ যোগাইতে পারে না অর্থাৎ এই ১৫ ঘর লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইয়া উঠে না।

বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যার সমস্তই ছোট ছোট নদী এবং খাল বিলে ঝিনুক পাওয়া যায় কিন্তু আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে ইহার পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইতেছে। আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে কোন্ কোন্ কারণ বশতঃ ঝিনুকের বৃদ্ধি হইতে পারে নাই এবং কিরূপ ভাবেই বা ইহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

ঝিনুকের মধ্যে স্ত্রীজাতি এক সময়ে অনেকগুলি অণ্ড ধারণ করে, এবং তাহার পর ঐ সকল ডিম প্রসব করিলে ঐ ঝিনুকের ফুস্ ফুসে লাগিয়া থাকে ঐ সময়ে ইহাদের মধ্যে পুরুষজাতি ঐ সকল ডিমকে শুক্রসংযোগে ফলবতী করে। এই সংযোগ জলের একটু স্পন্দনেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিছুদিন ডিমগুলি এই অবস্থায় বৃদ্ধি পায় এবং তাহার পর এক প্রকার কীটে পরিণত হয়। কত দিনে এই বর্দ্ধন শেষ হয় প্রত্যেক প্রকার ঝিনুকের পক্ষে বিভিন্ন এবং এখনও জানা যায় নাই। এই কীটের দুইটী খোলা এবং একটী আংটা আছে। ইহাদের গ্লকিডিয়ম (Glochidium) বলে। ইহারা মাতৃদেহ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াই কোন এক বিশেষ প্রকার মৎস্য ডানায় সংলগ্ন হয় এবং যতদিন না ঝিনুকের অবয়ব প্রাপ্ত হয় ততদিন ঐ অবস্থায়ই সংলগ্ন থাকে। তাহার পর ইহারা মাছের ডানা হইতে খসিয়া পড়ে এবং আপনার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই বৎসর জুন মাসের প্রারম্ভে আমরা পূর্ব্ববঙ্গে ধৃত কয়েকটী বোল এবং গজাল মাছের ডানায় বহুসংখ্যক উক্ত প্রকার গ্লকিডিয়ম পাইয়াছি। অবশ্যই অন্য অন্য মাছে এ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে কিন্তু সে বিষয়ে এখনও কোনও কিছু জানিতে পারা যায় নাই। পুনশ্চ বাক্‌সারে ১৬ই জুন তারিখে এক প্রকার তলদেশের জালের দ্বারা বহুসংখ্যক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিনুক পাওয়া গিয়াছে। অতএব ঝিনুকসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন দেখা যাইতেছে যে ঝিনুকের বৃদ্ধির জন্য কয়েক প্রকার মাছ বেশী পরিমাণে আবশ্যক। এবং এই জাতীয় মাছ কমিয়া যাইলে ঝিনুকেরা তাহাদের জীবনের একভাগ পরিপূর্ণ করিতে পারে না এবং সেইজন্য তাহারা নষ্ট হইয়া যায়।

১৯১৪ সালের মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত এক বৎসরে জার্ম্মানি এবং অষ্টিয়াহাঙ্গেরি হইতে এই দেশে ৪০৬২১৪ টাকা মূল্যের ঝিনুকের বোতাম আমদানি করা হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে এই ঝিনুকের কারবার হইতে অনেক উপকার হইতে পারে। কিন্তু ঝিনুকের উন্নতি না হইলে বোতাম, গহনা প্রভৃতির কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। এই সকল কার্য্যে উন্নতি করিতে হইলে ভাল রকমের ঝিনুক প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক। কিন্তু যতদিন না আমরা ঝিনুকের বিষয় সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি ততদিন পর্য্যন্ত ইহাদের বর্দ্ধনের উপায় করা যাইতে পারে না। ঝিনুকের ভিতর যে সকল ব্যাধিকীটের চারিদিকে মুক্তা জন্মায় তাহাদেরও বর্ণনা এখন করা যায় নাই।

(১) দেশী বর্ষবহুজননক্ষম বর্ণসঙ্কর রেশম কীট দেশী বর্ণশুদ্ধ রেশমকীট অপেক্ষা অধিক রেশম প্রদান করে। কিন্তু বর্ণসঙ্কর কীট পালনে বসনীদের বিশেষ আস্থা নাই; সুতরাং সঙ্কর জাতি-পালন-প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে উহাদের সকল প্রকার পরিবর্ত্তন বিরোধীতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(২) বর্ণশুদ্ধ বর্ষবহুজাত স্ত্রী প্রজাপতি কিম্বা পুং প্রজাপতি স্থানান্তরে হইতে আনীত ঐ জাতীয় স্ত্রী কিম্বা পুং প্রজাপতির সহিত সংযোজিত ডিম ও তজ্জাত পলু এক স্থানের ঐ জাতীয় প্রজাপতির ডিম হইতে উৎপন্ন পলু অপেক্ষা সবলকায় হয় ও ইহাদের রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতাও বেশী হইয়া থাকে।

(৩) মহীশূরজাত রেশম কীট দেশী অন্যান্য জাতীয় রেশম গুটি অপেক্ষা বড় ও বেশী রেশম প্রদান করে। নিস্তারি পলু এপ্রিল ও মে মাসে, মহীশূর জাতি জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত এবং বর্ষ একজাত পলু অক্টোবর হইতে মার্চ্চমাস পর্য্যন্ত পালন করা উচিত।

(৪) সকল জাতীয় রেশম কীট, বড় তুঁতগাছের পাতা খাইলে, বড় ও ভাল গুটি উৎপন্ন করে কিন্তু উহাদিগকে ছোট ঝোপ গাছের পাতা খাওয়াইলে উৎপন্ন গুটি-গুলি ছোট হয় ও কম রেশম প্রদান করে।

(৫) বিদেশ হইতে আনীত বর্ষ একজাত ডিম পালন করা উচিত। এই জাতীয় ডিম ফেব্রুয়ারী ও অক্টোবর মাসে এবং যে মাসে স্বাভাবিক তাপ প্রায় ৬৫° ডিগ্রি হইতে ৮৫° ডিগ্রি (ফাঃ) পর্য্যন্ত হয় সেই মাসে পালন করাও যাইতে পারে।

(৬) বিদেশ হইতে আনীত ডিম ও দেশে উৎপন্ন বর্ষএকজাত পলুর ডিম কোনও পাহাড়ে অথবা বরফের কলে প্রায় চারি মাস রাখিয়া শীত খাওয়াইয়া আনিলে তিন, চারি দিনের মধ্যেই ফুটাইয়া লওয়া যায়।

(৭) বিদেশ হইতে আনীত বর্ষএকজাত ডিম হইতে উৎপন্ন পলুতেও দেশে পালিত ঐ জাতীয় ডিম হইতে উৎপন্ন পলুতে রোগের পরিমাণ প্রায় সমান।

(৮) প্রথমে কিছু দিনের জন্য বিদেশ হইতে আনীত ডিম শীত খাওয়াইয়া পালন করা উচিত ও বসনীদিগকে পালন করিবার জন্য দেওয়া উচিত।

(৯) বিদেশ হইতে আনীত বর্ষএকজাত ডিম হইতে যে স্থানে ভাল ফল পাওয়া না যায় সেই স্থানে দেশী বড় পলুর ও বিলাতি পলুর বর্ষএকজাত সঙ্কর জাতির ডিম পালন করা যাইতে পারে।

(১০) বর্ণশুদ্ধ বর্ষএকজাতি অপেক্ষা ইতালীয় ও জাপানের বর্ষএকজাতীয় প্রজাপতির মিশ্রণে গঠিত বর্ণসঙ্কর জাতি ভাল ফল প্রদান করে।

(১১) কৃত্রিম উপায়ে (শীত না খাওয়াইয়া) বর্ষএকজাত পলুর ডিম ফুটাইয়া লইলে ভাল ফল পাওয়া যায় না।

(১২) পলু বাহিরে তুঁতগাছে থলিয়ার মধ্যে পালন করিলে গুটি কিছু ছোট হয় ও রেশমের পরিমাণও কম হয় বটে কিন্তু প্রজাপতিগুলি খুব সবল হয় ও ভাল ডিম পাড়ে সুতরাং ঐ ডিম হইতে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু বাহিরে পলু পালন করিতে হইলে অনেক খরচ হয়।

(১৩) বর্ষবহুজাত ডিম শীতে অর্থাৎ খুব ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিলে প্রায় ২৫দিন পর্য্যন্ত ভ্রূণ নষ্ট না করিয়াও পরে ফুটাইয়া লইলে ভাল ফল প্রদান করে কিন্তু তাহাদের গুটি বড় হয় না কিম্বা রেশমও বেশী পাওয়া যায় না।

(১৪) নিম্নলিখিত উপায়ে বর্ষবহুজাত জাতির ন্যায় সঙ্কর জাতির ডিম ফুটাইয়া লইলে বর্ষবহুজাত গুটি অপেক্ষা অনেক বড় ও বেশী রেশম সংযুক্ত গুটি পাওয়া যায়;— (১) বর্ষএক জাতির পুরুষ প্রজাপতির সহিত অথবা (২) বর্ষএকজাত ও বর্ষবহুজাত বর্ণসঙ্করজাতির প্রথম অথবা তৎপরবর্ত্তী কোনও বংশের পুংপ্রজাপতির সহিত অথবা এই জাতির পুরুষ ও বর্ষবহুজাত জাতির স্ত্রী প্রজাপতির সহিত সংযোজিত হইয়া যে পুরুষ প্রজাপতি হইবে তাহার সহিত বর্ষবহুজাত স্ত্রী প্রজাপতি সংযুক্ত হইয়া যে ডিম পাড়িবে ঐ ডিম প্রথম পুরুষে বর্ষবহুজাত ডিমের ন্যায় ফুটিবে ও উহারা সবল হইয়া বড় ও ভাল রেশম গুটি প্রদান করিবে। প্রত্যেক পুরুষেই ঐ দুই প্রকার পলু এক সময়ে পালন করিয়া প্রজাপতিগুলি যাহাতে একদিনে বাহির হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই বর্ণসঙ্কর জাতির ডিম প্রথম পুরুষে প্রায় সবগুলিই বর্ষবহুজাতির ন্যায় ফুটিবে কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষে প্রায় সব ডিমগুলিই বর্ষএকজাত হইবে; সুতরাং ঐ ডিমগুলিই বর্ষবহুজাত জাতির ডিমের ন্যায় পালন করা চলিবে না কিন্তু ঐ গুলিকে শীত খাওয়াইয়া লইলে ডিম পাড়িবার প্রায় চারিমাস পরে পালন করা যাইবে।

বাঙ্গালায় সরকারী নার্শারীগুলিতে বাঙ্গালার সমস্ত বসনীদের প্রতিবৎসর যত ডিম দরকার তত ডিম এই উপায়ে প্রস্তুত করা সম্ভবপর নয় এবং বসনীরা নিজেরাও এই উপায়ে ভাল ডিম প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন।

(১৫) আমরা এই প্রকার একটি সবলকায় বর্ষবহুজাত বর্ণসঙ্কর জাতি গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছি যাহা হীন বল না হইয়া বর্ণশুদ্ধ বর্ষবহুজাত জাতি অপেক্ষা অধিক রেশম উৎপাদন করিবে।

মৌমাছির যত্ন

(পুষা রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের মৌমাছি-পালন পুস্তক হইতে)

ফ্রেমগুলিকে সমান সমান এবং নিয়ম মত দূরে না রাখিলে দুইটি মৌচাকের মধ্যে যদি ফাঁক কম হয়, তবে মৌমাছিরা দুইটি মৌচাককে জুড়িয়া দিবে কিম্বা আড়ভাবে দুই তিনটি ফ্রেম জুড়িয়া মৌচাক গড়িবে। আবার যদি ফাঁক বেশী হয়, তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে নূতন একটি মৌচাক গড়িবে। মৌচাকগুলি সোজা হওয়া উচিত। যদি বাঁকা হয়, বাঁকা অংশটি টিপিয়া সোজা করিয়া দিতে পারা যায়। ইহাতে সোজা না হয়, কাটিয়া দেওয়া যায়। মৌচাকের কোন অংশ যদি ফুলিয়া উঠে, তাহাও কাটিয়া দেওয়া যায়। মৌমাছিরা যতগুলি মৌচাক জুড়িয়া বসে ও ঢাকা রাখিতে পারে, ততগুলি ঘরে রাখা উচিত। বাকি বাহির করিয়া লইয়া এমন বাক্সে রাখিতে হয়, যাহাতে পোকা লাগিতে না পারে।

সাধারণতঃ রোজ রোজ মৌমাছির ঘর খুলিয়া সমস্ত মৌচাক্ পরীক্ষা করিবার দরকার হয় না। ৮।১০ দিন পরে পরে একবার করিয়া দেখা দরকার যে (১) রাণী বাঁচিয়া আছে এবং ডিম পাড়িতেছে। রাণীকে না দেখিতে পাইলেও যদি ছোট বাচ্চা এবং ডিম থাকে, তাহা হইলে রাণী বাঁচিয়া আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। আইবড় রাণী হইলে এখানে একটি ওখানে একটি ডিম পাড়িবে। আর দাসী রাণী এক কোষেই একটির বেশী ডিম থাকে। অন্য সময় কম থাকে। (২) মৌমাছিদের খাবার অভাব হয় নাই, কোন না কোন মৌচাকে মধু থাকিলেই হইল। (৩) মৌমাছিরা সমস্ত মৌচাকগুলি ঢাকিয়া রাখিতে পারে কি না ; যদি না পারে, বাড়তি মৌচাক বা মৌচাকগুলি ঢাকিয়া রাখিতে পারে কি না, যদি না পারে, বাড়তি মৌচাক্ বা মৌচাক্গুলি বাহির করিয়া লওয়া উচিত। (৪) মোমের পোকা বা অপর কোন শত্রু ঘরে ঢুকিতে পারে নাই। দেশী মৌমাছির বাসায় প্রায়ই ঘরের মেঝেতে মৌচাকের টুকরা ইত্যাদি জড় হয় এবং মৌচাকের ও মোমের পোকা কোন মৌচাকে না থাকিলেও এই সকল টুকরা বা ময়লাতে থাকে। যদি পোকা থাকে মারিয়া ফেলা উচিত।

ঘর খুলিয়া না পরীক্ষা করিলেও রোজ একবার করিয়া দেখা উচিত। মৌমাছিদের আচরণ দেখিয়া, বিশেষতঃ সকাল বেলায়, সহজেই ধরা যায় যে, ইহাদের অবস্থা ঠিক আছে কি না। বৃষ্টি, বাদল বা কোয়াসা না থাকিলে মৌমাছিদের সাধারণভাবে কাজ করা উচিত ; বাসা হইতে উড়িয়া যাইবে এবং পরাগ ইত্যাদি লইয়া ফিরিয়া আসিবে। সময় অনুসারে কাজ কম বেশী হয়। মধুকালে খুব বেশী কাজ করে। যদি কাজ না করিয়া বাসার চারিধারে উড়িতে থাকে বা অনেক মৌমাছি বাসার সম্মুখে বিমনা হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে বাসা খুলিয়া দেখা উচিত।

বর্ষাকালে মধু ইত্যাদি কম পাওয়া যায়, সেই জন্য এই সময় মৌমাছিরা খুব কম কাজ করে। যদি বাসায় মধু না থাকে, তবে এই সময় ইহাদিগকে খাবার দিতে হয়। অত্যন্ত শীতের সময় যদি ঠাণ্ডার দরুণ কাজ করিতে না পারে, তবে এই সময়েও খাবার দেওয়ার দরকার হইতে পারে। যখন বাহির হইতে মধু ইত্যাদি কম পাওয়া যায়, তখন রাণী কম ডিম পাড়ে এবং বাচ্চাও অল্প পালা হয়। বর্ষার পর আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বেশী করিয়া বাচ্চা পালা হয়, তখন আবার বেশী মৌচাক দেওয়ার দরকার হইতে পারে। বাসায় যে সকল মৌচাক্ থাকে, সেইগুলি যদি মধু, পরাগ, ডিম বা বাচ্চা ভরিয়া যায়, তাহা হইলে ইহাদের মাঝখানে খালি মৌচাক বসাইয়া দিতে হয়। এইরূপে মৌচাক যোগাইয়া রাণী যাহাতে ডিম পাড়িবার অনেক জায়গা পায় এবং অনেক বাচ্চা পালা হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হয়। যদি তৈয়ারি মৌচাক্ না থাকে, তবে নূতন মৌচাক গড়াইতে হয়। এই কাজের জন্য অন্য দলের গড়া খালি মৌচাক ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই মৌচাক যদি ফ্রেমে গড়া না হয়, ছক দিয়া ফ্রেমে লাগাইয়া দিতে পারা যায়।

পাহাড়ে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসেই বেশী মধু পাওয়া যায়। সমতল দেশেও মৌমাছিরা এই সময় কিছু মধু যোগাড় করে, তবে বেশী নয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে সমতল দেশে বেশী মধু পাওয়া যায় এবং জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত কিছু কিছু পাওয়া যাইতে পারে। মধুকালেই বেশী বাচ্চা পালা হয়, সেইজন্য এই সময় দলও খুব বড় হয়। আবার মধুকাল শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কম বাচ্চা পালার দরুণ দলও ছোট হইতে থাকে। দল ছোট হইলে মৌমাছিরা সমস্ত মৌচাক ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। তখন বাড়তি মৌচাকগুলি বাহির করিয়া লইয়া এমন ভাল জায়গায় রাখিয়া দিতে হয়, যেখানে মোমের পোকার কীড়া ঢুকিতে না পারে।

মধুকাল শেষ হবার পর যদি মৌমাছিদের মত যথেষ্ট মধু ঘরে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মৌমাছিদিগকে বড় বেশী দেখা শুনা করিতে হয় না।

নিকটে যদি পুকুর, ঝরণা, বা জলের কল না থাকে, তাহা হইলে মৌমাছিরা যাহাতে জল পায়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে হয়। ঠাণ্ডা জায়গায় হাঁড়ি বা গামলায় জল রাখিতে হয় এবং দুই এক দিন অন্তর বদলাইয়া দিতে হয়।

কেমন করিয়া নূতন মৌচাক্ গড়াইয়া লইতে পারা যায়

মধুকাল ছাড়া অন্য সময় কোন দলই নূতন মৌচাক্ গড়িবে না। দল যখন বড় হইয়াছে এবং অনেক মধু যোগাড় করিতেছে, সেই সময় ফ্রেমের উপরের কাঠির নীচে মোম লাগাইয়া দলের মাঝখানে দিতে হয়। ইহার উপর মৌমাছিরা নূতন মৌচাক্ গড়িবে। একবারে একটি করিয়া ফ্রেম দিতে হয়। খালি

ফ্রেম না দিয়া ফ্রেমে পত্তন লাগাইয়া দিতে পারা যায়। এই পত্তনের উপর নূতন মৌচাক্ গড়িবে। দেশী মৌমাছির চেয়ে ইতালীয় মৌমাছিরা বেশী সহজে ও শীঘ্র পত্তনের উপর নূতন মৌচাক্ গড়ে। পত্তনের উপর মৌচাক্ গড়াইবার এক উদ্দেশ্য হইতেছে যে, মৌচাক্‌টি অনেক দিন থাকিবে এবং মৌমাছিদিগকে নূতন নূতন মৌচাক্ গড়িতে হইবে না। কিন্তু দেশী মৌমাছির মৌচাকে এত মোমের পোকা লাগে যে পত্তন কিনিয়া মৌচাক্ করাইয়া লাভ হয় না। মৌচাক্‌গুলি রক্ষা করিতে পারিলে লাভ আছে।

নূতন মৌচাক্ সাদা হয়। মৌমাছিরা বেশী দিন ব্যবহার করিলে রং কাল হইয়া যায়। যে ভাগে বাচ্চা পালা হয়, তাহার কোষে কীড়াদের তৈয়ারি গুটী থাকে বলিয়া সেই ভাগটি শক্তও হয়।

মৌমাছিকে খাওয়ান

সাধারণতঃ মৌমাছিদিগকে খাবার দেওয়ার দরকার হয় না, কারণ তাহারা যত দিন পাওয়া যায়, ফুল হইতে নিজেরাই মধু ও পরাগ যোগাড় করিয়া আনে। যখন ফুল হইতে মধু ও পরাগ না পাওয়া যায়, তখনও যদি ইহাদের ঘরে মধু ও পরাগ থাকে, তাহা হইলে খাবার দেওয়ার দরকার হয় না। মৌমাছিদের প্রধান খাদ্য মধু। যদি ঘরে কোন মৌচাকে মধু না থাকে, তাহা হইলে মধু কিম্বা চিনি কি গুড়ের সরবত দিতে হয়। খাবার অভাব হইলে ক্ষুধার জ্বালায় সমস্ত দলটিই ঘর ছাড়িয়া অন্য জায়গায় চলিয়া যাইতে পারে।

বাচ্চাদের প্রধান খাদ্য পরাগ। পরাগ না থাকিলে বাচ্চা পালা যাইতে পারে না। আমাদের দেশে পরাগের অভাব হয় না। বাহির হইতে মধু না পাইলেও মৌমাছিরা সব সময়েই পরাগ যোগাড় করে।

আমাদের দেশে কেবল বর্ষার সময়েই মধুরসের অভাব হয়। মধুকালের পর আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, এই কয় মাসের মত যথেষ্ট মধু যদি মৌমাছিদের জন্য তাহাদের ঘরে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর খাবার দেওয়ার দরকার হয় না।

অপর কোন কোন সময়ে মৌমাছিদের দল বৃদ্ধির সুবিধার জন্য খাবার দিলে লাভ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে সব জায়গাতেই কম হউক, বেশী হউক, মধুরস পাওয়া যায়। বর্ষার পরে এই সময়ে মৌমাছিরা বেশী বাচ্চা পালে। তার পর অগ্রহায়ণ মাসে আবার মধুরস কমিয়া যায়। সেইজন্য বাচ্চা পালাও কম পড়ে। মৌমাছিদের স্বভাব এমন যে, ঘরে যথেষ্ট মধু থাকিলেও বাহির হইতে যদি মধুরস না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা কম বাচ্চা পালে। সেইজন্য অগ্রহায়ণ মাসে বাহিরের মধুরস কম হইলে যদি একটু একটু খাবার দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা বাচ্চা

পালা কম বা বন্ধ করে না। এই সময় কিছু খাবার দিলে ইহারা সমান ভাবে বাচ্ছা পালিয়া যাইবে এবং দল খুব বাড়িতে থাকিবে। দল বড় হইলে পৌষের শেষে বা মাঘ মাসে যেমন মধুকাল আরম্ভ হয়, তখনই খুব বেশী বেশী মধু যোগাড় করে।

খাবার যেমন দরকার, সেই মত দিতে হয়। বেশী দিলে সমস্ত মৌচাক্ ভরিয়া রাখিবে এবং রাণী ডিম পাড়িবার জায়গা পাইবে না।

ছোট দলকে খাবার যোগাইয়া যে কোন সময়ে বেশী বাচ্ছা পালান যাইতে পারে। কারণ মৌমাছিদিগকে খাবার খোঁজে বাহিরে যাইতে না হইলে বাসায় থাকিয়া গরম রাখিয়া বেশী বাচ্ছা পালিতে পারে এবং দলটি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া যায়। তবে এইরূপে খাবার দিলেও যদি রাণী নিস্তেজ হয়, কিম্বা যদি দলে খুব কম দাসী থাকে, তাহা হইলে কোন ফল হয় না।

খাবার এবং কিরূপে ইহা দিতে হয়

মধুই মৌমাছিদের সব চেয়ে উত্তম খাবার। যদি কোন মৌচাকে বদ্ধ মধু থাকে, তবে মধুকোষগুলির মুখ আঁচড়াইয়া মৌচাক্‌টি ঘরের ভিতর রাখিয়া দিতে হয়, তখন মৌমাছিরা ঐ মধু ব্যবহার করে। ঘরের ভিতর কোন মৌচাকে এইরূপ মধু থাকিলে তাহারও মুখ এইরূপে আঁচড়াইয়া দিলে তার পর মৌমাছিরা এই মধু খাইতে থাকে।

অর্দ্ধেক মধু ও অর্দ্ধেক জল মিশাইয়া গরম করিয়া ফুটাইয়া দিলেও হয়, ঠাণ্ডা হইলে খাইতে দিতে হয়। আকের চিনির সরবত করিয়া (আন্দাজ আধ সের চিনি আড়াই কি তিন পোয়া জলে গুলিয়া এবং একটু গরম করিয়া) খাইতে দিতে পারা যায়। মাতিয়া গিয়াছে ও টক হইয়াছে, এমন গুড়, চিনি বা মধু খাইতে দেওয়া উচিত নয়। বাজারের কেনা মধুর সঙ্গে অনেক রোগের বীজ থাকে, সেই জন্য সব সময়েই এই মধু ভালরূপ গরম করিয়া তবে খাইতে দেওয়া উচিত।

মধু বা চিনির সরবত খালি মৌচাকের কোষে ভরিয়া এই মৌচাক্‌টি মৌমাছিদের ঘরের ভিতর রাখিয়া দিলেই হয়। ইহা ছাড়া খাবার দিবার নানা রকম টিনের ও কাচের পাত্র বিক্রি হয়। যদি এইরূপে মৌচাকে করিয়া খাবার দেওয়ার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে একটা চ্যাপ্টা বাটি বা টিনের পাত্রে ভরিয়া এই পাত্রটি ফ্রেমগুলির উপর রাখিয়া দিতে হয়। আর যাহাতে মৌমাছিরা সরবতে পড়িয়া ডুবিয়া না মরে, তাহার জন্য কয়েকটী হাল্‌কা কাঠি, খড় বা ঘাসের ডাঁটা বা সোলা সরবতের উপর ভাসাইয়া রাখিতে হয় এবং পাত্রের কিনারাতেও ঠেকাইয়া রাখিতে হয়, যেন মৌমাছিরা কাঠি বহিয়া নামা উঠা করিতে পারে। তাহা হইলে সরবতে পড়িয়া ডুবিবার ভয় থাকে না। পেচওয়ালা টিনের ঢাকনা দেওয়া ছোট ছোট বোতলকে বেশ খাবারের পাত্র করা যায়। ঢাকনাতে কয়েকটি ছিদ্র করিয়া দিতে হয়। সরবত ভরিয়া ঢাকনা কষিয়া তাহার উপর নেকড়া বাঁধিয়া উবুড় করিয়া

৬১ নং চিত্রের মত এক টুকরা কাঠের মধ্যে বসাইয়া ফ্রেমের উপর রাখিয়া দিতে হয়। বোতলের মুখটি কাঠের ছিদ্রে বসে এবং সরবত যেমন ঝরিতে থাকে, মৌমাছিরা চুষিয়া লয়। এইরূপে খাবার দিতে হইলে লেপ না সরাইয়া লেপের মধ্যে ছিদ্র কাটিয়া দিতে হয়। এই ছিদ্র দিয়া আসিয়া মৌমাছিরা খাবার লইতে পারে।

কৃষকের বক্তব্য

(প্রাপ্ত)

আজকাল দেখিতে পাই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সমস্ত সংবাদ পত্রই খাদ্যদ্রব্যের দুর্মূল্যতা ও তাহার প্রতীকারের নানারূপ আলোচনা ও উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

বঙ্গদেশে খাদ্যদ্রব্য বলিতে প্রধানতঃ ধান, চাল, ডাল, তৈল, লবণ, তরি তরকারী ইত্যাদিই বুঝাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে লবণ ব্যতীত জিনিষ আমাদের দেশেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে দেখা উচিৎ যে, এই সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয় কাহার দ্বারা? এবং ইহার ক্রয় বিক্রয়ে যে টাকা ব্যয় ও আয় হয় তাহা কে পায়? এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দেশের কৃষকেরাই এই সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া নিজে ভোগ করে ও অন্যকে সরবরাহ করিয়া থাকে। এদেশের আয় পনর আনা লোক কৃষিজীবী ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদী সম্মত। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই খাদ্য তথা আমাদের কৃষকদিগের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে কৃষকগণই তথা দেশের প্রায় পনর আনা লোকই লাভবান হয়, এই সমস্ত টাকা আমাদের দেশের লোকই পাইয়া থাকে। টাকা গড়িতে পারে না অবশ্য কিছু না কিছুর বিনিময়েই লোকে উহা পাইয়া থাকে। আপনাদের মুখেই শুনিতে পাই, উৎপন্ন জিনিষ যত অধিক মূল্যে বিক্রয় করা যায় ততই লাভ।

দেশের আজকাল যে অবস্থা এবং জীবন ধারণোপযোগী অন্যান্য বিদেশীয় যেরূপ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে যদি দেশের শিক্ষিত মহোদয়গণ চেষ্টা করিয়া খাদ্য দ্রব্যের তথা দেশের উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করিয়া দেন, তবে বোধ হয় কৃষকগণের দুরবস্থা চরমে পৌঁছিবে। দেশের অন্যান্য শ্রেণীর লোক, যেমন কারখানার শ্রমজীবী, আফিসের প্রভৃতি ধর্ম্মঘট ইত্যাদির দ্বারা স্ব, স্ব, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট

হইতে তাহাদের শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি করাইয়া লইয়া থাকে। কৃষকগণের নিজের উৎপন্ন দ্রব্য ব্যতীত আর কি আছে? তাহারা কাহার কাছে শ্রমের মূল্য বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিবে? এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিলে কি মনে হয় না যে, তাহারা গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, বর্ষার প্রবল ঝঞ্জাবাত মাথায় করিয়া বন্য শূকরের মত কাদা মাখিয়া সমস্ত দিন ও প্রায় অর্দ্ধেক রাত্রি পরিশ্রম করিয়া যাহা উৎপন্ন করে তাহা উচ্চমূল্যে বিক্রীত হওয়া উচিৎ। এরূপ অবস্থায় যদি কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায় তাহা হইলে তাহারা আজকাল যেমন যথাসাধ্য পরিশ্রমে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে ভবিষ্যতে তাহাও পারিয়া উঠিবে না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরিতে পারা যায় টাকায় যদি আটমণ চাল (বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সায়েস্তা খাঁর সময়ের দর) বিক্রয় হয় এবং কাপড়, কেরাসিন তৈল, লবণ ইত্যাদি বিদেশীয় দ্রব্যের মূল্য যদি বর্ত্তমানে যেমন আছে তেমনই থাকে, তাহা হইলে একজন কৃষক পরিবারের ২।৩ মাসের উপযোগী উক্ত জিনিষ সংগ্রহ করিতে তাহার সমস্ত বৎসরের উৎপন্ন ধান্যেও সঙ্কুলান হইবে না। গত কয়েক বৎসর পাটের দর হ্রাস হওয়ায় কৃষকদিগের কিরূপ দুর্গতি হইয়াছিল তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।

এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া স্বতঃই মনে হয় যে আপনারা দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানী বন্ধ করিবার এবং অন্যান্য যে সমস্ত উপায়ে দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের চেষ্টা করিতেছেন তাহা ঠিক নহে। যাহাতে দেশের পনর আনা লোকের সুবিধা তাহার বিরুদ্ধে যাওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

শেষে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাসের চেষ্টা না করিয়া যদি কৃষির উন্নতির চেষ্টা করেন ও কৃষিজাত দ্রব্য সকল কিরূপে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যাইতে পারে কৃষকদিগকে তাহা শিক্ষা দেন এবং বিদেশীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের চেষ্টা করেন তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইতে পারে।

জীবন ধারণোপযোগী যে সমস্ত জিনিষের জন্য আমাদিগকে বিদেশীয়দিগের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় সেই সমস্ত জিনিষ যাহাতে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে তজ্জন্য সকলের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। এমন কি আমরা যাহাতে প্রতিযোগীতায় বিদেশীয় আমদানী বন্ধ করিতে পারি তাহারও লক্ষ রাখা দরকার।

এম, রহমান। বগুড়া।

(হিতবাদী)

বঙ্গদেশের রেশম বাণিজ্য

A Monograph on the Silk Fabrics of Bengal by N. G. Mukerjee M. A, M, R, A. C. of the Bengal Provincial service.

রেশম, কার্পাস এবং শর্করা.—বর্ণিয়ার প্রণীত 'ভারত-ভ্রমণ' পুস্তকে এই তিনটী দ্রব্যই বঙ্গ-দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ণিয়ারের মতে বঙ্গদেশ জাত রেশম এবং কার্পাস কেবল যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অভাব পুরণ করিত এরূপ নহে। তিনি বলেন যে, এই রেশম এবং কার্পাস অন্যান্য ভারতীয় রাজ্য এবং সমগ্র ইউরোপ খণ্ডেরও অভাব পূরণে সমর্থ। ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। সেই সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতীয়, বিশেষতঃ বঙ্গীয়, রেশম বাণিজ্যের অনেকবার উত্থান পতন হইয়াছে। ১৭১৬ খৃঃ অঃ যে, বঙ্গীয় রেশম বিলাতী বাজার হইতে চীন এবং ইটালীর রেশম ভিন্ন অন্যান্য দেশ জাত সমস্ত রেশমের স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহাই আবার ১৮৯২ খৃঃ অঃ চীন, জাপান, ইটালী, ফ্রান্স প্রভৃতির নিম্নে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে বঙ্গদেশে রেশমের ব্যবসা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বাস্তবিক অন্যান্য অনেক কারণ বশতঃ, বিশেষতঃ বিদেশীয় বণিক সমূহের উৎসাহ এবং অধ্যবসায় বলে এবং অপর দেশ সমূহে বৈজ্ঞানিক প্রথাবলম্বনে, রেশমের অনেক উন্নতি সাধিত হওয়ায়, বিদেশীয় রেশমের বাণিজ্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার তুলনায় বঙ্গদেশে রেশম বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে কোন চেষ্টাই করা হয় নাই।

পাট, নীল অথবা চা ব্যবসায়ের ন্যায় রেশম ব্যবসায়েরও যাবতীয় উন্নতি বৃটিশ অর্থ এবং বৃটিশ উদ্যম দ্বারা সাধিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গীয় রেশমের উন্নতি ও বিলাতে তাহার কাটতির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তাঁহারা কাশিমবাজার, মালদহ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে কুঠি স্থাপন করিয়া রেশম-সূত্র এবং রেশমী বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন।

১৭৭৩ খৃঃ অঃ হইতে ১৮৯১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় কোরা রেশমের রপ্তানির হিসাবে দৃষ্ট হয় যে, উক্ত সময়ের প্রথমার্দ্ধে রপ্তানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১৮২৯ খৃঃ অব্দে প্রায় ১৭,৪৭ মণ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। তাহার পর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, মধ্যে কেবল ২০ বৎসর ভিন্ন (১৮৭০-৯০) রেশমের রপ্তানি ক্রমশঃ ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু রেশমের রপ্তানি যেমন কমিয়াছে পশমের রপ্তানি সেইরূপ বাড়িয়াছে। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে পশম কোন ব্যবহারেই আসিতে পারে বলিয়া ইউরোপীয়গণের ধারণা ছিল

না। কিন্তু এক্ষণে উহা অনেক ব্যবহারে লাগিতেছে এবং তজ্জন্য রপ্তানিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

সন	রেশম পাউণ্ড	পশম পাউণ্ড	কোয়া পাউণ্ড
১৮৮১-৮২	৩৩৯,৩৫২	৭৪[illegible],[illegible]১	২৮৫৮,৩
১৮৮২-৮৩	৫০১,৫৭১	৮৩১,৪০৫	২৩৪৫২
১৮৮৩-৮৪	৬৭২,৭১০	৮৮৮,০৪৫	৪৪০৫৯
১৮৮৪-৮৫	৫৩১,২০৫	৯৫০,৯৮৪	৮১৭১৩
১৮৮৫-৮৬	৩৫৮,০৭১	১,০২৩,৮০[illegible]	৫৬৮৮০

এই সময় হইতে পশমের রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। রেশমের রপ্তানি কমিয়া যাওয়ার আরও একটি কারণ এই যে, ভারতবর্ষে রেশমের অন্তর্বাণিজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের যে সমুদয় প্রদেশে রেশম প্রস্তুত হইয়া থাকে, বঙ্গদেশই তন্মধ্যে প্রধান, এমন কি ভারতীয় রেশম বাণিজ্যকে বঙ্গীয় রেশম বাণিজ্য বলিলেও বলিতে পারা যায়। অনেকেরই ধারণা আছে যে বঙ্গদেশে রেশমের ব্যবসায়ের আর তাদৃশ সুদিন নাই। ইহা কিন্তু ভ্রম। বর্ত্তমান গ্রন্থ পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্ব সময়াপেক্ষা এক্ষণে বঙ্গীয় রেশম বাণিজ্যের অবস্থা কোন প্রকারেই হীন নহে; কি সূক্ষ্ম কার্য্যের হিসাবে, কি উৎপাদনের মাত্রায়, কি অন্তর্বাণিজ্যের বিস্তারে, সর্ব্বরূপেই ইহা এতদ্দেশে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং বিদেশেও ইহা চীন, জাপান, ইটালী এবং ফ্রান্সের নিম্নেই স্থান পাইবার যোগ্য। এখনও এতদ্দেশীয় রেশম এবং রেশমজাত দ্রব্য, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া, জাঞ্জিবার, মরিচ দ্বীপ, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা, এডেন, আরব্য, লঙ্কা, চীন, পারস্য, তুর্কী, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, পঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে গৌড়ীয় রেশমী বস্ত্রের যথেষ্ট আদর।

অধুনা বঙ্গদেশের মধ্যে ন্যূনাধিক ২৩টী জেলায় রেশমের চাষ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি, মালদহ প্রভৃতি প্রধান। মুরশিদাবাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জেলায় বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার রেশমজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর, সমস্ত বঙ্গদেশোৎপাদিত রেশমের মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ মুদ্রা। গত কয়েক বৎসর যদি প্লেগের আবির্ভাব না হইত এবং ১৮৯৬'৯৭ সালে যদি দুর্ভিক্ষ দেখা না দিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে বোধ হয় রেশম বাণিজ্য সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। ১৮৯১ এবং ১৯০১ সালের সেনসাস্ রিপোর্টে রেশম ব্যবসায়ী ব্যক্তিবর্গের যে হিসাব পাওয়া যায় তাহাও বিশেষ আশাপ্রদ। ১৮৯১ সালে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যাহারা কোন না কোন

রূপে (পলু পালন, সূতা কাটা, বয়ন প্রভৃতি) রেশমের উপর নির্ভর করিত তাহাদের সংখ্যা ১৩৮৮৫৭। ১৯০১ সালে উক্ত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা ১৮৮১৬৯। এতদ্দ্বারা অবশ্য বুঝিতে পারা যায় যে, রেশমের ব্যবসার কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে। হুগলি, নদিয়া, হাবড়া এবং বগুড়া প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় রেশম ব্যবসা যে নিতান্ত অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, রাজসাহী এবং মুরসিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় এই ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আজ কাল অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ এই ব্যবসায়ে অনুরক্ত হওয়ায়, রেশম চাষে পাস্তুরের প্রথা প্রচলিত হওয়ায়, এবং রেশম সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষাদি প্রদানের জন্য স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় বঙ্গদেশ রেশম ব্যবসার উন্নত অবস্থায় আসিয়াছে।

১৮৭০ হইতে ১৮৯০ সাল পর্য্যন্ত ২০ বৎসর বঙ্গদেশীয় রেশমের রপ্তানির পরিমাণের মাত্রাধিক্য এবং তৎপরে তাহার হ্রাস দেখিয়া অনেকেই রেশম ব্যবসায়ের উন্নতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া থাকেন, তাঁহাদের কিন্তু মনে রাখা উচিত যে ১০০ বৎসর ইংরাজ পরিচালিত রেশম বাণিজ্যের মধ্যে এই ২০ বৎসরই আশাতীত লাভজনক হইয়াছিল। কিন্তু কোন ব্যবসা চিরকালই যে এই ভাবে চলিবে তাহা আশা করা নিতান্ত অসঙ্গত। বস্তুত এই কয় বৎসর ছাড়িয়া দিলে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় রেশম ব্যবসায়ের যেমন শুভ সময় এরূপ আর কখন ছিল না। এখন অন্তর্ব্বাণিজ্য বিশেষ রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। নিম্ন প্রদত্ত তালিকায় তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

বঙ্গদেশ হইতে রেশম রপ্তানি।

১৮৯৬—১৮৯৮ খৃঃ অঃ

সন		উত্তর পশ্চিম, মধ্য প্রদেশ পঞ্জাব, রাজপুতানা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে	বিদেশে
১৮৯৬-৯৭	রেশমসূত্র	১১,৯১,৬৬৪৲	৪৯,৫০,৭০৯৲
	রেশমজাতদ্রব্য	১০,০২৩২৪৲	১১,৫০৪৬০৲
১৮৯৭-৯৮	রেশম সূত্র	১৮৩৩৪২৫৲	৪৯,৭৭,৩৭৪৲
	রেশমজাত দ্রব্য	২০২০৭৬০৲	৮৯৯৭৯১৲

এই সমস্ত রেশম রেলপথে আমদানি। ১৯৬-৯৭ এবং ১৮৯৭-৯৮ সালে, কলিকাতায় ক্রমান্বয়ে ১৯ লক্ষ এবং ১৬ লক্ষ টাকার রেশম আসে, তন্মধ্যে উক্ত দুই বৎসরে তালিকা উল্লিখিত ১১,৫০, ৪৬০৲ এবং ৮,৯৯৭৯১৲ টাকার রেশম বিদেশে যায়। সুতরাং বাকি টাকার রেশম এতদ্দেশেই কাটতি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নদী, খাল এবং স্থলপথে যে সমস্ত রেশম কলিকাতায় আসে তাহার কোন হিসাব নাই। বঙ্গদেশজাত•

রেশমী বস্ত্রের অন্তর্বাণিজ্য ধরিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সমূহে যাহা প্রেরিত হয়, কলিকাতায় যাহা আসে, এক জেলা হইতে অপর জেলায় যাহা যায়, নিজ উৎপাদনের স্থানে যাহা কাটতি হয়, এতদ্সমূহের মূল্য ৫০ লক্ষ টাকার অধিক ; এতদ্ভিন্ন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে যে রেশম সূত্র প্রেরিত হয় তাহার মূল্য ৩০ লক্ষ টাকা। এই সূত্র হইতে যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় তাহার মূল্য ৫০ লক্ষের কম হইবে না। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে বঙ্গদেশীয় রেশমে ভারতবর্ষীয় রেশম বাণিজ্যের অন্ততঃ এক কোটি টাকা আয় হইয়াছে এবং এতদ্সওয়ায় আবার ৫০ লক্ষ মুদ্রার রেশম সূত্র বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। যে দেশে বাৎসরিক দেড় কোটি টাকার রেশম উৎপন্ন হয় তদ্দেশে রেশম বাণিজ্যের অবস্থা যে হীন তাহা কখনই বলিতে পারা যায় না। আমদানির হিসাবে ধরিতে গেলে বঙ্গের রেশম বাণিজ্যের অবনতি দৃষ্ট হয় না। ১৮৯৭-৯৮ হইতে ১৯০০—১৯০১৲ পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরের হিসাবে দৃষ্ট হয় যে ভারতবর্ষে গড়ে বৎসরে ২,১২, ৮৭,৯৪৫৲ টাকার রেশম সূত্র এবং তজ্জাত দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। তন্মধ্যে বঙ্গদেশে কেবল ১০,৯২,৫২৩৲ মূল্যের সূত্র এবং দ্রব্য আসিয়াছে। এতদ্দেশেই ব্যবহারার্থ এতদ্দেশ জাত ৫০ লক্ষ টাকার দ্রব্যের সহিত তুলনা করিলে এই প্রায় ১১ লক্ষ টাকার বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানি কোন রূপে ভীতিজনক হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন বিদেশীয় রেশমী দ্রব্য সমূহের মধ্যে অধিকাংশ দ্রব্যই সাহেব অথবা ফিরিঙ্গি মহলে ব্যবহৃত হয়। এই সমুদয় রেশমী দ্রব্য যে অধিক দিবস স্থায়ী হয় না তাহা অনেকেই জানেন। তজ্জন্য যাহারা দেশীয় এবং বিদেশীয় উভয়বিধ রেশমী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা প্রথমোক্ত দ্রব্যেরই পক্ষপাতী।

রাজনীতিতেই হউক কিম্বা ব্যবসা বাণিজ্যেই হউক ইংলণ্ডের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভারতবর্ষ যে, বৎসরে ২।৩ কোটি টাকার রেশম বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া থাকে তাহা যদি সমস্ত ইংলণ্ড হইতে ক্রীত হইত তাহা হইলে সেই টাকা রাজকর (Home charge) দেওয়া গেল ভাবিয়া আমরা আশ্বস্ত থাকিতাম। কিন্তু এই সমস্ত রেশম এবং রেশমী বস্ত্র ইংলণ্ড ভিন্ন অপরাপর ইউরোপীয় দেশ হইতে আমদানি হয়। ইংলণ্ড বৎসরে, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশ হইতে ১৭।১৮ কোটি টাকার রেশম জাত দ্রব্য আমদানি করে এবং কেবল ৩.৪ কোটি টাকার রেশমজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। ইহাকে অবশ্য ইংলণ্ডীয় রেশম বাণিজ্যের দুরবস্থা বলিতে হইবে। ইংলণ্ড যত রেশম জাত দ্রব্যের মাত্রা কমাইয়া রেশম সূত্র আমদানি করে এবং রেশম জাত দ্রব্য যত অধিক পরিমাণে রপ্তানি করে ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল। ইংলণ্ডকে এখন তাহার রেশম বাণিজ্যের ক্রমে পতননিবারণ পূর্ব্বক উন্নতি সাধন করিতে হইলে মানিংহাম লীক, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি স্থান হইতে রেশম কুঠি উঠাইয়া বালুচর, কাশী, মির্জ্জাপুর

অমৃতসহর, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে কুঠি স্থাপন করিতে হয়। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলেই ইংলণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশমব্যবসায়ে যেরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল এখনও তাহাই করিতে পারে এবং ভারতে ও রেশম-বাণিজ্য সমধিক উন্নতি লাভ করে। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিলে এবং কোন সভা সমিতি অথবা কোম্পানির সাহায্য পাইলে বঙ্গীয় রেশম ব্যবসায়ীগণ যে অনধিক কাল মধ্যে ব্যবসায়ের নতন পরিবর্ত্তন এবং সমৃদ্ধি সাধন করিবে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা সাধারণ রেশম বাণিজ্যসম্বন্ধে কতিপয় কথা বলিলাম। এক্ষণে পাঠকগণের অবগতির জন্য বঙ্গদেশের নানা স্থানে যে বিবিধ প্রকারের রেশমবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান শ্রেণীর রেশমজাত দ্রব্যের উল্লেখ করিলাম।

মুরসিদাবাদ জেলা ;—

১ম শ্রেণী ; সাধারণতঃ সামঞ্জ রেশম হইতে প্রস্তুত।

(১) গাউন-পিস্—২ প্রকারের, সাদা এবং রঙ্গিন। মাপ সাধারণতঃ ১০ গজ × ৪২ ইঞ্চি। এইরূপ গাউনপিসের মূল্য ১২৲—৪০৲ এই মালদহ হইতে আনিত বড় পলুর সূত্রে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গাউন-পিস্ প্রস্তুত হয় তাহার মূল্য ৪৫৲—৫০৲। গাউন-পিস্ ইংরাজ স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা পোষাকের জন্য এবং বাঙ্গালি ভদ্রলোকদিগের দ্বারা চোগা চাপকান প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হয়।

(২) কোরা।—এই শ্রেণীর বস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ এবং ইহা প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। তথায় ইহা আস্তেনের জন্য এবং রঞ্জিত হইলে স্ত্রীলোক-দিগের জ্যাকেট প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হয়। কোরার মূল্য প্রতি বর্গগজ।৴০—১॥০

(৩) হাওয়া-বস্ত্র-ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ধনীলোকেরা ইহা হইতে গ্রীষ্মকালে পরিধানোপযোগী সাট, কোট প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। হাওয়া সাড়িও স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করেন।

(৪) রুমাল।—মির্জ্জাপুরের ২ ফিট × ২ ফিট আয়তনের উৎকৃষ্ট রুমালের মুল্য ১৲।

(৫) আলোয়ান। সাধারণতঃ ভদ্রলোকে ইহার জোড়াই ব্যবহার করেন। ৩ গজ × ১½ গজ আলোয়ানের মূল্য ২৫৲—৩৫৲।

(৬) ধুতি এবং জোড়। হিন্দুদিগের সমস্ত ক্রিয়া উপলক্ষে এই শ্রেণীর বস্ত্র আবশ্যক হয় বলিয়া ইহার কাটতি অধিক। ১৫ হাত × ৪৫ ইঞ্চি জোড় ১৮৲ এবং ১০ হাত × ৪৫ ইঞ্চি ধুতি ৮৲—১০৲।

(৭) মেথলা।—ইহা এক প্রকার কোরা আসামে রপ্তানি হয় এবং স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা ব্যবহার হয়।

(৮) মটকা।—মুরসিদাবাদের মটকা ধুতি এবং সাড়ী রাজসাহীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহার অধিকাংশই আসাম এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশে রপ্তানি হয়। মটকা ৪—৮ গজ লম্বা এবং ৪০—৪৫ ইঞ্চি চওড়া। মূল্য প্রতি থান ৩৲—৫৲।

(৯) মটকা এবং সামরু। এই সমস্ত বস্ত্র মোটা এবং পুরুষের পোষাকের উপযুক্ত। মূল্য প্রতি গজ ২৲।

(১০) নকল আসামী রেশম অথবা মুরসিদাবাদ এণ্ডি। ইহা স্থট প্রভৃতি প্রস্তুতের বিশেষ উপযুক্ত। বৎসরে প্রায় ৫০০০০৲ টাকা মূল্যের এই জাতীয় কাপড় বহরমপুর হইতে রপ্তানি হয়। এম, এম, বাগচি কোং এই কাপড়ের প্রধান বিক্রেতা। ৭ গজ × ২৭ ইঞ্চি থানের মূল্য ৬৲—৭৲।

(১১) পাড়-সংযুক্ত বস্ত্র সমূহ। সাড়ী, ধুতি, চেলী, জোড় প্রভৃতি এই জাতীয় নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। মধ্যবিত্ত এবং ধনীলোকেরা এই সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করেন। কমলারঙের ঢাকাই তাজপাড়যুক্ত সাদা রেশমী সাড়ি বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ আদরের দ্রব্য। তাজপেড়ে, কল্কীপেড়ে, তোরঙ্গপেড়ে, পদ্মপেড়ে প্রভৃতি পাড়যুক্ত সাড়িরই অধিক প্রচলন। একথান সাড়ি মূল্য ১০৲—১৮৲। মৃত্যুঞ্জয় সরকারের প্রস্তুত ফুটকি-ওয়ালা জমিযুক্ত অতি সুন্দর সাড়ির মূল্য ৩০৲। ধুতিও অনেক প্রকার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

২য় শ্রেণী।—নক্সা লুম প্রস্তুত দ্রব্যাদি ;—

এই শ্রেণীর দ্রব্যাদির মধ্যে বালুচর সাড়ি, শাল, দোশালা, রুমাল প্রভৃতি প্রধান। বালুচরের সাড়ির, বেনারসি সাড়ির প্রতিযোগিতায় আজকাল আর অধিক কাটতি নাই। অবশ্য কারুকার্য্য হিসাবে এই সমস্ত সাড়ী অথবা শাল বেনারসি সাড়ি অথবা কাশ্মিরী শাল হইতে নিকৃষ্ট। এই শ্রেণীর বস্ত্রাদি পুনঃ প্রচলনের আশাও কম, কারণ দুরবাজ নামক ব্যক্তি এই শ্রেণীর বস্ত্র অত্যুৎকৃষ্টরূপে বয়ণ করিতে পারিত সে বার বৎসর হইল মরিয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থান অধিকার করিবার আর উপযুক্ত লোক নাই।”

হুগলি জেলা ;—

(১) সওয়া গজী থান (২) মকৃমা (৩) মেলাই বাটা (৪) ফুলারু (৫) জরদা এই কয়েক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ইহাদের অধিকাংশ তসর এবং রেশম মিশ্রিত। সওয়া গজী এবং ফুলারু শ্রেণীর বস্ত্র পঞ্জাব প্রদেশে রপ্তানি হয়।

বাঁকুড়া জেলা ;—

ফুলাম সাড়ি, ধুতি, থান, গলাবন্ধ’ রুমাল এবং চেক কাপড়, এই কয়েক শ্রেণীর কাপড়ই এই জেলায় প্রস্তুত হয়।

মালদহ জেলা ;—

এক সময়ে মালদহ জেলায় রেশম ব্যবসায়ের প্রধান স্থান ছিল। এখনও এই জেলায় সুন্দর সুন্দর সাড়ী ধুতি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে ব্যবহারোপযোগী চাদর ও এই স্থানে পাওয়া যায়।

রাজসাহী জেলা ;—

রাজসাহী জেলায় কেবল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মটকাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জেলাতে অনেক পশম উৎপন্ন হয় এবং এই পশম কিয়ৎপরিমাণে কলিকাতা, দিল্লী এবং পঞ্জাবে চালান যায়। কিন্তু অধিকাংশ বিদেশে রপ্তানী হয়।

আমাদের পাঠকগণ বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতে বঙ্গদেশে রেশম বাণিজ্য সম্বন্ধে, বোধ হয় অনেকটা জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। অতঃপর আমরা বর্ত্তমান পুস্তক সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত নিত্য-গোপাল মুখোপাধ্যায় বহু দিবস হইতে বঙ্গীয় কৃষিবিভাগে সংশ্লিষ্ট আছেন এবং গভর্ণমেণ্ট দ্বারায় প্রেরিত হইয়া ফ্রান্স হইতে তিনি রেশম বিজ্ঞান-সম্বন্ধে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আইসেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে তাঁহার ন্যায় রেশম তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও বলা যায়। বর্ত্তমান পুস্তক তাঁহার গভীর জ্ঞান এবং গবেষণার উপযুক্তই হইয়াছে। পুস্তকে রেশম প্রণালী, রেশম বয়ন, রঞ্জন, রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করণ, প্রতি জেলায় রেশম বাণিজ্যের অবস্থা রেশমের অন্তর এবং বহির্ব্বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় অতি সুচারু এবং বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। নিত্যগোপাল বাবুর পূর্ব্ব প্রকাশিত রেশম-বিজ্ঞান পুস্তকের পাঠকের পক্ষে বর্ত্তমান পুস্তকের সমস্ত অংশ নূতন না হইলেও ইহার কতিপয় অংশ যে নব-প্রকাশিত এবং দেশীয় বাণিজ্যের মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিগণের পাঠযোগ্য, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। পুস্তকে কাপড়ের ছবিগুলি অত্যন্ত দক্ষতা এবং পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। এমন কি হঠাৎ দেখিলে যেন কাপড়েরই নমুনা বলিয়া বোধ হয়। সর্ব্বশেষে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের ধন্য-বাদার্হ গবর্ণমেণ্ট যে দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে অর্থ-ব্যয়ে সঙ্কুচিত না হইয়া এইরূপ অত্যাবশ্যকীয় পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, ইহা অবশ্য আমাদের বিশেষ পরিতোষের বিষয়। রেশমের ন্যায় অপরাপর দেশীয় বাণিজ্যের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষিত হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

বাঁকুড়ার পত্র

দুর্ভিক্ষের প্রতিষেধ কল্পনা

(ক) কৃষিবৃদ্ধি।

আমাদের সর্ব্বদা স্মর্তব্য, অন্ন-বস্ত্র-ঔষধ প্রাণধারণ ত্রিপাদ। অন্ন দ্বারা দেহের ভরণপোষণ হয়, বস্ত্র দ্বারা শীত বর্ষা হইতে রক্ষা হয়, ঔষধ দ্বারা দুর্বল অঙ্গ সবল হয় প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক মণ্ডল, এমন কি প্রত্যেক গ্রাম, যাহাতে মোটা ভাত মোটা কাপড় মোটা ওষুদ, এই তিনের তরে হা হা করিয়া না ছোটে, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি আধুনিক অর্থনীতি বুঝি না, কৃষি ও কলার অতিভাগ বুঝি না; কিন্তু প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি, প্রাণরক্ষারপক্ষে যেমন হৃৎ-ফুস্‌ফুস্‌-মস্তিষ্ক এই তিন অঙ্গের সামর্থ্য অত্যাবশ্যক, তেমন অন্ন-বস্ত্র ঔষধ প্রাণরক্ষার এই তিন বাহ্য ত্রিপাদের সদ্‌ভাবও অত্যাবশ্যক। এই তিনের তরে দেশান্তরে, মণ্ডলান্তরে, এমন কি গ্রামান্তরেও যাইতে চাই না। ইহার নিমিত্ত আদিম মানবের অবস্থায় যাইতে হয়, সেও স্বীকার। আমরা বুঝি সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্,' কোনও বিষয়ে অতি ভাল নয়। জর্মনীর অধঃপতনের মূল নাকি 'অতি,' কর্মবিভাগে 'অতি, রাজ্যব্যবস্থায় 'অতি'। ইয়ুরোপে যে ধন-সাম্যবাদীর দল, রাজ্য-বিপ্লববাদীর দল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে তাহারও মূলে সেই 'অতি'। জীবদেহেও দেখি, অঙ্গবিশেষের অতিবৃদ্ধি সর্বনাশের কারণ হয়; বৃত্তির অতিভেদ হইলে মরণের পথও আয়ত হয়। বিশেষতঃ আমাদের সমাজ যেমন, তাহাতে কর্মের অতিভাগ অন্ততঃ বর্তমানে মঙ্গলজনক নহে।

সংস্কৃতভাষায় ধান্য অর্থে যাবতীয় খাদ্যশস্য বুঝাইত। লোকে যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা ধান্য। ধান্যের তিন-ভাগ করা হইত। গম যব শালি (ধান প্রভৃতি 'শূক-ধান্য',) কারণ শূক বা শুঙ্গা আছে। কোদো, কঙ্গু, মাণ্ডিয়া প্রভৃতি 'অণু-ধান্য,' কারণ ক্ষুদ্র। আর, মুগ, মসূর, মাষ, তিল প্রভৃতি 'শমী-ধান্য,' কারণ সুঁটী হয়। ব্রী-হি শব্দেও যাবতীয় খাদ্যশস্য বুঝাইত; যাহা দ্বারা দেহের ভরণ হয়, তাহা ব্রী-হি। দেহের ভরণ নিমিত্ত ত্রিবিধ শস্য আবশ্যক। ধান, গম, যব, জনার প্রভৃতিতে পলল (পা-লো) অধিক। এসব পললীয় ব্রীহি। মুগ মসূর মাষ প্রভৃতিতে পলল ব্যতীত (পল) (মাংস) দ্রব্য অধিক। এসব পলীয় ব্রীহি। তিল, সরিষা, চীনেবাদাম প্রভৃতিতে স্নেহ (তৈল) অধিক। এসব স্নেহ-ব্রীহি। শাগ-ভাত খাইয়া বাঁচিতে পারা যায় বটে, কিন্তু কেবল বাঁচিয়া থাকা, আর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া থাকা, এক কথা নয়। কেবল শাগ-

ভাত খাইয়া বাঁচিতে পারা যায় বলিয়া আমরা ক্ষীণ-জীবী হইতেছি। দেহ ক্ষীণ, বল ক্ষীণ, এমন লোকের দ্বারা দেশ ভরিয়া যাইতেছে। শক্তি ও সামর্থ্য ও আয়ু ক্ষীণ হইতেছে। শুধু ভাত খাইলে দেহ পুষ্ট হয় না, ডাল চাই, তেল চাই।

এ বিষয়ে বাঁকুড়ার ভাগ্য মন্দ নহে। ১৯০১ সালে বাঁকুড়ায় ধান ১৬ লক্ষ, গম ১৬ হাজার, যব ৬ হাজার, জনার ৯ হাজার, মাণ্ডিয়া ৩ হাজার বিঘায় চাষ হইয়াছিল। মাণ্ডিয়া বা রাগী দরিদ্রের খাদ্য, নিকৃষ্ট ভূমিতেও জন্মে। জনার উচা জমিতে ডাঙ্গা জমিতে জন্মে। আমেরিকার এই ব্রীহি এদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বহু জনের অন্ন জুটিতেছে। ধান্য কেদার-শস্য, প্রভূতোদক। গম, যব এরূপ নহে, অল্পোদক। এই হেতু এই দুই ও জনারের চাষ বাড়াইতে পারা যায় কি না দেখা কর্ত্তব্য। ঋতুভেদ ও ব্রীহির জলতৃষ্ণা ভেদ দেখিয়া যত বিভিন্ন ব্রীহির চাষ হয়, ততই মঙ্গল। বাকুড়ায় পলীয় ও স্নেহব্রীহি প্রায় সমান; উভয়ে মিলিয়া পললীয় ব্রীহির সমান। তথাপি পলীয় ব্রীহির পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই ভাল। পূর্ব্বকালে দেশে কুসুমফুলের চাষ হইত। ফুলের রঙ্গে পাট রঞ্জিত করা হইত। এখন বিলাতী কৃত্রিম রং আসিয়া গাছের রঙ্গের আদর নাশ করিয়াছে। কিন্তু কুসুমফুলের বীজ হইতে তেল হয়। তেলের জন্য চীনেবাদামের চাষ হইতেছে। কুসুমফুলের চাষে পোষায় কি না, দেখা কর্ত্তব্য। "গরি কলাই" বা ভাট কলাই নামে এক উৎকৃষ্ট ব্রীহি আছে। উহা একাধারে পলীয় ও স্নেহ। ভাত ও গরির একটু ডাল, পাইলে দেহের পোষণ ও বলাধান হইতে পারে। আমরা আহার এত লঘু করিয়া ফেলিয়াছি যে পেট ভরিলেই ভোজন হইল মনে করি। পূর্ব্ববঙ্গে মাছ সুলভ, পশ্চিমবঙ্গে দুর্লভ। দুধ ও ঘি কোথাও সুলভ নহে। ভাত, ডাল, তেল, এই তিন নইলে পশ্চিমবঙ্গ চলিতে পারে না। নিজের চাষে এই তিন ফলিলে কিছু-না-কিছু নিজের ভোগে আসে। গ্রামে ফলিলেও আসে। দূরান্তরে দূরগ্রামে ফলিলে সহজে আসে না, বাড়ীর গাছের আম বিক্রি করিলেও নিজের ভোগে কিছু আসিবেই আসিবে। এই হেতু যে গ্রাম বা যে জেলা ভাত-ডাল-তেল সম্বন্ধে যত স্বাধীন হয়, তত ভাল। এই বাকুড়ায় তিনই জন্মিতেছে বলিয়া উহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছি।

ফল মূল ও শাকও আহার্য্যের মধ্যে ধরিতে হইবে। নগরে ধনী বাস করে, গ্রাম গ্রামান্তর হইতে উত্তম উত্তম আহার্য্য নগরে চলিয়া আসে। এত আসে যে উৎপাদক গ্রামে দুর্লভ হইয়া পড়ে। গত জ্যৈষ্ঠমাসে বাঁকুড়া সহরের বাজারে কুষ্মাণ্ডাদি বর্গের ফলশাক (যেমন কাঁকুড়, লাউ, ঝিঙ্গা) এত বড় দেখিয়াছি যে লোকে অধিক জন্মায় না কেন, বুঝিতে পারি না। দুর্ভিক্ষের বৎসরে ফলশাক অধিক উৎপন্ন হইবার কথা। বাজারে মূল-শাক ও পত্র-শাকও অপর্য্যাপ্ত বোধ হইল না। পত্র-শাকের মধ্যে পাট-শাগ প্রচুর। আলুও পটোল অভাব। গ্রীষ্মের আম দুর্লভ; যাহা বা কিছু দেখিয়াছি, তাহা বুনো। তাহাই ক্রেতা পয়সায় একটি করিয়া কিনিত। গত বৎসর বৃষ্টি হয়

নাই বলিয়া আম নাকি ফলে নাই। ইহা কিছু সত্য; অধিক সত্য বাঁকুড়ায় তত আম-গাছ নাই। বাজারে কাঁচকলা ও পাকা কলাও আমের তুল্য নিকৃষ্ট। বাঁকুড়াবাসী হয় উদ্যমহীন, না হয় সেকেলে জীবন যাপন করিতেছে। আমের দেশে লোকে আম খাইয়া মাসখানেক কাটাইয়া দেয়, কলা যে পুষ্টিকর খাদ্য, এসব কথা বাঁকুড়া শোনে নাই। দুর্ভিক্ষের প্রতিষেধ কামনা করিতেছে, কিন্তু জেলার মধ্যের বড় বড় রাস্তার পাশে ফলকর গাছ না রুইয়া ছায়া ও কাঠের গাছ জন্মাইতেছে। বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশ ছোটনাগপুরের তুল্য। ছোটনাগপুরে কমলানেবু জন্মে, স্থানে স্থানে হাজার হাজার গাছে আছে। বাঁকুড়ায় কেহ কমলার বাগান করিয়া দেখিয়াছেন কি?

বাঁকুড়ায় 'কৃষি-সমিতি' আছে, কৃষির বৃদ্ধি দেখিতেছেন, ভাল বীজ বিক্রয় করিতেছেন। অথচ বাঁকুড়ার বাজারে যে আলু বিক্রয় হইতেছিল তাহা প্রায় অখাদ্য, সেঝে না। আমরা শাক খাই, ফল খাই। ইহা নূতন নহে। বোধ হয় শাক ও ফল বৃদ্ধি 'কৃষি-সমিতি'র কর্মের বহির্ভূত। শুধু বাঁকুড়ায় নহে, অন্যত্রও দেখিয়াছি, 'কৃষি-সমিতি'র শাক ও ফল অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। হয়ত 'শাক-সমিতি' ও ফল-সমিতি'র উদয় না হইলে ধান গম কাপাস গুড় এইরূপ গোটা কয়েকের বৃদ্ধি ব্যতীত অপর কৃষি-দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে না। ধান গম প্রধান আহার্য বটে, কিন্তু কলাই তিল নগণ্য নহে। যবও ত গমের তুল্য, বরং উৎকৃষ্ট। কিন্তু যবের কৃষিবৃদ্ধির চেষ্টা হইতে শোনা যায় না। কদাচিৎ আলুর (বিলাতী আলুর) বৃদ্ধির চেষ্টার সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু বোধ হয় দেশী আলু (খাম আলু, চুপড়ী-আলু, প্রভৃতি), শাঁখ আলু, রাঙ্গা-আলু, কিংবা মান, কচু প্রভৃতি কন্দের বৃদ্ধি দূরে থাক, কৃষির সংবাদও পাওয়া যায় না। কেবল দুর্ভিক্ষের বৎসরেও সে-সব নিত্য আহার্য, সে-সবের আয়-ব্যয় দেখা কর্তব্য মনে করি। "বাঁকুড়া গেজেটিয়রে" লিখিত আছে, বাঁকুড়ার লোক ধানে নির্ভর করে, অথচ ধানের জলের অভাব ঘটে, এইহেতু দুর্ভিক্ষ হয়। এমন স্পষ্ট নির্দেশ থাকিতে দিগ্‌ভ্রান্ত হইবার কারণ নাই।

আমাদের সংবাদ-পত্র-লেখক ও কদাচিৎ জমিদার দেশে কৃষি-কলেজ স্থাপনের নিমিত্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। তাঁহারা মনে করেন, কলেজ দ্বারা দেশে কৃষিজ্ঞান ব্যাপ্ত হইবে, লব্ধজ্ঞান যুবা "বৈজ্ঞানিক উপায়ে" বিঘায় দশ মণ ধানের স্থানে পঁচিশ মণ ফলাইতে থাকিবে। আমি মনে করি, এই ভ্রান্তিময় আশা যত শীঘ্র দূর হয়, দেশে তত মঙ্গল। একটা বিপুল সমাজের অঙ্গে বিদেশী "বৈজ্ঞানিক উপায়ে "জুড়িয়া দেওয়া অসম্ভব মনে করি। তা ছাড়া লব্ধজ্ঞান যুবা চাকরি খুঁজিবে, নিজের চাষ খুঁজিবে না, ইহাও ধ্রুব। সরকার বাহাদুর কৃষিপ্রাজ্ঞ লইয়া কৃষ্যধিকার স্থাপন করিয়াছেন, 'আদর্শক্ষেত্র' করিয়া কৃষির দোষগুণ পরীক্ষা করিতেছেন, সময়ে সময়ে দেশে উৎপন্ন কৃষি শস্যের প্রদর্শনী করিতেছেন। যত্নের ত্রুটী নাই, তথাপি সমালোচকের

নিন্দা ব্যতীত প্রশংসা শুনিতে পাই না। অতএব কোথাও না-কোথাও ভুল হইতেছে। অট্টালিকার ভিতরে বসিলে নির্মাণের যে দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না, বাহিরে দাঁড়াইলে তাহা সহজে লক্ষ্য হইতে পারে। এই বিবেচনায় এখানে দুই এক কথা দেশের সমক্ষে সংক্ষেপে ধরিতে যাইতেছি।

অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন, দেশের কৃষক কৃষিকর্ম জানে না, আঁধারে হাতড়ায়, হাতে ঠেকিলে কুড়াইয়া লয়। যদি ইহাই সত্য, তাহা হইলে এন্-জি-মুখার্জ্জির "ভারতীয়-কৃষি" বিষয়ক গ্রন্থে সেই অজ্ঞ কৃষকের হাতড়ানার আবৃত্তি কেন? মনে রাখিতে হইবে, তিনি কৃষি-প্রাজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থ হাওড়া শিবপুরে কৃষি-বিদ্যার্থীরা অধ্যয়ন করিতেন। সব কৃষক কৃষিকর্ম্মে দক্ষ নহে; কোন্ বার্তায় সবাই দক্ষ? সব ডাক্তারের সমান হাত-যশ নাই, সব উকীলের সমান মুখ-যশ নাই। নির্ব্বোধ মনে করে, যশোলাভ ভাগ্যাধীন। কিন্তু অল্পেই বুঝা যায়, স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিবেক, এবং ভূয়োদর্শন, এই দুই, যাবতীয় বার্তা ও কলায় দক্ষতালাভের মূল। এই দুই নরলোকে তত সুলভ নহে, কৃষক-কুলেও নহে। দেশের কৃষি-কর্ম্মে দোষ থাকিতে পারে; কিন্তু দোষ বাহির করা এক কথা, আর দোষ শোধরান আর এক কথা। ক্ষিপ্র-মতি মনে করে, দোষ আবিষ্কার যত কঠিন, শোধন তত নয়। বস্তুতঃ প্রায়ই বিপরীত। চপল-মতি মনে করে, দেশের কৃষক আত্ম-হিত বোঝে না; হাজার শোনাও হিতবচন শোনে না। এইরূপ ক্ষিপ্র-মতি ও চপল-মতির দ্বারা দেশের বহু অনিষ্ট হইয়াছে; কেহ অন্তরে প্রবেশ করিতে চাহিল না, বাহিরে দাঁড়াইয়া তিরস্কার করিল। আমি কৃষি-বিদ্যার আশ্রয় চাই না, এমন নহে; কিন্তু দেশের অসাধ্য বিদ্যা পুথীতেই থাক। "বৈজ্ঞানিক-কৃষি" বলিতে বুঝি কৃষি-কর্ম্মের তত্ত্বানুযায়ী কৃষি। প্রথমে কর্ম্ম, পরে কর্ম্মের তত্ত্ব। প্রথমে তত্ত্ব নহে; প্রথমে কর্ম্ম। কর্ম্ম ও পরীক্ষা, ফলে এক। দেশের কৃষক কর্ম্ম করিতেছে, পরীক্ষা করিতেছে, ভূয়োদর্শন করিতেছে। সে কর্ম্ম-সিদ্ধ, প্রয়োগ-সিদ্ধ হইয়াছে। মূঢ় নইলে কেহ সিদ্ধকে সাধনা শিখাইতে যায় না। কৃষক কর্ম্মের তত্ত্ব জানে কি? কিসে কি হয়, জানে কি? প্রায়ই জানে, নতুবা কর্ম্ম ঠিক হইত না। জানে না, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ব্যক্ত করিতে। অধীত-বিদ্য, কৃষি-প্রাজ্ঞ জানেন কি? তাঁহার পরিভাষা ছাড়িয়া দিলে, কতটুকু জানেন? তাঁহার জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত কৃষি-কলেজ নহে, কৃষির আদর্শক্ষেত্র নহে; গবেষণাক্ষেত্র চাই।

আবার বলি, আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া কৃষিবৃদ্ধি বিলোকন করিতেছি। তথাপি কর্ম্মের একটা স্থূল প্রক্রম লিখিতে যাইতেছি; আশা করি কৃষি-প্রাজ্ঞ ও কৃষ্যধিকার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। কৃষিবিদ্যা কিমিতি-বিদ্যা বা ভৌতিক-বিদ্যার ন্যায় কেবল পরীক্ষা; জ্ঞাত অবস্থায় ফলাফল নির্ণয়-সাপেক্ষ নহে। কারণ অবস্থা, ভাব জ্ঞাত কই? বীজের ভাব, ক্ষেত্রের ভাব, অবস্থার ভাব, জানা কই? সুতরাং ভূয়োদর্শন প্রধান

করিতে হইতেছে। নূতন পরীক্ষা চলুক, ; ফললাভে কালবিলম্ব হইবে। ইতিমধ্যে, বরং পরীক্ষায় ও গবেষণায় আদৌ, দেশের ভূয়োদর্শন-লব্ধ উত্তম জ্ঞান অর্জ্জিত ও দেশময় ব্যাপ্ত করা হউক। মনে করুন, ধানের ফলন বৃদ্ধি কাম্য হইয়াছে। যে দেশে, যে অঞ্চলে, এমন কি যে গ্রামে ফলন বাড়াইতে চাই, আমি সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন কৃষকের, বিভিন্ন ক্ষেত্রের ফলন লক্ষ্য করিব। মনে করুন, দেখিলাম বহু ক্ষেতে বিঘায় ১০ মণ, এক ক্ষেতে ১৮ মণ ধান ফলিয়াছে। ইহার অপেক্ষা অধিক ফলন নাই। এই সংবাদ আমার পক্ষে নূতন হইলেও গ্রামে গুপ্ত নাই। তথাপি সকল ক্ষেতে তত ফলে না কেন? কৃষক ফলায় না কেন? কি গুণে ১৮ মণ, কি দোষে ১০ মণ? এখন অর্থনীতির ও কৃষি-বিদ্যার পুঞ্জি-পাত্র খুলিতে হইবে, পাত্রে না পাইলে গবেষণা করিতে হইবে। এইরূপ, যাবতীয় কৃষি-জাত লইয়া করিতে হইবে। তখন বলিতে পারিব "দেশের কৃষিকর্ম্ম কিছু জানি, কিছু শিখাইবার পাইয়াছি। যথাসময়ে বৃষ্টির ন্যূনতায় বাঁকুড়ার ধান মরিয়া যায়। অতএব অন্য দেশ হইতে নূতন ধান আনিয়া দেখ, কিংবা বাঁকুড়ার ধানের জাতান্তর ঘটাও, এসব যুক্তি পরে হইবে। এখন উপস্থিত রক্ষা হউক। ভারতের ভাণ্ডারে, হিমালয় হইতে কুমারিকায়, দেখিবার বুঝিবার শিখিবার এত আছে, যে, নূতন কিছু করিবার আগে ভাণ্ডার দেখা কর্ত্তব্য। বিপুল পরীক্ষা চলিতেছে, পরি-সংখ্যার লোক নাই। কেবল পরিসংখ্যা দ্বারা কৃষিজ্ঞান বহু পরিমাণে বাড়িতে পারে। এক স্থানের উত্তম জ্ঞান অন্য স্থানে প্রচারিত হইলে ইষ্ট আশু সাধিত হইতে পারিবে। কারণ দেশটা, দেশের মানুষ, সমাজব্যবস্থা প্রায় সমান।

আমাদের দেশের কৃষক নাকি অবোধ। তাহার বোধ জন্মাইবার উপায় একটিমাত্র আছে। তাহার গ্রামে গিয়া তাহার ক্ষেতের পাশের ক্ষেতে কৃষিকর্ম্ম-প্রদর্শন, এক উপায়। গম বেশী ফলাইবার ক্রম আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তম কথা। "আদর্শ ক্ষেত্রের" ফল গ্রামে গিয়া দেখাও। বাঁকুড়ায় প্রায় ৬ হাজার গ্রাম আছে। বৎসরে কিম্বা দুই বৎসরে অন্ততঃ ৬খানা গ্রামে "বৈজ্ঞানিক প্রণালী" "উন্নত প্রণালীতে" চাষ করিয়া দেখাও। প্রতি গ্রামে দুই পাঁচ বিঘা জমি প্রদর্শনের নিমিত্ত উচিত খাজানা দিয়া পাওয়া যাইতে পারিবে। 'কৃষি সমিতি' গ্রামের মুখ্য দিয়া নিজের উপদেশ মতন চাষ করাইতে পারিবেন। লাভের কিছু অংশ অবশ্য দিতে হইবে। সমিতির শিক্ষক আছেন, উপদেশ মতন কাজ হইতেছে কি না তিনি তাহা দেখিতে থাকিবেন। কোথাও ধান, কোথাও কলাই, কোথাও তিল, কোথাও কার্পাস, কোথাও আখ, ইত্যাদির "উন্নত" কৃষি চালিতে থাকিবে। বৎসরান্তে কৃষির ক্রম এবং লাভের হিসাব সোজা বাঙ্গালায় ছাপাইয়া হাটে হাটে বিতরণ করিতে হইবে। অবশ্য কেনা মুনিব দিয়া চাষ করিতে হইবে। ইহাতে লাভ কিছু কম হইবে বটে, কিন্তু কৃষকমাত্রেই ঘরের মুনিষ ও কেনা মুনিষের প্রভেদ বোঝে। তিন বৎসর

পরে সে সে গ্রাম ছাড়িয়া অন্য ৬ খানা গ্রামে যাইতে পারিবে। এই ক্রমে একবৎসরে ১৮খানা গ্রাম ঘুরিলে জেলায় সাড়া পড়িয়া যাইবে, কৃষক জানিবে, এমন লোক আছেন যিনি তাহার কল্যাণ কামনায় এত যত্ন করিতেছেন। এই যে বিশ্বাস, ইহা "আদর্শ ক্ষেত্রের" কৃষি দ্বারা জন্মিবে না। বিশ্বাস জন্মিলে সে স্বয়ং উপদেশ প্রার্থনা করিবে। এখন উপদেশ অযাচিত। অযাচিত উপদেশ বাতাসে ভাসিয়া যায়। উল্লিখিত ক্রমে ব্যয় আছে, আয়ও ত নিশ্চিত। অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্যে শিক্ষকের বেতন। তাহা ত এখনও দিতে হইতেছে। যদি লাভে আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে কৃষককে কোন্ মুখে শিখাইতে চাই?

এই ক্রমে কাজ করিলে, দুইটি বিষয় লক্ষ্য হইবে। (১) কৃষকের আর্থিকতা, (২) সমবায়ের আবশ্যকতা।

(১) অধিকাংশ কৃষক আর্থিকতায় হীন, দরিদ্র; দেহ খাটাইয়া যাহা পারিবার করে। দেশের সমালোচকেরা কৃষকের আর্থিকতা উহ্য রাখিয়া বিলাতের কৃষি-ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন। দেশটা যে বিলাত নয়, ধনী নয়, এই কথা এত ভুলিতে থাকেন যে অধীর হইয়া উঠেন। কৃষ্যধিকারও যে এই ভুলে পড়েন নাই, এমন বলিতে পারি না। এক "আদর্শক্ষেত্রে" অমসার দাদখানি চালের ধানের চাষ করা হইয়াছে, সরুধানের করা হইয়াছে, যেখানে মোটা লাল চাল পাইলে লোকে বর্তিয়া যায়। সকল চাল সমান পুষ্টিকর নহে। যে ক্ষেত্রে চালের পুষ্টিকারিতা বিবেচিত হয় না, দেশের অন্নাভাব বিবেচিত হয় না, তাহাকে 'আদর্শ' বলিতে পারা যায় কি?

(২) দুর্ব্বলের এক বল, সংহতি। আর্থিকতায় হীনের এক গতি, সংহতি। কৃষি সমবেত না হইলে যেমন আছে তেমন থাকিবে। কৃষক সমবায় চাই, সমাংশী সমবায় চাই। এরূপ সমবায় দেশে নূতন নয়। অনেকে 'গাঁতা' করিয়া চাষ করে, কিন্তু একায় অসুবিধা না দেখিলে করে না। কিন্তু সমবায় দ্বারা সুবিধা বাড়ে, আয় বাড়ে, অসাধ্য সাধিত হয়, তাহা বুঝিয়াও বোঝে না। সমবায় প্রায়ই সাময়িক, এবং একটা, কদাচিৎ দুইটা, উৎপাদনে আবদ্ধ থাকে। বোধ হয়, বর্ত্তমান "ঋণদান সমবায়" উজ্জ্বল হইয়া কৃষির সমাংশী-সমবায় গঠনে সাহায্য করিবে। স্বৈরিতা ও স্বাধীন-চিত্ততা, এবং দুর্ব্বলের স্বাভাবিক বঞ্চনা ও অসত্যতা, এই দুই ভাব সংহতির বিরোধী। কি ছোট কি বড়; কি গ্রাম কি নগর; কোথায় বঞ্চনা নাই? অথচ কৃষক সমবায় নইলে দরিদ্র কৃষক সময়ে খইল পাইবে না, পাইলেও সস্তায় পাইবে না, সময়ে মুনিষ পাইবে না, জল রক্ষার বাঁধ করিতে পারিবে না, বাঁধের জল জোলে ছাড়িতে পারিবে না, ইত্যাদি এক-যোগে কর্ম্মের ফলভাগী হইতে পারিবে না। বাঁধের বাঁধ কাটিয়া দিলে জল উচা জমিতে যাইবে না। নদীতে জল আছে, অথচ নদীপাড়ের জমি জলাভাবে শুখাইয়া যায়। দক্ষিণ-দেশে মান্দ্রাজে বড় বড় বাপীর জল তুলিয়া কৃষি হইতেছে। বৎসর কয়েক হইতে তেলের এঞ্জিন দিয়া দমকল চালাইয়া জমিতে জল তোলা হইতেছে। 'ঋণদান-সমবায়,

কেবল ঋণ-দান ও ঋণ-আদায় না করিয়া সমাংশী কৃষক-সমবায় গড়িতে থাকিলে তাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবে। প্রথম প্রথম 'কৃষি- সমিতি' চেষ্টা করিতে পারেন। তাহাঁদিগকে 'মহাজনি' করিতে বলি না। তাহাঁদিগের টাকাই বা কই? কিন্তু তাহাঁদিগের বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-পদ-মান আছে, পরহিতেচ্ছা আছে। 'ধর্ম্মই এক রক্ষক', 'অন্ততঃ ব্যবসায়ে সত্যতা শ্রেয়ঃ—একথা পরার্থপ্রিয় লোকেই শিখাইতে পারে। ঋণদান-সমবায়-কে কৃষি-সমিতি সহায় করিয়া গ্রামে গ্রামে কৃষক-সমবায় গড়িতে পারেন। কৃষিই দেশের বার্ত্তা, প্রধান বার্ত্তা, যাহা ধরিয়া লোকে বাঁচিয়া আছে। কলা বলি, বাণিজ্য বলি, চাকরি বলি, কোনও কিছু দ্বারা জীবন-ধারণ হয় না। সেকালে কেবল কৃষি এক বার্ত্তা ছিল না। গো-পালনও একটা বড় বার্ত্তা ছিল। গো ছিল ধন। মরাই-ভরা ধান, আর গোআল-ভরা গোরু থাকিলে অন্ন চিন্তার চমৎকারিত্ব চলিয়া যায়। গো-মহিষ-মেষ-ছাগ পালনের নিমিত্তে মাঠ চাই। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মানভূম, বীরভূম, জেলা উত্তম। মাঠ আছে, জঙ্গল আছে। অন্য জেলায় গো-চর ভূমি কৃষিভূমিতে পরিণত হইয়াছে, গোরু পোষা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। বাঁকুড়াই ধরি। বাঁকুড়ায় মহিষ আছে; দুধ ঘি পাইবার সুযোগ আছে। মেষ আছে; কম্বল উৎপন্ন হয়। কিন্তু সবই নামে মাত্র। এককালে অনেক ছিল বোধ হয়। একালে কে পশুপালন বার্ত্তা করিবে? যে মাঠে ধান কলাই জন্মে না, অল্প চেষ্টা করিলে বোধ হয় সে মাঠে পশু পালনের ঘাস জন্মিতে পারে। জঙ্গলে পশুর খাদ্য লতা-পাতা নিশ্চয় আছে।

গ্রাসের পর আচ্ছাদন চিন্তা। বাঁকুড়ায় কাপাস চাষ নগণ্য। বঙ্গের কোথায় বা গণ্য? গাঁয়ের তাঁত গিয়াছে, চরকাও গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কাপাস চাষ গিয়াছে। সুতা রঙ্গাইবার লাল ও নীল রঙ্গও গিয়াছে। বস্ত্র ব্যবসায় হীন হওয়াতে কেবল তাঁতীর অন্ন নহে, আনুষঙ্গিক অন্য কলাজীবীর অন্নও গিয়াছে। বস্ত্র ব্যবসায়ে স্ত্রী পুরুষ খাটিত। পুরুষে কাপাস জন্মাইত, স্ত্রীলোকে কল হইতে সুতা করিত। তাঁতী তাঁত বুনিত, বাড়ীর মেয়েরা সুতার পাট করিত। পুরুষে রঙ্গ আনিত, মেয়েরা সুতা রং করিত। এখন যদি বা পুরুষের কর্ম্ম জোটে, নারীর কর্ম্ম নাই। যে দেশে স্ত্রী পুরুষে খাটিয়া সংসার চালাইত, সে দেশে অর্দ্ধেক লোক প্রায় বসিয়া আছে। এত বড় পরিবর্ত্তনে সমাজ-অঙ্গ শুষ্ক না হইয়া পারে না।

কৃষি-ভূমিতে উৎপন্ন যত হয়, বন-ভূমিতে তত হয় না বটে, কিন্তু ফলাইতে থাকিলে বন-ভূমি নিস্ফলা হয় না। বাঁকুড়ার মেষ-কম্বল ও তসর কাপড় বনের দান বলিতে পারা যায়। বাঁকুড়ার তসরের এখনও খ্যাতি আছে; কিন্তু তুৎ-পাট গিয়াছে। পাট চাষ কেন গিয়াছে, জানি না। তুৎ-পোকার মড়ক কারণ হইয়া থাকিবে। কিন্তু তুতিয়া জাতি আছে, এখন নাকি দস্যু হইয়াছে। অন্-

চিন্তায় সাধু চোর হয়, অন্যে পরে কা কথা। বাঁকুড়ার ত্রিশ হাজার তাঁতী যে দস্যু হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য।

দেখিতেছি, বস্ত্র বিষয়ে বাঁকুড়ার অবস্থা পূর্ব্বকালে ভালই ছিল। কাপাসের কাপড়, তসর ও পাটের কাপড়, লোমের কাপড়, তিন কাপড়ই ছিল। কয়টা জেলা আছে যেখানে ত্রিবিধ বস্ত্র উৎপন্ন হয়? কম্বল মোটা হউক, দরিদ্রের পক্ষে মোটাই ভাল। বাঁকুড়ায় শীত কম নয়। শীতে মোটা কম্বলই ভাল। কিন্তু প্রচুর পাই কই? যে-দিকে তাকাই, সে-দিকেই সেই-কথা। কে ইহার উত্তর করিবে?

আমাদের তৃতীয় কাম্য, ঔষধ। বাঁকুড়ার বনভূমি বনৌষধির আকর। হিমালয়ের ওষধি অবশ্য নাই, কিন্তু মধ্যভারতের ওষধি অনেক আছে। বনে কেবল ঔষধের গাছ নয়, অন্য কাজের গাছও আছে। কাজের গাছ ফেলা যাইতেছে না বটে, কিন্তু যত্ন করিলে বনের আয়-বৃদ্ধি অসম্ভব হইবে না। যে-সব জমিদারের জঙ্গল আছে, তাঁহারা মিলিয়া একজন বন-দ্রব্য-অভিজ্ঞ দ্বারা আয়-ব্যয় গাছ রক্ষা ও পালন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

আমি বাঁকুড়ার কি দেখিয়াছি, কি বা শুনিয়াছি। বাঁকুড়াবাসীর যাহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছে, অতি পরিচয়বশেই হউক, অনুসন্ধিৎসার অভাবেই হউক, তাহার দ্বারা বার্তা স্থাপনের চেষ্টা নাই, ইহাই দুঃখ। যখন বিদেশী গিয়া, একা কিংবা সম্ভূত হইয়া, বাঁকুড়ার ধনে ভাগ বসাইবে, তখন ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিবে। দুর্ব্বল আকৃতির ঈর্ষা স্বাভাবিক, কারণ তাহাই তাহার কৃতিত্ব। কোন্ মরুদেশ হইতে মারোআড়ী আসিয়া বঙ্গদেশে ধন-কুবের হইতেছে, আমরা দেখিতেছি আর ঈর্ষায় মরিতেছি। সে মরুদেশে বাঙ্গলীর কিন্তু চাকরিরও প্রত্যাশা নাই। গত ৪ঠা ভাদ্রের "সঞ্জীবনী" লিখিয়াছেন, "কলিকাতার বাড়ীগুলি মাড়োয়ারীরা ক্রমে হস্তগত করিতেছেন। তাঁহারা ক্রমে বাঙ্গলাদেশের জমিদার হইতেছেন।" দরিদ্র বাঁকুড়াই কি বাদ পড়িয়াছে? বাঁকুড়ার রেল ষ্টেশন হইতে নামিলেই এক উচা চিমনী চোখে পড়ে। এক মাড়োআড়ী কলের ঘানী বসাইয়াছেন। বাঁকুড়ার কত তৈলিকের ঘানী বন্ধ হইয়াছে শুনিবামাত্র সেই চিন্তা আসিতে থাকে। মারোয়াড়ী বণিক্ ঘাট-বাট ছাইয়া ফেলিয়াছে, বাঁকুড়ার জমিদারও হইয়াছে। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।—প্রবাসী।

নূতন জীবের সৃষ্টি

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

নূতন শৃঙ্গবিহীন গো জাতি

যাহাদের জীবন আছে, তাহাদিগকে জীব বলে। সুতরাং উদ্ভিদ ও পশু পক্ষী ইহারা জীব। উদ্ভিদ্ হইতে কীট, পতঙ্গ ও পক্ষীকে পৃথক্ করিবার নিমিত্ত ইহাদিগকে প্রাণী বলে। কৌশলে প্রাণীদিগের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়, নূতন জাতির সৃষ্টি করিতে পারা যায়, কিন্তু নূতন প্রাণীর সৃষ্টি করিতে পারা যায় না। ঠিক না হউক, অনেকটা নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি করিতে পারা যায়।

মাতা পিতা বাছিয়া লইলে গো জাতির সন্তান সন্ততি বলিষ্ঠ ও সুন্দর হয়। ভাল ফল হইবে সেই প্রত্যাশায় লোকে উদ্ভিদের ভাল বীজ রোপণ করে। বন্য অবস্থায় কদলী বীজে পরিপূর্ণ। তাহার পর প্রতিপালন করিয়া ও বাছিয়া পুছিয়া মানুষ ইহাকে

সুখাদ্যে পরিণত করিয়াছে ও ইহার নানা জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। এখন অন্য উদ্ভিদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃ বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত কলা বীজের সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষের যত্নে আশে পাশে উর্ব্বরা ভূমি পাইয়া কলা বীজ উৎপাদন করে না, তেড় বাহির করে। যে কলা গাছের স্বভাব প্রথম এইরূপ হইল তাহার চারা লইয়া মানুষ চাষ করিতে লাগিল। এইরূপে সে কদলী জাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ভূমিতে আবশ্যকীয় উদ্ভিদ খাদ্য শেষ হইয়া যাইলে, এখনও পুরাতন কদলী গাছের ফলে পুনরায় বীজের সৃষ্টি হয়। আম্রের ইতিহাস এইরূপ। বন্য আম্র গাছের ফল আমড়ার ন্যায় অম্ল ও বৃহৎ আঁটি বিশিষ্ট। একণে শত শত সুমিষ্ট আমের জাতি হইয়াছে। তাহার পর সকলে দেখিল যে আঁটি পুতিলে সকল সময়ে পিতা গাছের ন্যায় ফল হয় না। সেজন্য কলম উদ্ভাবিত হইল। পুরাতন গাছের ডাল লইয়া নূতন এক শিশু আম গাছে জুড়িয়া দিল। সেই শিশু গাছ অম্ল আম গাছের চারা হউক না কেন, কলমের ডালে তাহার ন্যায় ফল হইবে না, যে গাছের ডাল, সেই গাছের ন্যায় ফল হইবে। বড়ই আশ্চর্য্য কথা যে, অম্ল গাছ দ্বারা শোষিত রস দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া পুরাতন ডাল পুরাতন গাছের ফল উৎপাদন করে। এ পুরাতন ডাল কি পুরাতন গাছের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে? তাহা যদি হয় তাহা হইলে পুরাতন গাছ কালক্রমে বৃদ্ধ হইয়া যখন মরিয়া যাইবে, তখন দেশে বিদেশে তাহার যত কলম কাছে সে সমুদয় কি মরিয়া যাইবে? আমি তাহার উত্তর দিতে পারি না। সে পুরাতন ডালটা নূতন গাছে পরিণত হয় সেই জন্য বোধ হয় মরিবে না।

পশু, পক্ষী ও উদ্ভিদের নূতন জাতি কি নিয়মে উৎপাদন করিতে পারা যায়, সে নিয়ম মেণ্ডেল সাহেব প্রথম বাহির করেন। এক প্রকার আম আছে, যাহাতে প্রতি বৎসর ফল হয়, ও ফল ভারে গাছ অবনত হইয়া পড়ে। কিন্তু এ আম অতিশয় অম্ল। আর এক প্রকার অতি সুমিষ্ট ও সুস্বাদু আম গাছ আছে, কিন্তু তাহাতে কচিৎ কখন ফল হয়, ও ফল অধিক হয় না। একণে আমি যে নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিব, তাহাতে অম্ল গাছের ফলন্ত গুণ ও মিষ্ট গাছের মিষ্টত্ব গুণ থাকিবে। কলম করিলে তাহা হয় না। অম্ল গাছের ডাল লইয়া কলম করিলে তাহার ফলন্ত গুণ থাকিবে, মিষ্ট গুণ থাকিবে না। মিষ্ট গাছের ডাল লইয়া কলম করিলে তাহাতে মিষ্টত গুণ থাকিবে, ফলন্ত গুণ থাকিবে না। মেণ্ডেল সাহেবের নিয়ম অবলম্বন করিলে একাধারে দুই গুণের উৎপত্তি হয়। অম্ল গাছের অম্লত্ব ও মিষ্ট গাছের নিস্ফলত্ব গুণ দূর হয়। এক গাছের রেণু অপর গাছের জরায়ুতে প্রদান করিয়া তিনি নূতন জাতি উৎপাদন করেন। তাঁহার নিয়ম অবলম্বনে গো, অশ্ব, মেষ, শূকর কুক্কুর কপোত প্রভৃতি নানা প্রাণীর নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। আমেরিকা মহাদেশে টেক্সাস প্রদেশে গো জাতির সর্ব্বদা ম্যালেরিয়া জ্বরের ন্যায় জ্বর হইত। মেণ্ডেল সাহেবের নিয়মে এক প্রকার নূতন জাতির

সৃষ্টি হইয়াছে। এ জ্বর তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। এরূপ গরুর দল এখন অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ব আফ্রিকায় এক প্রকার মাছি আছে। গো, অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতি পশুর গায়ে বসিলে তাহারাও একপ্রকার রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মরিয়া যায়। এই রোগ হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় নানারূপ পরীক্ষা হইতেছে। এই পরীক্ষায় এক প্রকার গো জাতি উদ্ভাবিত হইয়াছে।

নূতন গো জাতি

এই অঞ্চলে আর এক প্রকার ডাশ মাছি আছে, তাহারা কামড়াইলে মানুষের ঘুমন্ত রোগ হয়। তাহাতে মানুষের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। কেবল নিদ্রা যাইতে মানুষ ইচ্ছা করে। অবশেষে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া মরিয়া যায়। ইহার ঔষধ নাই। এই রোগের উপদ্রবে অনেক জনপূর্ণ স্থান এক্ষণে লোকশূন্য হইয়াছে। পূর্ব্ব-আফ্রিকার সহিত ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি হইবার সম্ভবনা। বাণিজ্য পথে চীন দেশ হইতে আমাদের দেশে প্লেগ আসিয়াছে। এই পথে মধ্য আমেরিকা হইতে পীতজ্বর ও পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে ঘুমন্ত রোগ আমাদের দেশে আসিতে পারে। ঘুমন্ত রোগের কথা আমি পরে লিখিব। যে জ্বরমুক্ত গরুর কথা উপরে প্রদত্ত হইয়াছে তাহার বৃহৎ শৃঙ্গ আছে। কিন্তু যে গরুর চিত্র প্রদত্ত হইল তাহার শৃঙ্গ নাই।

পুরাতন শৃঙ্গবিহীন গরু

এই দুই গরুর সহায়তায় এক প্রকার শৃঙ্গ-বিহীন গো জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এক পুরুষে এ কার্য্য সম্পাদিত হয় না। কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, ইহাদের অনেক পুরুষ লইয়া পরীক্ষা করিলে তবে ইচ্ছানুযায়ী ফল লাভ করিতে পারা যায়, মেণ্ডেল সাহেবের নিয়ম অবলম্বনে তোমার যে দিকটী ইচ্ছা সেই দিকটী প্রবল করিতে পার। শৃঙ্গবিহীন গরুকে শৃঙ্গবিশিষ্ট করিতে পার, অথবা শৃঙ্গবিশিষ্ট গরুকে শৃঙ্গবিহীন করিতে পার। এই উপায়ে কিরূপ নূতন শৃঙ্গবিহীন গো জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার চিত্র উপরে প্রদত্ত হইল।

এ নিয়মে ছাগ, মেষ, শূকর পায়রা, মুরগী প্রভৃতি পশু পক্ষীর নানা প্রকার নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক দিন হইতে ভেড়ার পশমের উন্নতির জন্য চেষ্টা হইতেছে। বিলাত প্রভৃতি দেশে পূর্ব্বে একমাত্র ভেড়ার লোমেই লোকের পরিচ্ছদ হইত। এক্ষণে লোকে তুলা ও রেশমের কাপড়ও ব্যবহার করে। পিতা মাতা বাছিয়া লোকে পূর্ব্বে পশমের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিত। এই সামান্য জ্ঞান ব্যতীত লোকে আর বিশেষ কিছু জানিত না। জীবের স্বভাব, বর্ণ, কায়ার আয়তন, ইচ্ছা মত কিরূপে পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়, তাহা লোকে জানিত না। এক্ষণে অনেক পরীক্ষা করিয়া নানা জাতীয় পশমের উৎপত্তি হইয়াছে।

নূতন প্রকার পশম

এ পশম অতি কোমল। ইহার তুলনায় আমাদের দেশের পশম কিছুই নহে। বিলাতে সচরাচর যে পশম হয়, তাহা অপেক্ষা উহার মূল্য চারি পাঁচ গুণ অধিক। তবেই দেখ, বিজ্ঞান বলে লোকের কত উপকার হইতে পারে।

গোধূম সম্বন্ধে পরীক্ষা

মেণ্ডেল সাহেবের নিয়মে আবশ্যকীয় উদ্ভিদেরও উন্নতি হইতে পারে। ক্ষেত্রজ্ঞ এক জাতীয় গোধূমের রেণু লইয়া অপর জাতীয় গোধুমের স্ত্রী পুষ্পে প্রবিষ্ট করিয়া দিতেছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য নূতন গমের সৃষ্টি কর।

আমেরিকায় এক প্রকার গোধূম আছে, তাহাতে ফল অধিক হয়, কিন্তু অনাবৃষ্টিতে শীঘ্র মরিয়া যায়, আর এক প্রকার গোধূম আছে, তাহা অনাবৃষ্টিতে শীঘ্র মরিয়া যায় না,
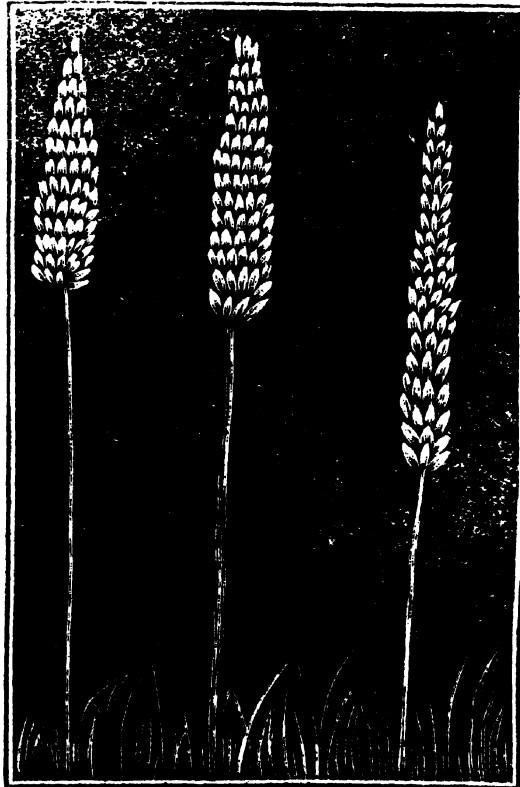
কিন্তু তাহাতে ফল অধিক হয় না, এই দুই জাতীয় গোধুমের যোগে দুই জাতীয় গুণ বিশিষ্ট এক প্রকার নূতন জাতির সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইতেছে। এ পর্য্যন্ত তাহার কিরূপ ফল হইয়াছে তাহা উপরে চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

গোধূম পরীক্ষার ফল

দক্ষিণ দিকে স্ত্রী জাতি বাম দিকে পুরুষ জাতি, মধ্যে পরীক্ষার ফল, ভূমির গুণে চাষের গুণে আমাদের দেশে নানা নূতন জাতীয় ধান্যের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু উদ্ভিদের রেণু লইয়া পরীক্ষা করিতে এখনও আমরা জানি না। রেণু লইয়া পরীক্ষা করিলে বোধ হয় ধান্যের অনেক উন্নতি হইতে পারে।

আমেরিকাতে বর্ব্বাঙ্ক সাহেব এইরূপ পরীক্ষা করিয়া নানা প্রকার নূতন ফুল ফলের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের এই বালিতে কেবল ফণী মনসা বা নাগফণীর গাছ সবলে সতেজ বৃদ্ধি হয়। অল্প দিনের মধ্যে তাহার এরূপ বন হইয়া পড়ে যে, বলিতে গেলে তাহার ভিতর মাছি পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না! এক বেড়া দেওয়া ব্যতীত এ কাঁটা আর কোন কাজে লাগে না। কিন্তু ইহার কাঁটা দূর করিতে পারিলে ইহা উত্তম গো-খাদ্য হয়। মেণ্ডেল সাহেবের নিয়মে অষ্ট্রেলিয়ার লোকে এক প্রকার কণ্টক বিহীন নাগফণীর সৃষ্টি করিয়াছে। সাহেবেরা এ জাতীয় নাগফণী এ দেশে আনিয়াছেন। কিন্তু এ দেশে ইহা ভালরূপ বৃদ্ধি হইতেছে না। বর্ব্বাঙ্ক সাহেব এই নাগফণীর গাছে এক প্রকার সুস্বাদু অম্ল মধুর ফলের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা এখনও এ দেশে আসে নাই।

—বঙ্গবাসী।

চাউলের দর—বিগত ৫০ বৎসর বাঙালায় চাউলের দামের কিরূপ কম বেশী হইয়াছে নিম্নে তাহা দেখান যাইতেছে—

১৮৭০ সালে চাউলের দর ছিল	১॥	টাকা হইতে	৩৲
১৮৮০ ” ” ”	২৲	”	৫৲
১৮৯০ ”	২॥	”	৫৲
১৯০০ ” ” ”	৩৲	”	৮৲
১৯১০ ” ” ”	৩।।	”	১০৲
১৯১৯ ” ” ”	৪॥	”	১২৲

চাউল ভারতের প্রধান খাদ্য। ইহার দর ক্রমশঃ বাড়িতেছে—কমের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় সাধারণ প্রজার যে কি কষ্ট হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। গভর্ণমেণ্ট রেঙ্গুন চাউল আনাইয়া প্রজার কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু রেঙ্গুন চাউলের দরও ৭।৭॥ টাকার কম নহে।

জবা ফুলের দ্বারা কাল রঙ—জবা ফুলের রঙ লাল কিন্তু উহা দ্বারা কাগজও কাপড়ে কাল রঙ করা যাইতে পারে। ফুলের রস বাহির করিয়া তাহাতে কাপড় চামড়া কাল রঙ হয়। ঐ—রসের সহিত কিছু লেবু সংযোগ করিলে কিন্তু লাল রঙ হয়।
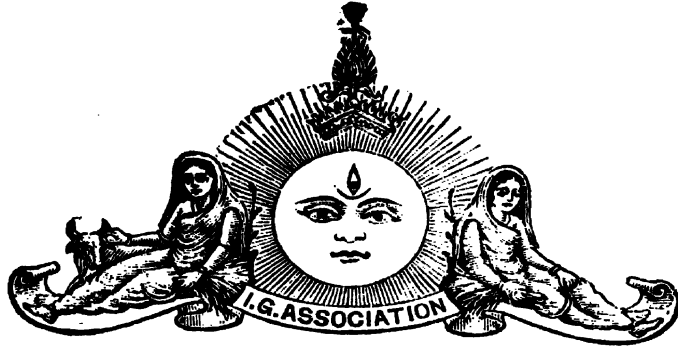
কার্ত্তিক, ১৩২৬ সাল

ভারতীয় কৃষির উন্নতি

ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য কিছু চেষ্টা হইতেছে বটে কিন্তু তাহা সর্ব্বতোমুখী নহে, সুতরাং উন্নতি ষোলকলায় পূর্ণ হওয়ার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। আমেরিকায় কৃষি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত প্রণালীতে পরিচালিত হয় বলিয়া তথাকার ক্ষেত্রগুলি অধিক ফল প্রসব করে এবং ফসলও উৎকৃষ্ট হয়। এই কারণে আমেরিকার চাষীদের অবস্থা স্বচ্ছল। আমেরিকার চাষীরা চাষে কৃষিযন্ত্র লাগাইয়া অর্থ, পরিশ্রম ও সময়ের অপব্যয় নিবারণ করিয়াছে; ফলে তাহাদের লাভের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে।

আমেরিকার চাষীরা যে এতদুর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে তাহার প্রধান কারণ সমবায় পদ্ধতি। তথায় কৃষক, জমিদার, ধনী একজোটে কার্য্য করিতেছে—পরস্পরের অভাব সহজে পূরণ হইতেছে। কিন্তু ভারতে এই সমবায় পদ্ধতির এখনও একান্ত অভাব।

এখানকার চাষীরা দলবদ্ধ হইয়া কাজ করে না—বা করিতে শিখে নাই। কিন্তু আমেরিকায় চাষী যদি চাষের সকল যন্ত্র একলা রাখিতে না পারে তবে তাহারা কয়েকজন মিলিয়া দলবদ্ধ হয় এবং সমবায় সংরক্ষিত যন্ত্রের সাহায্যে তাহারা সকলে নিজ নিজ ক্ষেত চষা, নিড়ান, মইদেওয়া, বিধে দেওয়া, ফসলকাটা তোলা বা মাড়া সব রকম কার্য্য সারিয়া লয় যে সকল যন্ত্রপাতি রক্ষা করা একজনের পক্ষে ভার বোঝা দশে একযোগে তাহা হাল্‌কা করিয়া লয়। ইহাতে কি তাহাদের কত কম সুবিধা। ভারতের চাষীদের মধ্যে এইরূপ সমবায় কোন কালে দৃষ্ট হয় না বলিলেই হয়। আক কাটা, আক মাড়া, ধান ভানা কলের এই প্রকার সমবায় কোথাও কোথাও দেখা যায় বটে কিন্তু তাহা চাষীদের সমবায় নহে। ব্যবসায়ীগণ এই

সকল কল লইয়া চাষীদের মধ্যে গিয়া বসে এবং কলগুলি ভাড়ায় খাটায়। প্রয়োজন হিসাবে কলের ভাড়া চড়িয়া যায়।

চাষীদের পরস্পরের সহযোগীতা ছাড়া গভর্ণমেণ্টেরও সহযোগীতা আবশ্যক। এখানে গভর্ণমেণ্টের সহযোগীতার চেষ্টা আছে বটে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নহে। বাঙলার ধান ও পাট বাঙলার নিজস্ব সম্পত্তি। গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে দুই একটা ভাল ফল দেখিলে এদেশে হৈ, চৈ, পড়িয়া যায়। হয়ত, অতি পুরাতন কথা নূতন ভাবে, নূতন ছাঁদে, ছাপিয়া বাহির হইয়া লোকের চটক লাগাইয়া দেয়। কিন্তু তাহলেই কি সব কাজ শেষ হইল? ইন্দ্রশালী ধান, কাকিয়া বোম্বাই পাট বা পোকা লাগে না এমন দেশী পাট পাইলে কি চাষীদের সব অভাব মিটিয়া গেল!

সত্য কথা, তন্তুতত্ত্ববিদ ফিনলো সাহেব দ্বারা পাট চাষের প্রভুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অমিশ্র কাকিয়া বোম্বাই (Capsularis জাতীয় পাট) ও দেশী (olitorus জাতীয়) R, 26. পাটের চাষ বেশ আশাপ্রদ ফল প্রদান করিতেছে এবং একর প্রতি গড়ে প্রায় ২০০ পাউণ্ড ফলন বাড়িয়াছে এবং অন্য ভাল পাট নির্ব্বাচনেরও চেষ্টা হইতেছে। মিঃ ফিন্‌লো পাটের জমির উপযুক্ত সারের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে বাঙলা, আসাম ও বিহার যেখানে পাট চাষ হয় তথাকার চাষীদের উপকার হয় নাই তাহা নহে কিন্তু তাহাদের শত অভাব বর্ত্তমান থাকিতে একটা দুইটা ভালমন্দ উপদেশে কি ফলোদয় হইবে!

এদেশে চাষীরা ভাল হেলো গরু ও কর্ষণযন্ত্র অভাবে তাহাদের জমি সুচারুরূপে চষিতে পারে না, জমিতে সার দিতে পারে না, যাহা কিছু গোময় সার পায়, তাহা জ্বালানী অভাবে পুড়াইয়া ফেলে, ক্ষেতে জল সেচনের আবশ্যক হইলে তাহার সুবিধা সুযোগ পায় না, অনশনে, অর্দ্ধাশনে, ও অন্য কারণে স্বাস্থ্যহানি হওয়াতে চাষীর মানুষ জন, গরু বাছুর মরিয়া শেষ হইতে চলিয়াছে, জমিদার তাহাদের অবস্থা দেখেন না, জমির ধারে কখন জান না; এমতাবস্থায় গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে রক্ষা না করিলে তাহদের রক্ষার উপায়ন্তর নাই।

এক সময় আমেরিকায় কয়েক বৎসর পর পর অনাবৃষ্টি হওয়াতে গমের ফসল নষ্ট হইয়া ক্ষতি হইল। তখন আমেরিকায় কৃষিবিভাগের চেষ্টা হইতে লাগিল যে অনাবৃষ্টিসহ গমের সন্ধান করা। সাইবিরিয়া হইতে অনাবৃষ্টিসহ গম মিলিল। এখন উহার চাষে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হইবে যে এমেরিকার চাষীরা অনাবৃষ্টী সহ গমের চাষ করিয়া বছরে প্রায় শতকোটি টাকা লাভ করিতেছে।

আমেরিকায় ধান চাষ আগে অল্পই হইত, এখন আমেরিকায় এত উৎকৃষ্ট ও এত অধিক ধান উৎপন্ন হইতেছে যে তাহারা নিজের অভাব মিটাইয়া উদ্‌বৃত্ত ধান বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। ভারতবর্ষ ধান্য উৎপাদনের প্রধান দেশ; কিন্তু কালে বোধ হয় আমেরিকা ভারতবর্ষকে ধান্য উৎপাদনে পরাজিত করিবে।

আবার ভারতের ধান য়ুরোপে রপ্তানি হইয়া কাপড়ের মাড়, অন্যান্য কার্য্য এবং মদের ভাঁটিতে খরচ হইতেছে আর ভারতবর্ষকে অন্নের জন্য হাহাকার করিতে হইতেছে—ভারত এখন ব্রহ্মদেশের মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। ভারতের চাষীগণকে রাজা বা জমিদারগণ রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে ?

ভারতে প্রায় ৩॥ কোটী একর জমিতে গমের আবাদ হয় এবং তাহাতে কম বেশী কোটি টন গম উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন গমের দশমাংশ বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে এবং তাহার মূল্য ১৯,০০ লক্ষ টাকা। ভারতে উৎপন্ন গম অধিকাংশই তাদৃশ ভাল নহে এবং সেই কারণে তাঁহার মূল্যও কম। সরকারী পরীক্ষাক্ষেত্র ভারতের গম চাষের উন্নতি জন্য বিবিধ চেষ্টার ফলে দুই প্রকার ভাল গমের চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—পুষা ১২নং ও পুষা ৪নং। এই দুই প্রকার গমের চাষ করিলে একর প্রতি ১৫৲ টাকা. বিঘা প্রতি ৫৲ টাকা অধিক আয় হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে পুষা ১২ নং গমের খ্যাতি সমধিক—পাটনা ও ভাগলপুর বিভাগে ইহার বহুল চাষ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইহা ছাড়া কানপুর ১৩নং, পঞ্জাব ১১নং গম ভাল বলিয়া নিৰ্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাও দেখা হইয়াছে যে যেখানে কূপের জলে চাষ হয় তথায় ১২নং পুষা ভাল এবং যেখানে খালের জলের সেচ পাওয়া যায় সেখানে পঞ্জাব ১১নং ভাল।

কৃষি বিভাগের চেষ্টায় গমের চাষ কতকটা উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে সত্য কিন্তু এখানে সমবায় পদ্ধতি প্রচলিত হইলে এবং রাজা, জমিদার সহায় হইলে ভারতের মত জল মাটিতে এই গম চাষের আমরা শতগুণ উন্নতি দেখিতে পাইতাম। গম চাষে ভারতের অভাব পূরণ করিয়া বিদেশে হইতে ২ কোটী টাকার স্থানে শতকোটী টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিত না কি ?

ভারতের মত সুবিস্তৃত প্রদেশে কেবল মাত্র ২৭।২৮ লক্ষ একর ভূমিতে আকের আবাদ হয়। সমগ্র ভারতে ৪৯টি মাত্র চিনির কারখানা আছে। আকচাষের ও চিনির প্রস্তুতের কতদূর পর্য্যন্ত উন্নতি হইলে ভারতের অভাব পূরণ হইবে তাহা বিদেশ হইতে আমদানী চিনির মাত্রা দেখিলেই বুঝা যায়।

ধান, গম, তুলার পরই লোকের গুড়, চিনির আবশ্যক। বিদেশ হইতে ভারতকে ১৪।১৫ কোটী টাকার চিনি প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। জাভা, মরিমস্, ষ্ট্রেট সেট্‌লমেণ্ট ভারতকে এই চিনি যোগাইয়া থাকে।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে চিনি শিল্প সমিতি (A bureau of informantion on Sugar Industry) স্থাপিত হইবার কল্পনা হইতেছে। সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইলে হয়ত প্রভূত উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে অন্য দেশের চাষাবাদের উন্নতি কত দ্রুত গতিতে চলিয়াছে আর ভারতের সবেমাত্র ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙ্গিতেছে।

ভারতে এখন অনেকগুলি কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাদের মধ্যে কয়েকটি বেশ কার্য্যোপযোগী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঐ সকল পরীক্ষা ক্ষেত্রের ফল কয়জন চাষী জানিতে পারে। আমেরিকাতে চাষীদের মধ্যে কৃষিজ্ঞান বিস্তারের জন্য ২৫ কোটী পত্রিকা বিতরণ করা হয়। আমাদের দেশে বোধ হয় ১ কোটী কৃষি পুস্তিকাও বিলি হয় না। আর বিলি করিয়াই বা লাভ কি ? আমাদের দেশে চাষীরা শতকরা ৮০ জন নিরক্ষর।

আমেরিকায় বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা ক্ষেত্র সমূহে নূতন নূতন কৃষিযন্ত্রের উদ্ভাবন ও পরীক্ষা চলিতেছে। কেজোযন্ত্রগুলির সমবায় পদ্ধতিতে চাষীদের ব্যবহারের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতেছে। কৃষি বিভাগের মারফতে নূতন যন্ত্রপাতির কার্য্য কুশলতার জ্ঞান চাষীদিগকে জ্ঞাপন করা হইতেছে।

আমেরিকায় কৃষিবিভাগ নিয়ত উদ্ভিদ তত্ত্বের নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন—পরিষ্কার তথ্যগুলি সত্যতা নিরুপণ হইতেছে—ও তাহা কাজে লাগান হইতেছে। এই প্রকার কৃষিকর্ম্মে নিয়োজিত পশুগণের ও খাদ্যোপযোগী পশু পক্ষীর শরীর তত্ত্ব খাদ্য আলোচনা চলিতেছে।

উদ্ভিদের খাদ্য (সার) নির্ণয় ও উদ্ভিদের বৃদ্ধির ও ফল প্রসবের অনুকূল ও প্রতি-কূল অবস্থা নির্ণয় করা হইতেছে।

জমিতে পাল্‌টি চাষের ব্যবস্থা এবং কোন্ ফসল চাষে জমিতে কোন সার সঞ্চিত হয়, কোন্ সার ব্যয়িত হয় তাহা স্থির হইতেছে।

বিদেশ হইতে নূতন বীজ, নূতন গাছ আনাইয়া স্বদেশে তাহাদের প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে।

ক্ষেতের জল মাটি বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়া দেওয়া যে ঐ জল মাটি কোন্ কোন্ ফসলের উপযুক্ত।

সাধারণ ও কৃত্রিম সার নির্ণয়, পশুখাদ্য তৃণ ঘাস উৎপাদন, দুগ্ধ উৎপাদন এবং দুগ্ধ জাত ছানা, মাখন, ঘৃত সংরক্ষণ প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাহায্যকল্পে কৃষি বিভাগের হস্ত প্রসারিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমেরিকার কৃষি বিভাগ এই কারণে বিশেষ প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে—কিন্তু আমাদের কৃষি বিভাগের সন্ধান কয়জন চাষীতে রাখে। আমাদের দেশের চাষীরা এখনও শত অভাব বুকে করিয়া লইয়া সেই সেকালের মামুলী প্রথায় চাষাবাদ করি-তেছে—দৈব অনুকূল হইলে কিছু পায়—দৈব প্রতিকূল হইলে সর্ব্বস্ব হারাইয়া হাহাকার করে। এই সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, আমরা বাক্যান্তরে বলিবার চেষ্টা করিব।

ত্রৈলোক্যনাথ বিয়োগ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ইহজগত পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি রাজকর্ম্মের উচ্চপদে থাকিয়াও, ইংরেজ ও ইংরেজীর মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও "বঙ্গবাসী"র স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে প্রৌঢ় বয়সে বাঙ্গালা লেখা আরম্ভ করেন; যাঁহার প্রথম লেখা "ভারতে স্থবর্ণ" তৎকালে বঙ্গবাসী অফিস হইতে প্রকাশিত "জন্মভূমি" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে, বঙ্গীয় সাহিত্যিক মহলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়; যিনি সেইকাল হইতে দেহত্যাগের অব্যবহিত কাল পর্য্যন্ত প্রথমে "জন্মভূমি" পরে "বঙ্গবাসী"তে ক্রমান্বয়ে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধীয় নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া আসিতেছিলেন; আবার কৌতূহলপ্রদ নানা গল্পে বাঙ্গালী পাঠকের মন মুগ্ধ করিয়া আসিতেছিলেন; এই সম্পর্কে যাঁহার "কঙ্কাবতী" প্রভৃতি অপূর্ব্ব গ্রন্থসমূহ "বঙ্গবাসী" অফিস হইতে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে এক অভিনবত্ব আনয়ন করিয়াছে। তিনি স্বতন্ত্রভাবে কৃষক পত্রিকায় অনেকানেক কৃষিতথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। ব্যাঙের ছাতা কোঁড়ক, (Mushroom) প্রকৃত জিনিসটা কি এবং কি প্রকারে তাহার চাষ করিতে হয় বঙালা ভাষায় তিনিই প্রথমে প্রচার করেন। এড়ি রেশম, তুঁতের রেশম সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধগুলি বস্তুত অতুলনীয়। তিনি লৌহ, পাথুরে কয়লা লইয়া সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমূহের গল্পচ্ছলে সহজ সরল ভাষায় আলোচনা তাঁহার লেখার একটি মৌলিকত্ব।

এক কথায় যিনি চাকুরী জীবনের মিষ্টার টি, এন, মুখার্জ্জী হইতে সাহিত্য জীবনের ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় হইয়াছেন, সেই ত্রৈলোক্যনাথকে "আমাদের ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেই সাধারণের বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে, ঐ নামের দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিতে ভ্রম হইবার অবসর থাকিবে না।

১৮৯৭ সালের ভারতীয় কৃষিসমিতি স্থাপিত হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার সহিত উক্ত সমিতির সহিত সংশ্রব হয়। তিনি তখন হইতে আজীবন ইহার পরামর্শদাতা ও প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতায় ভারতীয় শ্রমশীল্প সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহারও অধ্যক্ষ ছিলেন।

বৎসর দুই হইল ইনি ৺পুরীধামের পার্শ্বে সমুদ্রতীরে অনেকখানি স্থান ক্রয় করিয়া সেইখানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় কাণপুর কৃষি কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ স্থানে

থাকিয়া পিতার পরামর্শানুসারে কৃষিবিষয়ের নানা পরীক্ষা করিতেছিলেন। গত দুই মাস হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাতজ্বরে পীড়িত হইয়া পড়েন। সেই পীড়া ক্রমশঃ বাড়িয়া গত সোমবার তাঁহার দেহান্ত ঘটায়। সেবা চিকিৎসার অবশ্য কোন ত্রুটিই হয় নাই, কিন্তু গণা দিন ফুরাইলে ধরিয়া রাখিবে কে? পুত্র, কন্যা পত্নী, রাখিয়া প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে স্বনামো পুরুষো ধন্যঃ, মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকে প্রয়াণ করিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বগ্রাম ২৪ পরগণা-রাহুতা হইতে হুগলী ডফ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া দারিদ্র্যের নিষ্পীড়নে কিরূপে চিড়া খাইতে খাইতে হাঁটিয়া বড় বড় নদী সাঁতরাইয়া পার হইয়া কটকে গিয়াছিলেন; সেখানে এক পরিচিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেরের কৃপায় পুলীশের দারোগা পদ পাইয়াছিলেন; সেই পদে থাকা কালে হঠাৎ স্যার উইলিয়ম হণ্টারের নজরে পড়িয়া কলিকাতায় হণ্টার সাহেবের অফিসে উচ্চপদ পাইয়াছিলেন; তাহার পর ভারত গবরমেণ্টের রেভিনিউ সেক্রেটারী স্যার এডোয়ার্ড বকের সুনজরে পড়িয়া যুক্তপ্রদেশের কৃষি বিভাগে,পরে ভারত গবরমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে বড় বড় পদ পাইয়াছিলেন। শেষকালে কলিকাতায় মিউজিয়মের ছয় শত টাকা বেতনের সুপারিণ্টেণ্ট পর্য্যন্ত হইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন; বিলাতের লণ্ডন একজিবিসনে ভারতের প্রদর্শনীয় দ্রব্যের ভার লইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন, সেখানে কিরূপে স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স-অব-ওয়েলসের (ভূতপূর্ব্ব ভারত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের) নেক নজরে পড়িয়াছিলেন; এ সমস্ত কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভূতপূর্ব্ব রুষ জার নিকোলাস্—যিনি সম্প্রতি রুষের প্রজাদের হস্তে নিহত হইয়াছেন, তিনি সে সময় রুষের যুবরাজ, তিনি লণ্ডন একজিবিশন দেখিতে গিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাক্যালাপে মুগ্ধ হন এবং বন্ধুত্বের উপহার স্বরূপ তাঁহাকে এক অঙ্গুরীয় উপহার দেন এই রুষ যুবরাজ পরে ভারত ভ্রমণে আসিয়া নিজে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া বড়লাটের দ্বারা মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কলিকাতার বড়লাট প্রাসাদে ডাকাইয়া দেখা করেন।

মোট কথা, এমন চৌকোষ লোক বাঙ্গালায় আর হঠাৎ পাওয়া যাইবে না। স্কুলে তিনি তৃতীয় শ্রেণীর অধিক পড়েন নাই, কিন্তু তিনি আজীবন নিজে নিজে এত অধিক পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার ন্যায় বিদ্বান লোক—বিশেষতঃ কৃষি-শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে তথ্যজ্ঞ এবং তৎসম্পর্কীয় উদ্ভিদ্ রাসায়নজ্ঞ তাঁহার ন্যায় ভারতে খুব কম লোকই ছিল। তিনি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় উভয়ে প্রথমে "বিশ্বকোষ" বাহির করেন। অ আ বর্ণ দুইটীতেই দুইখানি বৃহৎ পুস্তক হয়। তাহার পর এই "বিশ্বকোষ" সম্পাদন ভার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর হাতে যায়। এমন বিদ্যার জাহাজ, অথচ বাহিরে তাহার কিছুমাত্র প্রকাশ ছিল না; বাহিরে যেন সদানন্দ ছেলে মানুষটী,

কখন কখন ব্যবহারে পাগলবৎ প্রতীয়মান ছিলেন। ঐ সব কঠিন কঠিন বিষয়ে তিনি সোজা বাঙ্গালায় জলের ন্যায় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া লিখিতে পারিতেন, এইটাই তাঁহার মহাশক্তি ছিল। এমন নির্দ্দোষ রঙ্গরসযুক্ত গল্প লিখিতেন যে, পড়িতে পড়িতে যেমন পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইত, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ লাভ হইত। তাঁহার এই শ্রেণীর গল্পগুলর উল্লেখ করিয়া একবার একজন ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় সাহিত্যে কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলিয়াছিলেন,— মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালার সুইফ্‌ট। সুইফ্‌ট একজন নামজাদা ইংরেজ লেখক।

এমন একটী দুর্লভ রত্ন আজ বাঙ্গলা হারাইল। বাঙ্গালায় আমরা এমন একটী মানুষের মত মানুষ হারা হইলাম।— বঙ্গবাসী।

আমেরিকায় চাউল—পূর্ব্বে আমেরিকাতে চাউল উৎপন্ন হইত না, আমেরিকাবাসীর প্রধান আহার্য্য নহে বলিয়া কেহই ধান্যের আবাদ করিত না। যে সকল ভারত সন্তান বা চীনবাসী আমেরিকায় গিয়া বাস করিতেছে, তাহাদের জন্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ হইতেই চাউল তথায় প্রেরিত হইত। ইদানীং মার্কিন রাজ্যের দক্ষিণাংশে ধান্যের আবাদ হইতেছে। সংপ্রতি বিলাতে "টাইমস" পত্র সংবাদ পাইয়াছেন যে, এবারে আমেরিকাতে এত অধিক চাউল হইয়াছে যে, তদ্বারা স্থানীয় অভাব মোচন হইয়াও পাঁচ লক্ষ টন বা প্রায় দেড় কোটী মণ চাউল উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। সেই অতিরিক্ত চাউল অবশ্য বিদেশে রপ্তানী করা হইবে। ইতোমধ্যেই নাকি প্রায় ৬০ লক্ষ মণ চাউলের ক্রেতা ঠিক হইয়াছে। "টাইমস" আরও বলিতেছেন যে এসিয়া মহাদেশের চাউল অপেক্ষা মার্কিন চাউল অনেক উৎকৃষ্ট। যদি মার্কিন চাউল ইউরোপ ও আফরিকা প্রভৃতি স্থানে আমদানী হয় তবে ঐ সকল স্থানে ভারত হইতে চাউল রপ্তানি হ্রাস পাইতে পারে। ইহাতে আপাততঃ অন্নকষ্ট পীড়িত ভারতবর্ষে চাউলের মূল্য কিছু হ্রাস পাইবে সত্য, কিন্তু পরে যদি মার্কিন চাউলের সহিত ভারতীয় চাউল প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারে তবে, এদেশের কৃষকগণের বিশেষ ক্ষতি হইবে। বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য না করিলে ভারতীয় কৃষকগণ কি মার্কিন কৃষকদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে?—ভাবনার কথা।

রেঙ্গুণ চাউল—রেঙ্গুণ হইতে যে চাউল আমদানি হইয়া থাকে তাহা আতপ বাঙ্গালা দেশের অনেক লোকেরই আতপ চাউল ব্যবহারে অভ্যাস নাই। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ লোকেই নিজ নিজ দেশ পদ্ধতি ক্রমে সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। রেঙ্গুন চাউলের ন্যায় যদি রেঙ্গুন ধান্য আমদানি করার বন্দোবস্ত করা যায়

তাহা হইলে মফস্বলবাসীদিগের সেই ধান্য হইতে চাউল প্রস্তুত করিয়া লইবার সুবিধা হইতে পারিবে। কলিকাতায় চাউল প্রস্তুতের সুবিধা না হইতে পারে কিন্তু মফস্বলের অধিবাসিগণ ধান্য পাইলে সিদ্ধ চাউলের অভাব পূরণ করিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্ট যদি এ সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া বর্ত্তমানে রেঙ্গুন হইতে যে পরিমাণ চাউল আমদানির ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক ধান্য আমদানি করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন তবে মফস্বলের অনেক অসুবিধা দূর হইতে পারিবে।

ধারে চাউল বিক্রয়—দরিদ্র ব্যক্তিরা ধারে চাউল ক্রয় করিতে না পাইলে, সুলভ মূল্যের চাউল তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না। যে সমস্ত লোক বাজারেএক পয়সাও ধার পায় না সেই সমস্ত লোকের পক্ষে এ সাহায্য বড়ই হিতকর হইবে। দরিদ্র ক্রেতাগণ তাহাদের সুবিধা মত এক বৎসরের মধ্যে চাউলের দাম পরিশোধ করিবে। মূল্যের উপর কোন সুদ লওয়া হইবে না। একান্ত দরিদ্রগণ পক্ষে মূল্য গ্রহণের সময় বিশেষ বিবেচনা করা হইবে। প্রত্যেক পরিবারভূক্ত লোক সংখ্যার হিসাব করিয়া প্রতি পরিবারের সপ্তাহোপযোগী চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে এবং সুবিধামত তাহারা টাকা শোধ করিতে পাইলে এখন দরিদ্রের বিশেষ আনুকূল্য হয়।

শর্করা—ভারতের শর্করা শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও উহার পুনরুদ্ধার উপায় অবধারনার্থ ভারত গবর্ণমেণ্ট এক কমিট নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা "ছেড়ে দিয়া তেড়ে ধরার মত হইলেও গবর্ণমেণ্টের এই চেষ্টা প্রশংসার্হ। যাঁহাদিগের ঔদাসীন্যে শিল্প নষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা এখন ভ্রম বুঝিয়া প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতেছেন, ইহা ভাল কথা। কমিটি প্রধানতঃ ইক্ষুজাত চিনির বিষয়েই বিবেচনা করিবেন শুনিতেছি। এতৎপ্রসঙ্গে বঙ্গদেশের খর্জ্জুর রসজাত গুড় ও চিনি যেন উপেক্ষিত না হয়, ইহাই আমাদিগের অনুরোধ। এদেশের খর্জ্জুর বৃক্ষ সমুহ এখন সম্পূর্ণ অবহেলায় রাখা হয়। ঐ সকল বৃক্ষ হইতে সুপ্রণালীক্রমে রস বাহির করিতে পারিলে কি পরিমাণে গুড় ও চিনি পাওয়া যাইতে পারে, তাহাতে লাভ বা ক্ষতির কিরূপ সম্ভাবনা, সে বিষয়েও অনুসন্ধান আবশ্যক। কর্ত্তৃপক্ষ বঙ্গদেশের খর্জ্জুর শরর্করা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এক ব্যক্তিকে কমিটিতে গ্রহণ করিলে ভাল হয়।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ—১৯২০ সালের শীতকালে প্রিন্স-অব-ওয়েলস—আমাদের যুবরাজ—ভারতে আসিবেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনিই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধের উদ্বোধন করিবেন, এইরূপই শুনা যাইতেছে।

কলিকাতায় শিল্প-বিদ্যালয়—এতদিনে গবর্‌-মেণ্ট এদেশে টেক্‌নিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হইয়াছেন। বেঙ্গল গবরমেণ্টের অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী

গুড সাহেব কলিকাতার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে এক সভায় আহ্বান করিয়াছেন; আগামী ১৮ই নবেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় কলিকাতার লাট বাড়ীতে এই সভা হইবে। স্বয়ং গবরণর লর্ড রোণাল্ড.শ সভাপতি হইবেন। কলিকাতায় শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সভায় পরামর্শ হইবে। যদি এই সভাতেই কার্য্য-পদ্ধতি ঠিক হইয়া যায় তাহা হইলে, তদনুসারে কাজ করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই কমিটি গঠিত হইবে।

দারিদ্রের কারণ—শ্রীমতী আনি বেশান্ত বলিয়াছেন যে "ভারতের দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ রাজা ও জমিদারগণের প্রজার প্রতি কর্ত্তব্যের ঔদাসীন্য। তিনি আরও বলিয়াছেন যে "জনসাধারণে দুঃখ কষ্ট আর অধিক দিন সহ্য করিতে পারিবে না।" এই ঔদাসিন্য দুরীভূত না হইলে প্রজার অবস্থা কখনই স্বচ্ছল হইতে পারে না। শ্রীমতী বেশান্ত যে রাজনীতিক দলের অন্তর্ভুক্ত, তিনি সেই দলের পক্ষ হইতে যাহা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছেন তাহা বলিয়াছে, কিন্তু আমাদের মনে হয় দেশের অবস্থার সমস্ত দায়িত্ব কেবল গবর্ণমেণ্টের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। আমাদেরও প্রতি পল্লীগ্রামে, প্রতি মহকুমায় ও প্রতি জেলায় শিক্ষার অভাব, অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, দূর করিবার জন্য দেশবাসি-গণের সহিত মিলিয়া কার্য্য করিতে হইবে। সমস্ত বিষয় বিশেষ ভাবে ভাবিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে গবর্ণমেণ্টের চেয়ে আমাদের নিজেদের দোষও কম নহে। গবর্ণ-মেণ্ট দেশে যে সমবায় প্রথার যৌথ ঋণ দান সমিতি কৃষিসমিতি, শিল্প সমিতি, ব্যবসা সমিতি, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, প্রত্যেক শিক্ষিত দেশবাসীর এই দিকে মনো-যোগী হইয়া অশিক্ষিত কৃষককুলকে বুঝাইয়া গবর্ণমেণ্টের শুভ উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয় সদ্বিষয়ে সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

সাধু চাষী—ঢাকায় বরদী নামক স্থানের জমীদার বাবু বরদা কান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নাম অনেকের নিকট সুপরিচিত। ইনি কৃষি কর্ম্মে আত্ম নিয়োগ করিয়া ছিলেন। শোন নদীর উপকুলে দিহিরিতে তিনি মারগৃহি নামক একটি ধান্যক্ষেত্রে স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি শেষ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া চাষ লইয়াই পড়িয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট ১৫ বৎসর কাল চাষেই অতিবাহিত করেন। ধান চাষের উন্নতিই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বীজ নির্ব্বাচন দ্বারা ধান চাষের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং তিনি ধানের ফসল চারিগুণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাধরণতঃ আমাদের দেশে বিঘা প্রতি ১০ মণ ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি বিঘায় ৪০ মণ পর্য্যন্ত ধান উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যের ফল দেখিয়া স্থানীয় সকলকে বিস্ময় মানিতে হইয়াছিল। তিনি চাষীদের লইয়া চাষে ব্যাপৃত থাকি-তেন এবং তাহাদের উন্নতি কল্পে প্রাণপণ করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। চাষীগণের মধ্যে স্বক্ষেত্রে তাঁহাদের জীবলীলা শেষ করিয়াছেন।—তিনি দেশের প্রকৃত বন্ধু। কারণ—

The Saying is That he is the Greatest Benefactor of humanity who can grow two blades of corn in place of one.

তাঁহার আত্মশক্তিতে প্রত্যয় ও নির্ভরতা ছিল—এই অন্যান্য সাধারণ গুণের জন্যই তিনি মানুষের মত মানুষ। তাঁহার বংশের সকলেই গণ্যমান্য ও বুদ্ধিমান তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহ জজ, কেহ ব্যারিষ্টার, কেহ বিলাত ফেরত ডাক্তার।

বাঙ্গালার গরু মহিষ

গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে ভারতের কয়েকটী প্রধান প্রদেশের গরু মহিষের সংখ্যা নির্ণয় করা হইতেছে।

মিঃ ব্লাকউড ১৯১১ সালে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও আসামের এবং ১৯১১ সালের পর হইতে বাঙ্গালার অবশিষ্ট অংশের গো-মহিষের সংখ্যা ও অবস্থা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৯১৫ সালে তিনি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন। সেই রিপোর্টের সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

বাঙ্গলা দেশের লোক সংখ্যা ৪ কোটি ৫৫॥ লক্ষ ; গো-মহিষের সংখ্যা ২,৫৩,৫৫,৮৩৮ সুতরাং প্রতি ১০০ জন লোকে ৫৬টা গরু মহিষ আছে অর্থাৎ প্রতি দুই জনে প্রায় একটা গো-মহিষ আছে। ইংলণ্ডে ১০০ লোকের মধ্যে গরুর সংখ্যা ২৬এর বেশী নহে।

বাঙ্গলার সমতলভূমি অতিশয় উর্ব্বরা কিন্তু গরুগুলির অবস্থা ভাল নয়। বাঙ্গালায় পশ্চিমাঞ্চলের গরুগুলি পূর্ব্বাঞ্চলের গরু অপেক্ষা একটু দীর্ঘকায় কিন্তু মোটের উপর গবাদি পশু সর্ব্বত্রই অনাহারে শীর্ণ ও ক্ষুদ্র দেহ। বর্দ্ধমান ও রাজসাহী বিভাগে গরুর সংখ্যা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ অপেক্ষা বেশী।

বাঙ্গালার ৮০,৮৭,৮৭২ বলদের মধ্যে শতকরা ১২টা অন্য স্থান হইতে আমদানি করা, ৭১,১০,৬৩৪ গাভীর মধ্যে শতকরা ৩৭টা মাত্র অন্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। বেহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতেই গরু আমদানী করা হইয়া থাকে। মণিপুরী গরু ত্রিপুরা জেলায় আমদানী হয়।

অন্য প্রদেশ হইতে আনীত বলদগুলি খুব জোরয়ান বটে, কিন্তু তাহারা বেশীদিন বাঁচে না। ভিন্ন প্রদেশ হইতে আনীত গাভীর দুগ্ধ বাঙ্গালা দেশে আসিয়া কম হইয়া যায়। স্থানীয় গাভীগুলির দিনে ৩ সেরের বেশী দুধ হয় না।

ভাল ষাড়ের সংখ্যা বাঙ্গালা দেশে অত্যন্ত কম। ভাল ষাড় আনীত হইলেও তাহাদের পর্য্যাপ্ত খাইতে ও ইতস্তঃ চরিতে দেওয়া হয় না সুতরাং তাহারা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। যে দেশের গাভী ও ষাড় উভয়ই দুর্ব্বল, সে দেশে বলবান গরু জন্মিবার আশা কোথায় ?

গরুর খাদ্যের যথেষ্ট আয়োজন নাই। দিন দিনই গোচর হ্রাস হইতেছে, পূর্ব্ব বাঙ্গালার গরুর ভাল খাদ্যও জন্মে না।

প্রেসিডেন্সী ও রাজসাহী বিভাগে বিশেষতঃ বর্দ্ধমান জেলায় গরুর পরিবর্ত্তে মহিষের দ্বারা গাড়ী টানার ব্যবহার দিন দিন বেশী প্রচলিত হইতেছে।

বাঙ্গালার কৃষকদের জমি কম, ভূমি উর্ব্বরা সুতরাং দুর্ব্বল গরুর দ্বারাও চাস করা সম্ভব, অনুসন্ধান করিয়া ইহা অবগত হওয়া গিয়াছে যে প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক কৃষকের গড়ে প্রায় ৮॥ বিঘা জমি আছে এবং প্রত্যেক ২১ বিঘা চাষের জন্য ২টা মাত্র হালগরু আছে।

২৩ জন চাষা মিলিত হইয়া পরস্পরের জমি চাস করিয়া থাকে, কিন্তু পরস্পরে মিলিত হইয়া কার্য্য করার ভাব বর্দ্ধিত না হইলে ঐ প্রথা সম্যক বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রজার জমির পরিমাণ কম তাই তাহারা উৎকৃষ্ট গরুর আবশ্যকতা উপলব্ধি করে না। নিজের হাল ও গরুর দ্বারাই তাহা চাষ করে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে পতিত জমি অপেক্ষা চাষের জমি বেশী, বর্ষাকালে জমি ডুবিয়া যায় সুতরাং তথায় চাষের জন্য যত গরুর প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা বেশী কেহ রাখে না। বিশেষতঃ গরুর গাড়ীর প্রচলনও বেশী নাই, সুতরাং ঐ দুই বিভাগে গরুর সংখ্যা কম।

বাঙ্গালার আর্দ্র ভূমিতে গরু সবল হইতে পারে না। যে সকল স্থান বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায়, সে সকল স্থানে গোমহিষ সচ্ছন্দে চরিতে পারে না। গোচর ও ঘাসের অভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের গোজাতির উন্নতি হওয়া অসম্ভব। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে লোকে গোচর ভূমি পর্য্যন্ত চাষ করিতেছে সুতরাং গরুগুলি আর চরিতে পারে না। কিন্তু যথেষ্ট গোচরও যদি থাকে তবু গোজাতির উন্নতি সম্ভব নয়, যদি ভূমি আর্দ্র থাকে। আসামে পশু খাদ্যের অভাব নাই। কিন্তু আর্দ্রতা বশতঃ গো-মহিষের দেহ সবল হইতে পারে না। বাঙ্গালার গোজাতির অবনতির আর কয়েকটী কারণ এই যে, এখানে ভাল ষাঁড় নাই, দুর্ব্বল ষাড় গুলিই বৎসের জনক হয়, বৎস গুলিকে যথেষ্ট দুধ খাইতে দেওয়া হয় না।

লোকের মুখে তিনটী অভিযোগ সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়—

১। দুধের দাম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ২ গরু অল্প দুধ দেয়। ৩ গরুর সংখ্যা

ক্রমে হ্রাস হইতেছে। লোকে বলে যথেষ্ট থাকিলে ঐ ত্রিবিধ দোষ দূর হইত।

মিঃ ব্লাকউড ও গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, উহাতে বিশেষ কোন ফলোদয় হইবে না। কৃষির জমি গোচর করা দুঃসাধ্য, যদি অনেক কৃষি ভূমি গোচর করা হয়, তাহা হইলে গরুর সংখ্যা বাড়িতে পারে, কিন্তু তখন গোচর আর পর্য্যাপ্ত হইবে না। চাম্পারণে অনেক গোচর আছে, কিন্তু গরু অতি নিকৃষ্ট, নাসিকে গোচর অতিশয় কম কিন্তু গরু অতি উত্তম।

জলপাইগুড়ি ও মালদহ ব্যতীত বাঙ্গালার আর কোথাও গরুর বংশ বৃদ্ধির ব্যবসায়ী নাই। বাঙ্গালার জলবায়ু যেরূপ তাহাতে ঐ ব্যবসায় লাভজনক হইতে পারে না।

ত্রিবিধ উপায়ে বাঙ্গালার গরুর উন্নতি হইতে পারে। (১) উত্তম ষাঁড় রাখা, (২) বাছুরকে বেশ করিয়া দুধ খাইতে দেওয়া, (৩) ঘাসের চাষ করা।—

সরকারী কৃষি-রিপোর্ট।

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে শ্রীরামপুরেই কেবল একটী বয়ন বিদ্যালয় আছে। স্বদেশীর হিড়িকের সময় কলিকাতাতেও একটী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা গতাসু হইয়াছে। কিন্তু বস্ত্র বয়ন ও সূত্র নির্ম্মাণ রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইলে উহাও একটী প্রধান শ্রম শিল্পের মধ্যে পড়িগণিত হইতে পারে, বহু ব্যক্তি উহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পার, দেশের লোকের অভাব অনেক পরিমাণে দূর হয়। সম্প্রতি নোয়াখালী জেলা বোর্ড একটী বয়ন বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে ছয় হাজার উনষাট টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এরূপ অনুষ্ঠান সকল জেলা বোর্ডের দ্বারা সমান ভাবে হইলে বয়ন ও সূত্র নির্ম্মাণ শিল্প দেশের মধ্যে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। সেরূপ হইলে দেশের দশাও অনুরূপ দাঁড়ায়। শিল্প সম্বন্ধে সর্ব্বত্র সজাগ ভাব দেখা যাইতেছে। সারা দেশে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সেই সাড়া কেবল কথার তাড়া না হইয়া কাজের তাড়া হইলে তবে তাহার উপকারিতাও বুঝিতে পারা যায়। কথা ত অনেক হইয়াছে। এখন নির্ব্বাক কার্য্য চাই।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস

সব্জীবাগান।—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম, মটর, মুলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মুলা, বিলাতী সীম, বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীতপ্রধান দেশে এবং যথায় জমিতে রস অধিক দিন থাকে—যথা উত্তর-আসামে বা হিমালয়ের তরাই

প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিম্নবঙ্গে কপিচারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সব্জী :—বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভুঁই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আঁাস জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়। নদীর চরে তরমুজ চাষ প্রশস্ত।

ফুলের বাগান।—হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্বিনা, ক্রিসান্থিমম, ফ্লক্স, পিটুনিয়া অ্যাষ্টারসম, সুইটপী ও অন্যান্য মরশুমী ফুল বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটী দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না, পাকমাটি চূর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব

কৃষি ক্ষেত্রে।—মুগ, মসুর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা না হউক কতক পরিমাণে ফসল হইবেই। পশু খাদ্যের মধ্যে ম্যাঙ্গোল্ড বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত চারার আইল বান্ধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব, বই, মুগ কলাই, মটর এই সকল রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আলু ও বিলাতী সব্জীর বীজ লাগান এই মাসেও চলিতে পারে; কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন; মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ শসা, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালী দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্গা করিয়া দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে; বিলাতী সব্জীর জাঁটিতে জল সিঞ্চন, প্রাতে বেলা ৯টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া

সন্ধ্যায় আবরণ খুলিয়া দেওয়া ; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয় ; ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট।—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্ট হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিমে ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা' কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টীগোলাপ খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটীতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরাতন ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটিবার সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যকমত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্রে খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় পোড়ামাটি, সরিষার খৈল, গোমুত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুঁড়া সার সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার একভাগ, পোড়ামাটি একভাগ এবং এঁটেল মাটি দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এই সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভূষা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভূষা কলিকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড মিশ্র সারে এক প্যাকেট ভূষা যথেষ্ট, ভূষা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়। পাকা ছাদের রাবিশের গুড়া কিঞ্চিৎ, অভাবে পোড়ামাটি ও গুঁড়া চুণ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া লইলে গাছের ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

২০শ খণ্ড । | অগ্রহায়ণ, ১৩২৬ সাল । | ৮ম সংখ্যা

আর্য্য কৃষিরীতি

সুখার্থী কৃষকদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়—

শ্রীঅক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্ন লিখিত ।

দেবয়াতনোদ্যান নিপাতস্থান গোব্রজান্ ।
সীমা শ্মশানভূমিশ্চ বৃক্ষছায়া ক্ষিতিং তথা ॥
ভূমিং নিখাত যূপাঞ্চ অয়ন স্থানমেবচ ।
অন্যামপি হি চারাহ্যং ন কর্ষেৎ কৃষিকৃৎধরাম্ ॥
নোষরাং বাহয়েদ্ভূমিং বর্চাশ্মকর্করীবৃতাম্ ।
বাহয়ন্ন প্রমত্তশ্চ ন নদীপুলিনং তথা ॥
ধ্বস্তসৌ বাহয়েল্লোভাদ্দ্বেষাদ্বাপি হি মানবাঃ ।
ক্ষীয়ন্তে সোহচিরাৎ পাপাৎ সপুত্রপশুবান্ধবঃ ॥
নরকং ঘোরতামিস্রং পাপীয়ান যাতি চৈ ন সা ।
পরকীয়া যোহপহৃত্য কৃষিকৃদ্বাহয়েদ্ধরাম্ ॥
স ভূমিস্তেন পাপেনহ্যনন্তনরকং বসেৎ ॥
ন দূরে বাহয়েৎক্ষেত্রং ন চৈবাত্যন্তিকে তথা ।
বাহয়েন্ন পথিক্ষেত্রং বাহয়েন্দুঃখভাগভবেৎ ॥

(বৃহৎপরাশরসংহিতায়াং)

দেবস্থান, উদ্যান, নিহত স্থান, গোষ্ঠ (গোচারণ স্থান), সীমাপ্রান্ত, শ্মশানভূমি, বৃক্ষছায়া, যূপ (বৃষ কাষ্ঠ) প্রোথিত স্থান, যাতায়াত স্থান, এবং অন্যান্য অবাহ্য ভূমি সকলও কর্ষণ করিবে না। উত্তর ক্ষেত্র, বিষ্ঠাক্ষেত্র, প্রস্তর ও কর্করসঙ্কুল স্থান এবং নদীতট প্রমত্ত হইয়া কখনই কর্ষণ করিবে না। যদি লোভ ও দ্বেষাদির বশবর্ত্তী হইয়া চাষ করে, সেই পাপে সে শীঘ্রই পশু, বান্ধব ও পুত্রাদির সহিত বিনাশ প্রাপ্ত এবং ঘোর তামিস্র নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি অন্যের জমি অপহরণ করিয়া কৃষিকার্য্য করে তাহাদেরও সেই পাপে অনন্ত নরকে গতি হয়। অতি দূরে বা অতিশয় নিকটে কিম্বা পথ চষিবে না। ইহাতে দুঃখভাগী হইতে হয়।

সুখ দুঃখ কর্ম্মায়ত্ত এবং কর্ম্ম হইতেই সঞ্জাত। যে কার্য্যই হউক না কেন, সুখলাভ করাই সকল কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কৃষিকার্য্যের দ্বারা উহা সম্যক সাধিত হইতে পারে। অতএব অনার্য্যের কৃত কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা উহাকে নষ্ট করা কাহারও উচিত নহে। প্রমত্ত ব্যক্তিগণের দ্বারাই উহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রমত্তগণ নিজের বেগ নিজে সম্বরণ করিতে পারে না। তাহারা নিজের গতিও নিজে বুঝিতে পারে না। একারণ আর্য্যোচিত নিয়ম সংরক্ষণেও তাহাদের সাধ্য নাই। অতএব অপ্রমত্ত হইয়া আর্য্যোচিত বিধানে চাষ করা শ্রেয়ার্থী ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য। যে স্থান চষিবার স্থান নয় সেখানে চাষ দেওয়া এক লোভ নয় অপরের দ্বেষমূলক তাহাতে আর সংশয় নাই। আমাদের যতই বিদ্যা বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতা থাকুক, সুখের মূল উপাদান অনুমান ব্যতীত যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই তখন তাহা পাইতে হইলে তপস্যাপরায়ণ ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য মনীষিগণের উপদেশ ব্যতীত আর কি শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হইতে পারে। তাঁহারা বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা যাহা দুঃখের নিদান বলিয়া স্থির জানিয়াছিলেন সেই সেই স্থলেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের কিছুমাত্র অসদ্ভাবও নাই। সূক্ষ্মদর্শী হইয়া দেখিলে সকলেই উহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা হিতেচ্ছুক তাঁহারা শাস্ত্রবাক্যে সন্দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মানুধাবন করিয়া দেখুন উহা হইতে ধ্রুব সত্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়া বিশিষ্ট ফল ও সর্ব্বোত্তম সুখ লাভে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

ক্ষেত্রষেবং কৃতিং কুর্য্যাৎ যা মুষ্ট্রৈর্নাবলোকয়েৎ।
ন লঙ্ঘয়েৎ পশুর্য্যাং বা নাভীযাদ্যঞ্চ শূকরঃ॥
বদ্ধশ্চ যত্নতঃ কার্য্যে মৃগমুত্রাসনায় চ।
অত্রাপ্যুদ্রবং রাজ তস্করাদি সমুদ্ভবম্॥
সংরক্ষেৎসর্ব্বতো যস্মাদ্যস্মাৎগৃহ্লাত্যসৌ॥
কৃষিকৃন্মানবস্তেবং মত্বা ধর্ম্মং কৃষে ধ্রুবম্॥

(কৃষিপরাশরে।)

উষ্ট্র অবলোকন করিয়াও ক্ষেত্রমধ্য দেখিতে না পায়, কোন পশু লঙ্ঘন করিতে না পারে, শূকর খনন করিতে সক্ষম না হয়, মৃগ সকল নিকটস্থ হইতে না পারে, কৃষক এরূপভাবে বেড়া দ্বারা ক্ষেত্র সংরক্ষণ করিবে। এতদ্ব্যতীত রাজা ও তস্কর হইতেও কৃষির উপদ্রব হইয়া থাকে। কৃষক এইরূপে কৃষিধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া যাহাতে কৃষি রক্ষা হয় সম্যক প্রযত্নে তাহা করিবেক।

আগে রোঁধ। পরে-খোঁদ॥ [খনা।]

আগে রুদ্ধ করা অর্থাৎ বেড়া দেওয়া আবশ্যক পরে খোঁদ [খোদন] চষা খোঁড়া বিধেয়।

কৃষিক্ষেত্রের অনেক বিঘ্ন। অতএব বিঘ্ন নিরাকরণ জন্য অগ্রেই যত্নবান হওয়া কৃষকের কর্ত্তব্য। যেমন কৃষকের কৃষিবিষয়ে সুদক্ষতা (স্বাদ বোধ) থাকা আবশ্যক। কৃষিজাত শস্যাদির বিঘ্ন সংরক্ষণ সম্বন্ধে ততোধিক জ্ঞান ও বোধ থাকা প্রয়োজন তদ্ব্যতীত ফললাভ হওয়া সুদুষ্কর।

মৃত্তিকা বিশেষে বিশেষ বিশেষ বীজবপন বিধি।

অনবদ্যাং শুভাং স্নিগ্ধাং জলাবগাহনক্ষমাম্।
নিম্নাং হিবাহয়েদ্ভূমিং যত্র বিশ্রমতে জলম্॥
বাহয়েত্ত্ব জলাভ্যর্ণে পুষ্টে স সেকসম্ভবে।
শারদমুচ্চকৈঃ স্থানে কলম্বং বাপয়েদ্বলীম্॥
অধাপ্ত কাম্ব কার্পাসং তদন্যত্র তু হৈমনম্।
বসন্ত গ্রীষ্মকালীয়মপ্সু স্নিগ্ধেষু তদ্বিদঃ॥
কেদারেষু তথা শালীন্ জনোপান্তেষু চেক্ষবঃ।
বৃন্তাক শাকমূলানি কন্দানি চ জলান্তিকে॥
বৃষ্টিবিশ্রান্তপানীয় ক্ষেত্রেষু যবাদিকম্।
গোধূমাংশ্চ মসূরাংশ্চ খল্বান্ খলু কুলথকাঃ॥
সমস্নিগ্ধেষু চোপ্যানি ভূমী জীবান্ নিজান্তা।
তিলা বহুবিধাশ্চোক্তা অতসী শোণমেব চ।
মুদমুজং জগৎ সর্ব্বং বাপয়েৎ কৃষিকৃন্নরঃ॥

(কৃষিপরাশরে।)

এরূপ জমিতে কর্ষণ করিবে যেন উহা স্নিগ্ধ, উৎকৃষ্ট, নিম্ন অর্থাৎ অবগাহনের উপযুক্ত জল ধরিতে পারে। জলাশয় সমীপে ধান্য বপন করিবে কারণ সেচনের প্রয়োজন হইলে জল সুপ্রাপ্য হয়। আশু ধান্য উচ্চ স্থানে বপন করিবে। সিক্ত স্থানে, কার্পাস এবং যেখানে বহু জল ধরে তথায় হৈমন্তিক ধান্য বপন করিবে। বসন্ত ও

গ্রীষ্মকালীয় ধান্য সকল কর্দ্দম ক্ষেত্রে বপন করিবে। কেদার বিশিষ্ট ক্ষেত্রে শালিধান্য এবং জলপ্রান্তে ইক্ষু রোপণ করিবে। শাক, বেগুণ, কন্দ, মূলক প্রভৃতি জল সমীপে বপন করিবে। স্বভাবতঃ সিক্তক্ষেত্রে একটু বৃষ্টি হইয়া যাইলে অর্থাৎ জমি স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করিলে যব, গোধুম, মসুর, ছোলা, কলায়, তিল, অতসী (মসিনা,) শণ এবং মেস্ত পাট প্রভৃতি বপন করিবে।

জল সংরক্ষণ

আগে বেঁধে আলি। রুইগে যা শালি ॥
যদি না হয় শালি ! খনাকে দিস্ গালি ॥ (খনা)

হৈমন্তিক জমির যদি ভালরূপে আইল বাঁধা থাকে তাহা হইলে ক্ষেত্র হইতে জল বহু দিবসাবধি নিঃসরণ হয় না। ক্ষেত্রে জল দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহাতে শালি ধান্য ভাল হয়। জল রক্ষণের জন্য আগে হইতেই যে কৃষক যত্নবান তিনিই সম্যক ফল লাভ করিয়া থাকেন। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হওয়ার পর সকল জমির যত্নপূর্ব্বক আইল বাঁধাই উচিত। তাহা হইলে সময়ের জল জমি মধ্যে দাঁড়াতে পারে। ঐ জল ব্যতীত আমন ধান্য বাঁচে না এবং বৃদ্ধিও হয় না। জল সংরক্ষণে যত্নবান হওয়া কৃষকদিগের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য জানিতে হইবে। ইহা স্মরণ রাখিবার জন্য খনা বলিয়াছেন।

আউশ মলে থোব কোথা। আমন মলে যাব কোথা ॥

আউশের মই, বিদা ও নিরাণ দ্বারা অনেক ধান নষ্ট হয় কিন্তু ঐ তিনের দ্বারা আবাদ যত বেশী হয় ততই আউস ধান্যের ফলন অধিক হয়। বিদা ও মইয়ে অনেক আউস গাছ মারা যায় এজন্য আউস ধান কিছু বেশী পরিমাণে বোনা উচিত। চারা অবস্থায় রৌদ্রের তাপে আউসের পাতাগুলি ঈষৎ শুষ্ক হইলেও সে ধান্য প্রায়ই ভাল হয় কিন্তু জলাভাবে যদি আমনের জমি ফাটিয়া যায়, তাহা হইলে আমন গাছের শিকড়গুলি ছিঁড়িয়া যায় একারণ আর তাহাতে ক্ষীর ঢালিলেও ধান ভাল হয় না। অতএব জল সংরক্ষণ করাই আমাদের প্রধান আবাদ। প্রথমাবস্থায় গাছের পাতাগুলি জাগাইয়া কাঁটি পর্য্যন্ত জল রাখাই নিয়ম। গাছগুলি পুষ্ট হইলে আধহাত তিন পোয়া, স্থল বিশেষে গাছের মূলে এক হাত পর্য্যন্ত জল রাখা যায়। জলই আমনের জীবন বটে কিন্তু সময় বিশেষে এই জলও আবার ত্যাগ করাও জানা আবশ্যক। নিরাণের পর জমিতে একবার পিঠ খাওয়ান উচিত। কিন্তু পিঠ খাওয়ানর পরই আবার জলপূর্ণ করার ব্যবস্থা করা উচিত। কাদা মারা রোগ (অর্থাৎ ধান্য গাছ না বাড়িলে, গাছের রোগ জন্মিলে) ঐরূপ পিঠ খাওয়াইতে হয়। এতদ্ব্যতীত ভাদ্র মাসেও পিঠ খাওয়ান নিয়ম কিন্তু সে সময়ে মূলে অল্প অল্প জল থাকা চাই। কদাচ পূর্ব্বের মত খাওয়ান ব্যবস্থা নয়।

নৈরুজ্যার্থং হি ধান্যাং জলং ভাদ্রে বিনচয়েৎ।
মূলমাত্রন্তু সংস্থাপ্য কারয়েজ্জলমোক্ষণম্॥
ভাদ্রে চ জলসম্পূর্ণং ধান্যং বিবিধ বাধকৈঃ।
প্রপীড়িতং কৃষাণানাং ধর্ত্তে ফল মুত্তমম্॥

ধান্যসকলকে সুস্থ রাখিবার (রোগ হইতে বাঁচাইবার) জন্য ভাদ্রমাসে জমি হইতে জলমোক্ষণ করিবে। ঐ সময় মূলমাত্রে জল রাখিয়া সমুদয় জল ছাড়িয়া দিবে। ভাদ্রমাসে জমি জলপূর্ণ থাকিলে ধান্যসকলের বিবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ধান্য প্রপীড়িত হইলে কৃষকগণ উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হন না। অর্থাৎ ধান্য বৃক্ষে ভালই ফল ধারণ করে না। ভাদ্রে প্রখর রৌদ্রের তেজে ধান্য ক্ষেত্রের জল উত্তপ্ত ও মৃত্তিকা উত্তপ্ত হইয়া ধান্যমূলগ্রন্থিতে তাপ লাগিলেই প্রচুর পরিমাণে চতুঃপার্শ দিশা চারা বহির্গত হওয়ার সুবিধা হয়। আর ঐ সময় জল পূর্ণ থাকিলে কথনই ধান্যবৃক্ষ হইতে অধিক চারা নির্গত হয় না। বিশেষতঃ উত্তপ্ত জল নিয়ত ধান্যের গাছের উপরি অংশে (অর্থাৎ মূলের উপরিভাগে) লাগিয়া ধান্যবৃক্ষ বৃদ্ধি পায় না এবং পীড়াগ্রস্থও হয়।

মাসিক বৃষ্টি প্রসঙ্গে খনা যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে

সিংহে চটকা কন্যা কাণে কাণ।
বিনা ব্যয়ে তুর্ষে কোথা থোব ধান॥ (খনা)

ভাদ্র মাসে মেঘের চট্‌কা ভাঙ্গা অর্থাৎ ভাল করিয়া এক এক চমক রীতিমত রৌদ্র হওয়া ভাল। আশ্বিন মাসে যাহাতে কাণে কাণে অর্থাৎ আইলের কাণায় কাণায় (মাথায় মাথায়) জল হয় এরূপ বৃষ্টি হওয়া ভাল। আর কাত্তিক মাসে যদি বিনা বাতাসে বর্ষণ হয় তাহা হইলে ধান রাখিবার যায়গা অর্থাৎ ধান্য কাটিবার সময় আছড়া ফেলিবার যায়গা জমিতে হয় না।

আশ্বিনে কার্ত্তিকে চৈব ধান্যস্য জলরক্ষণম্।
নকৃতং যেন মূর্খেন তস্য কা ফলবাসনা॥
যথা কুলার্থী কুরুতে কুলস্ত্রীপরিক্ষণম্।
তথা সংরক্ষয়ে বারি শরৎকালে সমাগতে॥

আশ্বিন কাত্তিক মাসে ধান্যক্ষেত্রে জল রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে মূর্খ তাহা না করে তাহার ফল বাসনা করা কেন? অর্থাৎ তাহার ফল বাসনা করা বৃথা মাত্র। যেমন কুলার্থী ব্যক্তি কুলস্ত্রীকে বিশেষরূপে রক্ষা করেন সেইরূপ শরৎকাল সমাগমে ক্ষেত্রে বারি রক্ষার জন্য সম্যক যত্নবান হইবে। এস্থলে শরৎকাল সমাগমে অর্থাৎ শরৎকাল সমাগম হইলে (শরতের মধ্যে বা আশ্বিন মাসে) বুঝিতে হইবে।

ভাদ্রমাসে প্রায় ধান্যের চারা নির্গমের কাজ হইয়া যায়। তৎপরেই অর্থাৎ আশ্বিন মাসে ক্ষেত্রে জলপূর্ণ করিলে চারাগুলি সত্বরই বর্দ্ধিত হইয়া মূল বৃক্ষের সমান হইয়া থাকে এবং পুষ্ট হইয়া গর্ভধারণে সক্ষম হয়। আশ্বিনের শেষ ধান্য গর্ভস্থ থাকিলে কার্ত্তিকের প্রথমেই ফুলাইয়া যায়। ফুলাইবার সময় ধান্যে জল থাকিলে সত্বর পুষ্পিত হয় এবং ফুলানের পর জল থাকিলে আগড়া না পড়িয়া উত্তমরূপে ধান্য বাঁধিয়া যায় ও ধান্যগুলি পুষ্ট হয়। তৎপরে আর জলের প্রয়োজন নাই, তখন ক্ষেত্র শুষ্ক থাকাই ভাল।

আউশের জমিতে আদৌ জল থাকা ভাল নয়। আউশের জমি কেবল ঘাসশূন্য রাখাই প্রধান কার্য্য। বৃষ্টিতে জল দাঁড়াইতে না পায় এজন্য জল বাহির হওনার্থে বর্ষাকালে জমির (ঘাই) জল বাহির হওয়ার পথ সর্ব্বদা খুলিয়া রাখা বিধেয়। তবে জমীর ঘাস যদি নিড়াইয়া শেষ করা সহজ না হয় তাহা হইলে জল বাঁধিয়া আমন নিড়ানের ন্যায় তৃণশূন্য করা যায় কাঁচল ব্যতীত অন্য জমিতে ঐরূপ জল বাঁধা নয়।- তাহাতে ধান্য বসিয়া যায় অর্থাৎ বর্দ্ধিত হওয়া স্থগিত হইয়া যায়।

বৃষ্টি-জ্ঞান

শ্রীঅক্ষয়কুমার জ্যোতিরত্ন লিখিত।

বৃষ্টি-বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে কৃষি-বিষয়ে সুফল লাভ হওয়া সুদুষ্কর। আমাদিগের এই বিষম অভাব দূরীকরণ জন্য আর্য্য মণীষিগণ দুষ্কর তপস্যা ও গভীর গবেষণা বলে বৃষ্টি অনাবৃষ্টির বিষয় সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া সে অভাবের সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিয়া গিয়াছেন। মহামান্যা খনা স্ত্রীজাতি হইয়াও এবিষয়ে অভ্রান্ত সত্যসকল উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল বিষয় যত অবগত হইয়া অনুধান করিবেন ততই কৃষি-বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবেন, এজন্য এ স্থলে তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সার্দ্ধ দিন দ্বয়ং কৃত্বা পৌষে পৌষাদিনা বুধঃ।
গণয়েৎ কালিকীং বৃষ্টিমবৃষ্টিং বানিল ক্রমাৎ ॥
সৌম্যবারণয়োবৃষ্টিরবৃষ্টিঃ পূর্ব্ব যাম্যয়োঃ।
নির্ব্বাতেবৃষ্টির্হানিস্যাৎ সঙ্কুল সঙ্কুলজলম্ ॥
একৈকং পঞ্চদণ্ডেন দিবসো মাসস্য মতঃ।
পূর্ব্বার্দ্ধে বাসরী বৃষ্টিরুত্তরার্দ্ধে চ নৈশিকী ॥
দণ্ডাদণ্ডে পতাকাস্তু বাতস্যানুক্রমেন চ।
বিজ্ঞেয়া মাসিকী বৃষ্টি দৃষ্টাবাতং দিবানিশিম্ ॥

(বৃহৎ পরাশরে)

পৌষ মাসকে ১২ ভাগ করিলে ২॥ দিনে এক ভাগ হয়। জ্ঞানীব্যক্তি উহা লইয়া বায়ুর গতিক্রমে সাময়িক বৃষ্টি এবং অবৃষ্টি গণনা করিবেন। বায়ুশূন্যতায় অবৃষ্টি এবং প্রবলে জলাকীর্ণ ফল জানিবেন। প্রত্যেক ভাগে এক এক মাসের গণনা পাইবেন। এই-রূপ প্রত্যেক পাঁচ দণ্ডে এক এক মাসের মত এক এক দিনের সংবাদ অগ্রেই জানিতে সক্ষম হইবেন। এই পাঁচ দণ্ডকে দুই ভাগ করিয়া পূর্ব্বে ২॥ দণ্ডে দিবসের এবং পর ২॥ দণ্ডে রাত্রির বৃষ্টি অবৃষ্টি জানিবেন। এই পর্য্যায়ে যে দণ্ডে যে পলে বায়ুর গতি হইবে আগামী বৎসরে বৃষ্টি অবৃষ্টিও তদ্রূপ হইবে।

ধুলীভিরের ধবলীকৃত মন্তরীক্ষং
বিদ্যুৎচ্ছটাচ্ছুরিত বারুণ দিগ্বিভাগম্।
পৌষে যদা ভবতী মাসি সিতে চ পক্ষে—
তোয়েন তত্রা সকলা প্লবতে ধরিত্রী॥

(হারিত সংহিতায়াং)

পৌষ মাসের শুক্লপক্ষে যে তিথিতে অন্তরীক্ষ ধুলিপরিপূরিত শ্বেতবর্ণ এবং বিদ্যু-চ্ছটা সকল বহু বিস্তৃত রেখাবৎ ও মেঘ দ্বারা দিগ্বিভাগিত দৃষ্ট হয় আগামী বৎসর সেই তিথিতে ধরণী নিশ্চয়ই বৃষ্টির জলে ধরণী প্লাবিতা হইবেন।

পৌষে মাসি যদা বৃষ্টিঃ কুজ্ঝাটির্যদাভবেৎ।
তদাদৌ সপ্তমে মাসী তাং তিথিং প্লাব্যতে মহীম্॥

(কৃষি পরাশরে)

পৌষের দিন (যে তিথিতে) কুজ্ঝাটিকা বৃষ্টি-হয় তাহার সপ্তম (আষাঢ়) মাসের সেই তিথিতে ধরণী নিশ্চয়ই ভারী বৃষ্টি দ্বারা প্লাবিতা হয়েন।

রাঢ় অঞ্চলস্থ কৃষকগণের অনেকেই ইহা অবগত আছেন। তাঁহারা তিথি না ধরিয়া উক্ত তারিখ ধরিয়া রাখেন। উক্ত তারিখে উক্ত তিথি ঘটে কি না তাহা আমি দেখি নাই। যাই হোক তিথিই হোক আর তারিখ হোক যে দিনে কুজ্ঝাটিকা হয়, আষাঢ়ের সেইদিনে সুবৃষ্টি হওয়া অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? সক-লেরই আমাদিগের প্রকাশিত বিষয়গুলির সত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই মুনিবাক্যের অভ্রান্ততা সুস্পষ্ট জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। তদ্ব্যতীত উহা বুঝিবার উপায় নাই।

মাঘে মাসি চ সপ্তম্যাং পঞ্চম্যাং ফাল্গুনস্য চ।
চৈত্রস্য তৃতীয়ায়াঞ্চ বৈশাখ প্রথমেঽহনি।
মেঘস্য গর্জ্জিতংশ্রুত্বা জলদস্য চ দর্শনে।
আরভ্য চতুরো মাসান্ সম্যগ্বর্ষতি বাসব॥

(শ্রীপতি ব্যবহার নির্ণয়ে)

মাঘমাসের শুক্লাসপ্তমী ফাল্গুন মাসের পঞ্চমী চৈত্র মাসের তৃতীয়া ও বৈশাখের

প্রথম দিনে মেঘ দর্শন বা মেঘগর্জ্জন শ্রুত হইলে চতুর্থ মাসে বাসব সম্যক্ বারি-বর্ষণ করিয়া থাকেন।

সপ্তম্যাং স্বাতিযোগে যদি ভবতি নভোদৃষ্টচন্দ্রার্কতারং
বিজ্ঞেয়া প্রাবৃড়েষাবহুজলবিপুলা সর্ব্বশস্তানুকূলা।

(ঐ ঐ)

যে কোন মাসেই হোক যদি শুক্লাসপ্তমীতে স্বাতিযোগ হয় এবং সেই দিবস যদি চন্দ্র, সূর্য্য ও তারা এককালে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বৎসর বর্ষাকালে সর্ব্ব-শস্তানুকূলা ও বিপুল শস্যসম্ভূতা মহতী বৃষ্টি হইয়া থাকে। এস্থলে বৎসর বুঝিতে আগামী বর্ষাকাল পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে।

প্রতিপদি মধুমাসে ভানুবার সিতয়াং—
যদি ভবতি তদাস্যান্নির্জ্জনা বৃষ্টিরব্দে।
অবিরত জলধারা সান্দ্রাবিন্দু প্রবাহৈ—
ধরণীতলমশেষং ব্যাপ্যতে সোমবারে॥
অবনিতনয় বারে বারিবৃষ্টির্ণসম্যক—
বুধ গুরু সিতবারে শস্যসম্পৎ প্রমোদঃ।
জলনিধিরপি সৌরে শুষ্যতে কাম্বুবৃষ্টিঃ
সকলমিদমুদারেণাম্বুবেদ্যাং পৃথিব্যাম্॥

(বরাহ পুরাণে)

মধুমাসে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শুক্লাপ্রতিপদিতে রবিবার হইলে সেই বৎসর সুবৃষ্টি হয়। সোমবারে হইলে ধরণীতল অবিরত জলধারা প্রবাহে ব্যাপ্ত হয়। মঙ্গলবার হইলে ভাল বৃষ্টি হয় না। বুধবারে শস্য, গুরুবারে সম্পৎ ও শুক্রবারে প্রমোদ এবং শনিবারে হইলে বৃষ্টিই হয় না।

আষাঢ়্যা পৌর্ণমাস্যাং সুরপতি ককুভোবাতিবাতঃ সুবৃষ্টিম্
শস্যধ্বংসং প্রকুর্য্যাদিহ দহনদিশোমন্দবৃষ্টির্যমেন।
নৈঋর্ত্যাং নিষ্ফলাস্যাৎ বরুণবহুজলো বায়ুনা বায়ুকোপঃ।
কৌবের্য্যাং শস্যপূর্ণাভবতি সমুদিতা মেদিনী শম্ভুনাপি।

আষাঢ় পূর্ণিমার পূর্ব্বে বাতাস হইলে সুবৃষ্টি হয়, অগ্নিকোণে শস্যধ্বংস, দক্ষিণে মন্দবৃষ্টি, নৈঋতে নিষ্ফল, পশ্চিমে বহুজল, বায়ুকোণে বায়ুকোপ (ঝড়াদি) উত্তরে শস্যপূর্ণ এবং ঈশানে বায়ু বহিলে পৃথিবী ফলশস্যে সুশোভিতা হয়েন্।

শুচেনিশাংশে প্রথমেঽতিবৃষ্টিঃ, শস্যানি সর্ব্বাণ্যুপযান্তি সিদ্ধিম্।
আদ্যে দ্বিতীয়ে তিলমুদ্গমাষা, ভাগেতৃতীয়ে খলু শারদানি॥

(বরাহে)

আষাঢ় মাসের প্রথম রাত্রির প্রথমাংশে বৃষ্টি হইলে সে বৎসর সুবৃষ্টি হয়। আর ও দ্বিতীয়ভাগে জল হইলে তিল, মূলা ও মাষাদি ভালরূপ হইয়া থাকে। আর তৃতীয়ভাগে জল হইলে শারদীয় শস্যাদি নিশ্চতই উত্তমরূপে ফলিয়া থাকে।

অশ্লেষায়াং গতোভানুর্যদি বৃষ্টিংনমুঞ্চতি।
মঘা পঞ্চকমাসান্ত করোত্যেকার্ণবাং মহীম্॥

(ঐ)

আষাঢ় মাসের অশ্লেষা পর্য্যন্ত যদি বারিবর্ষণ না হয়, তাহা পাঁচমাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ কার্ত্তিক অবধি মঘা মহী প্লাবিত করেন।

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে নবম্যাং যদি বর্ষতি।
বর্ষত্যেব সদা দেব স্তত্রো বৃষ্টৌ কুতো জলম্॥

(পরাশর সংহিতায়াং)

আষাঢ় মাসের শুক্লনবমীতে জল হইলে সে বৎসর সুবৃষ্টি হয়।

আষাঢ় নবমী শুকল পাখা।
কি কর শ্বশুর লেখা যোখা॥
সকালে শুকা বিকালে বান।
মধ্যে বর্ষে সকলি ধান॥

যদি বর্ষে কণা, পর্ব্বতে ফলে কেলেমোণা :—
যদিবর্ষে মুষলধারে, সমুদ্রেতে বগা চরে ;—
যদিবর্ষে রুণিঝুণি, শস্যের ভার না সয় মেদিনী ;—
যদি বর্ষে পাটে, চাষীর গরু বিকায় হাটে॥

(খনা)

বাৎসরিক বৃষ্টি গণনা লইয়া হে শ্বশুর মিছে আর কেন লেখা যোখা করিতেছ। আষাঢ় নবমীর শুক্লপক্ষেই জলের হিসাব এইরূপে পাইবে। সকালে জল হইলে সে বৎসর শুকা হয়, বিকালে হইলে বান হয়, মধ্যে হইলে ধান হয় (কিন্তু তাহারও একটু বিশেষ আছে।) কণা কণা জল হইলে কেলে মোণা প্রভৃতি ধান্যও উচ্চ পর্ব্বতেও ফলিবে অর্থাৎ সুবৃষ্টি হইবে! মুষলধারে হইলে সাগরও শুকাইয়া যায় অর্থাৎ শুকা হয়, জল শুকাইলে সমুদ্রের মাঝখানে চড়া হইয়া বগ চরিতে পারে। আর রুণিঝুণি জল হইলে সে বৎসর মেদিনী শস্যপূর্ণা হয় এবং শেষে (সন্ধ্যার সময়) জল হইলে চাষীদের গোরু হাটে বিকায় অর্থাৎ শুকা হয়।

চতুর্থ্যাং কর্কটস্থার্কে বৃষ্টির্জানপদে যদি।
বিফলাঃ সর্ব্বসংক্লেশাঃ কর্ষকাণাং ভবন্তি চ ॥
বৃষ্টেহ্ন্যভাগে প্রথমে সুবিষ্টির্ভবেৎ দ্বিতীয়ে
তিলকীটসর্পাঃ।
বৃষ্টিস্তু মধ্যাপয় ভাগ্যৃষ্টে নিশ্ছিদ্র বৃষ্টিস্তু
নিশা প্রবৃত্তে ॥
(বরাহে)

শ্রাবণ মাসের চতুর্থীতে জল হইলে কৃষকসকল সর্ব্বক্লেশে আক্লিষ্ট এবং বিফল মনোরথ হয়। ঐ দিবস দিবার প্রথমে বৃষ্টি হইলে সুবৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ভাগে হইলে তিল হয় এবং কীট ও সর্প ভয় হয়, মধ্যভাগে জল হইলে জল হয়। নিশা প্রবৃত্ত হইলে অবিরল জল হয়।

শয়ে শুকো আশীতে বান।
নই ছিয়ানই ধানেই ধান ॥
যদি হয় শ্রাবণে বৃষ্টি।
তবে হয় ধানের সৃষ্টি ॥
(খনা)

বৎসরের একশ দিনের দিন জল হইলে শুকো, আশীতে বান, নব্বই ও ছিয়ানব্বইয়ে ধান এবং শ্রাবণের প্রথমে জল হইলে সে বৎসর নিশ্চতিই ধান্য হইবে বলা যায়।

সুবৎসরাদির নির্ণয়

সাগরে গুটি শস্যে ভরা। সুখ বছরা বসুন্ধরা ॥

পঞ্জিকায় যেবার সাগরে গোটিকাপাত লেখে, সেবার সুবৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবী শস্যে পরিপূর্ণা ও বৎসর সুখ পূর্ণ হয়।

কাণার ছাতা বুধের মাথায়।
ক্ষেতের ফসল রাখব কোথায় ॥
(খনা)

শুক্র মন্ত্রী ও বুধ রাজা হইলে সেবার ক্ষেত্রে ফসল রাখিবার যায়গা হয় না। অর্থাৎ সুবৎসর হয়—সুবৃষ্টি হয়।

শনি রাজা মঙ্গল পাত্র। চষ খোঁড় ঐমাত্র ॥
(খনা)

শনি রাজা ও মঙ্গল মন্ত্রী হইলে চষা খোঁড়া মাত্রই সার হয় অর্থাৎ সময়ে বৃষ্টি এবং শস্যাদি ভাল হয় না।

চৈতে তের শনির ঘরে।
কাঠার ফসল কুড়োয় ধরে॥
(খনা)

১৩ই চৈত্র শনিবার হইলে এককাঠা জমিতে যাহা হওয়া উচিত একবিঘাতেও তাহা হয় না। অর্থাৎ সেবার শস্যাদি ভালই হয় না, সময়ে বৃষ্টিও হয় না।

পাঁচ রবি মাসে পায়। ঝরায় কিম্বা খরায় খায়॥
(খনা)

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাঁচ রবিবার হইলে হয় অতিবৃষ্টি নয় অনাবৃষ্টি হইয়া শস্য হানি করে।

ফাল্গুনে রোহিণী যত্নে চাই।
আগামী বছর গণিয়া পাই॥
সপ্তমী অষ্টমী হয় ধান।
নবমীতে হয় বান॥
দশমীতে পাতান খায়।
খনা বলে এ অসংশয়॥
(খনা)

ফাল্গুন মাসের রোহিণীতে সপ্তমী ও অষ্টমী হইলে ধান হয় এবং নবমী হইলে বান হয়। দশমী হইলে ধান্য পাতা মাত্র সার হয় অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ হয়।

মধুমাসে প্রথম দিবসে হয় যে সে বার।
রবি চোষে মঙ্গল বর্ষে দুর্ভিক্ষ হয় বুধবার।
সোম শুক্র গুরুবার পৃথিবী না সয় শস্যের ভার॥ (খনা)

চৈত্র মাসের প্রথম দিবসে রবিবার হইলে, শুকো, মঙ্গল হইলে হাজা, বুধ হইলে দুর্ভিক্ষ এবং সোম শুক্র ও গুরুবার হইলে পৃথিবী শস্যপূর্ণা হয়েন।

চৈতে কুয়া বৈশাখে শীত। বর্ষা হয় কদাচিৎ॥ (খনা)

চৈত্র মাসে কুয়া এবং বৈশাখ মাসে শীত হওয়া ভাল নয়। ঐরূপ হইলে সেবার ভাল বর্ষাই হয় না।

আষাঢ় শাওনে পুবে বাও।
হাল ছেড়ে দিয়ে বাণিজ্যে যাও॥ (খনা)

আষাঢ় শ্রাবণে পুবে বাতাস হইলে সে বৎসর ভাল শস্যাদি হয় না।

যদি বর্ষে আগনে। রাজা যায় মাগনে॥
যদি বর্ষে পৌষে। কড়ি হয় তুঁষে॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজার পুণ্যদেশ॥
যদি বর্ষে ফাগুনে। চিনা কাউনে দ্বিগুণে॥ (খনা)

অগ্রহায়ণ মাসে জল হইলে দুর্ভিক্ষ হয়। পৌষ মাসে হইলে অকিঞ্চিৎকর তুঁষেও কড়ি হয়। মাঘের শেষে জল হইলে শস্যাদি ভাল হয়। ফাগুনে হইলে চিনা ও কাউনাদি ধান্য দ্বিগুণ হয়।

এ বচনটী অনেকের মতে সেই বৎসরের ফল। আবার অনেকের মতে আগামী বৎসরের ফল প্রকাশক বলিয়া খ্যাত আছে।

কোজাগরী চাঁদটি যেমন। সেইবার ফসল তেমন॥ (ডাক)

কোজাগর পুর্ণিমায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে সেবার ভাল শস্যাদি হয় না।

আশুবৃষ্টি ও অবৃষ্টি নিরাকরণ।

মেঘের মুখে দখিণ মেঘ
তাহাই জেনো জলের রেখ॥ (খনা)

বৈশাখের প্রথমেই দক্ষিণে মেঘ হইলে সে বৎসর নিশ্চয়ই সুবৃষ্টি হয়।

ছুটে মেঘ অবিরল। বাদলের ভারি ফল॥
নীচেতে উজান বয়। হপ্তাধিক ক্ষান্ত নয়;
দক্ষিণ মেঘে সুনিশ্চয়। পুবে পশ্চিমে তত নয়॥ (খনা)

দুর আকাশে ৭।৮ দিন ধরিয়া দ্রুতবেগে মেঘ (ধূমের ন্যায়) অবিরত চলিতে এবং নীচের মেঘ উজান বহিতে দেখিলে নিশ্চিতই বাদল হইবে বুঝিবে। দক্ষিণ মেঘ ছুটিতে দেখিলে তাহাতে আর সংশয় নাই। পূর্ব্বের ও পশ্চিমের মেঘে ততদুর ফল হয় না।

নিকট আকাশ নিকট ফল।
এতেই আসে বৃষ্টির জল॥

আকাশ নিকট হইলেই শীঘ্র জল হইবে জানা যায়।

সাঁঝের মেঘ সিন্দুর রঞ্জিত।
পরদিন জল না হয় কচিৎ॥

সন্ধ্যা বেলা সিঁদুরে মেঘ দর্শন হইলে পরদিন নিশ্চয়ই জল হইবে না জানিবে।

চন্দ্র শোভার মধ্যে তারা। পাণিবর্ষে মুষলধারা॥ (খনা)

চন্দ্রশোভার মধ্যে তারা দৃষ্ট হইলে নিশ্চয়ই মুষলধারায় জল হয়।

দুরে শোভা নিকট জল। নিকট হলে দুরে জল॥

চন্দ্রশোভা দুরে হইলে শীঘ্র জল এবং নিকট শোভা হইলে দুরে জল বুঝিবে।

অমোঘা দক্ষিণে বিদ্যুৎ অমোঘা উত্তরে ধ্বনি।
অমোঘা পশ্চিমে মেঘা আমোঘা পূর্ব্বে বায়সা॥
(রাজমার্ত্তণ্ড পুরাণ)

যদি মেঘ দর্শনের অগ্রেই দক্ষিণে বিদ্যুৎ ও উত্তরে মেঘ গর্জ্জন শ্রুত হওয়া যায় এবং পশ্চিম হইতে মেঘ আগমন হইতে ও পূর্ব্বে কাকের রংএর মেঘ দেখিলে নিশ্চয়ই জল হওয়া বুঝিবে।

মেঘের লক্ষণ।

পচুই মেঘে মুষলধারে পূবে মেঘে হয় বাত।
কোদালে মেঘে পুকুর ভরে, ঘুচে যায় তাতেই তাত। (খনা)

পশ্চিমে মেঘে মুষলধারে বারিবর্ষণ পূবে মেঘে বাত ও কোদালে মেঘে পুকুর ভরে এবং গরম ঘুচিয়া যায়।

হঠাৎ বৃষ্টির বিবরণ।

ভাদ্র আশ্বিন পূবে বাও।
আল কেটে দিয়ে ঘরে যাও॥ (খনা)

ভাদ্র আশ্বিনে পূবে বাতাস দেখিলে অতিবৃষ্টি হইবে জানা যায়।

কোদালে কুড়ুলে মেঘের গায়।
এলো মেলো দিচ্ছে বায়।
শ্বশুরকে বল বাঁধতে আল।
আজ না হয়তো হবে কাল॥ (খনা)

কাঁচির মুখে ফুল

শ্রীশশিভূষণ সরকার লিখিত

আমাদিগের প্রয়োজনমত অনেক সময়ে ফুল পাওয়া যায় না, কিম্বা যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে কুলান হয় না। আবার এমন অনেক ফুলও আছে, যাহা আদৌ পাওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। ফুলের টানাটানিটা আমরা সচরাচর প্রায় অনুভব করিতে পারি না। যখন কোনরূপ অনাটন পড়ে, তখন অন্যান্য পুষ্প দ্বারা সে অভাব পূরণ করিয়া লই।

বৎসরের মধ্যে দুইটা সময় আমরা ফুলের বিশেষ অভাব অনুভব করি, প্রথম দুর্গোৎসবে, দ্বিতীয় বড়দিনের পর্ব্বে। শেষোক্ত পর্ব্বকালে ফুলের অনাটন হইলে,

হিন্দুর তাহাতে বিশেষ আসে যায় না; তবে দুর্গোৎসবকালে ফুলের অভাবটা বড়ই অভাব বলিয়া মনে হয়। কথায় বলে দুর্গোৎসবের ব্যাপার! দুর্গোৎসবে উনকুটি চৌষট্টির যত আয়োজন করিতে হয়, এমন বুঝি আর কোন উৎসবে করিতে হয় না। আয়োজন সব ঠিক, ধুমধামও চূড়ান্ত, বাড়ীও সরগরম; কিন্তু দেবীর পূজার জন্য সে কুসুমস্তূপ কৈ? পুষ্পের বিবিধ রকম কোথায়? আর ফুলের সে মনোহারিণী ঔজ্জ্বল্য বা আরামদায়িনী আঘ্রাণই বা কৈ? এই বিশিষ্ট সময়ে ফুলের যে অভাব হয়, ফুলের যে রকমের ও মনোহারিত্বের অভাব হয়, তাহার বিশিষ্ট কারণও আছে। বর্ষা-সমাগমের সঙ্গে প্রায় সকল উদ্ভিদেই নবশক্তির সঞ্চার হয়। ফলতঃ সে সময়ে উহারা অমিততেজে বাড়িতে বাড়িতে পুষ্পপ্রদানোন্মুখী হইয়া পড়ে এবং সেখান হইতেই উহাদিগের বৃদ্ধি স্থিরভাব ধারণ করে। পুষ্পধারণশক্তিও আপাততঃ স্থগিত হইয়া যায়। সংসারে সকল কার্য্যেরই একটা শৃঙ্খলা আছে, নিয়ম আছে এবং সেই নিয়মের বশীভূত হইয়াই এই জগৎসংসার চলিতেছে। উদ্ভিদ এক সময়ে বাড়ে, আবার এক সময়ে বিরাম লাভ করে। গাছপালার যে বিরাম, তাহার কতকটা ঔদ্ভিদক নিয়মবশে, আর কতকটা ঋতু-পরিক্রমণের ফলে সংঘটিত হইয়া থাকে; কিন্তু যে কারণেই হউক, মনুষ্য চেষ্টা সে কারণকে বিধ্বস্ত করিতে যে অসমর্থ তাহা নহে। হিন্দুর দেবসেবার উপযোগী যত প্রকার পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে গোলাপ, টগর, গন্ধরাজ, করবী, স্থলপদ্ম, জবা, রজনীগন্ধা, কাঞ্চন, কলিকা, বৈজয়ন্তী বা সর্ব্বজয়া, অপরাজিতা, বেলা, জুঁই, মল্লিকা চামেলী, নেওয়ার, সেফালিকা ইত্যাদি প্রধানতঃ; কিন্তু এতৎ সমুদায় ফুলই গ্রীষ্ম হইতে বর্ষাকাল মধ্যে আপনাপন আবয়বিক ও পুষ্পধারণ কার্য্য সমাধা করিয়া, শরতের শেষ হইতে বিশ্রামলাভে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়। আর দুর্গোৎসবও প্রায় শরতের শেষে বা হেমন্তের প্রথমেই হইয়া থাকে। এই আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে একেই উদ্ভিদগণ ক্লান্তির পরেই শান্তিলাভ করিতে থাকে, তাহাতে আবার সেই সময়ের শৈত্য ও শিশিরপাত হেতু আরও নির্জীবভাব ধারণ করে। কাজেই দুর্গোৎসবকালে ফুলের অনাটন হয়; ফুলের বাজারও মহার্ঘ হয়।

দুর্গোৎসবকালে ফুলের প্রাচুর্য্য রাখিতে হইলে ঔদ্যানিকের প্রধান কার্য্য, গাছে পুষ্পপ্রদায়িনীশক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে রোধ করা। কার্য্যটী অতি সহজ হইলেও, অভিজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্য; অনভিজ্ঞের হস্তে ফলান্তর হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আষাঢ় মাসের শেষভাগ হইতেই পঞ্জিকা দেখিয়া দুর্গোৎসবের দিন স্মরণ করিয়া রাখিতে হয়। বলা বাহুল্য যে, হিন্দুমাত্রেই তাহা বিশেষ স্মরণ রাখেন, কারণ এমন উৎসব ত আর নাই। দুর্গোৎসবের দিন হইতে ঠিক ষাট দিবস পূর্ব্বে গাছের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। এই সময়ে স্বভাবতঃ গাছে প্রচুর ফুল হইয়া থাকে। এইক্ষণ হইতে উহাদিগের পুষ্পসম্ভাবী শাখা-প্রশাখার শিরোভাগ অল্প পরিমাণে ছাঁটিয়া দিতে হইবে।

এইরূপ ডগা কাটিয়া দেওয়াকে ইংরাজী ঔদ্যানিক ভাষায় (ট্যাপিং) কহে। ট্যাপিং করিলে, ছেদিত শাখা-প্রশাখার নিম্নস্থিত চোক হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বাহির্গত হইতে থাকিবে এবং তাহারই শিরোভাগে ফুল দেখা দিবে। গাছে যদি পর্ব্বদিনের আট-দশ দিন পূর্ব্বে কুঁড়ি দেখা দেয় এবং যদি তাহা দুই-চারি দিবসের মধ্যে ফুটিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা হইলে এই সকল কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। সে সময়ে মায়া মমতা করিলে চলিবে না। অনেক ঘন-বিন্যাস কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হইতে আট-দশ দিন সময় লাগে; সুতরাং এরূপ ফুলের কুঁড়ি না ভাঙ্গিয়া দেওয়াই উচিত। যদি দুই মাসের ও কম সময় থাকে, তাহা হইলে ডগা না কাটিয়া, কেবল কুঁড়গুলিকে বোঁটাসমেত কাটিয়া দিতে হইবে, বিলম্বে ডগা কাটিয়া দিলে, তাহাতে ফুল আসিতে আসিতে দুর্গোৎসব অতীত হইয়া যাইবে। বিগত বৎসর দুর্গোৎসবের ঠিক দেড় মাস অর্থাৎ পঁয়তাল্লিস দিবস পূর্ব্বে আমি কার্য্য আরম্ভ করি। আমার কার্য্যপ্রণালী কিছু স্বতন্ত্র ছিল। আমি যে কেবল গাছের ডগা কাটিয়া দিয়াছিলাম, তাহা নহে, অনেক পুরাতন শাখাকে একেবারে গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া দিই, অনেক অনেক শাখা-প্রশাখার কচি অংশও কাটিয়া ছোট করিয়া দিই। এইরূপে কার্য্যের সূত্রপাত করিবার পর হইতে গাছ সকলে ক্রমাগত মুকুল আসিল এবং সেই কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই দুই-তিন জন মালীর কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইল। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই অধিকতর ফুল আসিতে লাগিল এবং এমন হইয়া পড়িল যে, বুঝি বা পুষ্পোদ্গমনের গতিরোধ হয় না। তখন মাটিতে 'যো' পাইলেই গাছের গোড়া খুঁড়িয়া উলট পালট করিবার ব্যবস্থা করিলাম। উদ্দেশ্য—মাটির রসটাকে কতক পরিমাণে শুষ্ক করিয়া ফেলা। অবশেষে পর্ব্বদিনের পাঁচ-ছয় দিবস পূর্ব্ব হইতে আর ফল বা কুঁড়ি কাটা স্থগিত করিলাম। ফলতঃ পূজার কয়দিন প্রভূত পরিমাণে ফুল পাওয়া গেল।

বড়দিনের সময়ে যে ফুল বিশেষতঃ গোলাপ ফুল পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে তাহার কারণ কার্ত্তিক মাসে সচরাচর গোলাপগাছ ছাঁটা গিয়া থাকে। গোলাপ গাছ ছাঁটিবার সময় কেবল যে উহাদিগের শাখা-প্রশাখা ছাঁটিয়া দিয়া লোকে নিশ্চিন্ত হয়, তাহা নহে। উহাদিগের গোড়া হইতে সমূহ পরিমাণে মাটি তুলিয়া দিয়া স্থূল শিকড়দিগকে হিম ও রৌদ্র খাওয়াইতে হয়। একদিকে শাখা-প্রশাখা ছেদিত হয়, অন্যদিকে আবার বহু শিকড় কাটা যায়, শিকড় সকল অনাবৃত থাকে; সুতরাং গাছগুলি একেবারে জখম হইয়া পড়ে ও পুষ্পধারণোপযোগী হইতেও সে জন্য বিলম্ব হয়। বড়দিনের সময়ে ফুলের বাজার কলিকাতা সহরে খুব চড়া থাকে; এমন কি খৃষ্টমাস-ইভের দিন সন্ধ্যার সময়ে বাজারে ফুল একেবারে পাওয়া যায় না। যে সকল দোকানদার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ফুল রাখিতে পারে, তাহারা একটি ফুল আট আনা হইতে এক টাকাতেও বিক্রয় করিয়া থাকে। পুষ্পব্যবসায়ীদিগের পক্ষে ইহা একটা বিশেষ লাভের দিন। এমন দিনে

সমধিক পরিমাণে ফুলের যোগান দিতে না পারিলে ব্যবসায়ের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি বলিতে হইবে। এই সময়ে ফুলের যোগান যথেষ্ট পরিমাণে রাখিতে হইলে, গাছগুলিকে কার্ত্তিক মাসে ওরূপ তীব্রভাবে না ছাঁটিয়া, শাখা-প্রশাখার উপর উপর ছাঁটিয়া দিলে ভাল হয়, এবং সেই সঙ্গে যাহাতে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে গাছে না আদৌ ফুল ধরিতে পারে, তাহার জন্য কুঁড়ি কাটিয়া দেওয়ায় লাভ আছে। ইহাতে ফুলের পরিমাণ অধিক হইবে। আর সেই সকল ফুলকে বড় ও উজ্জ্বলবর্ণের করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ায় তরল সার দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। গাছের গোড়ার শিকড় আদৌ যাহাতে বিচলিত না হইতে পায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, শিকড় ছাঁটিয়া দেওয়া ত দূরের কথা। যে প্রণালীতে আজকাল গোলাপ গাছ ছাঁটা গিয়া থাকে, তাহাতে বড়দিনের সময়ে ফুল পাইবার কোন আশা করা যাইতে পারে না।

বেল, জুঁই, চামেলী ও নেওয়ার প্রভৃতি কয়েকটী গাছ বসন্তকালের প্রারম্ভ হইতে পুষ্প প্রদান করিয়া বর্ষাগমের অতি অল্পদিন পরেই বিশ্রাম করে কিম্বা গজাইতে থাকে সুতরাং ইহাদিগকে দ্বিতীয়বার পুষ্প প্রদান করিবার জন্য বিরক্ত করা ভাল নহে। আর এই অল্পকাল মধ্যে একই গাছকে দুইবার ফুল প্রদান করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, উহারা পুষ্প প্রদান করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে উহাদিগের সমূহ ক্ষতি হয় এবং পরবৎসর যথাসময়ে ফুল প্রদান করিতেও বিমুখ হয়। অতঃপর ইহাও দেখা যায় যে, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প দুর্গোৎসবকালে বড় ব্যবহার হয় না, আর পুরোহিতগণও এই সকল ক্ষুদ্র পুষ্প ব্যবহারে বড় রাজী নহে। শেফালিকার জন্য বড় বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না, কারণ ইহা সেই সময়ে স্বভাবতঃই পুষ্পিত হইয়া থাকে।

বৈজয়ন্তী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি মূলজ উদ্ভিদকে একমাস পূর্ব্বে গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া দিয়া গোড়ার মাটি নিড়েন কিম্বা খুরপি দ্বারা আলগা করণান্তর মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিলে যথাসময়ে উহাতে নূতন শক্তি আসিবে; ফলতঃ গাছও পুষ্পিত হইবে। সেসময়ে মাটিতে যদি সমধিক রস থাকে তাহা হইলে জলসেচন করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

প্রত্যেক গাছের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অতিশয় দীর্ঘ হইবার ভয়ে আর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহি; তবে হিসাব করিয়া কাঁচি চালাইতে পারিলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস; কিন্তু কাঁচি পরিচালনা করিবার ভার নিরক্ষর মালীদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে ইহাতে কিন্তু বিচক্ষণতার আবশ্যক। উদ্যানস্বামী স্বয়ং অথবা কোন কর্ম্মিষ্ঠ লোক দ্বারা ইহা সম্পাদিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

কাঁচির মুখে ফুলের আবার আর একটা দিক আছে। কাঁচির মুখে কাগজ হইতে লতাপাতা, ফুলফল, ঝাড়ল্যাম্প, দেওয়াগিরি প্রভৃতি কত কি রমণীয় সামগ্রীই না প্রস্তুত করা যায়।

পিচবোর্ড কাটিয়া জীবজন্তু, গরু, বাছুর, বাঘ, মানুষ এমন প্রস্তুত করা যায় যে ঐ সকল দ্রব্য হঠাৎ দেখিলে জীবন্ত বলিয়া কখন কখন ভ্রম হয়।

এই কার্য্যের দ্বারা শুধু যে সখ মিটান হয় এমন নহে ইহাতে অনেকের জীবিকায় উপায় হইয়া থাকে। আমাদের দেশের লোক যদি অলস না হইত তাহা হইলে এইরূপ কৃত্রিম কাগজের ফুলের রীতিমত ব্যবসা চলিত।

আমরা কোন এক সময় দক্ষিণ দেশে এক বাটীতে রাশ দেখিতে গিয়াছিলাম সেখানে চৌগড়ীর ঝুড়ি রঙ করিয়া তাহাতে কৃত্রিম অর্কিডের ফুলে এরূপ ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল—গাছের ডাল, পাতা, রঙ, ফুলের পাপড়ী, গাছের গোড়ার মস্ (সেহালা) গুলি দেখিলে বস্তুতই সত্যকার গাছ ও ফুল বলিয়া মনে হয়। রাত্রে দেখিলে সে ভ্রম দূর হইবার নহে—দিনে দেখিলে অবশ্য ধরা যায়—ইহা দেখিয়া শিল্পীর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

কাঁচির মুখে এমন সুন্দর গোলাপ ফুল পাতা, কুঁড়ি নির্ম্মিত হইতে পারে যে তাহা আসল সঙ্গে মিশাইয়া রাখিলে আসল বলিয়াই মনে হয়।

বিবিধ বিচিত্র রঙের জন্য ভিন্ন রঙের কাগজ অবশ্য ব্যবহার করিতে হয় এবং আবশ্যক হইলে তাহা মোমে সিক্ত করিয়াও লওয়া হয়।

বর্দ্ধমান কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী

বর্দ্ধমানে ইতঃপূর্ব্বে যে প্রদর্শিনী হইয়াছিল তাহা আমাদিগকে কষ্ট করিয়া স্মরণ করিতে হয়, যদি ঐরূপ দীর্ঘ সময় ব্যবধানে প্রদর্শিনী সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে কৃষিশিল্পের উন্নতির আশা অল্পই। আবার বর্ষে বর্ষে প্রদর্শিনী খুলিতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, ম্যালেরিয়া জ্বর পীড়িত অন্নকষ্টাতুর প্রজাবর্গের পক্ষে বর্ষে বর্ষে ঐরূপ ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রতি বৎসর বান্জেটিয়া প্রদর্শিনীর কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, উক্ত প্রদর্শিনীর সমগ্র ব্যয়ভার কাশিম-বাজারাধিপতি মহারাজা বাহাদুর একাকী বহন করিয়া থাকেন। আমাদের বর্দ্ধমানাধিপতি হিজ হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কাশিমবাজার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন, সুতরাং "প্রস্তাবিত প্রদর্শিনীর সমস্ত ব্যয়ভার তিনি গ্রহণ করিয়া প্রজাবর্গের মঙ্গল সাধন করুন" এরূপ অনুরোধ করিলে অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না, কিম্বা যদি বর্দ্ধমান, বীরভূম ও হুগলী তিনটি জেলা একত্রিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে এক

এক বৎসর এক এক স্থানে প্রদর্শিনী খোলা হয় তাহা হইলে প্রত্যেক জেলার ব্যয় লাঘব হইবে এবং কার্য্যেও অনেকটা সহজ সাধ্য হইবে।

প্রতি বর্ষে একবার মাত্র প্রদর্শিনী দর্শন করিলে আমাদের ন্যায় অজ্ঞ কৃষককুলের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না, প্রত্যেক মহকুমার অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া কৃষি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। স্থানীয় কৃষককুল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এইরূপ সমিতি হইতে উপকার লাভে সমর্থ হইবে।

আর একটি কথা—যদ্যপি আমাদের গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক সবডিবিসানে এক এক জন পুষাকলেজ উত্তীর্ণ সার্কেল অফিসার নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহার দ্বারা একটী কৃষি সমিতি সংগঠিত করিয়া চাষীগণকে লইয়া একটি ছোট খাট আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য পরিচালনা করা হয় তাহা হইলে প্রজাদিগের বিশেষ উপকার হইবে, অথচ গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। কয়েদীগণকে কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করিলে মন্দ হয় না। জেলখানার নিকট কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইলে এই কার্য্যের সুবিধা হয় এবং এতদ্বারা গবর্ণমেণ্টের ব্যয়সংক্ষেপ হওয়াও সম্ভব। অধিকন্তু বন্দীগণ উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্য শিক্ষা পাইয়া স্ব স্ব ভবিষ্য জীবন নির্ম্মল রাখিতে পারিলে তদ্বারা দেশের উত্তরোত্তর শান্তি সংস্থাপিত হইবে।

কাটোয়া অঞ্চলে নারিকেলবৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। নারিকেলের পাতা হইতে ঝাঁটা এবং ফল খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন নারিকেলের সদ্ব্যবহার আমরা কিছুই জানি না। বিস্তর নারিকেলের ছোবড়া আমরা জ্বালানি কার্য্যে অপচয় করিয়া থাকি। নারিকেলের ছোবড়া হইতে রশা, রশী, পাপোষ, খাটের গদী, জাহাজের ধাক্কা, নিবারণার্থে থোপ, ম্যাটিং প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের অনভিজ্ঞতা বশতঃ বর্ষে বর্ষে অনেক টাকার দ্রব্য বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। প্রদর্শনীর নিকট আমরা এ সম্বন্ধে কোন উপকারের দাবি করিতে সমর্থ নহি। স্থানীয় কৃষিশিল্প সমিতি স্থাপিত হইলে তদ্বারা ইহার উপায় সহজে হইতে পারিবে। আর চাকুরী প্রত্যাশী যুবকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহাদের মধ্যে দুই চারি জন এই কার্য্য শিক্ষা করিয়া আসিয়া স্বগৃহে নারিকেল ছোবড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা খুলিলে অল্প মূলধনে নিজের এবং আরও কতকগুলি মজুরের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া, দেশের উপকার করিতে সমর্থ হইবে।

নারিকেলের দুগ্ধ হইতে তৈল বাহির করিয়া প্রদর্শনীতে exhibit করা যাইতে পারে। এই তৈল সুপরিস্কৃত ও বিশুদ্ধ হইলে গুণে Codliver oil কে পরাজিত করিবে; অপিচ মঞ্জিষ্ঠা বা য়্যালকেনটরূট যোগে রঞ্জিত করিয়া তাহাতে কিছু সুগন্ধ মিশ্রণপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট কেশ তৈল প্রস্তুত হইবে। ইহাও প্রদর্শনীতে একটি প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্য।

গো মহিষাদি পশু সকল যাহা প্রদর্শিত হইবে তদ্বারা সাধারণ প্রজাগণ অল্পই উপকার প্রাপ্ত হইবে। আমাদের পূর্ব্ব প্রস্তাবিত পুষা কলেজোত্তীর্ণ সার্কেল অফিসারের অধীনে এক বা একাধিক হাঁসি-হিসার বা মণ্টগোমারী ষাঁড় পালিত হইলে প্রকৃত পক্ষে স্থানীয় গোজাতির বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইবে, ইহাদের গোবরের সার হইবে এবং ব্রীড জন্য কিছু টাকাও লাভ হইবে। অপিচ গ্রামে গ্রামে যে সকল গো-ভাগাড় আছে, তাহা এই মহৎ কার্য্য জন্য অধিকাংশ জমিদারগণ আনন্দ চিত্তে দান করিবেন বলিয়া সম্পূর্ণ আশা হয়। ঐ সকল স্থান চর্ম্মব্যবসায়ীগণকে নিলাম দ্বারা বন্দোবস্ত করিলে প্রচুর টাকা আমদানী হইতে পারিবে. সুতরাং বৃষ পালন জন্য গবর্ণমেণ্টকে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না।

আমরা প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়গণকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা ইক্ষু বা খর্জ্জুর রস হইতে কি উপায়ে একেবারে চিনি প্রস্তুত হইতে পারে সুদক্ষ ব্যক্তি দ্বারা তাহা মেলাস্থলে প্রদর্শনের এবং তাহার বিবরণ পূর্ব্বোক্ত গাইড বুকে সরল বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণনের ব্যবস্থা করিবেন। সাদা কাপড় বুনানি ও ফুলদার কাপড়ের কার্য্য সুদক্ষ তন্তুবায় দ্বারা যাহাতে প্রদর্শিত হয় তাহার সুব্যবস্থা করিয়া সাধারণ জনগণের কৃতজ্ঞভাজন হইবেন

দাঁইহাট ভাস্কর্য্য ও বাসনের জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ এবং বাঘটিকুরায় উৎকৃষ্ট তসর ও কেটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরা আশাকরি উক্ত স্থানবাসী মহোদয়গণের উদ্যোগে কতকগুলি দ্রব্য মেলায় প্রতিবৎসর প্রদর্শিত হইয়া গ্রামের সুনাম রক্ষিত হইবে। যে সকল দ্রব্য প্রেরিত হইবে তাহা যেন সুন্দর এবং আধুনিক রুচির অনুকুল হয়। তৎসম্বন্ধে আমরা কতকগুলি দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

১। পিতল ও কাঁশার টি-ট্রে গঠন (cival shape) সুদৃশ্য এবং পালিশযুক্ত এবং উভয় পার্শ্বে হাতলযুক্ত হইবে।

২। দুয়াত রাখিবার আধার। ইহা সাহেব কোম্পানীদের ক্যাটেলাগ দেখিয়া তদনুরূপ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং বাজার হইতে দুইটী দুয়াত ক্রয় করিয়া তাহাতে বসাইয়া দিতে হইবে।

৩। Oval shape বগী থাল উত্তম পালিশ যুক্ত।

৪। কোটের নিমিত্ত তসর ও কেটের থান। কাপড় মোটা, বুননিঠাস, সুতাসমান এবং রং উজ্জ্বল হইবে। কোটের কাপড় টেরচাজি নবুনানী হইলে অধিক আদরণীয় হইবে।

৫। তসর ও কেটের শীত বস্ত্র (চাদর)। ইহা কোটের কাপড়ের ন্যায় হইবে, অধিকন্তু চতুর্দ্দিকে ফুলদার বর্ডার থাকা চাই, ইহার মধ্যস্থলে জোড়া না হইলেই ভাল হয়, থাকিলে তাদৃশ ক্ষতি নাই।

৬। লতা ও ফুলদার ও চতুর্দ্দিকে ঝুল যুক্ত টেবেলপোষ।

৭। তসরের উড়ানী।

৮। কষ্টি পাথরের paper weight ইহা একখণ্ড ওভাল সাইজ প্লেটের উপর একটি শায়িত কুকুর বা কুম্ভীর মূর্ত্তি থাকিবে। কারিকরের নাম ও নিবাস ইংরাজী হাই-টাইপ দ্বারা খোদিত হইবে।

৯। শিল্পীগণ অনুরূপ যে কিছু প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক তাহাও করিতে পারিবেন। তবে তাহা সুদৃশ্য এবং আধুনিক রুচি সম্মত হওয়া আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

গত বর্ষে এই প্রদর্শনী খুলিবার কথা ছিল, কিন্তু কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত ঘটিয়া উঠে নাই, বর্ত্তমান বর্ষে উক্ত প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শুনিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিলাম।

প্রদর্শনী দ্বারা জনসমাজের কিরূপ উপকার সাধিত হইয়া থাকে এবং আমরা কি কি উপায়দ্বারা উক্ত উপকার সম্যকরূপে লাভ করিতে সমর্থ হইব, সাময়িক পত্রিকায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি এবং আশা করি বিজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হইয়া তৎসম্বন্ধে সদালোচনা করিবেন ও আবশ্যকীয় কথা সকল সবিনয়ে কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবেন।

"প্রদর্শনী" কথাটি ইংরাজী Exhibition শব্দের প্রতি শব্দ, অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে মেকমর্দ্দনের মেলা, হরিহরসত্রের মেলা প্রভৃতি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ মেলা প্রতিবৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসিয়া থাকে, কিন্তু ইহা প্রদর্শনী নহে, পণ্য সম্ভার ক্রয় বিক্রয়ার্থ জন সমূহের সম্মিলন মাত্র, ইহাতে প্রতিযোগিতায় পুরস্কার দানের ব্যবস্থা নাই তজ্জন্য আমরা ঐ সকল মেলাকে প্রদর্শনী বলিতে উৎসাহী হইতেপারি না।

আকবর বাদসাহের অন্তঃপুরে প্রতিবর্ষে একটি স্ত্রী-শিল্পের প্রদর্শনী হইত, ইহাতে যে প্রদর্শিনী হইত, ইহাতে পারদর্শিতানুসারে পুরস্কার বিতরণের নিয়ম ছিল, মহারাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ-কালে একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা ছিল কি না ঠিক জানা যায় না, কিন্তু তাহা পণ্য বিক্রয়ের মেলা নহে, প্রকৃতপক্ষে প্রদর্শনী, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, শেষোক্ত প্রদর্শনীতে (সিন্ধু ঘোটকাদি) জলজ ও স্থলজ পশু সকল, গো মহিষ, স্বাস্থ্যবতী বৃদ্ধা স্ত্রী, জলচর জীব ও শ্বাপদ জন্তু সকল জরায়ুজ অণ্ডজ ও স্বেদজপ্রাণী সকল এবং (শূক, শিম্বী, তুষও তৃণ জাতীয়) ধান্য সকল প্রদর্শিত হইয়াছিল, সমাগত নৃপতিবর্গ যজ্ঞপথে ঐ সমস্ত দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ মহাভারতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যথা :—

স্থলজা জলজা যে চ পশবঃ কেচন প্রভো। সর্ব্বানেব সমানীতানপশ্যংস্তত্র তে নৃপাঃ॥ গাশ্চৈব মহিষীশ্চৈব তথা বৃদ্ধস্ত্রীয়োহপিচ, ইত্যাদি। যজ্ঞপাটং নৃপাদৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়মাগতঃ। মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব, ৮৫ অধ্যায় ২৯-৩৫ শ্লোক।

কৃষির উন্নতিকল্পেও প্রাচীন হিন্দুগণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল মহাভারতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। মহর্ষি নারদ মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে—

কচ্চিদ্রাষ্ট্রে তড়াগানি পূর্ণানি চ বৃহন্তি চ।
ভাগশো বিনিবিষ্টানি ন কৃষির্দেবমাতৃকা॥

মহাভারত সভা ৫ অঃ

বলি, তোমার রাজ্যে বিভাগানুযায়ী যথা প্রয়োজন বৃহৎ বৃহৎ জলপূর্ণ তড়াগ সমূহ সংস্থাপিত আছে ত? কৃষিত দেবমাতৃক নহে? অর্থাৎ কৃষককুল বৃষ্টির অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে না ত?

উক্ত মহোর্ষি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কচ্চিন্ন ভক্তং বীজঞ্চ কর্ষকস্যাবসীদতি।

কৃষকগণ অন্ন বা বীজের অভাব জন্য অবসন্ন হয় না ত?

সেনাবল, মন্ত্রবল এবং বণিকবল যেরূপ রাজ্যের প্রধান অঙ্গবিশেষ, কৃষিবলও সেইরূপ প্রধান অঙ্গরূপেই পরিগনিত হইত। নারদের অপর প্রশ্ন—

* * * কচ্চিৎ তুষ্টা কৃষি বলা।

রাজ্যস্থ কৃষি বল ত সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে? আমরা "চাষা" নাম শুনিয়া অবজ্ঞাতভাবে যেরূপ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকি সেকালে তাহা ছিল না।

পুরাতন কথা লইয়া প্রস্তাব বাহুল্য করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষনে বৰ্ত্তমান প্রদর্শনিতে আমরা কি কি উপায়ে কিকি উপকার পাইতে পারি এবং প্রদর্শনী উপলক্ষে আমাদের কৰ্ত্তব্যই বা কি? তদ্বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক হইয়াছে।

আমাদের প্রথম কথা যে কেবল বাবুরা গিয়া প্রদর্শনী দেখিলে যথেষ্ট হইবে না কৃষির উন্নতি আকাঙ্খী কৃষককুলকে দেখাইতে হইবে, শুদ্ধ দেখাইলে চলিবে না, যাহাতে তাহাদের উন্নত প্রণালীর কৃষি যন্ত্র সকল ব্যবহার করিতে আগ্রহ জন্মে তাহার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতে হইবে এবং উৎকৃষ্ট বীজের উপকারিতা বুঝাইয়া দিতে হইবে।

বিদেশী লাঙ্গলের কার্য্য যাহা প্রদর্শিত হইবে তাহা চষা জমীতে না হয় আচট জমীতে প্রদর্শিত হইলে লাঙ্গলের ভাল মন্দ বুঝিতে পারিব, সাধারনতঃ বৰ্দ্ধমান জেলার মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত কঠিন ইহা যেন দর্শক ওপ্রদর্শকগণের মনে থাকে।

এই প্রদর্শনী সংক্রান্ত একখানি "গাইড বুক" (Guide-Book) প্রকাশিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহার জন্য প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষকে তাদৃশ ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। কৃষি-যন্ত্র বিক্রেতা, সার বিক্রেতা, পুস্তক বিক্রেতা, বীজ বিক্রেতা, এবং শিল্প-যন্ত্র ও শিল্প-কার্য্য সংক্রান্ত উপাদান বিক্রেতাগণ ইহাতে যে বিজ্ঞাপন দিবেন তাহার খরচাতেই গাইড মুদ্রিত হইয়া যাইবে। সুতরাং চাঁদা দাতাগণ তাহা বিনা মূল্যে ও অপরব্যক্তিগণ অতি অল্প মূল্যে পাইতে পারিবেন।

এই গাইডবহিতে বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোথায় কিরূপ মূল্যে কোন্ কৃষি-যন্ত্র, বীজ, পুস্তক, সার, শিল্প-যন্ত্র ও তৎসংক্রান্ত উপাদান সকল পাওয়া যাইবে, কোথায় ভাল গাভী ও ষাঁড় প্রভৃতি পাওয়া যায় এ সকল আমরা সহজে জানিতে পারিব। বিজ্ঞাপন বঙ্গভাষায় প্রচারিত হওয়াই প্রার্থনীয় ইহাদ্বারা সাধারণ ব্যক্তিবর্গের সমূহ উপকার সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা এইরূপ প্রদর্শনী উপলক্ষে একটী লটারীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় মনে করি। এতদঞ্চলবাসীগণ কোন নূতন ধরণের কৃষি-যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতে অত্যন্ত অমনোযোগী, ঐ সকল বিষয়ে ইহাদের প্রবৃত্তি আকর্ষণ জন্যই লটারীর আবশ্যক, এই লটারীতে কতকগুলি দ্বিপক্ষ লাঙ্গল, ইন্দ্রসালীধানের বীজ, কার্পাস-বীজ, পাট-বীজ, ধনিচা-বীচ, অস্থিগুড়া-সার, ঠকঠকীতাঁত ছানিকাটা কল, ময়দার কল, ইক্ষুমাড়াই কল, কুইনাইন পীল, ইক্ষু-বীজ, এবং কতকগুলি কৃষি পুস্তক থাকা চাই।

কোন নভেল নাটক বা অন্য পুস্তকের প্রয়জন হইবে না। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিই আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় যথা, কৃষি সম্বন্ধীয় গভর্‌মেণ্টের বার্ষিক রিপোর্ট, অন্য কৃষিগ্রন্থ, রেশম-বিজ্ঞান, মৎসের আবাদ, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থ, পশু-পক্ষীপালন, ঘড়ি মেরামত, ইট প্রস্তুত, কৃষি রসায়ন, ফসলের পোকা ইত্যাদি। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা আরও অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা আমাদের জন্য রেলওয়ে কন্‌সেশন টিকিটের্ ব্যবস্থা করুন, তাহাতে রেলকোম্পানীর আপত্তি হইতে পারে যে "পরিদর্শক ব্যতীত অপর লোকেও এ সুযোগে রেলওয়ে কোম্পনীর ক্ষতি করিতে পারে।" কথাটি অসঙ্গত নহে, ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তব্য এই যে স্থানীয় S. D, Oর নিকট হইতে সার্টিফিকেট লইয়া যাঁহারা প্রার্থনা করিবেন কেবল তাঁহারাই কন্‌সেশন টিকিট পাইবেন অন্যথা কেহ পাইবেন, না, এরূপ ব্যবস্থা হইলে রেলওয়ে কোম্পানীকে কেহ শঠতাপূর্ব্বক ফাঁকি দিতে সমর্থ হইবে না।

শ্রীরামরাম চন্দ্র। (প্রসুন)

বঙ্গে কৃষির অবনতি এবং তাহার কারণ

বিশেষ গবেষণার সহিত দেখিলে সকলেই বুঝিবেন কেন দিনের দিন বঙ্গে কৃষির এত অবনতি হইতেছে। ইহার কারণ কি? প্রথম-কৃষি সাধারণত নিম্ন কৃষককুলের উপর ন্যস্ত, দ্বিতীয়তঃ কৃষিকার্য্যের লাভ কোথায়, কৃষিতে লাভ হয় না বলিয়াই কৃষককুল ক্রমে নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে এবং ক্রমে তাহাদের গো মহিষ এবং জীবনের সম্বল জমি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যাইতেছে।

উপস্থিত ধান্য ও চাউলের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সকলেই বলিতেছেন যে ধান্য আমাদের দেশে প্রচুর উৎপন্ন হইতেছে এবং প্রতিবৎসর হইয়া থাকে এবং উদ্বৃত্ত ধান্য বা চাউল বিদেশে রপ্তানি হয় এবং রপ্তানি বন্ধ করিলেই ধান্য ও চাউলের মূল্য কমিয়া যাইয়া আবার ধান্য ২৲ টাকা মুল্যে প্রতিমণ বিক্রয় হইবে। কিন্তু তাঁহারা কি একবারও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন যে ২৲ টাকা মুল্যে ধান্য বিক্রয় হইলে চাষার কি লাভ হয়। যাঁহারা ধান্যের মুল্য কমাইবার জন্য ব্যাস্ত তাঁহারা কি কখন চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, যে চাষ করিতে গেলে কি খরচ হয়।

বঙ্গদেশে ধান্যই প্রধান কৃষি, অধিকাংশ জমিতে ধান্য ব্যতীত আর কোন ফসল হয় না এবং মুলধনের অভাবে শতকরা ৯৫ জন কৃষক ধান্য ব্যতীত আর কেন কৃষিকার্য্যে হনোহোশী হইতে পারে না, ঋণ করিয়া শতককরা ৯৫জন কৃষক কোনরূপে ধান্যের আবাদ করে এবং মাঠ হইতে ফসল ঘরে আসিবামাত্র, মহাজন আসিয়া তাহার অধিকাংশ কৃষিজাত ধান্য একরূপ জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া যায় বাকি যাহা থাকে তাহাতে তাহাদের সম্বৎসর উদরান্নের সংস্থান হয় কিনা সন্দেহ। কেন এরূপ হয় তাহা কি দেশবাসীর কাহারও চিন্তা করিবার অবসর আছে - আমার বোধ হয় নাই, তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে সকলেই কৃষককুলকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন।

গত আশ্বিন মাসের উচ্চ সংখ্যা কৃষক মাসিকপত্রিকাকে কৃষকের বক্তব্য শীর্ষে, বগুড়া নিবাসী এম রহমন মহাশয় লিখিয়াছেন যে কৃষককুলের অগাধ পরিশ্রমলব্ধ ফসল উচিৎমূল্যে বিক্রয় হওয়া উচিত। এম রহমন মহাশয়ের মতযদি বঙ্গবাসী সকলকেই ঐ কথা বলেন এবং কৃষির উৎপন্ন যাহাতে উচিৎমূল্যে বিক্রয় হয় তাহা হইলে, বঙ্গের কৃষক কুল রক্ষা পায় এবং তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের উচিৎ মূল্য পাইলে তাহারাও উৎসাহের সহিত নিজ পিতৃ পিতামহের জাতি ব্যবসা কৃষির উন্নতিকল্পে বনোনিবেশ করিতে পারে।

শস্যক্ষেত্রে বানরের উৎপাত

শিশুপাঠ্য "সরল পাঠ্য" নামক পুস্তকে 'বর্দ্ধমানের বানর' শীর্ষক একটি গল্প আছে, তাহা পাঠ করিলে এ জেলায় বানরেরর উৎপাত কিরূপ তাহা অনেকটা অনুভব করিতে পারা যায়; বস্তুত বানরের দৌরাত্ম্যে কি পল্লীবাসী, কি নগরবাসী সকলেই উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, মাঠে রক্ষক না থাকিলে ছোলা, মটর, অরহর কিছুই রক্ষা পায় না। রক্ষক রাখাও দরিদ্র কৃষককুলের পক্ষে কিরূপ কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই অনুমিত হইতে

পারে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, গ্রামের পার্শ্বস্থ একটি বেগুণের ক্ষেত্রে একজন রক্ষক লাঠি লইয়া প্রহরীর কার্য্য করিতেছিল, এরূপ সময়ে অনেকগুলি বানর আসিয়া দুই দলে বিভক্ত হইল এবং ক্ষেত্রের উভয় পার্শ্ব দিয়া আক্রমণ করিল। কৃষক যে দিকে তাড়া করিয়া যায় তাহার বিপরীত দিকে বানরগণ যাইয়া বার্ত্তাকু ফল ভক্ষণ করিতে লাগিল। ইহারা পাট গাছের পাতা চুষিয়া খাইয়া গাছগুলি পত্রশূন্য এবং নিস্তেজ করে, কার্পাসের গুটি ভাঙ্গিয়া ফল হীন করে, লঙ্কা, গোলাপ, সীম প্রভৃতি একেবারে নিষ্পত্র করিয়া দেয় এবং নিষ্প্রয়োজনে অনেক অপচয় করে। ফলকথা বর্দ্ধমান জেলায় বানরজাতি কৃষির অত্যন্ত অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বানরের উৎপাত না থাকিলে পল্লীবাসী কোন ব্যক্তিকেই তরকারী কিনিয়া খাইতে হইত না, কিম্বা তরকারী ক্ষেত্রে তরকারী না দিয়া পাট, শণ, কার্পাস, মশিনা প্রভৃতি বিদেশ রপ্তানী যোগ্য পণ্যের আবাদ করিয়া ধনশালী হইতে পারিত। প্রজার ধন বৃদ্ধি হইলেই রাজ্যের সমৃদ্ধি হয় ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এক্ষণে কি উপায়ে এই দুরন্ত জীবের দৌরাত্ম্য হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, ইহাই বিষম চিন্তার বিষয় হইয়াছে। বানর হত্যা করা কাহারও অভিপ্রেত নহে। এদেশবাসীগণের সংস্কার এই যে বানর হত্যা করিলে মহামারী বা আজন্ম হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ইহারা মৃত্যুকালে এরূপ ভাবে কাতরতা প্রকাশ করে যে, তাহা দেখিয়া লোক ইহাদের কৃত-দৌরাত্ম্য ভুলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। রোডসেস্ ও পবলিক্ওয়ার্কসেস্ ফণ্ড কৃষকদের অর্থ দ্বারা পরিপুষ্ট; এক্ষণে যদি এই ফণ্ড হইতে বার্ষিক কতক টাকা লইয়া তদ্বারা বানর ধরিয়া দ্বিপান্তরিত করা হয় তাহা হইলে দেশের কৃষির উন্নতি অনতিকাল মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হইবে। আমরা আশা করি, ৩।৪ বৎসর মাত্র ঐরূপ কার্য্য করিলে বানরের উৎপাত জন্য কৃষির ক্ষতি নিবৃত্তি ও কেবল বর্দ্ধমান জেলাতেই বার্ষিক লক্ষাধিক টাকার কৃষিজাত দ্রব্য রক্ষা করা।

হাঁস, মুরগী, পায়রাদ্বারা ও শস্যের অল্প ক্ষতি হয় না। মুসলমানপাড়ার সন্নিহিত অতি উর্ব্বর ক্ষেত্রেরও প্রায় অর্দ্ধেক শস্য হাঁস মুরগীতে অপচয় করে। অনেক স্থানে অনাথা বৃদ্ধস্ত্রীগণ (যাহারা ধান ভাঙ্গিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে) সৌখীন পায়রাপালকগণ দ্বারা অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া থাকে, ইহার কি কোন প্রতিকারের বিধান নাই। বিলাতি আইনে ব্যবস্থা আছে যে,—

"Birds, including game and pigeons, cannot commit trespass for which thier owners are responsible .On the other hand, the occupier of the land trespassed upon is entitled to shoot such birds when trespassing, but tame pigeons so killed do not become the property of the person who shoots them".

Ward, Lock &co's Landlord and Tenant. Page 17

আমাদের দেশে ঐরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে কনেকটা দৌরাত্ম্য কমিয়া যায়।

শেফালিকা

বাঙ্গালা দেশের অনেক গৃহস্থের বাটীতেই শেফালিকা (শিউলী গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদিগের ফুলবাগান নাই বা সে বিষয়ে তত সখ নাই, এমন লোকেও অনেকে ইহার বৃক্ষ রোপণ করেন। ইহার বীজ হইতে চারা জন্মিয়া থাকে, বর্ষাকালে সচরাচর গাছের তলেই চারা পাওয়া যায়। শেফালিকা গাছ বেশ বড় হয় ও যত্ন করিলে দুই বৎসরেই ফুল হইতে আরম্ভ হয়। যখন গাছটী ৪।৫ হাত উচ্চ হয়, তখন উহার মস্তকটী কর্ত্তন করিয়া দিলে, সেখান হইতে চারিদিকে ডাল বাহির হইয়া গাছটী ছত্রাকার হয় ও দেখিতে যে কেবল সুন্দর হয় এমন নহে, ডালের সংখ্যা বেশী হওয়াতে ফুলও বেশী হয়। যখন ফুল হয় তখন প্রচুর পরিমাণেই হয় এবং ফুলগুলির বোঁটা অত্যন্ত শিথিল বলিয়া প্রস্ফুটিত হইলেই মাটিতে পড়িয়া প্রাতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, ফুলগুলি মিষ্ট নরম গন্ধযুক্ত, প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইলে নিকটবর্ত্তী স্থান গন্ধে আমোদিত করিয়া তুলে। দু'চারটি ফুল সকল সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্বিন মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্তই বেশী পরিমাণে ফুল দেখা যায়। আমাদের দেশের অনেকে বিশ্বাস করেন, এই গাছ বাটীতে থাকিলে ম্যালেরিয়া বিশ নাশ করে—ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না, তবে কেবল গন্ধ ও দৃশ্যশোভা ব্যতীত ইহার জরঘ্নতা প্রভৃতি অনেক গুণ আছে, এজন্য অনেক সময় ইহার পাতা ও ছাল ব্যবহার হইয়া থাকে।

শেফালিকা পাতার রস সামান্য জ্বরে ও পুরাতন জ্বরে নিম্নলিখিতরূপে ব্যবহার করিতে হয়। নিতান্ত কচিও নহে ও পাকাও নহে, এরূপ কতকগুলি পাতা সমপরিমাণ বেলের পাতা ও কাল তুলসীর পাতা একত্র ছেঁচিয়া তাহার পর একখানি লোহার বঁটি বেশ গরম করিয়া বঁটির মুখ একটী পিতলের বাটির উপর রাখিতে হইবে, তখন একখানি নেকড়ার মধ্যে ঐ ছেঁচা পাতাগুলি রাখিয়া চাপ দিয়া রস উত্তপ্ত বঁটীর উপর ফেলিতে হইবে, যেন সমস্ত রস উত্তপ্ত বঁটীর উপর দিয়া গড়াইয়া পড়ে। এইরূপে প্রস্তুত অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ রসে একটু লবণের ছিটা দিয়া গরম গরম সেবন করিলে সামান্য ও সর্দ্দিযুক্ত জ্বরে বিশেষ উপকার হয়।

শেফালিকা ফুলের আরও একটী ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট

মেয়েছেলেরা প্রাতে ইহার ফুল কুড়াইয়া ফুলের সাদা পাপড়িগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রক্তাভ হরিদ্রা বর্ণ অংশটুকু অর্থাৎ বোঁটাটী রাখে ও উহা রৌদ্রে শুকায়। উহাকে সচরাচর "বুটী" কহে। ক্রমে ঐ বুটী অনেক হইলে জল বেশ গরম করিয়া তাহাতে ঐ বুটী ফেলিয়া দিয়া রগড়াইতে থাকে, ক্রমে জল একটু লালবর্ণের আভাযুক্ত হলদে হইয়া উঠে, তথন উহাতে ধৌত কাপড়, জামা, রুমাল ইত্যাদি ভিজাইয়া আবৃত স্থানে শুকাইলে সুন্দর রং হয়। ঐ রং কাঁচা হইলেও হঠাৎ উঠিয়া যায় না, ফট্‌কারী মিশাইলে রং কিছু পাকা হয়।—শ্রীগুরুচরণ সরকার।

ধান্য

ধান্য আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই টাকা মনে বিক্রয় হইত, কিন্তু দুইটাকা মণ দরে ধান্য বিক্রয় হইলে চাষির লাভ হওয়াত দূরের কথা, বরঞ্চ বিশেষ ক্ষতিই হইয়া থাকে কিন্তু কৃষি, নিরক্ষর কৃষককুলের হস্তে ন্যস্ত থাকায় তাহারা সেই ক্ষতি, সহজে বোধগম্য করিতে পারে না, কেবল মাত্র চাষে কিছুই নাই পণ্ডশ্রমই সার বলিয়াই নিরস্ত থাকে।

বিশ বিঘা জমিতে ধান্যের আবাদ করিতে হইলে কত খরচ হয় এবং দুই টাকা মণ হিসাবে ধান্য বিক্রয় হইলে কি লাভ হয় তাহা কি কখন কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন।

যদি সুজন্মা হয় তাহা হইলে বিঘা প্রতি ৮ মণের অধিক ধান্য হয় না, বিশ বিঘা জমি হইতে প্রতি বৎসর ১৬০ মণের অধিক ধান্য পাওয়া সুকঠিন, দুই টাকা মূল্যে প্রতি মণ ধান্য বিক্রয় হইলে ৩২০ টাকার ধান্য প্রতিবৎসর বিশ বিঘা জমি আবাদ করিয়া পাওয়া যায়।

কিন্তু বিশ বিঘা জমি আবাদ করিতে কত খরচ হয় তাহা কি কেহ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন?

প্রথমতঃ খাজনার হার—সাধারণতঃ গড়ে দুইটাকা বিঘা প্রতি খাজনা লাগে, তাহার উপর যদি চাষি সময়ে খাজনা দিতে না পারে জমিদার মহাশয়েরা উহার উপর সুদ চড়াইয়া থাকেন এবং চাষির গো মহিষাদি নিলাম করাইয়া সুদ সমেত খাজনা আদায় করেন, সে যাহাই হউক এক্ষণে দ্রষ্টব্য—বিশ বিঘা জমিতে খাজনা প্রতি বৎসর ৪০৲টাকা লাগে। বিশ বিঘা জমি আবাদ করিতে হইলে অন্ততঃ এক জোড়া বলিষ্ঠ বলদ আবশ্যক, এবং একজোড়া বলিষ্ঠ বলদ ন্যূনকল্পে ১২০৲ টাকায় ক্রয় করিতে হইবে, এক জোড়া বলদ ছয় বৎসরের অধিক চাষ করিতে পারিবে না এবং যে ১২০৲ টাকা ছয় বৎসর

কালের জন্য মাত্র বলদের মূল্যে ব্যয়িত হইবে, ঐ ১২০৲ টাকা অন্যরূপে খাটাইলে অন্তত বৎসরে ছয় টাকা করিয়া আয় হয় সুতরাং বলদ হিসাবে ন্যূনকল্পে চাষির ২৬৲ টাকা করিয়া খরচ হয়।

বিশ বিঘা চাষ করিতে হইলে অন্ততঃ একজন বেতন ভোগী কৃষকগণ রাখিতে হইবে। একজন কৃষাণ বৎসরে ৩৬৲টাকা বেতন এবং প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবা, বৎসর বৎসরে চারি খানি কাপড় এবং দুইখানি গামছা লইবে। কৃষাণ মহাশয়ের বেতন, খোরাকি এবং কাপড় বাবদে মাসে অন্তত ১০৲ টাকা করিয়া বৎসরে ১২০৲ টাকা খরচ হইবে।

তাহার পর বীচ টানিতে এবং রোপণ করিতে বিঘা প্রতি তিনটী করিয়া ঠিকা মনিব আবশ্যক, একটী মনিষ আট আনার কম পাওয়া যায় না, সুতরাং বীচ টানা এবং রোপণ হিসাবে বিশ বিঘায় বৎসরে ৩০৲ টাকা খরচ হইবে।

তৎপর ছিঁচ (সিঞ্চন), সুবৃষ্টি না হইলে অন্তত একটি করিয়া ছিঁচ দিতে হইবে, ঐকটী ছিঁচ দিতে বিঘা প্রতি দুইটি করিয়া মুনিষ আবশ্যক, বিশ বিঘায় ছিঁচ দিতে খরচ ২০৲।

সর্ব্বশেষে ধান্য কাটাই, ঝাড়াই, এবং মরাই জাত—ইহাতে বিঘা প্রতি অন্তত তিনটি করিয়া মুনিষ, বিশ বিঘায় ৩০৲ টাকা খরচ লাগিবে।

দুইটী বলদ রাখিতে হইলে যদিও চাষের খড় হইতে তাহাদের প্রতিপালন চলিবে, কিন্তু দুইটী বলদকে মাসে অন্তত একমণ করিয়া খইল খাওয়াইতে হইবে, একমণ সরিষার খইলের মূল্য ৬৲ টাকা বলদের খোরাকের জন্য প্রতি বৎসর ৬০৲ টাকা খরচ করিতে হইবে।

জমি হইতে যদি ৮ মণ করিয়া ধান্য লইতে হয় তাহা হইলে বিঘা প্রতি অন্তত ১ একমণ করিয়া খইলে সার স্বরূপ দিতে হইবে, বিশ বিঘা জমিতে খইল দিতে হইলে ১০০৲ টাকা খরচা হইবে।

এখানে দ্রষ্টব্য যদি ২০ বিঘা জমিতে মাত্র ৩২০৲ টাকা পাওয়া যায় তাহা হইলে কি থাকে কিছুই নহে উপরন্তু ঋণ—

আয়—৩২০৲ ব্যয়—খাজনা—৪০৲

বলদ—২৬৲
কৃষাণ—১২০৲
বীচটানা ও রোপণ—৩০৲
ছিঁচ—১০৲
কাটাই ঝাড়াই—৩০৲
বলদের খোরাক—৬০৲
সার—১০০৲
মোট ৪২৬৲

দুই টাকা মূল্যে ধান্য বিক্রয় করিয়া কৃষক পাইল	৩২০৲
বিশ বিঘা চাষ করিয়া তাহার খরচ হইল	৪২৬৲
ঋণ—	১০৬৲

যদি কৃষককুলকে বাঁচাইতে হয় এবং কৃষির উন্নতি করিতে হয় তাহা হইলে ধান্য অন্ততঃ চারি টাকা মণ হওয়া উচিত। ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি কৃষকের পক্ষে অমঙ্গল সূচক নহে।

সুপুষ্ট বীজ আবশ্যক

ফুল ও ফলের উৎকর্ষ-সাধন

সুপুষ্ট বীজ যে কৃষির উন্নতি সাধন পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়, এপর্য্যন্ত ভারতবাসীর অন্তঃকরণে সে কথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। ইউরোপ ও আমেরিকার কত কত উদ্ভিজ্জতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানের সাহায্যে এবিষয়ে প্রচুর উন্নতি ও আশ্চর্য্য ফল দেখাইতেছেন। তাঁহাদের যত্নে অব্যবহার্য্য উদ্ভিজ্জাদি ব্যবহার যোগ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে, বিস্বাদ ফলে মধুর আস্বাদ ঘটিতেছে, ক্ষুদ্রাকারের ফুল ও ফল বৃহদাকার হইয়া উঠিতেছে, ফলকথা যেখানে কষ্ট আছে সেখানে উন্নতিও হইয়া থাকে, যত্ন ও উদ্যমবিহনে, কোথাও উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষিবিষয়ে ভারতবাসীর মনোযোগ মাত্র নাই সুতরাং এদেশে ইহার উন্নতি হইতেছে না।

এতদ্দেশীয় লোকের মনে এইরূপ সংস্কার যে, যে বীজের জীবনীশক্তি আছে অর্থাৎ যাহা রোপণ করিলে অঙ্কুর জন্মে সেই বীজই ভাল। ফল ফুলের উৎকর্ষাপকর্ষ মৃত্তিকার দোষগুণে হইয়া থাকে। মৃত্তিকার দোষ গুণে যে ফল ফুল ভালমন্দ হয়, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু কেবল মৃত্তিকার দোষ গুণ ঐ ভাল মন্দের জন্য দায়ী নহে। বীজের উৎকর্ষাপকর্ষেও উক্ত দোষ গুণ ঘটিয়া থাকে, বীজ সংগ্রহ বিষয়ে এদেশীয় কৃষকদিগের বড়ই তাচ্ছিল্য দৃষ্ট হয়, কৃষকেরা সুপক, সতেজ, নিস্তেজ সকল ফল একসঙ্গে সংগ্রহ পূর্ব্বক সকলের বীজ একত্রে সংগ্রহ করে, বীজ বাছাই করার প্রথা এদেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বীজ সংগ্রহের এইরূপ দোষে এদেশে অনেক উদ্ভিদের ফল ফুল নিকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে। উত্তম ফলপ্রাপ্তির আশা থাকিলে, উৎকৃষ্ট বীজের অবশ্যই প্রয়োজন। কি প্রকারে বীজ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য তাহাই নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে সতেজ বৃক্ষেই ভাল ফল ফুল ধরিয়া থাকে। অতএব উত্তম ফল ফুল প্রাপ্তির নিমিত্ত উদ্ভিজ্জদিগকে সতেজ অবস্থায়-রাখার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক, সচ্ছন্দ স্থানে বাস এবং পুষ্টিকর খাদ্যের সুবিধা থাকিলে উদ্ভিজ্জগণ সতেজ থাকিতে পারে, এবং ফুলও আশানুযায়ী প্রদান করে। আমি একটি কলম লম্বা ভাদুরে আম্রের ও একটী ভাল গুঁটির আম্রের সুপুষ্ট বীজ বেশ সার যুক্ত মাটীতে রোপণ করিয়া তাহাতে বরাবর রীতিমত পাইট ও পরিশ্রম করায় গাছ বেশ সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া পাঁচ বৎসরে ফলবান হইয়াছে এবং আদিম বৃক্ষাপেক্ষাও ফলগুলি আকারে কিছু বড় ও সুমিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে গত বৎসরে ডেঙ্গো ডাটা শাকের কিছু সুপুষ্ট বীজ বাছাই করিয়া রাখিয়াছিলাম। গত বৈশাখ মাসে জমী চাষ ও কিছু সার দিয়া উক্ত বীজ বপন করি; গাছগুলি এক হস্ত উচ্চ বর্দ্ধিত হইলে কতকগুলি তুলিয়া শাকের জন্য ব্যবহার করি। বাকিগুলি একহস্ত ব্যবধানে ফাঁক ফাঁক করিয়া বসাইবার কারণ গত আশ্বিন মাসে উহা ৬।৭ হাত হস্ত উচ্চ এবং প্রায় একহস্ত বেড় বিশিষ্ট মোটা হইয়াছে। খাইতেও তেমনি সুমিষ্ট, নরম ও মুখরোচক হইয়াছে। ধান্য, পাট, সরিষা, তামাক প্রভৃতি শস্যেরও পরীক্ষায় প্রবৃত্ত আছি, এবং কতক সুফলও পাইয়াছি। কৌতুহলী কৃষকগণ যদি একটু যত্ন ও আয়াস সহকারে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তাহা হইলে সমস্ত ফসলেরই উন্নতি সাধন হয়, এবং তাহারাও লাভবান হইতে পারেন।

এক্ষণে কিরূপ আবাস স্থাপন ও কিরূপ খাদ্য কোন্ প্রকার উদ্ভিজ্জের পক্ষে হিতকারী, তাহা জানিবার জন্য কৃষকের কিছু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বহুদর্শিতা থাকা আবশ্যক। অম্লজান, যবক্ষারজান, অঙ্গারিকাম্ল, জলজান প্রভৃতি কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ এবং পটাশ, ম্যাগনেসিয়া, ফসফরাস, চুণ প্রভৃতি কতকগুলি পার্থিব পদার্থ উদ্ভিজ্জগণের শরীর পোষণার্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বায়বীয় পদার্থগুলি কতক তাহারা বায়ু হইতে গ্রহণ করে এবং বাকী পটাশাদির ন্যায় মূল দ্বারা শোষণ করিয়া মৃত্তিকা হইতে প্রাপ্ত হয়, মৃত্তিকায় এইসকল পদার্থের অল্পতা বা অভাব ঘটালেই সার প্রদানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। জীবজন্তুর মলমুত্র, খৈল, অস্থি, ভস্ম, চুর্ণ গলিত জীব ও উদ্ভিদ প্রভৃতিতে ঐ সকল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে। এই জন্যই উহারা সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জের প্রকৃতি অনুসারে কাহারও পক্ষে উক্ত পটাশাদির মধ্যে কোন পদার্থ বেশী এবং কাহারও পক্ষে কম আবশ্যক। এই নিমিত্ত যে সারে যে উদ্ভিজ্জের পোষনোপযোগী পদার্থ অধিক আছে, তাহাই তাহার পক্ষে অধিক উপকারী হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জগণের প্রকৃতি অনুসারে প্রয়োজনীয় সার প্রদত্ত না হইলে, সে সারে কোন উপকার দর্শে না, বরং কখন কখন হানি হইয়া থাকে,এই জন্য যে সার যে উদ্ভিজ্জের উপযোগী তাহা কৃষকের জানা আবশ্যক।

উপযুক্ত সার দিয়া রিতিমত পাইট করিয়া যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিলে গাছের অবস্থাও ভাল হইয়া থাকে, ফল ফুলও বড় হয়। এই সকল ফলের মধ্যে যে গুলি বড় এবং নিখুত, বীজ সংগ্রহের জন্ত সেই গুলি বাছিয়া বাছিয়া মনোনীত করিবে। একগাছে অনেক ফল থাকিলে, তাহাদের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, এজন্য যে বৃক্ষের ফল হইতে বীজ সংগ্রহের কল্পনা থাকিবে, তাহার কতক ফল তুলিয়া লইবে, ফল সুপক্ক না হইলে বীজ সংগ্রহ করিবে না। সংগৃহীত বীজের মধ্যে যে গুলি অপুষ্ট সে গুলি বাছাই করিয়া ফেলিয়া দিবে, এবং ভাল সুপুষ্ট বীজগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া যত্নপূর্ব্বক বোতলে বা বেশী হইলে কোন বিস্তৃতপাত্রে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। এমন অনেক উদ্ভিজ্জ আছে যে তাহাদের বীজ সদ্য সদ্য রোপণ না করিলে অঙ্কুর জন্মে না তাহাদের বীজ সদ্য সদ্য রোপণ করিবে। আবার অনেক উদ্ভিজ্জের বীজ রোপণের সময় পর্য্যন্ত শুষ্ক অবস্থায় না থাকিলে উৎপাদিকা শক্তি বিহীন হয়, সেরূপ বীজ শুষ্ক করত রাখিয়া দিবে।

উপরে যেরূপ কথিত হইল, সেই প্রকারে বীজ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা উপযুক্ত সময়ে চাষে ব্যবহৃত হইলে এবং ভূমির পাইট ও সার প্রদান ক্রিয়া রীতিমত সম্পন্ন হইলে অবশ্যই তাহাতে পূর্ব্বের অপেক্ষা উন্নতি ও উৎকৃষ্ট ফল উৎপন্ন হইবে। তাহাদের মধ্য হইতেও ভাল ফলগুলির বীজ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সংগ্রহ করিবে, এই প্রকারে বীজ সংগ্রহের প্রথা অবলম্বিত হইলে উত্তরোত্তর ফুল ও ফলের উন্নতি হইয়া, পরে তাহা আদিম অবস্থার সহিত তুলনায় এত উৎকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইবে যে, তখন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হইবে।—শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

বেল

বেল অতি উৎকৃষ্ট ফল, ইহার পুষ্টিকারিতা শক্তি অধিক। শুদ্ধ বেল ভক্ষণ করিয়াও সুস্থ ও সবল দেহে জীবনাতিপাত করিতে পারা যায়। পুরাণাদি শাস্ত্রে যোগী ঋষিদিগের কেবল ফলমূল ভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণের কথা জানা যায়; বোধ হয় এই প্রকার পুষ্টিকর ফলাদি তাহাদের আহারার্থে নিৰ্দ্ধারিত ছিল, বেল উদরাময় রোগের প্রধান মহৌষধ। আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে বেলের নিম্নলিখিত গুণ গুলি লিখিত আছে। বেল মধুর, কষায়, হৃদ্য, গুরু, কফপিত্তজ্বর, অতিসার নাশক। কচিবেল—স্নিগ্ধ, সংগ্রাহী, অগ্নিবৃদ্ধিকর; পাকাবেল সংগ্রাহক, গুরু, ত্রিদোষনাশক, মূল—বমনদোষ, ত্রিদোষ ও বায়ুরোগ শান্তিকারক। বেলশুট—কফ বাত শূল ও গ্রহণীরোগ শান্তিকর। সাধারণতঃ কাঁচাবেল পোড়াইয়া খাইলে

সারক ও পাকাবেল সারক গুণবিশিষ্ট, চৈত্র বৈশাখ মাসে দধি ও চিনি সহযোগে পাকা বেলের সরবৎ অতি উপাদেয় ও ঠাণ্ডা গুণবিশিষ্ট। শ্রীফল ও বেল পৃথক পদার্থ নহে। ছোট আকৃতির ফল হইলে তাহাকে সচরাচর শ্রীফল বলিয়া থাকে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে লিখিত আছে লক্ষ্মীর বামস্তন হইতে শ্রীফলের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীফল মহাদেবেরও অতি প্রিয়, এজন্য বিল্ব পত্র না হইলে শিবপূজা হয় না। বেলপাতার জ্বরাদি দোষনাশক ভেষজগুণ যথেষ্ট আছে।

বেল গাছের শিকড় অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করে এবং উহা হইতে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ফেকড়ি বাহির হয়, এই শিকড়ের কিয়দংশের সহিত ঐ ফেকড়ি কাটিয়া লইয়া উদ্যানে রোপণ করিলেও নূতন গাছ হইতে পারে। কিন্তু হঠাৎ এই রকমে ফেকড়ি তুলিয়া লইলেই অনেক সময় গাছ মরিয়াও যায়। নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া তুলিয়া লইলে প্রায় মারা যায় না। যে স্থান হইতে ফেকড়ি উদ্গত হয়, সেই স্থানের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া গুল কলমের ন্যায় উহার অর্থাৎ ঐ ফেকড়ির উভয় পার্শ্বস্থ শিকড়ের কতক অংশের চতুঃপার্শ্বস্থ ছাল তুলিয়া রস গমনাগমন বন্ধ করিতে হয়, পরে মাটী চাপা দিয়া কিছুদিন জল সেচন করিলে তাহা-হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় বহির্গত হয়, তখন সাবধানে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা নবজাত শিকড় সমেত কর্ত্তন করিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে হইবে। আমি এই প্রণালীতে দুইটি সুমিষ্ট গাছের ফেকড়ি তুলিয়া রোপণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে গাছ দুইটী ফল বড় হইয়াছে, এবং আদিম গাছের তুল্য সুমিষ্ট ও বড় আকার হইয়াছে।

বীজ দ্বারা বৃক্ষ উৎপাদন করিতে হইলে সুপক্ক বেলের বীজ কোন ঝুরা মৃত্তিকা পূর্ণপাত্রে পাতো দিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু বীজজাত চারায় অপেক্ষাকৃত বিলম্বে ফল ধরে, দোয়াশ মাটী বেলগাছের পক্ষে উপযোগী। যেস্থানে বর্ষার জল বসে, সেস্থানে চারা রোপণ করিবে না। চারা রোপণের পূর্ব্বে মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক তাহাতে খৈল বা গোবরের সার মিশাইবে। শাখাপ্রশাখাসহ অধিক পরিমাণে পত্র তুলিয়া লইলে গাছের অনিষ্ট হয়। শীতের প্রারম্ভে গাছের গোড়ায় মাটী খুড়িয়া দিলে ও আষাঢ় মাসে গোড়ায় আইল বান্ধিয়া বর্ষার জল খাওয়াইলে বৃক্ষের বিলক্ষণ তেজ বৃদ্ধি হয়। যে বেলের আবরণ পাতলা, আঠা ও বীজ কম সেই বেলই ভাল। বেলের আকার ৬।৭ সের ওজনেরও হয়। কচি বেল খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইলে তাহাকে বেল শুট বলে, উহা ঔষধে লাগে। বেলের মোরব্বা ও বেল পানা অতি উপাদেয় খাদ্য।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

গাধা ও গাধার দুধ

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

গর্দ্দভী ও শাবক

গাধার দুধ প্রায় মাতৃ-দুগ্ধের ন্যায়। রুগ্ন শিশুদিগের বিশেষ উপকারক। কিন্তু অনেক মুল্য। টাকায় এক সের পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আমি কলিকতার কথা বলিতেছি। পশ্চিম অঞ্চলে কিছু সুলভ।

গাধা বঙ্গদেশে অধিক নাই। এ স্থানের আর্দ্র ভূমি ও আর্দ্র বায়ু ইহার বাসের উপযোগী নহে। কাপড়ের ভার বহন করিবার নিমিত্ত কেবল রজকেরা ইহাকে প্রতিপালন করে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ হিমালয়ে নিম্নপ্রদেশে নানা প্রকার ভার বহন করিবার নিমিত্ত লোকে ইহাকে প্রতিপালন করে। পার্ব্বত্য প্রদেশে যে স্থানে পাহাড়ের গায়ে অন্য জন্তু উঠিতে নামিতে পারে না, সে স্থানে অধিক ভার লইয়া গাধা গমনাগমন করিতে পারে। হিমালয়ের উত্তর ভাগে যাহাকে ভোট বলে যে স্থানে একের পর আর এক অত্যুচ্চ তুষারাবৃত পর্ব্বতশ্রেণী তিব্বত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, সে স্থানে আমি গর্দ্দভ দেখি নাই। সে স্থানে ছাগল ও মেষ মানুষের ভার বহন করে। সে কালে তিব্বতের লোক ইহাদের পৃষ্ঠে সোহাগা ও লবণ প্রভৃতি বস্তু লইয়া ভারতবর্ষে আসিত। এ ব্যবসার এখন কিরূপ অবস্থা তাহা আমি জানি না।

তিব্বতে অনেক বন্য গর্দ্দভ আছে। কেবল তিব্বতে কেন? মধ্য এসিয়ার প্রায় সকল দেশেই ইহারা পালে পালে বিচরণ করে। বঙ্গদেশের পালিত গর্দ্দভ দেখিয়া তুমি মনে করিবে যে, এ জন্তু অপেক্ষা হেয় জীব আর পৃথিবীতে নাই। কেবল বুদ্ধিহীন মানুষের সহিত তুলনা করিবার উপযোগী। কিন্তু বন্য গাধা দেখিলে তোমার সে ভ্রম দূর হয়। ইহারা বলবান সুশ্রী ও ঘোড়া অপেক্ষা দ্রুতগামী। পারস্য প্রভৃতি দেশের লোক ইহার মাংস অতি উপাদেয় বলিয়া ভক্ষণ করে। সে জন্য বন্য গাধাকে লোকে শিকার করে। প্রতি বন্য গাধার পালে এক একটা মোড়ল থাকে। সকলের অপেক্ষা সে বুদ্ধিবান, বলশালী ও দ্রুতগামী। পালের সমস্ত গাধা তাহার আজ্ঞায় পরিচালিত হয়। কোন উপায়ে তাহাকে ধরিতে পারিলে পারস্যের শিকারীগণের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না।

পারস্য, তুরস্ক, মিসর বিশেষতঃ স্পেন দেশে গাধার আদর অধিক। এ স্থানের গাধার সহিত ভারতের গাধার তুলনাই হয় না। ঐ স্থানের গাধা, বিশেষতঃ চড়িবার গাধা, বলিষ্ট ও দেখিতে সুন্দর হয়। আমাদের দেশে সেকালে দণ্ডস্বরূপ অপমানিত মানুষকে গাধার পৃষ্ঠে বসাইয়া লোকে রাজপথে লইয়া যাইত। কিন্তু যে সকল দেশের

নাম করিলাম, সে স্থানে চড়িবার গাধার পৃষ্ঠে চড়িলে তুমি অপমান বোধ করিবে না। মিশর দেশে গাধার পৃষ্ঠে চড়িয়া আমি অনেক ভ্রমণ করিয়াছি। স্পেন দেশে ভাল জাতির শ্বেত গর্দ্দভ অধিক মুল্যবান। সেরূপ গাধা কেবল ধনবান লোকেরা ব্যবহার করিতে পারেন। সচরাচর ভদ্রমহিলাগণ ইহার পৃষ্ঠে অরোহণ করিয়া যাতায়াত করেন। চড়িবার গাধার কথা ধর্ম্ম পুস্তক বাইবেলে অনেক স্থানে আছে। বন্য গাধার সহিত বলিষ্ঠ দ্রুতগামী মানুষের তুলনা আছে। আরব ও তুরস্ক দেশে এক রজ্জুতে আবদ্ধ একের পশ্চাতে আর একটী এক সঙ্গে অনেক গুলি উষ্ট্র ভার লইয়া গমন করে, কিন্তু সেই রজ্জুতে আবদ্ধ তাহাদের সম্মুখে একটি গাধা যাওয়া চাই। তা না হইলে উট চলিবে না। কেন তাহা বলিতে পারি না। সেই গাধার পৃষ্ঠে চড়িয়া একজন মানুষ যদি বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে যায়, তাহা হইলে আরও ভাল হয়।

কিন্তু গাধার ডাক বাঁশীর শব্দের ন্যায় সুমিষ্ট নহে। আমাদের পল্লীগ্রামে, যে স্থানে লোকে কখনও গাধার ডাক শ্রবন করে নাই, সে স্থানে রাত্রিকালে যদি গাধা চিৎকার করে, তাহা হইলে গ্রামবাসিদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায় ও ভয়ে আত্মা পুরুষ শুষ্ক হইয়া যায়, লোকে মনে করে কোথা হইতে বুঝি একটা ভীষণাকার রাক্ষস দেশে আসিয়াছে। হিতোপদেশের পিঙ্গলক সিংহ সঞ্জীবক বৃষভের গর্জ্জন শুনিয়া ঘোরতর ভীত হইয়াছিল। কিন্তু সে যদি গাধার ডাক শুনিত, তাহা হইলে তাহার আর জ্ঞান থাকিত না। ফল কথা 'গর্দ্দভি কর্কশ শব্দ করোতি' সেই জন্য খরজাতীয় এই পশুর গর্দ্দভ নাম হইয়াছে। ইহাদের কণ্ঠদেশের অভ্যন্তরে একটু গহ্বর আছে। সেইজন্য এইরূপ শব্দ হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ইহার শব্দ ধরিয়া নামকরণ করেন নাই। ইহা ঘোড়ার জাতি, সেই জন্য ইহার প্রথম নাম হইয়াছে ইকুয়স। ঘোড়া হইতে পৃথক করিবার জন্য ইহার দ্বিতীয় নাম হইয়াছে আসিনস। গাধার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নাম হইয়াছে ইকুয়স্ আসিনস্।

অতি প্রাচীনকাল হইতে গাধা মানুষের গৃহপালিত পশু হইয়াছে। ঘোড়া কিজন্য মানুষের দাস হইল তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় সিংহ সর্ব্বদাই অশ্বকে আক্রমণ করিত। সিংহের জ্বালায় ঘোড়ার কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। সে জন্য ঘোড়া গিয়া মানুষের সহায়তা প্রার্থনা করিল। মানুষ বলিল যে—"তোমার পৃষ্ঠে যদি আরোহণ করিতে দাও তাহা হইলে তোমার পিঠে বসিয়া সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমাকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারি। অশ্ব সম্মত হইল। মুখে লাগাম দিয়া পিঠে জিন্ বসাইয়া, তাহাতে চড়িয়া মানুষ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া বল্লমের খোঁচায় তাহাকে বধ করিল।" তখন ঘোড়া বলিল,—"এখন তো কাজ হইয়া গিয়াছে, এখন আমার পিঠ হইতে নামো।" মানুষ তাহা করিল না।

তাহাকে লইয়া আস্তাবলে বাঁধিয়া ফেলিল। গর্দ্দভকে মানুষ কখন কিরূপে বশীভূত করিল সে সম্বন্ধে এরূপ কোন গল্প নাই।

কেবল রুগ্ন শিশুদের পক্ষে নহে, গাধার দুধ সকল দুর্ব্বল লোকের পক্ষে বিশেষ-রূপ উপকারী। যক্ষ্মা কাস রোগের প্রথম অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণের গাধার দুধ সেবন করিতে দিলে রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে। শীতপ্রধান ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক। সেজন্য এ সকল দেশে গর্দ্দভীর দুগ্ধের অধিক আদর। তা ছাড়া লোকের টাকা আছে। বড়লোকেরা ইহা অনায়াসেই কিনিতে পারেন।

দুগ্ধবতী গর্দ্দভী

সহরে রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক সেজন্য আমাদের দেশে, অর্থাৎ কলিকাতায় দুগ্ধবতী গর্দ্দভী রজকের ঘরেই থাকে। রজক তাহাকে লোকের বাড়ী বাড়ী লইয়া যায়, ও সেই স্থানে দোহন করিয়া ক্রেতাগণকে দুগ্ধ প্রদান করে। কিন্তু দুগ্ধ অধিক হয় না, এক ছটাক, আধ পোয়া, বড় জোড় এক পোয়া দুগ্ধ হয়।

আমাদের দেশে দুগ্ধবতী গাধীকে রজক যে বিশেষরূপ যত্ন করে তাহা বোধ হয় না। কিন্তু বিলাতে ইহাদের আদর ধরে না। গাধা স্থিরভাবে

দোহনের নিমিত্ত দাঁড়াইয়া আছে

আমি দেখিয়াছি যে, বিলাতের একজন লোক গর্দ্দভ দুগ্ধের ব্যবসা করিয়া অল্পদিনে ধনবান্ হইয়াছেন। তিনি এক প্রকাণ্ড অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দুগ্ধবতী গর্দ্দভীর নিমিত্ত গোয়াল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিলাতে ও গাধা ভার বহনের কাজ করে। তখন তাহাকে বড় কেহ যত্ন করে না। প্রহার প্রহার প্রহার, যত্নের মধ্যে তখন সে তাহাই ভোগ করে। কিন্তু প্রসব হইলে তখন ঐ গোয়ালের স্বামী তাহাকে ক্রয় করেন, অথবা ভাড়া করিয়া রাখেন। যে কয়মাস দুগ্ধ প্রদান করে, সে কয়মাস গর্দ্দভী স্বর্গসুখ ভোগ করে। গর্দ্দভের আবাসগৃহ দেখিলে বস্তুত দুঃখ হয়।

গর্দ্দভীর গোয়াল সুন্দর

মেলার সময় বিশেষতঃ সমুদ্রকূলে বালুকাতে দুই চারি জন লোক চড়িবার গাধা লইয়া যায়। বালকবালিকাদিগকে তাহাদের পৃষ্ঠে চড়িতে দিয়া তাহারা পয়সা উপার্জ্জন করে। কিন্তু সে অতি সামান্য ব্যবসা। দুগ্ধের ব্যবসাতেই টাকা হয়। যাহার বাড়ীতে গাধা বারো মাস ভার বহন করে, দুগ্ধবতী গর্দ্দভী বিক্রয় করিয়া অথবা ভাড়া দিয়া তাহার অধিক লাভ হয় না। ফোড়ে আসিয়া নবপ্রসূত গাধাকে ক্রয় অথবা ভাড়া করে। এরূপ একটী গাধার মূল্য ত্রিশ টাকা। ফোড়ে সেই গাধা লইয়া গর্দ্দভীশালার স্বামীকে তিন গুণ মূল্যে প্রদান করে। তিনি ইহাদের দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। সাইকেল করিয়া লোকের বাড়ীতে তিনি দুগ্ধ প্রেরণ করেন।

লোকের বাড়ী দুগ্ধ প্রেরণ সুন্দর ব্যবস্থা

বিলাতে ডাক্তারেরা যক্ষ্মা কাশি রোগে এই দুগ্ধের ব্যবস্থা করেন। যাঁহারা মফঃস্বলে বাস করেন, এরূপ অনেক বড় লোককে নিজের ঘরেই দুগ্ধকাল পর্য্যন্ত গাধাকে পুষিয়া রাখিতে হয়। বিশেষ আবশ্যক হইলে কোন কোন সময়ে স্বতন্ত্র রেল গাড়ী ভাড়া করিয়া গাধাকে লইয়া যাইতে হয়। তার জন্য শত শত টাকা ব্যয় হয়। শীতকালে যখন বড় বড় ইংরেজ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বায়ু সেবনের নিমিত্ত ফরাসী ইটালী প্রভৃতি দেশে গমন করেন, তখন কোন কোন লোক সহস্র সহস্র টাকা খরচ করিয়া দুই তিনটী গাধা সঙ্গে লইয়া যান। কোন ব্যবসায়ী বিলাতে একবার এক কোটীপতি সাহেবের আজ্ঞায় গর্দ্দভী প্রেরণ করিয়াছিলেন। গর্দ্দভী আসিয়া পৌছিল। কিন্তু তাঁহার চাকর চাকরাণী কেহই ইহা দোহন করিতে সম্মত হইল না। সকলে বলিল যে, গাধা দুহিলে আমাদের জাতি যাইবে। লোকসমাজে আমরা মুখ দেখাইতে পারিব না। কাজেই সেই ধনকুবেরকে নিজেই গর্দ্দভীকে দোহন করিতে হইল। বিলাতে এক একটী গাধা প্রায় তিন পোয়া করিয়া দুগ্ধ প্রদান করে। সকল সময় গর্দ্দভী দোহন করা নিরাপদ্ নহে। কখন কখন দোহনিকে কামড়াইয়া গর্দ্দভী তাহার শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়। বিলাতের লোকে কৌশলে গাধা দোহন করে। তাহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত হইতে হয় না।

গাধী দোহনে কৌশল আবশ্যক ।

শোকস্থান সহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি, ন পণ্ডিতম্॥

সহস্র সহস্র শোকের স্থান আছে, শত শত ভয়ের স্থান আছে, কিন্তু তাহাতে মূঢ়গণেই কাতর হয়। কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা গ্রাহ্য করেন না। গাধা পণ্ডিত লোক, গাধা তাহাতে বিচলিত হন না। যাহা হইবে তাহা হইবে এইরূপ মনে করিয়া গাধা সংসারে আসিয়া কালক্ষেপ করেন। সংসারে গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে কিরূপ গভীর চিন্তায় গাধা নিমগ্ন আছেন তাহাকে দেখিলেই সহজেই এই কথা মনে হয়।

গাধা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ।

আমাদের দেশে গাধা বিচক্ষণ জীব হইলেও অন্য দেশে ইহা মানুষের বড় উপকারী। অধিক ভার বহন করিতে পারে, শীত উষ্ণ সহ্য করিতে পারে, অল্পে সন্তোষ লাভ করে, চাণক্য বলিয়াছেন যে, এই তিন গুণ গাধা হইতে মানুষের শিক্ষা করা উচিত।

অবিশ্রান্তং বহেদ্ভারং শীতোষ্ণঞ্চ ন বিন্দতি।
সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দ্দভাৎ॥

২০শ খণ্ড। | পৌষ, ১৩২৬ সাল। | [illegible]ম সংখ্যা

ভারতের বর্ত্তমান কৃষি সমস্যা

য়ুরোপ, আমেরিকা, প্রভৃতি স্থানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হয় এবং সেখানকার কৃষিকার্য্যসম্পদ বিশেষ ও কৃষকের আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল, কিন্তু রত্নপ্রসূ ভারতে ও সোণার বাংলায় আজ হাহাকার কেন? একথার উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না, তাহার কারণ, কারণ অনেক। এই বৈজ্ঞানিক যুগে সকল দেশেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ আবাদ করা হয় কিন্তু ভারতের কৃষক তার মামুলি প্রথা ছাড়িবে না। চাষ আবাদ করিতে হইলে কেবলমাত্র বেশ ফসল ফলেছে ইহা বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না; দেখিতে হইবে কত অল্প টাকায়, অল্প সময়ে ও কম পরিশ্রমে কত বেশী ও মূল্যবান ফসল জন্মিতে পারে। প্রথমতঃ কৃষককে দেখিতে হইবে যে তাহার ক্ষেত্র কোন্ ফসলের উপযোগী এবং কি কি ফসল পর্য্যায়ক্রমে তাহার ক্ষেত্রে জন্মিতে পারে; তাহার পর তাহার অর্থ ও সামর্থ অনুযায়ী তাহাকে চাষে হাত দিতে হইবে। পরন্তু কোন্ জমিতে ও কোন্ শস্যে কিরূপ সার আবশ্যক হয় সে বিষয়ে ভারতে সাধারণ কৃষক অজ্ঞ, তাহার পর বীজ নির্ব্বাচন—ইহা একটী বিশেষ কঠিন কার্য্য। শস্য বিক্রয় যোগ্য করিবার পূর্ব্বে আরও অনেক বাধা ও প্রতিবন্ধক আছে। কৃষকের কৃষিসম্বন্ধীয় কিছু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকিলে ঐ বাধা বিপত্তিগুলির হাত হইতে এড়ান যায় না। এক্ষণে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা হয় কিন্তু বর্ত্তমান যুগে জগতব্যাপী প্রতিযোগিতার ফলে উহার লাভের অংশ

বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং এরূপ স্থলে নিকৃষ্ট ও মোটের উপর কম ফসল জন্মাইলে সেই কৃষিশিল্প এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে যে অচিরে বিনষ্ট হইবে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতের প্রস্তুত চিনি তাহার জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত।

প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার ভারতের কৃষকের নিকট উন্মুক্ত থাকিলেও বিজ্ঞানের দ্বারদেশে আজ সে ভিখারীবেশে দণ্ডায়মান; তাই প্রতিবৎসরই বিদেশী চিনীর আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রথমতঃ উপযুক্ত সার বা যথেষ্ট সারের অভাবে ইক্ষুর চাষ নষ্ট হয় কিন্তু সে বাধা অতিক্রম করিলেও আরও অনেক বাধাবিপত্তি আছে। মামুলি আমলের কলের সাহায্যে যে রস নিস্তৃত হয় তাহা গুণে এবং মিষ্টতায় বিদেশী চিনী অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং ইহাই হচ্চে প্রধান অন্তরায়।

এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে যে কি উপায়ে ও কোন পথে ভারতের চিরন্তন মামুলী প্রথার সহিত বৈজ্ঞানিক প্রথার খাপ খাওয়াইয়া ভারতের কৃষিশিল্পের উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। যে কোন বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা হউক না কেন তাহা কিন্তু সহজ সাধ্য হওয়া আবশ্যক এবং সেগুলি ভারতের জল মাটির উপযোগী হওয়াও চাই। য়ুরোপ বা এমেরিকায় কৃষি প্রথা ঠিক ঠাক্ যে এদেশে চলিবে একথা যাহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। প্রথমতঃ চাষীকে দেখিতে হইবে যে কিরূপে তাহার পতিত জমি হইতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মূল্যবান ও লাভকর এরূপ কোন ফসল জন্মিতে পারে। ভারতের চাষীরা কিন্তু নিস্ব, উহাদের সহিত ধনীর সহযোগীতা চাই। জমি হইতে মূল্যবান ফসল উৎপন্ন করা—এই নীতিটি হচ্ছে চাষ আবাদের বর্ণমালা। তারপর বীজ নির্ব্বাচণ কথাটা এখন সহজ ভাবে বুঝিয়া দেখার প্রয়োজন। বীজ নির্ব্বাচন মানে প্রকৃত পক্ষে গাছ নির্ব্বাচন। ক্ষেতের মধ্যে সেরা গাছগুলি বীজ উৎপাদনের জন্য বাছাই করিয়া রাখিতে হয় এবং তাহা হইতে সুপক্ক, সুপুষ্ট উৎকৃষ্ট বীজগুলি বাছাই করিয়া লইতে হইবে। বৎসর বৎসর এই কার্য্য করিতে করিতে বীজ সম্পূর্ণ উৎকর্ষতা লাভ করিবে।

কোন এমেরিকান চাষী এক সময় দেখিতে পাইল অতি অনাবৃষ্টি অজন্মার দিনে তাহার শস্যক্ষেত্রের কয়েক গোছা গম গাছ বাঁচিয়া গিয়াছে এবং মাথা তুলিয়া থাকিতে পারিয়াছে। ঐ সকল গাছের বীজ লইয়া পুনঃ পুনঃ আবাদ করিতে করিতে তথায় অনাবৃষ্টিসহ গমের উৎপত্তি হইয়াছে এবং অনেক এমেরিকার চাষী এখন অনাবৃষ্টিসহ গম বীজ বেচিয়া কোটি টাকা রোজগার করিতেছে।

উৎকৃষ্ট বীজ বপন না করিলে ভাল ফসল জন্মিবে কিরূপে? আমাদের দেশের সাধারণ কৃষকগণ দরিদ্র এবং ঋণজালে বদ্ধ, সুতরাং ভাল মন্দ বীজ বিচার করিয়া বপন করিবার ক্ষমতা তাদের নাই বলিলেও চলে। অধিকাংশ স্থানেই বাড়ী দেওয়া নিকৃষ্ট বীজেই চাষ আবাদ চলে। যদিও ভাল বীজ বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়

কিন্তু তাহার জন্ত প্রতিবৎসরেই অনেকগুলি টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যায় এবং তাহাও সকল শস্তের বীজ নহে কতকগুলি সব্জী, ফুল ও বিশেষ শস্তের বীজ মাত্র। ১৯১৮-১৯ সালে বিদেশ হইতে ১২৫৪৬২৮৯ টাকার বীজ ভারতে আমদানী করা হইয়াছে; কিন্তু এই বীজ যদি এই দেশে বৈজ্ঞানিক প্রথায় উৎপন্ন করা যাইতে পারিত তাহা হইলে অতগুলি টাকা বিদেশে চলিয়া যাইত না এবং দেশও ঐ পরিমাণে দারিদ্র হইত না। দশের চেষ্টা ও উদ্যম এবং সাধারণের সহযোগিতা ও সহানুভূতি ভিন্ন এরূপ জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না।

বিদেশ হইতে আমদানী না করিয়া এই দেশের জলমাটির উপযোগী উৎকৃষ্ট বীজ এখানে উৎপন্ন করিতে পারিলে দেশের প্রভূত উপকার সাধন হয়। মিসর দেশের তুলার বীজ ভারতে রোপণ করিয়া যথেষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে। এই তুলার চাষ যখন ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে হইবে তখন সমস্ত পৃথিবীর তুলার বাজারে বিপ্লব উপস্থিত হইবে এবং ভারতের কৃষিশিল্পের নবযুগ আসিবে। তারপর ক্রমে ক্রমে নূতন রকমের ফসল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। একশ বৎসর পূর্ব্বে পাটের চাষ ভারতে ছিল না বলিলেও চলে কিন্তু এক্ষণে প্রতিবৎসর প্রায় কোটী কোটী টাকার পাট এই দেশেই জন্মায়। আর একটী কথা; আমাদের দেশের কৃষক এক জমিতে পর্য্যায়ক্রমে কি কি মূল্যবান ফসল জন্মিতে পারে সে বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ না হইলেও পর্য্যায় চাষের জন্ত যে উদ্যোগ আয়োজন আবশ্যক এবং সার প্রয়োগ, জল সেচনের যে ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা তাহারা করিয়া উঠিতে পারে না এবং তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইবার অবসরও অনেক সময় পায় না। যদি বা কেহ কখন পায় তবে তাহাদের গুণপনা সাধারণে প্রকাশ করিবার সুযোগ হয় না। তাহারা সাধারণতঃ নিরক্ষর, শিক্ষিতগণ তাহাদের সহিত মিলিতে মিশিতে চান না। এমতাবস্থায় তাহাদের কথা কাগজে ছাপিয়া বাহির হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

বঙ্গদেশের সরকারী কৃষি বিভাগের স্মিথ্ সাহেব পর্য্যায় চাষের পরীক্ষার ফল সাধারণে প্রকাশ করিয়া অনেক উপকার করিতেছেন কিন্তু উপকার সম্পূর্ণ হইবে না যতক্ষণ না ধনী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় চাষীদের সহিত যোগদান করিবেন।

পাল্‌টি চাষে লাভ অনেক; এক বৎসরের মধ্যে একই জমিতে পাট ও ধান পর্য্যায়ক্রমে উৎপন্ন করা যাইতে পারে এবং কৃষকেরা সেইমত কার্য্য করিলে লক্ষ লক্ষ টাকা তাহাদের গৃহে আসিবে; পরন্তু ইহার ফলে তরিতরকারী চাউল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের মূল্যও কমিয়া যাইবে। সুপ্রশস্ত জমি লইয়া চাষাবাদ করা অপেক্ষা অল্প জমিতে অধিক ফসল উৎপন্ন করা অপেক্ষাকৃত লাভজনক।

অন্যান্ত প্রদেশের তুলনায় বাঙলার কৃষক একেবারে অলস; প্রকৃত সারের অভাবে বাঙালার জমির উৎপাদিকা শক্তি কত কমিয়া গিয়াছে এবং সোণার

বাঙালা এই আখ্যানটী আজ কাল কল্পনামাত্র হইয়া দাড়াইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে কি উপায় অবলম্বন করিলে গোজাতির উন্ননি সাধন করা যাইতে পারে কারণ গরুদ্বারাই ভারতের চাষ আবাদের কার্য্য চলিয়া থাকে। প্রথমতঃ অবাধে গোহত্যা প্রথা নিবারণ করিতে হইবে, তারপর যাহাতে দেশে উৎকৃষ্ট, বলবান ও তেজস্বী বলদ জন্মিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

খাদ্যতত্ত্বে চাউল

কৃষিবিশেষজ্ঞ শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত।

চাউলের রাসায়নিক খাদ্যগুণ

১। দাহ্যগুণ—

শ্বেতসার ও শর্করা	শতকরা	৬৫—৭৯ ভাগ।
তৈল	"	½-১ ভাগ।
সূত্র	"	¼ ভাগ।

২। মেদকারিতা গুণ—

প্রোটিড্	"	৬-৮ ভাগ।
ভস্ম	"	½-১ ভাগ।

চাউল বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। চাউল ব্যতীত বাঙ্গালী জাতির এক দিনও চলে না। চাউল খুব লঘু পথ্য—এই জন্যই বাঙ্গালা দেশে ইহার এত আদর। ভাত এক ঘণ্টা মাত্র সময়ের মধ্যে পাকস্থলীতে জীর্ণ হয়। কিন্তু ময়দার রুটী জীর্ণ হইতে প্রায় ৪ ঘণ্টার প্রয়োজন। নানাপ্রকারের ধান্য আছে, যথা—বোরো, আউশ এবং আমন। ইহাদের মধ্যে আবার সরু মোটা এবং শাদা, প্রভৃতি * নানা বিভাগ। কোন কোন ধান্যে শুঁয়া থাকে। কয়েক প্রকার সুগন্ধি ধান্য আছে। ইহাদের মধ্যে সরু আমন ধান্যের সাদা চাউল উচ্চশ্রেণীর লোকের নিকট অতিশয় আদরণীয়। এই চাউল সর্ব্বাপেক্ষা লঘু পথ্য বলিয়া বিখ্যাত। বোরো এবং অধিকাংশ আউশ অত্যন্ত মোটা এই জন্য উচ্চশ্রেণীর লোক এই সব চাউল গ্রহণ করে না। মোটা চাউল সহজে জীর্ণ হয় না। মোটা চাউল অপেক্ষা সরু চাউলের মূল্য মণকরা অন্ততঃ এক টাকা অধিক।

---

* আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লাল শালিধান্যের চাউল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট শালিধান্যের চাউল নিকৃষ্ট। পরন্ত কৃষ্ণবর্ণ আউশধান্য আউসের মধ্যে উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

আবার নূতন অপেক্ষা পুরাতন চাউলের মূল্য আরও অধিক। পুরাতন চাউল অতিশয় লঘু এই জন্য ইহা এত মুল্যবান। চাউল পুরাতন হইলে ইহার তৈলের ভাগ কমিয়া যায়। চাউলে সাধারণতঃ শতকরা অর্দ্ধ হইতে এক ভাগ তৈল থাকে। দুই বৎসরে চাউলের একার্দ্ধ তৈল নষ্ট হয়। ধনী লোক কখনও প্রথম বৎসরের চাউল আহার করেন না। ইহাকে নূতন চাউল বলে। যাহাদের অবস্থায় কুলায় না, তাহারা আষাঢ় মাস হইতে নূতন চাউল গ্রহণ করিতে পারেন। সাধারণ লোক বোরো, আউশ, মোটা সকল রকম চাউলই গ্রহণ করিয়া থাকে। সিদ্ধ করা ধান হইতে যে চাউল প্রস্তুত হয়, তাহাকে সিদ্ধ চাউল বা উষ্ণ চাউল বলে। পুরাতন ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করিবার সময়ে সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ধান প্রায় ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। বঙ্গদেশে উষ্ণ চাউলেরই অধিক প্রচলন। ভাত প্রস্তুত করিতে মাড়ের সহিত এই চাউল হইতে অধিক কিছু মূল্যবান পদার্থ চলিয়া যায় না।

সিদ্ধ না করিয়া যে চাউল প্রস্তুত হয়, তাহাকে আতপ বলে। পুরাতন ধানের আতপ চাউল করিতে হইলে, ধান প্রায় ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। আতপ চাউলের মাড়ের সহিত অনেক পদার্থ চলিয়া যায়। সুগন্ধি ধান্যদ্বারা সাধারণতঃ আতপ চাউল প্রস্তুত হয়। পুরাতন আতপ চাউল পোলাউর জন্য উত্তম। সিদ্ধ করিলে ইহার সুগন্ধ নষ্ট হয়। অধিক সিদ্ধ চাউলের ভাত শক্ত হয়। এবং চাউলের ও ভাতের বর্ণ মলিন হয়। অধিক সিদ্ধ করিলে অর্থাৎ সিদ্ধ করাতে যখন ধান ফাটিয়া যায়—চাউলের ওজন বৃদ্ধি হয় ও ইহা কুটিবার সময়ে ভাঙ্গে না। এইজন্য ব্যবসাই লোক অধিক সিদ্ধ করিয়া চাউল প্রস্তুত করে। সিদ্ধ করিবার সময়ে যখন পাত্রের উপর ভাবনার বাষ্প উঠে, তখন বুঝিতে হইবে যে, সিদ্ধ ঠিক হইয়াছে। এইরূপ সিদ্ধ চাউলের বর্ণ উজ্জ্বল হয়। বাখরগঞ্জের লোক নূতন ধান গরম জলে কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া চাউল প্রস্তুত করে। বঙ্গদেশে বিধবাদিগের খাদ্যের জন্য এবং ঠাকুর পূজার জন্যই প্রধানতঃ আতপ চাউলের ব্যবহার। আতপ চাউলের কীটের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা কঠিন।

চাউল ছাঁটার মাত্রা অনুসারেও মূল্যের তারতম্য হয়। অধিক ছাঁটা চাউলের মুল্য অধিক। কিন্তু অধিক ছাঁটা চাউলের অধিকাংশ তৈলাক্ত পদার্থ ও লবণ এবং কতক নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ কুঁড়ার সহিত চলিয়া যায়। ইহাতে চাউলের মূল্য হ্রাস হওয়া যুক্তিযুক্ত, কিন্তু অধিক ছাঁটায় চাউল এবং তাহার ভাত অতি উজ্জ্বল হয়, এই জন্যই এই চাউল অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। ছাঁটা চাউল সতরঞ্চি কিম্বা থলিয়ার উপর রাখিয়া ঘসিয়া পালিস করিয়া লইলে ইহার ভাত ফাটে না, ইহাকে মাজা চাউল বলে।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে সাধারণতঃ মোটা ধানের এবং অধিক সারযুক্ত উর্ব্বরা ভূমির ধানের চাউল অধিক সারবান, সুতরাং উচ্চভূমির ধান খাদ্যগুণে

শ্রেষ্ঠ। পুষ্টিকারিতায় চাউল অন্যান্য প্রধান খাদ্য অপেক্ষা হীন, ইহাতে প্রোটিড্ ও ভস্মের ভাগ অতি অল্প। এইজন্য ভাতের সহিত প্রচুর মৎস্য, মাংস গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। কেবল ভাত আহার না করিয়া এক বেলা রুটীর ব্যবস্থা করিলে শরীর বলিষ্ঠ হইবে।

চাউল দুই তিন ঘণ্টা ভিজাইয়া যাঁতায় পিষিয়া বা ঢেঁকিতে কুটিয়া আটা প্রস্তুত করা যায়। চাউলের আটায় উত্তম চাপাটি ও পিষ্টকাদি প্রস্তুত হয়। ধান্য হইতে সুখাদ্য চিঁড়া, মুড়ি ও খৈ প্রস্তুত হয়। কিন্তু ইহাদের সহিত তুঁষ থাকিলে এই সব খাদ্য অপকারী হয়।

কলিকাতায় চাউল সাধারণতঃ নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হয়, যথা—

(১) বালাম, (২) পেগু, (৩) ষোলই (৪) দেশী, (৫) রাঢ়ী, (৬) উত্তরা, (৭) মুগী, (৮) কাজলা, (৯) রেঙ্গুন।

বাখরগঞ্জের চাউলকে বালাম বলে। বালামের দানা শাদা, লম্বা, উজ্জ্বল, পরিষ্কার ও হাল্কা। ইহার ভাত ফাটে না ; দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাতে বালি কিম্বা কাঁকর থাকে না। বাখরগঞ্জের মোটা শাদা চাউলকে পেগু বলে এবং তথাকার শাদা আউসের নাম ষোলই। ষোলই মোটা ও ছোট, পেটে উজ্জ্বল দাগ আছে। ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, মেদিনীপুর, হাবড়া ও হুগলী জেলার শাদা চাউল সাধারণতঃ দেশী নামে অভিহিত। এই চাউল লম্বা, শাদা, উজ্জ্বল, পরিষ্কার ও ভারী। ২৪ পরগণার মাজা বাঁকতুলসী ও পাটনাই চাউল বিখ্যাত। এই চাউলে উৎকৃষ্ট ভাত ও পোলাউ প্রস্তুত হয়। পাটনা ধান্যের আতপ চাউলকে হুরা চাউল বলে, ইহারই নাম টেবল্ রাইস্। বাঁকতুলসী ধান্যের না-মাজা চাউল কোরা বাঁকতুলসী নামে কথিত হয়। দেশীর মধ্যে সিলেট চাউলও বিখ্যাত, ইহা মোটা চেপটা ও খর্ব্বাকৃতি।

বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়ার চাউলকে রাঢ়ী চাউল বলে। বিহারের চাউল এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। তথাকার কাটারীভোগ, সমুদ্রবালী, বাঁশমতি বিখ্যাত। এই চাউলে অনেক কাঁকর থাকে। এই অঞ্চলের বাদসাভোগ দাদখানি, রাঁধুনীপাগল চাউল বিখ্যাত।

রাজসাহী ডিভিসনের চাউলকে উত্তরা চাউল বলে। দিনাজপুরের চন্দনচূড়, কাটারীভোগ ও দাদখানি চাউল বিখ্যাত। দাদখানি ও কাটারিভোগ অতিশয় লঘুপাচ্য বলিয়া বিখ্যাত। এই চাউলে তৈলের ভাগ কম থাকাতেই এত লঘু। কিন্তু দাদখানি চাউলে মেদকারি গুণে বড়ই হীন। এই অঞ্চলের মোটা চাউলকে মুগী বলে।

বঙ্গদেশের লাল চাউলকে কাজলা বলে। এই চাউলের ভাত দেখিতে সুদৃশ্য নয়। এই জন্য অবস্থাপন্ন লোকেরা ইহা গ্রহণ করেন না। ভাতপাশা, খৈয়ামুগরী, দলকচুয়া প্রভৃতি কোন কোন কাজলা চাউল হাল্‌কা ও ইহাদের ভাত সুখাদ্য।

বর্ম্মার চাউল রেঙ্গুন নামে পরিচিত। ইহা আতপ চাউল। ইহার দানা বেটে ও ক্ষুদ্র। কলে ছাটা হয় বলিয়াই ইহাতে অনেক খুদ থাকে।

তৈলে পক্ক জালায় বা কুঁড়ার সহিত চাউল রাখিলে ইহাতে পোকা লাগে না।

চাউল রন্ধন-প্রণালী

প্রায় ১৫ মিনিট চাউল ধুইয়া রাখিবে। জল ফুটিলে উহাতে চাউল ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে কিঞ্চিৎ লবণ দিলে ভাল হয়। তৎপরে ১০।১২ মিনিটের মধ্যে আতপ চাউলের অন্ন প্রস্তুত হয়। সিদ্ধ নূতন চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিতে ১৫।১৬ মিনিট প্রয়োজন হয়। পুরাতন চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিতে অর্দ্ধঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হইতে পারে। কয়লার জ্বালে জল ফুটিতে ১০।১২ মিনিট লাগে। সুসিদ্ধ ভাত টিপিলে ইহা মিলিয়া যায়। ভাত অধিক সিদ্ধ হইলে ভাত গায়ে গায়ে লাগে ও তাহা সুস্বাদু হয় না। রন্ধন করিয়া ভাতের মাড় ফেলিয়া দিলে ইহার সহিত শ্বেতসার ও প্রোটিডের শতকরা প্রায় ৭ ভাগ ও তৈলের অর্দ্ধভাগ বিনষ্ট হয়। অন্ন ঘৃতে পক্ক অর্থাৎ এক সের চাউলে অর্দ্ধপোয়া ঘৃতযুক্ত অন্ন অধিক গুরু পথ্য নয়। কিন্তু অধিক ঘৃতযুক্ত পোলাউ গুরুপথ্য।

চাউলে ও দাইলে রন্ধন করিলে খিচুড়ি প্রস্তুত হয়। খিচুড়ি অতিশয় গুরুপথ্য। অর্দ্ধ চাউল ও অর্দ্ধ দাইলের খিচুড়ি খুব সুস্বাদু হয়, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এইরূপ গুরুপথ্য খাদ্য ব্যবস্থা করা যায় না। সুস্থ ব্যক্তিরা কোন কোন সময়ে এক সের চাউলে এক পোয়া দাইলের খিচুড়ি গ্রহণ করিতে পারে। আতপ চাউলের খুদ শর্করা সংযোগে দুগ্ধে পাক করিলে অতি সুস্বাদু পায়স প্রস্তুত হয়।

ভাত তিন ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া লইলে ইহাকে ভাতের মণ্ড বলে। ভাতের মণ্ড রোগীর পথ্য। ফুটন্ত জলে খৈ ভিজাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ছাকিলে খৈয়ের মণ্ড প্রস্তুত হয়। ভাতের মণ্ড ও খৈয়ের মণ্ড বার্লির মত রোগীর পথ্য স্বরূপ, ঐ মণ্ড কবিরাজগণ রোগীকে ব্যবহার করিতে বলেন।

চাউলখরিদে সতর্কতা

চাউল খরিদ করিবার সময় দেখা আবশ্যক যে—

(১) চাউল নূতন কি পুরাতন।

(২) কাঁকর কিম্বা বালি মিশ্রিত কি না, (রাঢ়ী চাউলে সাধারণতঃ কাঁকর ও বালি থাকে। চালনি দ্বারা চালিয়া কাঁকর ও বালি বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে।)

(৩) দানা ভাঙ্গা কি না।

(৪) ছাঁটা কিরূপ, (ধান আছে কি না।)

(৫) পোকা ধরা কি না।

(৬) দানা সাদা কিম্বা লাল।

(৭) দানা সরু কিম্বা মোটা, অথবা কিম্বা বেঁটে।

নিম্নস্থ তালিকায় কতিপয় বিখ্যাত চাউলের রাসায়নিক খাদ্য গুণ প্রদত্ত হইল।

এই পরীক্ষা শ্রীযুক্ত হুপার সাহেবের তত্ত্বাবধানে তাঁহার সহকারী শিবপুর কলেজের কৃষি পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছিল :—

এই তালিকা হইতে জানা যাইবে যে বোম্বায়ের কমোদ চাউলে প্রোটিড্ ও তৈলের উপাদানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আউস ও মোটা চাউলে সাধারণতঃ প্রোটিডের ভাগ অধিক। ময়মনসিংহের বাঁকতুলসী, ২৪ পরগণার বাঁকতুলসী অপেক্ষা অধিক প্রোটিড ধারণ করে। সেইরূপ ভাগলপুরের কাটারিভোগ দিনাজপুর ও রাজসাহীর কাটারিভোগ অপেক্ষা খাদ্য গুণে শ্রেষ্ঠ। দাদখানি ও বাঁকতুলসী চাউলের তৈলভাগ অতিশয় কম, এই জন্য রোগীর পথ্য বিচারে ইহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কতিপয় বিখ্যাত চাউলের খাদ্য গুণ

নাম	জল	শ্বেতসার ও শর্করা	তৈল	সূত্র	প্রোটিড্	ভস্ম
উড়ি ধানের চাউল, ঢাকা	৮˙৭	৭৭˙৫	২˙৮	১˙১	৮˙৪	১˙৫
ঐ ,, বর্দ্ধমান	৮˙৬	৭৮˙৭	২˙২	১˙০	৮˙০	১˙৩
আউস (লাল) ধুবরি	১০˙১২	৭৯˙৮	˙৪	˙৪	৮˙০	১˙০
ঐ (সাদা) চাঁদপুর	,,	৭৯˙৪	˙৫	˙৭	৮˙২	০˙৮
আমন (লাল) ঐ	,,	৮০˙০	˙২	˙৭	৬˙৮	১˙২
ঘুন্সি—মোটা আমন, খুলনা	,,	৭৭˙৬	˙৭	˙৬	৮˙৯	০˙৭
নাগ্রা ঐ বর্দ্ধমান	,,	৭৮˙০	১˙২	˙৮	৭˙৫	১˙১
ঐ ঐ ঐ(আতপ)	,,	৭৯˙০	˙৪	˙৪	৭˙৮	০˙৫
রূপসাল—২৪ পরগণা	,,	৮০˙৫	˙২	˙৬	৬˙৯	˙০৬
বালাম	,,	৭৯˙৩	˙৩	˙২	৮˙৫	০˙৮
পাটনা—২৪ পরগণা ১ বৎসর	,,	৭৯˙১	˙৫	˙২	৭˙১	০˙৭
ঐ ২ বৎসর	,,	৭৯˙০	˙২	˙২	৭˙৬	০˙৫
বাঁকতুলসী—২৪ পরগণা	,,	৮০˙৫	˙১	˙৩	৭˙৪	০˙৬
ঐ ময়মনসিং	,,	৮০˙২	˙১	˙৪	৮˙২	০˙৫
কাটারিভোগ ভাগলপুর	,,	৭৮˙৯	˙২	˙৩	৭˙৩	০˙৭
ঐ দিনাজপুর	,,	৭৯˙১	˙৩	˙৪	৬˙৬	০˙৮
ঐ রাজসাহী	,,	৮১˙১	˙২	˙২	৬˙৫	০˙৪
কালজিরা (আতপ)	,,	৭৯˙৫	˙৩	˙৬	৮˙৩	০˙৭
দাদখানি—দিনাজপুর	,,	৮১˙৭	˙১	˙৪	৫˙৭	০˙৯
সোণামুখি (সুগন্ধী) চট্টগ্রাম	,,	৭৮˙৩	˙৯	˙৪	৮˙৫	০˙৯
বোকা বা কমোল—তেজপুর *	,,	৭৭˙৬	˙৮	˙৮	৭˙০	১˙৪
কর্পূরকান্ত—কটক	,,	৮১˙১	˙৩	˙৫	৭˙৩	১˙৩
কমোদ—বোম্বাই	,,	৭০˙৫	৩˙০	˙৮	৯˙৭	১˙৭

* এই চাউল কিয়ৎক্ষণ তপ্ত জলে রাখিলে বিনা রন্ধনে ভাত প্রস্তুত হয়।

আমরা 'কৃষকে' ধান সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছি কিন্তু চাউল সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা জানিতে চান। আমরা এই সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারনা না করিয়া খাদ্যতত্ত্ব হইতে এই বিষয়টি সন্নিবেশিত করিতেছি। ইহা যে অতিশয় সারগর্ভ তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে। সারগর্ভ বিষয় সন্নিবেশ হেতু খাদ্য তত্ত্ব পুস্তক খানি খাদ্য সমস্যার দিনে অমূল্য গ্রন্থ। কৃঃসঃ

সংবাদ।

দেশব্যাপী হাহাকারের কারণ—এই দেশব্যাপী হাহাকার ও শোচনীয় অবস্থার কারণ কেবল অজন্মা হাজা শুখা নয়. এর কারণ—

"দেখ, পড়, আর চেয়ে থাক।"—জুলাই মাসের রপ্তানির হিসাব। ভারতবর্ষ হইতে একমাত্র জুলাই মাসে নিম্নলিখিত দেশসমূহে কি পরিমাণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

১।	ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে	২০৭৪ মণ
২।	তুরস্ক	১৪৪০৪৬
৩।	এডেন প্রভৃতি দেশে	৫৭২৭
৪।	আরব	১৭১০২৭৬
৫।	বেহেরিণ	২৮০২০৬
৬।	পারস্য	৩৫৫৮০৬
৭।	লঙ্কাদ্বীপ	৯৯৫১২২৭
৮।	ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট	২৯০৫৯০২
৯।	জাভা	২০৫২
১০।	চীন	৬৩৭২
১১।	জাপান	৬৪৭৪৩৩
১২।	মিশর	৫৪০
১৩।	ন্যাটাল	৬৪৮৪
১৪।	পর্ত্তুগীজ পূর্ব্বআফ্রিকা	৭৩২৫১
১৫।	মরীসস	১২২০৪
১৬।	জার্ম্মন পূর্ব্ব আফ্রিকা	৩৬১৩
১৭।	পূর্ব্ব আফ্রিকা	৫১০৫৭
২৮।	অন্যান্য আফ্রিকা বন্দর	৬৪২৮৫
১৯।	অন্যান্য দেশ	৬৭৫০০

বিদেশে মাল গেলে টাকা পাইল মহাজন—সে মহাজনও ভারতীয় নহে—রেলি, গ্রেহাম প্রভৃতি। কাজেই ঐ অর্থে আমাদের দেশের কোনও উপকার হয় নাই—প্রমাণ, যাহারা গৃহস্থ হইতে চাউল সস্তায় কিনিয়া বহুলাভে বিদেশে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহারা দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে একটি পয়সাও দান করেন নাই। চাউলের যে কথা পাটেরও সেই কথা। ইংলণ্ড ক্রমে অবাধ বাণিজ্য নীতি ত্যাগ করিয়াছেন। বিদেশী আম্‌দানীর উপর টেক্স ধার্য্য করিতেছেন। আমরা অবাধ ধ্বংসের পথে।—বরিশাল হিতৈষী।

ঢাকা কৃষিক্ষেত্রে পঞ্চায়ত সম্মিলনী

১৯১৯

১৯১৯ ইংরেজীর ২০শে আগষ্ট তারিখে ঢাকা সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে পঞ্চায়ত সম্মিলনীর বাৎসরিক অধিবেশন হয়। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীগণের বাৎসরিক সম্মিলনের একই তারিখে উক্ত অধিবেশনের দিন নির্দ্ধারিত হয়। উক্ত সম্মিলনীতে প্রায় ৫০০ শত পঞ্চায়ত সভ্য আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কৃষিক্ষেত্রের সকল প্রকার দ্রষ্টব্য বিষয় প্রদর্শন করা হয়।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর, ঢাকার বর্ত্তমান কালেক্টর, মিঃ এচ, জি, হার্ট, আই, সি, এস্, ও কৃষি-বিভাগের বর্ত্তমান ডিরেক্টর মিঃ মিলিগান সাহেবের পরামর্শানুযায়ী ১৯১৭ ইংরেজীতে ঢাকা কৃষিক্ষেত্রে পঞ্চায়ত-সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনের কৃতকার্য্যতা সকলেই এতদূর উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, পঞ্চায়তগণের অনুরোধে এই অধিবেশন তখন হইতেই বরাবর চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক অধিবেশনেই বঙ্গের লাট বাহাদুর কৃপা বিতরণে যোগ দিয়া আসিতেছেন।

এই বৎসর পঞ্চায়ত-সভ্যগণ ও আমন্ত্রিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কৃষিক্ষেত্রে বেলা ১১টার সময় উপস্থিত হইলে পর, কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর সাহেব, ডিপুটি ডিরেক্টর, উদ্ভিদ-তত্ত্ববিৎ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। কৃষি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বঙ্গীয় লাট-সভার মাননীয় সদস্য বাহাদুর দর্শকবৃন্দের সহিত আগমন করিয়া, তাঁহাদের সহিত কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করেন। উপস্থিত প্রত্যেক সভ্যগণকেই ঢাকা কৃষিক্ষেত্রের নক্সা, পরীক্ষা-ক্ষেত্রের অবস্থান ও পরীক্ষিত বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত একখানি পুস্তিকা দেওয়া হয়। বাঙ্গালা ভাষায় কৃষি-শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে নূতন কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ইহার বিবরণ সম্বলিত এক পুস্তিকা ও "কচুরীর অনিষ্টকারিতা ও ইহা বিনাশের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে একখানা পুস্তিকা তাঁহাদিগের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল।

ঢাকা সরকারী কৃষিক্ষেত্রের জমির পরিমাণ ৩৫০ একর হইবে এবং ইহার অধিকাংশ জমিই বঙ্গদেশের কৃষির উন্নতি সাধন কি প্রণালীতে করা যাইতে পারে, সেই তথ্য অনুসন্ধানে নিয়োজিত করা হইয়াছে। জমি ও ফসলের উন্নতি বিধায়ক গবেষণাও এই পরীক্ষা কার্য্যের অন্তর্গত। কিন্তু এরূপ গবেষণার ফল সময় সাপেক্ষ এবং এই অনুসন্ধানে যাহারা নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের ধৈর্য্য ও সত্যানুবর্ত্তিতার উপরই কার্য্যের সফলতা নির্ভর করে। সুতরাং সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, ঢাকা কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য

এইরূপ একটী সুবিস্তৃত ক্ষেত্র পুঙ্খানুরূপে পরিদর্শন করা পঞ্চায়ত-সভ্যগণের পক্ষে এত স্বল্প সময়ের ভিতর সম্ভবপর নয়, এই জন্য কয়েকটী স্থূল বিষয় তাঁহাদের দেখান হয়। উদ্ভিদতত্ত্ববিদের কার্য্যের মধ্যে আমন-ধান্য, বোরো-ধান্য ও আশু-ধান্য নির্ব্বাচনের প্রণালী কতক দেখান হইয়াছিল। এই শত শত ক্ষুদ্র ক্ষেত্রগুলির প্রত্যেকটীতেই কিরূপ ঐকান্তিক মনোযোগ প্রদর্শন ও ব্যষ্টিভাবে যত্ন লইতে হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, শ্রীযুত হেক্টার সাহেব কি পরিমাণ বৃহৎ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ইঁহার নির্ব্বাচিত ইন্দ্রশাইল-ধান্য নানা জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ২০ লক্ষ একর জমিতে বপন করা হইয়াছে, স্থানীয় ধান্য অপেক্ষা ইহার ফলন অনেক বেশী। বর্ত্তমানে যেরূপ অকাল পড়িয়াছে, তাহাতে ইঁহার উক্ত কার্য্যের উপকারিতা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

অভ্যাগত ভদ্রমহোদয়গণ তৎপর তন্তুবিদের (Fibre Expert) পরীক্ষা কার্য্য প্রদর্শন করেন। ইহাও ধান্য তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্যের অনুরূপ। উক্ত গবেষণার ফলে ৭নং কাকিয়া বোম্বাই পাট নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান বৎসর ১,০০,০০০ এক লক্ষ একর জমিতে ইহার চাষ হইয়াছে। ইঁহারা ইক্ষুক্ষেত্রও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বঙ্গদেশীয় ও ভারতবর্ষীয় নয়—সমস্ত পৃথিবীতে উৎপন্ন বিভিন্ন জাতীয় ইক্ষু—জাভা, মরিসাস্, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানা জাতীয় ইক্ষু এই ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে যে, এই বঙ্গদেশে কোন্ কোন্ জাতীয় ইক্ষুর চাষ প্রচলিত করা যাইতে পারে। ধান্য ও পাটের বীজের ন্যায় ইক্ষুবীজও কৃষকেরা এত অধিক পরিমাণই চাহিয়া থাকে যে, বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ তাহাদের অভাব পূরণ করিতে অসমর্থ। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট জেলায় জেলায় ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন; তদ্দ্বারা এই প্রকার অভাব দূরীভূত করিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

তৎপর দর্শকবৃন্দ নূতন কৃষি-বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এই প্রদেশে এইরূপ বিদ্যালয় এইবারই প্রথম পরীক্ষাস্বরূপ স্থাপিত হইতেছে। ভবিষ্যত জীবনে যাহাতে কৃষক-সন্তানগণ আপন আপন পৈতৃক ব্যবসা পরিচালনে বিদ্যালয়ের পারদর্শিতা কার্য্যকরী হইতে পারে, এইরূপ প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদিগকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক বালককে এক একটী ছোট পরীক্ষা-ক্ষেত্র দেওয়া হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে তাহারা স্থানীয় ফসলের সহিত কৃষি-বিভাগের উদ্ভাবিত ফসলের ফলন তুলনা করিবে। ঢাকা প্রভৃতি যে সকল অঞ্চলের মৃত্তিকা লালবর্ণ—সেই সকল মৃত্তিকাতে প্রয়োগের জন্য যে সকল সার কৃষি-বিভাগ অনুমোদন করিয়াছেন, তাহার গুণাগুণও পরীক্ষা করিবে। কারখানাতেও তাহাদিগকে কিছুকালের জন্য কৃষিযন্ত্রাদি তৈয়ার ও মেরামত কার্য্যাদি শিক্ষা করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ে তাহাদিগকে চলিত ভাষায় লেখাপড়া, হিসাব নিকাশ রাখা ও জমি-পরিমাপ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রকৃতি অনুশীলন প্রভৃতি বিষয়ে ও সাধারণ পাঠ দেওয়া যাইবে। বস্তুতঃ এই প্রকার বিষয় সকল শিক্ষা দেওয়া হইবে—যাহাতে তাহারা নিজের অবস্থাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া স্বীয় পৈতৃক জমিতে কৃষির প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয়।

কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করিবার পর, পঞ্চায়ত-সভ্যগণকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করান হয়। তৎপর সকলে বৈকালের সম্মিলনের অপেক্ষায় কৃষিক্ষেত্রের গো-শালার সন্নিকট খোলা গোদাম ঘরে উপস্থিত হন। বৈকালের অধিবেশন ১টা—৪৫ মিনিটের সময় আরম্ভ হয়। কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর সাহেব, ডিপটী ডিরেক্টরগণের সহিত কৃষি-বিষয়ক নানা বিষয় আলোচনা করেন। তৎপর কালেক্টর সাহেবের সভাপতিত্বে স্থানীয় অনেকানেক আবশ্যকীয় বিষয় আলোচিত হয়।

৫টা—১৫ মিনিটের সময় বঙ্গের লাটসাহেব বাহাদুর আগমন করতঃ বক্তৃতা করেন। তিনি সভ্যগণের গত বৎসরের কার্য্যে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করেন এবং যাহাতে তাঁহাদের সমিতির আরো উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, তৎসম্পার্কে পন্থা নির্দ্দেশ করেন।

বক্তৃতা শেষ হইলে পর লাটসাহেব বাহাদুর—যে সকল ভদ্রলোক বঙ্গীয় সেনাদলের (Bengal Regiment) জন্য সৈন্য সংগ্রহ কার্য্যে সহায়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে "সম্মানসূচক নিদর্শন" (Badges) উপহার দেন।

লাটসাহেব বাহাদুর চলিয়া যাইবার পর পঞ্চায়ত-সভ্যগণ ঢাকা ফার্ম্মে একটী দিন আনন্দে কাটাইয়া নানা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যান।

পত্রাদি

ছোলা মসূর ইত্যাদির পোকা *

মাঠ ফড়িঙ

বীজ হইতেই অঙ্কুর বাহির হলেই অনেক সময় মেটে ফড়িং বা মাঠফড়িঙ অঙ্কুর ও কচি কচি গাছ খাইয়া খেত উজাড় করিয়া দেয়, আবার নূতন করিয়া বীজ বুনিতে হয়। মাঠফড়িঙেয়ের কথা গমের পোকার বিবরণ দিবার সময় বলা হইয়াছে।

---

* কৃষি-জাত খন্দে যে সকল পোকার উপদ্রব হয় তাহার প্রতিকার বলিয়া দিবার জন্য আমাদিগকে অনেক পত্র লিখিতে হয়। বিভিন্ন পোকা ও তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা 'ফসলের পোকা' নামক পুস্তকে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। চাষেলিপ্ত ব্যক্তি মাত্রেরই এরূপ একখানি পুস্তক কাছে রাখা কর্ত্তব্য। আমরা তাহারই এক অধ্যায় নমুনাস্বরূপ এখানে সন্নিবেশ করিলাম। পুস্তকখানিতে বহুচিত্র দেওয়া আছে তাহাতে পোকা চিনিবার ও পোকার ব্যবহার জানিবার বিশেষ সুবিধা হয়। কৃঃসঃ—

চোরা পোকা বা কাটুই

বর্ষাকালে যে ক্ষেত জলে ডুবিয়া থাকে সেই ক্ষেতে প্রায় এই পোকার উপদ্রব বেশী দেখা যায়। এই পোকা যে ক্ষেতে লাগে সেই ক্ষেতের গাছগুলি হঠাৎ শুকাইতে দেখা যায়। কত গাছ কাটা হইয়া হেলিয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে। কাটা ও খাওয়া পাতা এখানে ওখানে পড়িয়া থাকে, কখনও কখনও গাছ বা ডাল মাটির নীচে পোতা থাকিতেও দেখা যায়। এই কাটা শুকান গাছের গোড়ায় বা যেখানে গাছ কিম্বা ডাল পোঁতা থাকে সেই স্থানের মাটী উল্টাইলে সচরাচর যে সুতলী পোকা দেখান হইয়াছে এইরকম পোকা মাটির নীচে পাওয়া যায়। ইহাকে একটু নাড়া দিলে কেন্নো বা কেন্নাইয়ের মত কুণ্ডলি হইয়া পড়িয়া থাকে। এই পোকাই এই রকমে গাছ কাটিয়া নষ্ট করে। ইহাকে চোরা পোকা বলে। ইহারা গাছের পাতা খায়; কিন্তু কেবল পাতা নষ্ট না করিয়া একেবারে গাছের পাতা কাটিয়া দেয় বলিয়া অনিষ্ট খুব বেশী হয়। পোকার পুস্তকে চিত্রপটে ৩ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে।

চোরা পোকা বর্ষার পরে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে সচরাচর দেখা যায়। ইহার সমস্ত রবি ফসলই এইরূপে নষ্ট করিতে পারে। স্ত্রী প্রজাপতি মাটির কাছের পাতা কিম্বা ডাঁটার উপর ডিম পাড়ে। ডিম ছোট ছোট পোস্তদানার মত। এক স্থানেই ৩০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়িতে দেখা যায়। একটী প্রজাপতি ৪০০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। গরমের সময় ২।৩ দিন, শীতের সময় ৭।৮ দিনের পরে ডিম ফুটিলে ছোট ছোট কীড়ারা পাতা খাইতে থাকে কিন্তু হাওয়াতে কিম্বা কোন রকমে গাছ নড়িলে হাতপা ছাড়িয়া দিয়া মাটিতে পড়িয়া যায় এবং মাটিতে পড়িয়া আছে এমন কাঁচাই হউক, বা শুষ্ক হউক পাতার নীচে লুকাইয়া থাকে। এই রকম পাতা খাইয়াই বাড়িতে থাকে। ১০।১২ দিন খাইয়া প্রায় ½ ইঞ্চি হয়। তখন ইহারা দিনের বেলা মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া লুকাইয়া থাকে ও রাত্রে বাহির হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যাহা সম্মুখে পায় তাহাই খায়। তার পর যত বড় হয় উল্লিখিত ভাবে গাছ কাটিয়া দেয়। অনেক সময়েই কাটা গাছ কাটিয়া দেয়। অনেক অনেক সময়েই কাটা গাছ গর্ত্তের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইয়া খায়। এই রকম গাছ মাটীতে পোতা বলিয়াই মনে হয়। গাছের ডাটা মাটীর নীচেও কাটে এবং মাটীর উপরেও কাটে। মাটীর নীচে কাটালে প্রায়ই গাছ খাড়া থাকে ও শুকাইয়া যায়। দিনের বেলায় বাহিরে আসিলে শালিক, কাক প্রভৃতি পক্ষীতে ধরিয়া খাইয়া ফেলে এই জন্যই বোধ হয় ইহারা মাটীর নিচে লুকাইয়া থাকে। সাধারণ পাতা খাওয়া পোকার মত ইহারা গাছের উপর চলা ফেরা করিতে পারে না। গরমের সময় প্রায় এক মাস এবং শীতের সময় প্রায় দেড় মাস প্রায় খাইয়া কীড়া সম্পূর্ণ বড় হয়। তখন প্রায় ২।০ ইঞ্চিরও বেশী লম্বা হয়, তখন মাটীর কিছু নিচে যাইয়া পুত্তিপুল হয়। স্তকের

৮ম চিত্রপটের ২ চিত্রে পুত্তলি দেখান হইয়াছে। গরমের সময় ১০।১২ দিন এবং শীতের সময় প্রায় ২০ দিন পরে পুত্তলি হইতে প্রজাপতিরূপে বাহির হয়। এ পর্য্যন্ত এই পোকাকে পোস্ত, ছোলা, তামাক, আলু, বেগুণ, কপি, মুলা, কাপাস ইত্যাদিও অনেক শাক শবজী খাইতে দেখা গিয়াছে। কীড়ারা জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে না। সেই জন্য বর্ষাকালের ফসলে দেখা যায় না। তখন জঙ্গলাদির অগাছা খাইয়া জীবিত থাকে।

প্রথমেই যখন চোরা পোকা লাগিয়াছে দেখা যায় কাটা গাছের গোড়ায় উল্‌টাইয়া কীড়াকে বাহির করিতে হয় এবং কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিতে হয়। ক্ষেত নিড়াইতে যখন মাটি উল্‌টান যায় কীড়ারা বাহির হইয়া পড়ে। কপি আলু প্রভৃতির ক্ষেত হইতে ইহাদিগকে এইরূপে বাছিয়া মারাই সহজ।

ক্ষেতে যদি জল ঢুকাইয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে কীড়ারা গর্ত্ত ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে। তখন পাখীতেও অনেক খাইয়া ফেলে এবং ছোট ছোট ছেলেরা হাতে করিয়া বাছিয়া লইতে পারে।

কিম্বা নিম্নলিখিত উপায়ে বিষ খাওয়াইয়া চোরা পোকাদিগকে মারা যায়। সেঁকো বিষ অর্দ্ধসের এবং গুড় একসের আন্দাজ ৭ সের জলে একসঙ্গে গুলিতে হয়। এই জলে ১০ সের ভুসি বেশ করিয়া মাখাইতে হয়। এই বিষাক্ত ভুসির ছোট ছোট ডেলা পাকাইয়া ৫।৬ হাত অন্তর অন্তর ক্ষেতে রাখিতে হয়। বিষাক্ত ভুসি খাইয়া পোকারা মরে। এই পরিমাণ ভুষি ৪ বিঘা জমিতে দিতে কুলায়। রবি ফসলের সময়েই কাটুই দেখা দেয়। অন্য সময় পড়া পতিতের উপর আগাছা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। যে পড়া পতিতের উপর ছোট ছোট আগাছা নাই সেখানে প্রায় কাটুয়ের কীড়া থাকে না। কারণ শক্ত মোটা ডাঁটা ওয়ালা বড় গাছ হইলে ইহারা তাহাদের ডাঁটা কাটিয়া আহার সংগ্রহ করিতে পারে না। কয়েক প্রকারের কাটুই পোকা দেখা যায়। উপরে যাহার কথা বলা হইয়াছে ইহাই অপর সকলের অপেক্ষা বেশী ক্ষতি করে।

রবি ফসল বুনিবার পূর্ব্বে যদি ক্ষেতে আগাছা ঘাস ইত্যাদি হইয়া থাকে তবে তাহাতেও কাটুই লাগিতে পারে। যদি কোন ক্ষেতে কাটুই আছে জানা যায়। তবে উহাতে ফসল লাগাইবার আগে কাটুইকে ধ্বংস করিতে হয়। ক্ষেতের সমস্ত আগাছা ঘাস ইত্যাদি উঠাইয়া ফেলিয়া দিয়া উপরি উক্ত উপায়ে ২।৩ দিন সেকো বিষ প্রয়োগ করিতে হয়। অন্য খাবার না পাইয়া সকলেই বিষ খাইয়া মরিয়া যাইবে। ভুসির বদলে কোন রকম ছোট ও নরম পাতা ওয়ালা গাছের ছোট ছোট ডাল পাতা সমেত সেকো বিষের জলে ডুবাইয়া দিতে পারা যায়।

কাতরী পোকা

পাটে যে কাতরী পোকা লাগে তাহারা ফুল ধরিবার সময় মহুর ও খেসারী আক্রমণ

করে। বেশী হইলে সমস্ত ফুল খাইয়া পাতাও খাইতে আরম্ভ করে। ছোলাতে প্রায় ইহাদিগকে দেখা যায় না। ইহাদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তা ছাড়া ফুল ধরিবার ৮।১০ দিন আগে হইতে রোজ রোজ ক্ষেতের মাঝে মাঝে আগুন জ্বালাইতে পারিলে অধিকাংশ প্রজাপতি আগুনে আসিয়া পুড়িয়া মরিবে। শীতকালে ক্ষেতের কাছে আগুন পোয়াইলে মন্দ হয় না। দুই কাজই হয়।

লেদা পোকা

ছোলার শুঁটী হইলে পোকা শুঁটীর ভিতর মুখ ঢুকাইয়া ভিতরের দানা খাইয়া দেয়। ইহা মটর, খেসারী ও অড়হরের শুঁটীও এইরূপে খায়। ইহাকে লেদা পোকা বলে। চিত্রপটের ৫ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে। অন্যান্য নিশাচর প্রজাপতির ন্যায় এই প্রজাপতি রাত্রে পাতার ও ফুলের এবং শুঁটীর উপর ২।১টা করিয়া প্রায় ৩০০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। ৩।৪ দিনের ভিতরে ডিম ফুটিলে ছোট কীড়ারা কচি কচি পাতা ও ফুল খায় কিম্বা কচি শুঁটীর ভিতর ঢুকিয়া দানা খায়। বড় হইলে কেবল শুঁটীর ভিতরের দানা খায়। একটা পোকাতেই অনেক ছোলা নষ্ট করে। ২৫।৩০ দিন খাইয়া মাটীর ভিতর যাইয়া পুত্তলি হয়। আবার ১০।১২ দিন পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়।

ক্ষেতের ভিতর নজর রাখিয়া যাইতে যাইতে লেদা পোকা বেশ দেখা যায়; ইহাদিগকে ধরিয়া মারাই সহজ। অনেক সময় ছোলা গম তিসি প্রভৃতি প্রায় এক সঙ্গে রোয়া হয়। ছোলা গাছ দূরে দূরে থাকে। লেদা পোকা এক গাছের কাছেই অন্য গাছ পায় না। ইহাতে ক্ষতি কম হয়। আর অনেক গাছের মাঝে থাকে বলিয়া প্রজাপতিও খুঁজিয়া খুঁজিয়া সব গাছে ডিম পাড়িবার সুবিধা পায় না।

শুঁটির পোকা

লেদা পোকা একটু বড় হইলে আর শুঁটীর ভিতর না ঢুকিয়া কেবল মুখ ঢুকাইয়া দিয়াই বীজ খায়। ৮ম চিত্রপটের ৭ ও ৮ চিত্রে যে দুই রকমের প্রজাপতি দেখান হইয়াছে ইহাদের কীড়ারা লেদা পোকা অপেক্ষা ছোট ছোট সুতুলী পোকা। ৮ চিত্রের প্রজাপতির কীড়া মুগ, বরবটী ও মটরের শুটীর ভিতর ঢুকিয়া যায় ও ভিতরে থাকিয়া সমস্ত বীজ খাইয়া ফেলে। যে শুঁটীতে পোকা ঢুকিয়াছে তাহার উপর একটা ছিদ্র দেখা যায় এবং এই ছিদ্র হইতে কতকটা পোকার বিষ্ঠা বাহির হইয়া শুঁটীর উপরেই লাগিয়া থাকে। কীড়া বড় হইয়া শুঁটীর ভিতরেই পুত্তলি হয়। প্রজাপতি দিনের বেলা ক্ষেতের মধ্যে উড়িয়া বেড়ায় এবং ক্ষেতে যাইলেই নজরে পড়ে। হাতজালে প্রজাপতি ধরিয়া মারা এবং যে শুঁটীতে কীড়া ঢুকিয়াছে সেই সমস্ত শুটি তুলিয়া পুড়াইয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারা যায় না।

তেওড়া বা খেসারী কলাইয়ের পোকা সকলেই দেখিয়া থাকিবে। ৮ম চিত্রপটের ৭ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে এবং ৬ চিত্রে কি রকম করিয়া পোকা শুটীর ভিতর থাকে ও বীজ খায় দেখান হইয়াছে। প্রজাপতি দিনের বেলা প্রায় বাহির হয় না। রাত্রিতে শুটীর উপর ডিম পাড়ে। ডিম হইতে ফুটিয়াই কীড়ারা শুটীর ভিতর ঢুকিয়া যায়। কীড়ারা তখন এত ছোট এবং যে ছিদ্র করিয়া ঢোকে তাহা এত সরু যে ছিদ্র নজরে পড়ে না। আর কিছুদিন পরেই ছিদ্র বুজিয়া যায়। সেই জন্যই মনে হয় শুটীর ভিতর পোকা কোথা হইতে আসিল। পোকা বড় হইয়া শুটীর ভিতরেই পুত্তলি হয় এবং পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। এই পোকা মটর শুটী এবং শণের শুটীরও ভিতর ঢুকিয়া বীজ খায়।

তেওড়ার ফুল হইবার পর হইতে মধ্যে মধ্যে ক্ষেতে আগুন জালিলে অনেক প্রজাপতি পুড়িয়া মরে। ইহা ছাড়া অপর উপায় প্রায় কিছুই নাই।

পাতার পোকা

৮ম চিত্রপটের ৯ চিত্রে পীঠে সাদা ডোরা কাটা, সবুজ রঙের, মাথার দিকে সরু যে কীড়া রহিয়াছে ইহারা মটর, খেসারীর পাতা, শালগম ও কপির পাতা, তিসির পাতা প্রভৃতি অনেক গাছের পাতা খায়। এক এক সময় ইহাদের সংখ্যা বড় বেশী হয় এবং পাতা খাইয়া অনিষ্ট করে। ইহাদের প্রজাপতি দুই রকমের হয়। এই চিত্রপটের ১০ ও ১১ চিত্রে দেখান হইয়াছে। প্রজাপতিরা সন্ধ্যার পর বাহির হয় এবং পাতার উপর এখানে ওখানে ডিম পাড়িয়া বেড়ায়। এক একটি প্রজাপতি ৪০০।৫০০ ডিম পাড়ে। শীতের সময় ৮ দিন ও গরমের সময় ৩ দিন পরে ডিম ফোটে। কীড়া কেবল পাতা খায় এবং শীতের সময় ৩০ দিনে ও গরমের সময় ২০।২১ দিনে বড় হইয়া মুখের লালার দ্বারা পাতা জড়াইয়া এই পাতার মধ্যে পুত্তলি হয়। তার পর শীতের সময় ১৬ দিন ও গরমের সময় ৮ দিন পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়।

গাছ হইতে হাতে করিয়া বাছিয়া মারা ছাড়া আর অপর উপায় নাই।

ডাঁটার পোকা

কখনও কখনও মটর গাছ, বিশেষতঃ ছোঠবেলায়, একবারে শুকাইয়া যাইতে দেখা যায়। এক রকম ছোঠ মাছির কৃমি মাটির কাছে কিম্বা মাটির একটু নীচে ডাঠার ভিতর ফুকর কাটিয়া খায় বলিয়া গাছ শুকাইয়া যায়। এই মাছি ধরিলে প্রায় কিছুই করিতে পারা যায় না। গাছের গোড়ায় বেশী করিয়া মাটি দিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে আবার গাছ তেজ করিয়া উঠে এবং

গুটিও হয়। এই মাছিরা কেবল একবার মাত্র মঠর আক্রমণ করে। মঠর হইতে বাহির হইয়া আর মঠরে লাগে না; অতএব শুকান বা অর্দ্ধ শুকান গাছ উঠাইয়া পুড়াইলে কোন ফল নাই। শুকাইবার পূর্ব্বে গাছের পাতা হলদে হয়। যে সময়ে পাতা হলদে হইতে আরম্ভ করে, সেই সময় গাছ উঠাইয়া দেখিলে মাছির কীড়া বা পুত্তলি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আচরণ ধানের মাজরা মাছির আচরণের ন্যায়। যেখানে ইহার অত্যন্ত উপদ্রব, সেখানে আদত ফসলের পূর্ব্বে ফাঁদফসলরূপে কিছু মটর জন্মাইতে হয়। মাছি লাগিলে পাতা হলদে হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিকড় সহিত উঠাইয়া ফাদফসল পুড়াইতে হয়। তাহা হইলে আদত ফসলের ক্ষতি হয় না। আবার দেখা গিয়াছে ইহারা প্রায় ছোট মঠরের গাছ আক্রমণ করে না। বড় মটর বা কাবলী মটরের গাছ পাইলে কেবল ইহাই আক্রমণ করে।

গো-পালনে গ্রাম্য-পঞ্চায়েত—গ্রাম্য পঞ্চায়তীর পরিবর্ত্তন হইতেছে। পঞ্চায়ত গণ এক্ষণে গ্রামের রাস্তা ঘাট, জল নিকাশি পয়োনালায় সংস্কার করিবেন। পানীয় জলের ব্যবস্থা করিবেন। প্রাথমিক বিদ্যা শিক্ষার ভারও তাঁহাদের উপর থাকিবে।

আমাদের মনে হয় যে প্রজাদের সহিত এক মিলে কৃষি কর্ম্মের আয়োজন আয়োজন করাও তাঁহাদের উচিত—সেই সঙ্গে গোপালনের ব্যবস্থা থাকিবে এবং পঞ্চায়তগণ মনেকরিলে যাহাতে প্রজার বা জমিদারের খাস জমি লইয়া গো চারণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে তাহার সুযোগ থাকিবে। দশ খানা গ্রাম খুঁজিয়া এখন একটা ভাল ষাড় মিলে না। ভাল জাতের গাই পাইলেই অধিক দুধ প্রাপ্তির আশা করা যায় না। ভাল জাতীয় গাভীর মন্দ ষাড়েরর সহিত সংযোগ হইলেই তাহাদের দুধ কমিয়া যাইবে। ভাল জাতের পাটনা, ভাগলপুর মুলতান দেশের গরু যেমন দুধ দেয় তেমনি তাদের খোরাক অত্যন্ত অধিক। খোরাকের মূল্য যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে তাহাদের রিতিমত খাওয়াইয়া সস্তায় দুধ সববরাহ করা কঠিন। ভাল ষাঁড়ের যোগাড় থাকিলে দেশী গরুরও উন্নতি হইবে। পঞ্চায়তগণ তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট কৃষি-ক্ষেত্র রক্ষা করুন নতুবা মাছ, দুধ, ভাতের কষ্ট কোন কালে ঘুচিবে না।

দুগ্ধের ব্যবসা—এমেরিকাতে বড় বড় গো-শালা আছে এবং গো-শালা সংশ্রবে সুবিস্তৃত গোচরণের মাঠ আছে। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে সকল গরু চরিয়া বেড়াইতে পায় ও মাঠে প্রচুর ঘাষ খাইতে পায় তাহাদের দুধে কখন রোগ

জীবাণু তিষ্ঠিতে বা বৃদ্ধি হইতে পারে না। আমাদের দেশেও যখন গাবাদি মাঠে চরিয়া খাইতে পাইত এবং ঘরে আসিয়া দুধ দিত তখন শিশুর এত যকৃতে রোগে অকাল মৃত্যু ঘটিত না বা যক্ষাদি উৎকট রোগ এত অধিক হইত না। রৌদ্র বাতাসে চরিয়া বেড়াইতে পাইলে গবাদির পশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং ঘাসের সঙ্গে নানা প্রকার তৃণ পত্রাদি খাইতে পাইলে যে দুধ প্রদান করে সে দুধের ভেষজ গুণ নিশ্চই অধিক হয়। কেবল ভেষজ গুণ কেন স্বচ্ছন্দ আহারে দুধের ছানা মাখনের মাত্রাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

গো-শালার দোহন পাত্রাদির মলিনতা হেতু দুধ অনেক সময় বিকৃত হয়। এমেরিকায় গো-শালা সমূহে গরুর খাইবার পাত্র, জলের টব দোহন পাত্র সকলই নূতন ধরণের এবং সর্ব্বদাই ঐ সমস্ত পত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এত-দ্দেশে কলে দুধ দোহোনের ব্যবস্থা আছে তথাপিও যাহারা কল পরিচালনা করে তাহারা পরিষ্কার কাপড় পরিয়া বা হাত পা ভালরূপ ধুইয়া তবে গোশালায় প্রবেশ করিতে পায়। আমাদের দেশেও গোরুর আবাস স্থান পরিষ্কার রাখার প্রথা আছে। এখনও কেহ আকাচা কাপড়ে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হইয়া, হাত পা না ধুইয়া গোদোহন করিতে পায় না। গোদোহন পাত্রাদিও প্রত্যহ মাজিয়া ঘসিয়া পরিস্কার করা হয়। মাটির ভাড় হইলে তাহা প্রতিদিন ধুইয়া পুছিয়া পোড়াইয়া লওয়া হয়। এখন গৃহস্থেরা এই নিয়ম পালন করিলেও গোয়ালারা যাহারা দুধের ব্যবসা করে—যাহাদের গোরুর দুধ খাওয়াইয়া সহরের ছেলেপিলে মানুষ করিতে হয় তাহারা যৎপর-নাস্তি অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন। ব্যবসায়ে আপাততঃ দুপয়সা কিসে রোজগার হইবে এই তাহাদের চেষ্টা—অন্যের তাহাতে ক্ষতি হউক বা অসুবিধা হউক বা ভবিষ্যতে তাহাদের ব্যবসায়ের বিঘ্ন হউক ইহা তাহারা চাহিয়াও দেখে না। আমাদের দেশের লোক সকলেই অল্প আয়ে সংসার চালায় তাহারা সস্তায়ই সব জিনিষ চায়। গোরু পোষার খরচ ৪ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। গোরুকে খোল ভুসী খাওয়াইলে ভাল দুধ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু রীতিমত খোল ভুসী খাওয়াইবার সামর্থও অনেকের নাই। গোরু চরিয়া খাইতে পাইলে খরচের মাত্রা অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু গোরু চরিবে কোথায়! 'কৃষকে' আমরা গোপালন সম্বন্ধে অনেক আলো-চনা করিয়াছি—কিন্তু কয়জন লোক প্রকৃতপক্ষে গোশালা স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন?

কারিগরি বিদ্যালয়—মধ্য-প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের নাগপুর, জব্বলপুর, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি কারিগর বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এবং আকোলা, রাইপুর, চাঁদমেতী প্রভৃতি স্থানে আরও কতকগুলি বিদ্যালয় সংস্থাপনের আয়োজন করিতেছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে বৃত্তি দিয়া দুই বৎসর কাল সূত্রধার, কামার ও চর্ম্মকারের কার্য্য, উৎকৃষ্ট যন্ত্র ব্যবহার, ড্রয়িং এবং দ্রব্যাদি নির্ম্মাণের হিসাব শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষান্তে ছাত্রদিগকে ব্যবসায়ের যন্ত্র ইত্যাদি পুরস্কার দেওয়া হয় এবং কোন্ উপকরণ কোথায় কি দরে পাওয়া যায় এবং নির্ম্মিত দ্রব্য কোথায় বেশী দরে বিক্রয় করা যাইতে পারে, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

দেশের বর্ত্তমান জীবিকা-সমস্যার দিনে যুবকেরা যাহাতে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের উপায় শিক্ষা করিতে পারে, দেশের সকল বিদ্যালয়েই সেরূপ ব্যবস্থা হওয়া বিশেষ কল্যাণকর। বঙ্গের কোন কোন স্থলে আজকাল এতদুদ্দেশ্যে ছাত্রদিগকে কৃষি শিল্পাদির শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে, ইহা অবশ্য আশার বিষয়। বোলপুর শান্তিনিকেতনে, কলিকাতা সিটী স্কুলের সংশ্রবে, চট্টগ্রাম দুর্গাপুর ও রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে শিল্প ও কৃষিকার্য্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ সময় আমাদের মেদিনীপুর জেলার মুগবেড়্যার গঙ্গাধর হাই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষও ছাত্রগণকে সূত্রধার প্রভৃতির কার্য্য শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করিয়া অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন। এখন দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে যদি এরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়, তবে দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। সর্ব্বত্র উক্তরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করিতেছি।—নীহার

সাধনার ফল—উদ্যোগ নিষ্ঠা ও একাগ্রতাতেই মানুষ ও জাতি বড় হয়, বলবান্ হয়, সফলতাকে অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়। তার একটি দৃষ্টান্ত—

শ্রীঅধরচন্দ্র লস্কার।—যশোহর জেলার অন্তঃপাতী ঘাবামল্লিকপুর গ্রামে অধরবাবুর পৈতৃক বাসস্থান। কুড়ি বৎসর পুর্ব্বে ইনি মল্লিকপুর মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে ৫৲ টাকা মাহিনার গুরুমহাশয় ছিলেন। আজ তিনি একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ইঞ্জিনিয়ার—ইউনাইটেড ষ্টেট্সের পশ্চিমস্থ ওরিগন প্রদেশে একজন ভূস্বামী।

অধরবাবু একটা গ্রামোফোন বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে করিতে জাপান গিয়াছিলেন। জাপান হইতে যখন আমেরিকয়া যান, তখন তিনি নিঃসম্বল। কিস্তিতে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করিবার সর্ত্তে অরিগন অঞ্চলে ৩৬ বিঘা জমি গ্রহন করেন॥ জলাভাবে ঐ জমি মরুভুমির মত পতিত ছিল। অধবাবু যন্ত্রের সাহার্য্যে ভুমির ভিতর হইতে জল উঠাইয়া জমি গুলি আবাদ করিতে আরম্ভ করেন। এমন একাগ্র সাধনার পুরস্কার দিতে মা কমলা চিরদিনই মুক্তহস্ত। অল্পদিনের মধ্যেই ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিলেন। এমন কি, উদ্বৃত্ত অর্থে তখন তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠ্যাভ্যাস

করিতেও সমর্থ হইলেন। ইঞ্জিনিয়ার অধরবাবু এখন দেশে ফিরিবার ও যুবকগণকে নূতন নূতন প্রণালীতে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বাবলম্বন ও অধ্যাবসায়ের এমন জলন্ত দৃতান্ত খুবই বিরল। এমন একদিন গিয়াছে—যখন মল্লিকপুর স্কুলের ,গুরুমহাশয়' ঘাঘানিবাসী ঐ সামান্য লোকটিকে চিনিয়া রাখা কাহারও আবশ্যক বোধ হয় নাই; স্থানীয় জ্ঞানী মানী ধনী মহাশয়েরা আজ বোধ হয় ভিড় ঠেলিয়াও তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইবেন। ধন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ধন্য সাধনার বল।

চাকুরীর নেসায় উন্মত্ত হতভাগ্য বঙ্গীয় যুবকগণকে আজ যদি স্বর্ণপ্রসু বাঙ্গালার মাঠে মাঠে কৃষিবাণিজ্যের নূতন আস্বাদন দেখাইতে পার—অধ্যাবসায় ও স্বাবলম্বন শিক্ষার মুর্ত্তিমান উজ্জল চিত্র তুমি,—আজ যদি বাঙ্গালীর একটি ছেলেকেও বুঝাইতে পার যে, দশ টাদা মন চাউলের দাম হইলে এক বিঘা জমির দাম কত—তাহা হইলে তোমার ভগীরথের মত গঙ্গা আনিয়া স্বজাতি-উদ্ধার সফল হইবে।—কল্যাণীসম্পাদক্।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

পৌষ ও মাঘ।

সজীক্ষেত্র।—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভুঁইয়ে শসা, করলা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরিবে ও ফুল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া—গোময়, ছাই ও পাঁক মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগুণ দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে, ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং

ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহতভাবে লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোঁড়া মাটি গুলি কিছু দিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সার মাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটী উপরে করিয়া, খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিবে।

পুরাতন ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছাঁটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্রে।—সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এইমাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারি করিয়া রাখিবে। এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মুলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মূলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পূরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীর্ষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়েও উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। এই মাসের প্রথম ১৫ দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। মশলায় হলুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিবার কালে একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আর শুকনা হইতে হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান।—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সব ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিয়াছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদি ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে এখন এষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিঙ্কস্, ফ্লক্স, ডেজী, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমীর ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের সব্জী যথা,—[illegible]র, সালগম, লেটুস্, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলা বীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, যুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছ গুলির তদ্বির না করিয়া জলদি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।
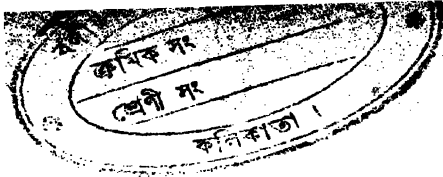
কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২০শ খণ্ড। | মাঘ, ১৩২৬ সাল। | ১০ সংখ্যা

আমাদের খাদ্যাভাব

তাহা পূরণ হইবে কিসে?

জান্তব জীবনে আমরা দেখিতে পাই যে উত্তম বীজ, উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং উপযুক্ত আহার পানীয় ব্যতীত আশানুরূপ সবল ও সুস্থকায় সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হয় না। উদ্ভিদ জীবনেও এই নিয়ম। ভাল ফল ফুল পাইতে হইলে আমাদিগকে বৃক্ষলতার উপযোগী আহার পানীয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। উদ্ভিদগণ মূলদ্বারা—শিকড় দ্বারা—আহার গ্রহণ করে। মূলদ্বারা পান করে বলিয়া তাহারা পাদপ।
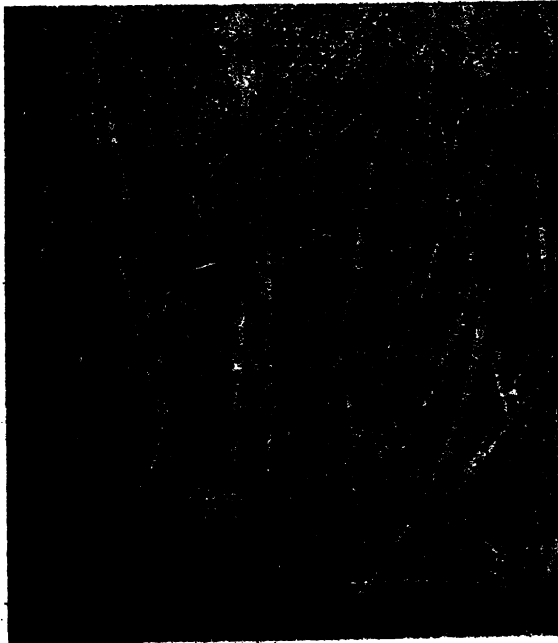
বিনা সারে আখের অবস্থা।

কোন প্রকার কঠিন দ্রব্য দ্বারা তাহারা মূল বা শিকড় সাহায্যে আত্মশরীরে টানিয়া লইতে পারে না। এই কারণে তাহাদিগের মূলে সাররূপে আহার প্রদান করিয়া জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিতে হয়। আমরা নিম্নে কতকগুলি ফল সবজীর আহারের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

কতিপয় সব্জী এবং ফলের খাদ্যগুণও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছি। এতদ্বারা আমদের উপযুক্ত আহার সংগ্রহের সুবিধা হইবে। কৃষি-রসায়ন নামক পুস্তকে উদ্ভিদের মৃত্তিকা বিচার, সার নির্ব্বাচন, বিভিন্ন সারের গুণাগুণ বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে
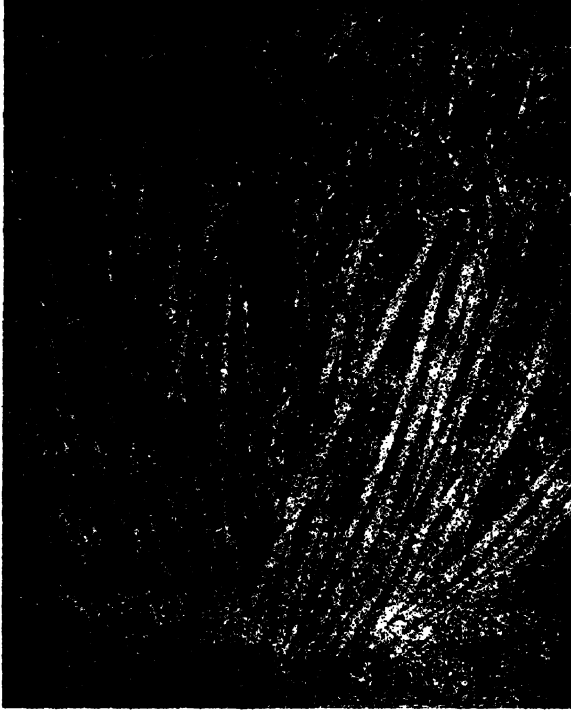
সার প্রয়োগে আখের অবস্থা।

পুস্তকখানির মূল্য ১।০ সিকা; "খাদ্যতত্ত্বে" বিবিধ খাদ্যের বিশ্লেষণ ও বিচার করা হইয়াছে খাদ্য নির্ব্বাচন প্রণালী ও রন্ধন প্রণালীরও যথোপযুক্ত বর্ণনা আছে। পুস্তকের মূল্য ১৲। উভয় পুস্তক কৃষিতত্ত্বাভিজ্ঞ, বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের বিশেষজ্ঞ শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান ভারতীয় কৃষি সমিতির অফিস্—১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ বিশেষ ফসলের সার ও মৃত্তিকা বিচার।

ধান

উপযুক্ত মৃত্তিকা—মেটেল ও দোয়াঁশ।

সার (এক একরে):—

নাইট্রোজেন * ... ... ১৫ পাউণ্ড

* ইহা গ্রহণোপযোগী নাইট্রোজেন বুঝিতে হইবে। নাইট্রোজেনযুক্ত ধাতব সারের নাইট্রোজেন ইসগ্রহণে পাপযোগী।

পটাস	... ...	৩০ পাউণ্ড
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	...	৩০ "

গম

উপযুক্ত মৃত্তিকা—মেটেল ও দোঁয়াস। মেটেল ভূমিতে শুভ্র বর্ণের দুধিয়া গম জন্মে না। এই মৃত্তিকায় দাউদি গমও লাল গমের গুণ প্রাপ্ত হয়। দাউদি গম বেলে দোয়াঁশ মৃত্তিকায় উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে।

সার (এক একরে):—

প্রথমতঃ সজী সার, পরে,

নাইট্রোজেন	... ...	১২ পাউণ্ড
পটাস	... ...	৩৬ "
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	... ...	৪৮ "

যব

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—দোয়াঁশ।

সার (এক একরে):—

নাইট্রোজেন	... ...	২৫ হইতে ৫০ পাউণ্ড
পটাস	... ...	৪ " ৯০ "
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	...	৩৫ " ৭০ "

যই

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—দোয়াঁশ।

সার (এক একরে):—

নাইট্রেজেন	... ...	১২ হইতে ১৮ পাউণ্ড
পটাস	... ...	২০ " ৩০ "
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	...	৩২ " ৪৮ "

ভূট্টা বা জনার

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—দোয়াঁশ।

সার (এক একের):—

প্রথমতঃ সবজী বা গলিত উদ্ভিজ্জ সার, পরে,

নাইট্রাজেন	... ...	১৬ হইতে ২০ পাউণ্ড
পটাস	... ...	৫৬ " ৭০ "
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	...	৪৮ " ৬০ "

যদিও ভূট্টা ফসল গম অপেক্ষা অধিক সার ভূমি হইতে গ্রহণ করে, তাহা হইলেও

ইহা অপেক্ষাকৃত অল্প সারে আথবা অনধিক উর্ব্বর ভূমিতে উত্তমরূপে জন্মিতে পারে।

ইহার সার সংগ্রহ করিবার শক্তি অতিশয় প্রবল। ইহার দ্বারা মৃত্তিকার প্রাকৃতিক গঠনও উৎকর্ষতা লাভ করে।

কড়াই,—খেশারী, মটর, অড়হর প্রভৃতি

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—দোয়াঁশ।

সার (এক একরে):—

পটাস	৪৮ হইতে ৬৪	পাউণ্ড
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড ...	৪৮ "	৬৪

এই শস্তে নাইট্রোজেন সারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু গাছ সতেজ করিবার করিবার জন্ম, প্রথম অবস্থয়, কিঞ্চিৎ পরিমাণে নাইট্রোজেন-সার প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

গাজর ও বিট

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—বেলে দোয়াঁশ।

সার (এক একরে) :—

নাইট্রোজেন	৫০	হইতে	১০০	পাউণ্ড
পটাস	৯০	,,	১৮০	,,
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড ...	৬০	,,	১২০	,,

গোবরসার প্রয়োগে গাজর ও বিট সুস্বাদু হয় না।

সালগম

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—বেলে দোয়াঁশ।

সার (এক একরে) :—

নাইট্রোজেন	৮	হইতে	১২	পাউণ্ড
পটাস	২০	,,	৩০	,,
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড ...	২৮	,,	৪২	,,

পরিণত গোবর সালগমের পক্ষে উত্তম সার।

বেগুণ

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—বেলে দোয়াঁশ।

সার—খুব উর্ব্বরা ভূমি হইলেও এক একরে, নিম্নলিখিত পরিমাণে সার প্রয়োগ করিতে হইবে :—

নাইট্রোজেন	৮০	পাউণ্ড
পটাস	১৮০	,,
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	১০০	

বিলাতী আলু

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—দোয়াঁশ। মেটেল জমীর আলু বড় সুস্বাদু হয় না মেটেল জমীর আলুতে অধিক পরিমাণে আঠা পদার্থ থাকে; এই জন্য, অনেক স্থলে কৃষকগণ এই আলুকে অধিক আদর করিয়া থাকে।

সার—আলু ফসলে কখনও তাজা গোবর প্রয়োগ করা উচিত নয়। এক একর জমীতে নিম্নলিখিত পরিমাণে সার প্রয়োগ করা যাইতে পারে :—

নাইট্রোজেন	৩০	হইতে ৬০	পাউণ্ড
পটাস	৯০	,, ১৮০	,,
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড ...	৬০	,, ১২০	,,

পেঁয়াজ

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—বেলে দোয়াঁশ।

সার—উদ্ভিজ্জ ও বিকৃত গোবর পেঁয়াজ ফসলের উত্তম সার। একএকর ভূমিতে নিম্নলিখিত পরিমাণে সারপদার্থ প্রয়োগ করা বিধেয় :

নাইট্রোজেন	৬০	হইতে ৮০	পাউণ্ড
পটাস	১০৫	,, ১৪০	,,
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	৯০	,, ১২০	,,
চুণ	৩০০	,, ৫০০	,,

মূলা।

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—বেলে দোয়াঁশ। মেটেল ভূমির মূলা সুস্বাদু হয় না।

সার (এক একরে) :—

নাইট্রোজেন	৩৫	হইতে ৪৫	পাউণ্ড
পটাস	৬৩	,, ৮১	,,
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	৪২	,, ৫৪	,,

বান্ধা কপি, ফুল কপি এবং ওলকপি

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—দোয়াঁশ।

সার—গোবর, খৈল প্রভৃতি কপির পক্ষে উত্তম সার। এক একর ভূমিতে নিম্নলিখিত পরিমাণে সার পদার্থসকল প্রয়োগ করা যাইতে পারে :—

নাইট্রোজেন	৫০	হইতে ৮০	পাউণ্ড
পটাস	৯০	,, ১৮০	,,
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড ...	৭০	,, ১৪০	,,

কমলা লেবু, পাতি লেবু প্রভৃতি

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—মেটেল দোয়াঁশ।

সার—কলা গাছের সারের প্রধান উপাদান আস্তাবলের সার হাড়ের গুঁড়া ও সোরা। প্রত্যেক ফলবান গাছে, প্রত্যেক বৎসর, নিম্নলিখিত পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয়:—

চুণ	...	...	২০ তোলা
পটাস	...	...	১৮ „
নাইট্রোজেন	...	...	৮ „
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড		...	১৩ „

আম্র ও লিচু

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—বেলে দোয়াঁশ।

সার—লেবুর সমস্ত সারই দ্বিগুণ পরিমাণে প্রয়োগ বিধেয়।

নারিকেল

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—দোয়াঁশ, বেলে দোয়াঁশ।

সার—চূর্ণ, পটাস ও উদ্ভিজ্জ সার নারিকেল গাছের পক্ষে প্রশস্ত। মধ্যে মধ্যে লবণ প্রয়োগ করিলে, নারিকেল গাছ সতেজ হইতে দেখা যায়। ধানের তুষ ও পচা পানা ইহার বিশেষ সার।

কদলী বা কলা

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—দোয়াঁশ, বেলে দোঁশায়।

সার—প্রথমতঃ সবজী, অন্যান্য উদ্ভিজ্জ ও জান্তব সার, পরে, এক একরে নিম্নলিখিত পরিমাণে সার প্রাদান করিতে হইবে: —

পটাস	...	...	৭০ পাউণ্ড
ফস্ফরিক এসিড	...	...	৭০ „

উদ্ভিজ্জ ও জান্তব সারের নাইট্রোজেন যথেষ্ট না হইলে, গাছ সতেজ হয় না, এবং পত্র বিবর্ণ হইতে থাকে। তাহা হইলে, প্রতি একরে, ১৫ হইতে ৩০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। উদ্ভিজ্জ ও জান্তব সার পচনের নিমিত্ত চুণ-সারেরও প্রয়োজন হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ পটাস এবং উদ্ভিজ্জ ও জান্তব সার আছে—এইজন্য ইহা কদলীর বিশেষ সার।

ইক্ষু

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—মেটেল দোয়াঁশ।

সার—প্রথমতঃ সবজী সার, তৎপরে, এক একর ভূমিতে, নিম্নলিখিত পরিমাণে, অন্যান্য সার প্রয়োগ করা বিধেয় :—

নাইট্রোজেন	১৮ হইতে	২৪	পাউণ্ড
পটাস	৫৪ ,,	৭২	,,
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	৪৮ ,,	৬৪	,,

লোটনি বা মাঘী-সর্ষপ

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—মেটেল দোয়াঁশ।

সার (এক একরে) :—

নাইট্রোজেন	২৪ হইতে	৩২	পাউণ্ড
পটাস	৪৮ ,,	৬৪	,,
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড ...	৪৮ ,,	৬৪	,,

রাই সর্ষপ

উপযুক্ত মৃত্তিকা—সকল প্রকার মৃত্তিকায়ই রাই জন্মিতে পারে। দোয়াঁশ মাটী সর্ব্বোত্তম।

সার—(এক একরে) :—

নাইট্রোজেন	৯ পাউণ্ড
পটাস	২৪ ,,
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	২১ ,,

মসিনা বা তিসি

উপযুক্ত মৃত্তিকা—মেটেলদোয়াঁশ।

সার (এক একরে) :—

নাইট্রোজেন	১৮ হইতে	২৪	পাউণ্ড
পটাস	৫৪ ,,	৭২	,,
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	৪৮ ,,	৬৪	,,

বীজ প্রাপ্তির জন্য তিসি পাতলা বুনিতে হয়। ইহাতে এক একর জমীতে প্রায় ২৪ সের বীজের প্রয়োজন; আর সূত্রের জন্য ইহা বপন করিলে, প্রত্যেক একরে প্রায় দেড় মণ বীজের আবশ্যক হয়। তিসির সূত্র অত্যতিশয় সূক্ষ্ম ও দৃঢ়।

রেড়ি বা এরণ্ড

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—বেলে দোয়াঁশ।

সার (এক একরে):—

নাইট্রোজেন	...	...	৮ হইতে ১০ পাউণ্ড
পটাস	...	...	৩২ „ ৪৮ „
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	...	...	৩২ „ ৪৮ „

কার্পাস

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—দোয়াঁশ।

সার (এক একরে):—

নাইট্রোজেন	...	...	১২ হইতে ২৪ পাউণ্ড
পটাস	...	...	১৬ ,, ৩২ ,,
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	...	...	৩২ ,, ৬৪ ,,

আমেরিকায় কার্পাস-বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত হইতেছে। এই বীজ গোরুর খাদ্য ও সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ছোটনাগপুরের বুড়ী কার্পাস বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পাট, মেস্তা ও শণ

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—দোয়াঁশ।

সার (এক একরে):—

নাইট্রোজেন	...	...	৩৫ হইতে ৪৫ পাউণ্ড
পটাস	...	...	৬৩ ,, ৮১ ,,
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	...	...	৪২ ,, ৫৪ ,,

তাজা গোবর এই সকল শস্যের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ।

তামাক

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—বেলে দোয়াঁশ মৃত্তিকায় চুরুটের তামাক, মেটেল দোয়াঁশ মৃত্তিকায় হুকার তামাক এবং বালু মৃত্তিকায় সিগারেটের তামাক উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে।

সার—চুরুট ও সিগারেটের তামাকে গোবর সার প্রয়োগ করা অনুচিত। ক্লোরিণযুক্ত পটাস-সার প্রয়োগ করিলে চুরুট উত্তমরূপে পোড়ে না। পোটাসিয়াম কার্ব্বনেট (ভস্ম), পোটাসিয়াম সালফেট এবং সোরা চুরুট-তামাকের পক্ষে উত্তম সার। এক একর ভূমিতে নিম্নলিখিত পরিমাণে সারপদার্থসকল ব্যবহার করা বিধেয়—

নাইট্রোজেন	...	...	৪০ হইতে ৬০ পাউণ্ড
পটাস	...	...	৯০ " ১৩৫ "
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	...	...	৫০ " ৭৫ "

চুরুট, সিগারেট প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর তামাক চাষ করা আবশ্যক।

চা

উপযুক্ত মৃত্তিকা,—দোয়াঁস।

সার (এক একরে) :—

নাইট্রোজেন		...	...	৩০ হইতে ৫০ পাউণ্ড
পটাস	...	...	...	২০ " ২৫ "
গ্রহণোপযোগী	...	...	...	৮ " ১২ "

অথবা,—

সোরা (নাইট্রোজেন শতকরা ৬—৮ ভাগ)				৫ মণ
হাড়চূর্ণ	...	...	...	১॥০ "

এতদ্ভিন্ন চা-গাছ ছাটা সমস্ত গলিত পত্র বা ভস্ম জমীতে প্রদান করা কর্ত্তব্য।

সোরা বৈশাখ, আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে তিনবারে, এবং হাড় চূর্ণ বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে দুইবারে, প্রয়োগ করা বিধেয়।

চা গাছ প্রায় ৫০ বৎসর চা প্রদান করিয়া থাকে। বিহিত ব্যবস্থা মত সার প্রয়োগ ব্যতীত, কখনও এই দীর্ঘকাল স্থায়ী গাছ অধিক দিন উত্তম ফসল প্রদান করিতে পারে না। ভারতীয় চা-সমিতির বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা শ্রীযুক্ত ম্যান সাহেব বলেন যে, উপরিস্থিত ৩ ফুট গভীর মৃত্তিকায়, বালুকা বাদে, অঙ্গারীয় পদার্থ শতকরা ৩৫ ভাগ, নাইট্রোজেন ০.৮ ভাগ, ফস্ফরিক এসিড ০.৩ এবং ০.৪ ভাগ পটাস না থাকিলে, তথায় উৎকৃষ্ট চা জন্মায় না।

চা-বাগানে সবজী-সার বিশেষ উপযোগী। ৩০ বা ৪০ ফুট অন্তর শুটীধারী গাছ রোপণ করিয়া অনায়াসে চা-বাগানের শ্রীবৃদ্ধি করা যাইতে পারে। যে গাছ ৪ বা ৬ বৎসরে কাটা যায় সেই সকল গাছ রোপনই উপযুক্ত।

সার সংগ্রহের উপায়—

কোন্ সাধারণ সার হইতে আমরা উদ্ভিদের প্রয়োজনমত নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক এসিড, পটাস প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে পারি ?

আমরা পাই সরিষার খৈল, রেড়ির খৈল হইতে	শতকরা	৫-৭ ভাগ	নাইট্রোজেন
সোরা	"	১৩	ফস্ফরিক এসিড
হাড়ের গুঁড়া	"	৮	"
গোময় ভস্ম	"	১২	পটাস
জলজ পানা (Water Hyacinth)	"	২০	"

জীপ্‌সম্‌ একটি চূণ প্রধান সার। সোডার জল তৈয়ারি হইবার পর যে চূণ পরিত্যক্ত হয় কিম্বা কার্ব্বাইড আলো জ্বালিয়া যে চূণ পরিত্যক্ত হয় তাহাও চূণ প্রধান সার। এখানে দামী খণিজ সারের কথা উল্লেখকরা হইল না।

ফসলের পোকা

পোকা লাগিয়া ধান গাছে এই দশা হইয়াছে

আমরা কথায় বলি শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্। ক্ষেত হইতে যাহা আহরণ করিয়া গোলাজাত করা হয় তাহাই শস্য, কেননা তাহার পূর্ব্বে ফলশস্যের যে কত বিঘ্ন, বিপদ তাহা চাষী মাত্রেরই বিশেষ জানা আছে—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড় ও ঝঞ্ঝা, পশ্বাদির উপদ্রব প্রভৃতি কত আপদই আছে। তার উপর আছে—পোকার উপদ্রব। ইহারা ক্ষুদ্র শত্রু হইলেও মহদনিষ্টকারী। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের দুই আনা রকম ফলশস্য
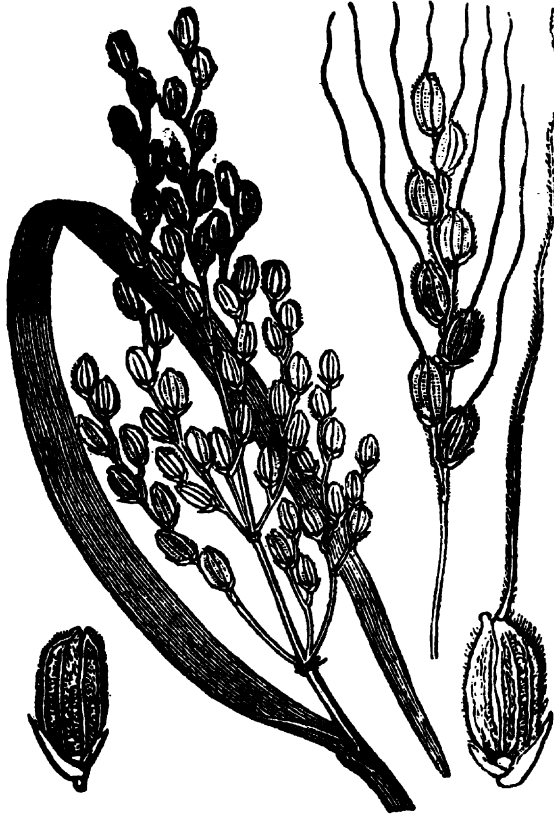
সুপুষ্ট বীজ হইতে ধানের সতেজ চারা হইয়াছে, তাহা কেমন সুন্দর ধান ফলিয়াছে

পোকার উপদ্রবে নষ্টত হয়ই কোন কোন সময়ে সিকি, বার আনা এমন কি ষোল আনাও নষ্ট হইয়া থাকে। কেবল যে ক্ষেতে পোকার উপদ্রব হয় এমন নহে গোলাজাত শস্যও পোকার দ্বারা নষ্ট হয়। পোকার উপদ্রব প্রতিকার করিতে পারিলে আমরা কোটি কোটি টাকার ফসল রক্ষা করিতে পারি।

যেমন শত্রুর—আবাস স্থান, তাহার গতিবিধি, তাহার আচরণ, তাহার অনিষ্ট করিবার শক্তি জানা থাকিলে মানুষ তাহা হইতে সাবধান হইতে পারে বা আত্মরক্ষা করিতে পারে তেমনি পোকার উৎপত্তি, আচরণ, বংশবৃদ্ধির জ্ঞান থাকিলে তবে আমরা তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা করিতে পারি। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের কীটপতঙ্গসম্বন্ধে জ্ঞান নিতান্তই কম। ভারতীয় কৃষিসমিতি হইতে প্রকাশিত কৃষক মাসিক পত্রিকায় আমরা যেমন ফুল-ফল-শস্যের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক ও দেশ-কাল-আবহাওয়া সঙ্গত উপায় চিন্তা করি তেমনি পোকার হাত হইতে 'ফুল ফল, শস্য রক্ষার চেষ্টাও করিয়া থাকি। ভারতীয় কৃষি সমিতি ফসলের পোকা' নামক একখানি পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাদের চাষাবাদ আছে তাহাদেরই পোকার ভয় আছে সুতরাং ইহা কৃষি ও কৃষকের উপযুক্ত সঙ্গী। পুস্তক খানিতে কৃষক অফিসে পাওয়া যায়।

খাদ্যের গুণাগুণ ও ব্যবহার

বিলাতী আলু

রাসায়নিক খাদ্যগুণ—

দাহগুণ—		মেদকারিতাগুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	১৪.৭	প্রোটিড	১.৮
তৈল	০.১		০.৮

জল ৬২.৬

তরকারীর মধ্যে বিলাতী আলু সর্ব্বপ্রধান। আলু আয়র্লণ্ডে আমাদের দেশের ভাতের ন্যায় প্রধান খাদ্য। ইহাতে বিলক্ষণ পরিমাণে শ্বেতসার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যান্য তরকারী অপেক্ষা ইহাতে প্রোটিডের পরিমাণও অধিক। কেহ কেহ বলেন যে ভাত বা রুটীর বদলে আলু ব্যবহার চলে। যাহারা যথেষ্ট পরিমাণে মাংস গ্রহণ না করেন, তাঁহাদের খাদ্য কেবল আলুর দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে না। তথাপি দুর্ভিক্ষের সময়ে বিলাতী আলু দ্বারা জীবন ধারণ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে বিলাতী আলু অবিদিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কলম্বাস এই আলু আমেরিকায় আবিষ্কার করেন। এবং তিনি এই আলুর চাষ ইউরোপে প্রবর্ত্তন করেন। ইউরোপে হইতে

আমরা এই আলু প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র বিলাতী আলুর চাষ হইতেছে।

অনেক প্রকার আলু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত যায়, যথা—(১) পাহাড়ী সাদা আলু ও (২) পাটনাই লাল আলু। পাহাড়ী আলু সিদ্ধ হইলে বালি বালি হইয়া গলিয়া যায়। লাল আলু সিদ্ধ করিবে আঠা আঠা হয়, কিন্তু বিলাতি আলুর মত গলিয়া যায় না। বিলাতি আলু উত্তমরূপে সিদ্ধ হয় বলিয়া ইউ-রোপীয়ানগণ ইহাকে অধিক আদর করেন। আলুর শ্বেতসার খুব সুসিদ্ধ না হইলে সুপাচ্য হয় না। ভালরূপ সিদ্ধ না হইলে ইহা দ্বারা পেট ভার হয় এবং অজীর্ণ রোগ জন্মে।

আলু হইতে একরূপ পালো প্রস্তুত হয়। সিদ্ধ আলুর সহিত সমপরিমাণে গমের আটা বা ময়দা যোগ করিয়া উত্তম চাপাটী প্রস্তুত হয়। চাউল বা ময়দা যোগ করিয়া উত্তম পিষ্টকাদিও প্রস্তুত হয়।

আলু সিদ্ধের নিয়ম

অলু খোসার সহিত ফুটন্ত জলে কিঞ্চিৎ লবণ ফেলিয়া দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়।

ওল কচু

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহগুণ, শতকরা		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	১২.৮	প্রোটিড্	২.৩
তৈল	২.৯	ভস্ম	১.৪

জল ৭৮

মেদকারিতা গুণে ওল তরকারীর শ্রেষ্ঠ। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে লবণাক্ত পদার্থ (ভস্ম) থাকায় ইহা গ্রহণ করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। এই জন্য অর্শরোগের পক্ষে ইহা অতি উপকারী।

ওলে চুণের দানা দানা দুই এক প্রকার যৌগিক পদার্থ থাকায় ইহা গলায় লাগে, এই জন্য ওল খাইতে অনেকেই ভয় পায়। কলিকাতায় যে বেম্বাই ওল বিক্রয় হয় ইহা গলায় লাগে না। বন্য ওলও খোলা জমীতে ভস্মসার দ্বারা চাষ করিলে সুখাদ্য হয়। সিদ্ধ করিয়া ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে অম্ল (লেবুর রস, তেঁতুল বা ভিমিগার) ও মরিচ প্রভৃতি কিয়ৎক্ষণ মাখিয়া রাখিলে' ইহা নির্ব্বিঘ্নে ভাতের সহিত গ্রহণ করা যাইতে পারে। সরিষা বাট মিশ্রিত ওলকচু সুখাদ্য।

মান ও অন্যান্য কচু

মান ও অন্যান্য কচুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ হয় নাই। তথাপি বলা যায় যে খাদ্যগুণে ইহা ওল অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট হইবে না। সব কচুতেই কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। কবিরাজগণ শোথ ও আমাশয় প্রভৃতি রোগে মানকচুর ব্যবস্থা করেন। অনেক চিকিৎসক লিভারের পক্ষে ওল ও অন্যান্য কচুর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

কাচা কলা ও মোচা

কাচা কলা ও মোচা উত্তম তরকারী। ইহাতে ট্যানিক্ এসিড্ থাকায় পেটের পীড়া ও কৃমি রোগের পক্ষে উপকারী।

শুষ্ক কাচা কলা

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	৭৭.৮	প্রোটিড্	৪.১
তৈল	০৪	ভস্ম	২০৭
সূত্র	১.২		

ইহার দাহ্যগুণ যথেষ্ট, কিন্তু মেদকারিতা গুণে ইহা কোন ধান্য জাতীয় শস্যের সমকক্ষ নহে। ওট-মিল কর্ণফ্লাওয়ার, বার্লিপাউডার অপেক্ষা ইহা অনেক নিকৃষ্ট। তবে ইহার স্বভাব ধর্ম্ম মল রোধক; সুতরাং ইহা পেটের পীড়ার পক্ষে উপকারী।

বেগুণ

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেনসার ও শর্করা	৪০০	প্রোটিড	১.৪
তৈল	১.৫	ভস্ম	১.৩

জল ৯০৯

আলুর পর বেগুণ আমাদের প্রধান তরকারী। বেগুণ সব ব্যঞ্জনেই ব্যবহৃত হয়। ইহা অতি লঘু পথ্য এই জন্য রুগ্ন ব্যক্তির পথ্য। আয়ুর্ব্বেদ মতে বেগুণ কফ ও পিত্ত নাশক। কিন্তু পাকা বেগুণ অপকারী। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে শ্বেত বেগুণ গুণে অন্যান্য বেগুণ অপেক্ষা হীন; কিন্তু অর্শরোগের পক্ষে হিতকারী।

কড়াই শুঁটী

রাসায়নিক খাদ্যগুণ (খোসা ছাড়ান)

দাহ্যগুণ		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	১৬·৯	প্রোটিড্	৭.০
তৈল	·৫	ভস্ম	১.

জল ৭০৬

কড়াইশুঁটী অতি উত্তম তরকারী। মেদকারিতা গুণে ইহা অন্যান্য তরকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ডাইল যেরূপ দুষ্পাচ্য ইহা সেরূপ নহে। বড় বড় সহরে ব্যবীত ব্যবহার অধিক নহে। ইহার ব্যবহার অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। পক্ব বুট বা মটর জলে ভিজাইয়া অঙ্কুরিত হইবার সময়ে রন্ধন করিলে ইহাদের সার পদার্থ অধিক পরিমাণে জীর্ণ হইতে পারে। পাটনা জেলার তিন পাখায়া ও বিলাতী মটরের শুঁটী সর্ব্বোত্তম।

শিম

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	৬০৯	প্রেটীড্	২০১
তৈল	০৩	ভস্ম	০৭

জল ৮৩০.

কচি শিম উত্তম লঘুপাচ্য তরকারী। আয়ূর্ব্বেদ মতে ইহা বাত প্রকোপক এবং অপকৃষ্ট।

বরবটী

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

মাহ্যগুণ		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	১.৬	প্রোটীড্	৩.৫
তৈল	১.২	ভস্ম	১·৬

কচি বরবটী অতি বলকারী। নেদকারিতা গুণে ইহা কড়াশুঁটী ব্যতীত অন্যান্য তরকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বাঁশ বোড়া সর্ব্বোত্তম। ইহার শুঁটী শুভ্র, লম্বা ; বীজ অল্প ও ক্ষুদ্র।

মুলা

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	৩০৪	প্রোটীড্	০২
তৈল	কিঞ্চিৎ	ভস্ম	০৮

জল ৯৫০৭

রাসায়নিক খাদ্যগুণ বিচার করিলে, মুলা উৎকৃষ্ট তরকারী নহে। তবে কচিমুলা লঘু পথ্য। ইহাতে গন্ধক থাকায় ইহা চর্ম্মরোগের পক্ষে হিতকারী। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা উষ্ণ, রুচিজনক, লঘু, পরিপাচক, স্বরবর্দ্ধক এবং জ্বর, শ্বাস, নাসিকা, কণ্ঠ ও চক্ষুরোগ বিনাসক কিন্তু পাকা মুলার অনেক দোষ।

বান্ধাকপি

রাসায়নিক খাদ্যগুণ—

দাহ্যগুণ		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	৪.৬	প্রোটিড্	১.২
তৈল—	৩.২	ভস্ম	.৮

জল ৭৫.৬

বিলাতী সবুজীর মধ্যে বান্ধাকপি ও ফুলকপি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইহাদের মেদকারিতা গুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গন্ধক থাকে বলিয়া ইহারা উষ্ণগুণবিষিষ্ট। নিরেট ও কীটাদি দ্বারা অক্ষত কপি উৎকৃষ্ট।

ফুলকপি

দাহ্যগুণ—		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	৫.০	প্রোটীড্	৩.০
তৈল	২.১	ভস্ম	১.১

মেদকারিতা গুণে ফুলকফি বান্ধাকপি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কমলা লেবু

রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	৮.৫	প্রোটিড্	•৬
তৈল	০.১	ভস্ম	•৪

জল ৬৩০৪

কমলালেবু অতি সুস্বাদু-লঘুপথ্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও পরিপাচক ফল। পেটের পীড়ার পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। পাহারিয়া চুণ প্রধান মৃত্তিকায় কমলা লেবু জন্মে। ছাতক, দারজিলিঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু উৎপন্ন হয় এবং অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানি হয়। নাগপুরে বৎসরে দুইবার লেবু ফলে। যে লেবু জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে তাহা অতি সুমিষ্ট কিন্তু যাহা কার্ত্তিক মাসে পাকে তাহা অতি অম্লস্বাদ বিশিষ্ট। উত্তম লেবুর ছাল পাতলা ও বীজ [illegible] থাকিবে। হাতে ধরিলে ইহা ভারি বোধ হয়। যে লেবুর ছাল মোটা তাহা [illegible] দিন ঘরে রাখা যায়।

নারিকেল

মালা ছাড়ান নারিকেলের রাসায়নিক খাদ্যগুণ

দাহ্যগুণ		মেদকারিতা গুণ—	
শ্বেতসার ও শর্করা	৩·৫	প্রোটিড	৬·৩
তৈল	৫৭·৪	ভস্ম	১·৩

ডাবের জল

শ্বেতসার ও শর্করা	২৪	প্রোটিড	১৪
তৈল	কিঞ্চিৎ	ভস্ম	·০৬

রাসায়নিক খাদ্যগুণ বিচার করিলে নারিকেল ফলের রাজা। কিন্তু ইহাতে অত্যাধিক পরিমাণে তৈল থাকায় ইহা অতন্ত গুরুপাচ্য। পরিপাক হইলে নারিকেল কড্ লিভার তৈলের মত উপকারী। নারিকেলের দুগ্ধ বা নারিকেল কোরা মিশ্রিত ডাইল ও তরকারী অতি সুস্বাদু হয়। মুড়ি ও নারিকেল ভক্ষণ অম্লরোগের পক্ষে উপকারী বলিয়া কথিত আছে। নারিকেল অপেক্ষা নারিকেল দুগ্ধ কিঞ্চিৎ অধিক লঘুপাচ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। নারিকেলের লাড়ু অতিশয় দুষ্পাচ্য। ডাবের জল উত্তম পানীয়। রাসায়নিক খাদ্য-গুণেও ইহা হীন নহে। কিন্তু, ইহা অত্যন্ত শীতল। সুস্থ শরীরে মধ্যাহ্নে, আহারের এক ঘণ্টা পরে পান করিলে ইহা বিশেষ ফলকারী। ডাবের জল অম্লরোগীর পক্ষেও ব্যবস্থা করা যায়। সরসলোণা ভূমিতে উত্তম নারিকেল জন্মে। উচ্চ শুষ্ক জমিতে নারি-কেল জন্মে না

নারিকেল দুগ্ধ দ্বারা ডাল, তরকারী ও মাংস অতি সুস্বাদ হইয়া থাকে। রন্ধন শেষ হইলে নারিকেল দুগ্ধ যোগ করিতে হয়। নারিকেল কোরাইয়া কোন পাত্রে রাখিবে। একটা নারিকেলে এক পোয়া ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিয়া পাত্র ঢাকিয়া রাখিতে হয়। শীতল হইলে ছাকিয়া লইতে হয়। এই জল বড় উপকারী।

কৃষি ও সমবায়

(প্রাপ্ত)

কো-অপারেটিভ বা সমবায় সমিতির কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু সমবায় সমিতির ব্যাপারটা কি তাহা অনেক শিক্ষিত লোকেও জানেন না। বড়লোকেও সমবায় সমিতির সাহায্যে নানাপ্রকারে লাভবান হইতে পারিলেও দুঃস্থ, প্রপীড়িত, সদা নির্য্যাতিত, ঋণজালে জড়িত ম্যালেরিয়া ও বক্রকীট ব্যাধিতে জর্জ্জরিত, ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রায় নিঃশেষিত, উপবাস ক্লিষ্ট, জীর্ণ, শীর্ণ জলাভাবে উন্মত্তপ্রায় বাঙ্গালী কৃষকের সমবায় পদ্ধতি অনুসারে সকল কার্য্য বিশেষতঃ চাষবাস করিলে মহৎ উপকার সাধিত হইতে

পারে। আমাদের শাসনকর্ত্তারা গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা বহুদিন অবধি করিতেছেন কিন্তু এখনও সফল হইতে পারিতেছেন না। নানা কারণে অতি নিরীহ গ্রামবাসীরা সরকারি কর্ম্মচারীদের সংস্পর্শে আসিতে ভীত হয়। মূর্খ, অজ্ঞ ও সম্পূর্ণ অশিক্ষিত পল্লীবাসিদের বুঝাইবার ও তাহাদের নেতৃত্ব করিবার লোক প্রায় আর কোনও গ্রামে নাই। অথচ সর্ব্বনাশের পথে সম্পূর্ণ অগ্রসর কৃষককে তথা দেশকে রক্ষা করিতে হইলে শিক্ষিত স্বদেশবাসী ও স্বদেশ-প্রেমিক যুবকদিগের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। শত বাধা স্বত্বেও সহস্র বাধা মাথায় করিয়া সকল স্বদেশানুরাগী ও শিক্ষিত ভারতবাসীকেই সমবায় রীতি নীতি ও পদ্ধতির প্রচার ও প্রয়োগ করিতে হইবে।

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই সমবায় সমিতির বহুল প্রচার হইয়াছে ও হইতেছে। আয়ারলেণ্ড ও মিশর দেশের কৃষকদিগের অবস্থা আমাদের ন্যায় এত খারাপ না হইলেও তাহারা প্রায় সমদশাপন্ন বলিলেও চলে। কিন্তু আয়ারলেণ্ডের কৃষকেরা ও শিল্পব্যবসায়ীরা সমবায় প্রথার সাহায্যে তাহাদের নিজের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছে। ইজিপ্ট বা মিশর দেশও ইংরাজের অধীন। সেখানকার কৃষকেরা (ফেলাইন) সমবায় মূলক পদ্ধতিতে তুলার চাষ করিয়া বেশ অবস্থাপন্ন হইতেছে। যে জাটলণ্ডের (হলাণ্ড বা ওলন্দাজদিগের দেশ) নিকট ইংরাজ ও জার্ম্মাণ জলযুদ্ধ হইয়াছিল সেই জাটলণ্ডে পূর্ব্বে মনুষ্যের বাসই প্রায় ছিল না। সমুদ্র বাঁধিয়া ঐ দেশ উদ্ধার করা হয় ও সমবায় মুলক পদ্ধতিতে উহাতে বাটী নির্ম্মাণ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্তই চলিতেছে। এক্ষণে উহা একটি অতি সমৃদ্ধিশালী স্থান। প্রত্যহ ঐ স্থান হইতে জাহাজ পূর্ণ ডিম্ব, দুগ্ধ পনির মাংস প্রভৃতি ইংলণ্ডে বিক্রয়ার্থ আসে। সমবায়ের সাহায্যে এখানে অত্যুৎকৃষ্ট ডিম্ব, দুগ্ধ মাংস প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে। মিশরেও ঐরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট তুলা হইতেছে। রাজসাহী জেলার নওগাঁয়ে গাঁজা চাষীরা এক্ষণে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ অধিক লাভ করিতেছে। কৃষিকার্য্যে বাণিজ্যে ব্যবসায়ে, শিল্প কার্য্যে কারখানায়, কেরাণী কূলের মধ্যে, চিকিৎসায়, বাটী নির্ম্মাণে, পুস্তকালয়ে, পুষ্করিণী খননে ও জলসংস্থানে ইত্যাদি সকল কার্য্যেই সমবায় পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে ও হইতেছে। ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশ কৃষি প্রধান। বেশীর ভাগ চাকুরে বাঙ্গালীরই কিছু না কিছু জ্যোত জমী আছে। ধান পাট আমাদের প্রধান সম্বল। বিহার ও অন্যান্য দূরদেশ হইতে যেরূপ দ্রুতগতিতে বাঙ্গালী, চাকুরী ও অন্যান্য কার্য্য হইতে দুরীভূত হইতেছে এবং বাঙ্গালা দেশে যেরূপ মারোয়াড়ি, মান্দ্রাজি, উড়িয়া চীনা, পাঞ্জাবী, পার্সী, বিহারী প্রভৃতির আমদানি ও আদর হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে ম্যালেরিয়া হুকওয়ারম (বক্রকীট) প্লেগ, বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা প্রভৃতির উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট বাঙ্গালীকে শেষ একমাত্র সাঁওতাল-সহায় কৃষক হইতে হইবে। সমবায় প্রণালীতে কৃষিকার্য্য না চালাইলে লাভের প্রত্যাশা নাই।

সমবায় কি ও কেমন ?—সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে এক যোটে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য দায়ী হইয়া-প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাহায্যকারী হইয়া সকলে সকলের, প্রত্যেকে সকলের এবং সকলে প্রত্যেকের সাহায্যকারী,এক মনে এক প্রাণে কার্য্য করাই হইতেছে সমবায়। কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে লইলে অর্থের আবশ্যক, লোকের আবশ্যক, উন্নত যন্ত্রাদির আবশ্যক, উৎকৃষ্ট বীজের, উৎকৃষ্ট সারের, জলের, স্বাস্থ্যের ও একতার একান্ত আবশ্যক। এই সমস্ত গুলিই সমবায় সমিতির সাহায্যে পাওয়া সম্ভব হইতে পারে। প্রথমটি পাইলে আবার অন্যগুলি আসিয়া পড়ে। সমবায় সমিতি নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিলে ঐ অর্থের অনাটন হয় না। সমবায় সমিতির পথ সুগম করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র আইন পাশ করিয়াছেন, লক্ষ টাকা খরচ করিয়া বড় বড় সাহেব ও দেশীয় কর্ম্মচারী রাখিয়াছেন, পুস্তক, পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, প্রায়ই সভাসমিতি করিয়া সমবায়ের মূল নীতি সকলের প্রচার ও প্রসার করিতেছেন এবং সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্ববিষয়ে সমবায় পদ্ধতি প্রয়োগের সহায়তা করিতেছেন। এ সুযোগ ত্যাগ না করা আমাদের উচিত ও কর্ত্তব্য।

সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কি করিতে হইবে ?

এক্ষণে প্রায় সকল জেলার ও মহকুমার সদরে কো-অপারেটিভ সেণ্ট্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বা হইতেছে। ঐ সকল ব্যাঙ্ক কর্ত্তাদের (সেক্রেটারি বা সম্পাদক) নিকট পত্র লিখিয়া বা নিজে যাইয়া সমবায় সমিতি বিষয়ক সকল কাগজ আনিতে হইবে। সেই সকল কাগজের (ফরমের) ঘরগুলি পূরণ করিতে হইবে। তাহাতে যে সকল প্রশ্ন আছে তাহার উত্তর প্রশ্নের পার্শ্বে লিখিয়া দিতে হইবে অন্ততঃ বারজন কৃষকের দ্বারা দুইখানি নিয়মাবলীতে ও একখানি দরখাস্তে সহি করাইয়া লইতে হইবে এবং দুইখানি বড় কাগজে (ছাপা ফরম) সকল সভ্যের (সমিতিভুক্ত কৃষকের) সম্যক অবস্থার পরিচয় লিখিয়া দিতে হইবে এই যে বারজন বা ততোধিক কৃষক বা তন্তুবায় নাম সহি করিয়া দিলেন ইহাঁদের লইয়া একটি সমবায় সমিতি হইল এবং ইহাঁরাই সমিতির সভ্য হইলেন। ইহারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য ও নিজের এবং আর সকলের জন্য দায়িক হইলেন। এই সকল সদস্যের একযোটে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে তাহাদের সকলের আবশ্যক টাকা মত শতকরা সাড়ে নয় টাকা বাৎসরিক সুদে ধার লইতে পারেন। সেই টাকা কেবল নিজের মধ্যে (সমিতির সভ্যদের মধ্যে) বাৎসরিক শতকরা সাড়েবার টাকা সুদে যিনি খাটাইতে পারেন। যিনি টাকা ধার লইবেন তাঁহাকে সভ্যদের মধ্য হইতে দুই তিন বা চারিজনকে জামিন দিতে হইবে। সকল সভ্য মিলিয়া একত্রে সভা করিয়া বসিয়া তাহাকে মত টাকা

ধার দেওয়া উচিত, কর্ত্তব্য ও নিরাপদ বোধ করিবেন তত টাকাই ধার দিবেন। যিনি যে কার্য্যের জন্য টাকা ধার লইবেন তাঁহাকে সেই কার্য্যেই সেই টাকা ন্যস্ত করিতে হইবে। যে ফসলের জন্য টাকা ধার লওয়া হয় সেই ফসল বেচিবার সময় ঋণের টাকা সুদ সমেত ফেরত দিতে হইবে, এই টাকা ধার লইতে ফেরত দিতে বা রসীদ লইতে কোনওরূপ ষ্টাম্প দিতে হয় না। সমিতির নামে কিছু রেজেষ্ট্রী করিয়া দিতে হইলে কোনওরূপ রেজেষ্ট্রী খরচও লাগে না। কেহ কোনওরূপ দুষ্টামি করিলে অতি তৎপর তাহার বিষয় আশ্রয়, গরু, বাছুর, ঘর দ্বার, জমী, ফসল প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া লওয়া যায়। সমিতির সভ্যদের অন্যত্র যতই ঋণ থাকুক না কেন সমিতির ঋণ সর্ব্বাগ্রে পরিশোধ হইবে। সমিতির টাকা যাহাতে না মারা যায় তাহার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। যদি কোনও কারণে ঋণ গ্রাহকের নিকট আদায় না হয় তাহা হইলে যাঁহারা জামিন হইয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট আদায় হইবে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের জন্য সকলেই দায়ী। সমিতির সভ্য হইলে আপনা হইতে মিতব্যয়িতা আসিয়া পড়ে। কারণ অন্যান্য সভ্যেরা কাহাকেও অযথা অর্থ ব্যয় করিতে দেন না। শ্রাদ্ধে বিবাহে ও অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারে অনর্থক অর্থনাশ নিবারিত হয়। কেহ কাহারও মন্দ চিন্তা করিতে বা ক্ষতি করিতে চাহেন না ও পারেন না কারণ একজন সভ্যের ক্ষতি হইলে অন্যান্য সভ্যকে দায়ী ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। মোকদ্দমা মামলা কমিয়া যায়। কারণ সভ্যেরা সকলে মিলিয়া নিজেদের মধ্যস্থিত সকল প্রকার বাদ বিসম্বাদ ও মনোমালিন্য মিটাইয়া দেন। নূতন পুষ্করিণী খনন করিতে ও পুরাতন পুষ্করিণী পঙ্কোদ্ধার করিতে টাকা ধার পাওয়া যায়। নয় টাকা সুদে টাকা লইয়া সাড়ে বার টাকা সুদে নিজেদের মধ্যে টাকা খাটাইয়া যাহা লাভ হয় তাহাতে রাস্তা স্কুল, ডাক্তারখানা প্রতি সকল রকম লোকহিতকর কার্য্য করা যায়। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার না লইয়া যে কোনও ব্যক্তির নিকট অল্প সুদে সমিতি টাকা জমা বা ধার লইতে পারেন। যে কোনও সভ্য চারি আনা হইতে যত বেশী ইচ্ছা টাকা সমিতির নিকট জমা রাখিতে পারেন। এই টাকার সুদ আমানতকারী শতকরা বাৎসরিক নয় টাকা বা ঐরূপ হিসাবে পাইবেন। সকল সভ্যকেই বার্ষিক আড়াই বা পাঁচ টাকা করিয়া সমিতিতে জমা দিয়া দশ বৎসরে এক একটি পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকার সমিতির অংশ গ্রহণ বা সংগ্রহ করিতে হইবে।

সকলের এইরূপ অংশ সংগ্রহ হইলে সমিতিকে ব্যাঙ্ক হইতে বা বাহির হইতে বেশী টাকা ধার লইতে হইবে না। তখন নিজেদের মধ্যে যত ইচ্ছা অল্প সুদে টাকা খাটাইতে পারেন ও লাভ হইতে গ্রামের স্ব স্ব সমাজের উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন। পাঁচ সাত বা দশটি সমিতি মিলিয়া একটি বড় সমিতি করা সম্ভব। একটি সমিতি একক না পারিলে এই কয়টি সমিতি মিলিয়া এক সঙ্গে সুলভে অধিক পরিমাণে খইল বা অন্য সার, আলু বীজ দূর হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া নিজের মধ্যে

বিক্রয় (বিনা লাভে) করা যায়। এবং চাষীদের ফসল ধরিয়া রাখিয়া সস্তার মুখে বিক্রয় না করিয়া বাজার উঠিলে বিক্রয় করিতে পারেন। যাহাদের ফসল তাহারা কিছু টাকা লইয়া যতদিন না সমস্ত ফসল উচিত মূল্যে বিক্রয় হয় ততদিন সংসার চালাইতে পারেন। কোনও এক সমিতি বা কয়েকটি সমিতি একত্রে মিলিয়া আখমাড়া কল বা অন্য যে কোনও আবশ্যকীয় কল ক্রয় করিতে পারেন। যেখানে সমবায় সমিতি স্থাপিত হয় সেইখানেই বড় বড় রাজপুরুষদের সুনজর পড়ে। কৃষি-বিভাগ সকল সমবায় সমিতিকে বীজ, সার, উৎকৃষ্ট বৃষ, উন্নত কৃষি শিক্ষাদাতা প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করেন। অনেক বিষয়েই গবর্ণমেণ্ট সমবায় সমিতির মত গ্রহণ করেন। সমবায় সমিতি প্রবল হইলে পুলিশের ও জমিদারের অত্যাচার কিছু কম পড়ে ও শীঘ্রই গ্রামের ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়। শ্রীঅশেষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিতবাদী।

অন্নসমস্যা

[স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত।]

বাঙ্গাদেশে কোন শিল্প-প্রদর্শনীর কথা শুনিলেই বুকের ভিতর কেঁপে ওঠে। আমাদের শিল্পই নাই; তার আবার প্রদর্শনী। বঙ্গশিল্পের প্রদর্শনী আর বাঙ্গালার বিষাদকাহিনীর এক অধ্যায় উন্মোচন, একই কথা। একদিন ছিল, যখন বাঙ্গালার সূক্ষ্ম শিল্প সুদূর ভিনিস নগরের বানিজ্যকেন্দ্রে আদৃত হইত। কিন্তু এখন প্রদর্শনীর আসরে নেমে অন্য সভ্য জাতির তুলনায় আমরা কি দেখাব। এত বেদ বেদান্ত উপনিশদ নয়, এ যে স্থূল জড়জগতের কথা। প্রদর্শনীতে আমাদের জীবনধারণের উপযোগী নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু যা আমরা আপন হাতে প্রস্তুত করিতে পারি—তারই একত্র সমাবেশ করতে হয়। এখানে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে এসে আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারি জীবনসংগ্রামে ক্রমাগত পরাজিত হ'য়ে বাঙ্গালী কোন্ আবর্ত্তে আজ ঘুরপাক খাচ্ছে! বিদেশ থেকে বস্ত্রের আমদানি না হ'লে আমাদের লজ্জা নিবারণ হয় না, দিয়াশলাই না এলে আমাদের সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে না। ষ্টীম্ এঞ্জিন থেকে সুচ সুতা পর্য্যন্ত সকল রকম জিনিসের জন্য আমরা পর প্রত্যাশী! উঠ্‌তে বস্‌তে খাইতে শুইতে এমন পরবশ এমন কোন জাতি আছে কিনা জানি না। যুদ্ধের সময় আমদানি বন্ধ হল; জর্ম্মনী ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে জিনিষপত্র নিয়মিতরূপে না আসায় বিদেশী প্রতিযোগিতা অনেকটা কমে গেল। কিন্তু আমরা এমনই অক্ষম যে, সেই সুবিধা কোন

ব্যবহার করিতে পারিলাম না। অথচ এদিকে রুচি আমাদের বড় সুমার্জ্জিত! অভাবের দিন হইলেও দেশী কারখানা থেকে ভাঁড়ে ওষুধ দিলে আমরা তাহা স্পর্শ কর্‌ব না, সলিতা পাকিয়ে দেরকোর উপর রেড়ির তেলের প্রদীপ রেখে পড়তে বসব না। তাই জাপান ফটফটে চিমনি আর শিশি বোতল জুগিয়ে আমদের রুচির মান রক্ষা ক'রে লাখ লাখ টাকা নিয়ে গেল। এই মহাসমরে ইউরোপ যখন নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত, সেই সুযোগে জাপান পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ বেশী জিনিষ ভারতবর্ষে পাঠিয়েছে। এই সব কারণে বলি, প্রদর্শনী দেখতে মন উঠে না—আনন্দ হয় না। কিন্তু তবু প্রদর্শনী হওয়া চাই, কারণ তা হলে জানতে পারব রোগ কি এবং কোথায়, দেহযন্ত্রের কোন স্থান পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়েছে। প্রদর্শনীর আয়োজন করলে এই রোগ কতকটা ধরা পড়বে। তখন ঔষধের ব্যবস্থার কথা ভাববার অবসর হবে।

যুবকবৃন্দ দেশের ভবিষৎ আশাস্থল। তাঁদের ভেবে দেখতে বলি—আমরা আজ দাঁড়িয়েছি কোথায়,মধ্যবিত্ত আজ কি অবস্থায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ; কিন্তু দারিদ্রের কঠোর নিস্পেষণে সেই মেরুদণ্ড আজ ভেঙ্গে যাচ্ছে। এর শোচনীয় পরিণাম যে কি তা মনে হলেও হৃদকম্প উপস্থিত হয়। উপার্জ্জনক্ষম মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মাসিক আয় গড়ে ২৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা, কেউ বলেন ৩০৲ হতে ৩৫৲ টাকা। কিন্তু তাঁর পোষ্য অন্ততঃ পক্ষে পাঁচটি—স্ত্রী পুত্র আছে, কোথাও বিধবা ভগ্নী এবং তাঁর ছেলেপুলে আছে। সুতরাং এই স্বল্প আয়ে তাঁদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। চালের মণ আজ ১০৷১২ টাকা, তেলের সের ১৲ টাকা, আর ঘি ত জোটেই না। রাসায়নিক, বাজার চলন ঘির উপাদান যে কি, তা আমাদের জানতে বাকী নেই, কিন্তু সে কথা আর নূতন করে বল্‌তে চাই না। আর মাছ, দুধ, বাঙ্গালীর শরীরপুষ্টির যা প্রধান উপাদান, তা কয়েক বছর পরে দেশে আর পাওয়া যাবে না, এমন লক্ষণ দেখা দিয়াছে। খাদ্যদ্রব্য ত এইপ্রকার দুর্ম্মূল্য, তার সঙ্গে এই অল্প আয়ের মধ্যে আবার কাপড় জামা জুতা লোকলৌকিকতা এবং ভদ্রআনার আর পাঁচ রকম উপকরণ আছে, তার উপর যখন পুত্রের উচ্চশিক্ষা ও কন্যার বিবাহের কথা এসে পড়ে, তখন বুঝতে পারা যায়, আমরা দুর্দ্দশার কোন স্তরে নেমে গেছি। আমাদের পেট ভরে খাওয়া হয় না, বাড়িতেও না, বাহিরেও না। কলিকাতা বা মফঃস্বলের কলেজ মেশে ঘরভাড়া বাদ ন্যূনকল্পে ১৫৲ টাকা খরচ পড়ে, তাতে ডাল ভাত আর একটা তরকারী ছাড়া অন্য কিছু বন্দবস্ত হয় না। একজন ছাত্রের খরচ মোট ৩৫৷৪০ টাকার কমে হয় না। এইরূপে শাকার আহারের ফলে শরীর নিস্তেজ হয়ে গেল রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, আর ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সাংঘাতিক ব্যাধি বুকের উপর পাথর হয়ে চেপে বসে। সার শঙ্করণ নায়ার বলিয়াছেন, গত কয়েক মাসে ভারতবর্ষে ইনফুলুয়েঞ্জা ৬০ লক্ষ লোককে গ্রাস করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে প্রতিবর্ষে ১২ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর কাছে বলি

হয়। এ সকলের মূলে দারিদ্র ও অজ্ঞতা। ডাঃ বেণ্টলি বলেন, ম্যালিয়া গরীবের রোগ। অনেকদিন ধরে পুষ্টিকর আহারের অভাবে লোকে বার বার এই রোগে আক্রান্ত হয়। কল্‌কাতায় যক্ষ্মা রোগ বেড়ে চলেছে; শিশু যতগুলি জন্মায় তার এক তৃতীয়াংশ এক বৎসর বয়স হবার আগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গত পাঁচ বছরে কল্‌কাতায় বাড়ী ভাড়া শতকরা দুশোটাকা বেড়েছে। এদিকে সাধারণ গৃহস্থের আয় ৪০ থেকে ৫০। কাজেই এঁদো গলিতে অন্ধকার বাড়ী ভাড়া করে থাকৃতে হয়; সেঁতসেতে মজে, অষ্ট প্রহর দরজা বন্ধ,বা পাছে আবরু নষ্ট হয় বা ছেলে গাড়িচাপা পড়ে। বাতাস রৌদ্র ও আলোক, যা গরিবের প্রতি বিধাতার দান, কল্‌কাতার কজন বাঙ্গালীর ভাগ্যে তা জোটে? এ "যজ্জীবনং তন্মরণন্' মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ" মরণ হইলেই বিশ্রাম। শিশুকে চাম্‌চেয় করে মেলিন্স ফুড খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়। এরাই ত ভবিষ্যতে বংশবৃদ্ধি করে। কাজেই জাতটা যে ক্রমে স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়্‌ছে তা আর বিচিত্র কি! আমাদের পিতৃপিতামহ ৭০।৮০ বৎসর বেঁচে থাকতেন। এখন আমরা? ইংরেজের আয়ু গড়ে ৪৬ বৎসর, আমাদের মাত্র ২৩। দারিদ্র ও মহামারি আমাদের বুকের রক্ত শুষে বার করে নিচ্ছে! এদের তাড়াবে কে?

বিপদ যখন একেবারে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে. জীবনসংগ্রাম যখন ভয়ঙ্কর কঠিন হয়ে উঠ্‌ছে, চারিদিকে সমস্যাগুলি যখন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে আছে, তখন আমরা কি কর্‌ছি? প্রায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছি। আমরা ভাবি না, বুঝ্‌বার চেষ্টা করি না। উপায় নির্দ্দেশ হলেও কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার উৎসাহ বা সাহস আমাদের থাকে না। আমরা সার বুঝেছি চাক্‌রী করা, আর আমাদের ছেলেদের লক্ষ্য হয়েছে এম-এ এম-এস্ সি পাশ করা, অথবা উকিল হওয়া; এখন একজন গ্রাজুটের বাজার দর কত? এম্‌-এ বা এম্ এস্‌সি বড় জোর ১০০ টাকা পেতে পারেন, বি-এ বিএসসি ৪০ টাকা থেকে ৫০ টাকা। কিন্তু এর সঙ্গে বিবেচনা কর্‌তে হবে যে একটা পদ খালি হলে তার জন্যে পঁচিশ দরখাস্ত পড়ে সুতরাং এই সিধান্ত হয় যে, গড়ে গ্রাজুয়েটের বিশেষ কোন সুবিধা পাবার যো নেই। পাঁচ বৎসর বয়স থেকে A. B. C. D. আরম্ভ করে ২২।২৩ বৎসর পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া ও নানারোগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হতে হতে ভগ্ন-স্বাস্থ্য বাঙ্গালী যুবক যখন স্কুল কলেজ পার হয়ে ডিগ্রী নিয়ে সংসারের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, তখন দেখেন তাঁর পুঁথিগত বিদ্যা জীবন সংগ্রামে কোথাও তাঁকে বিশেষ কোন সাহায্য কর্‌বে না। এ কি ভীষণ সমস্যা! আবার যিনি গ্রাজুয়েট হয়েছেন, তিনি ভাবেন আইন পড়তে না গেলে মহা অপরাধ হবে, আর জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্‌বেন "পাশটা করে রাখি।" আজকাল জেলার সদরে বা মহকুমায় উকিলরা কি রোজগার করেন, তাঁদের কজন অন্ন পান এবং কজন গাছতলায় কেরোসিনের বাক্সের উপর বসে দিন কাটান, এরূপ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লে বিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তরটা কাণ কাণে দেবেন —কারণ সেটা সাধারণের বড় প্রীতিকর হবে না। স্যার আশুতোষ প্রতিভাশালী

পণ্ডিত, শিক্ষাবিস্তারের জন্য অনেক করেছেন—এ সবই স্বীকার করি। কিন্তু আইন কলেজ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার বন্‌ল না। আমায় যদি কেউ একদিনের জন্যও কল্‌কাতায় সর্ব্বময় কর্ত্তা (Dictator) করে, তবে "ল-কলেজ"টাকে আমি আগে ভূমিসাৎ করি; অন্ততঃ দশবছরের জন্যে আইন পড়া উঠিয়ে দিই। কারণ তা হলে উপোষী উকিলদের সংখ্যা হ্রাস হতে পারে। আর ব্যাধির শেষ কি এইখানে? এ দেশের ছাত্র বি-এল পাশ করে ভাবেন এম-এল হবেন। যেন বিধাতা তাঁদের সৃষ্টি করেছেন শরীর ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে পরীক্ষা পাশ করতে এবং যমসদনে যেতে।

৬০।৭০ বৎসর আগে কল্‌কাতায় হৌসের বাঙ্গালী মুৎসুদ্দি ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ ললিতমোহন দাস, গোরচাঁদ দত্ত, প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। তাঁরা মাসে আট দশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করতেন অর্থাৎ এখনকার প্রায় বিশহাজার টাকা। কিন্তু আজকাল সে সব উপন্যাসের কথা হয়ে গেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কল্‌কাতায় প্রথম কারবার করেন বাঙ্গালীর সঙ্গে। বাঙ্গালার শিল্পজাত দ্রব্য তাঁরা বাঙালীর নিকট কিন্‌তেন। তখন ব্যবসা ছিল।

আগে বাঙ্গালীর চাকরী ছিল—বাঙ্গালীর হাতে।—

এমন কি উনবিংশ শতাব্দী প্রথমার্দ্ধে বাঙালীর সাহায্য ব্যতীত উইরোপীয় সওদাগরগণ তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি কর্‌তে পারতেন না। এই জন্যই রামদুলাল দে, মতিলাল শীল প্রভৃতি ক্রোড়পতি হয়েছিলেন! কিন্তু এখন ব্যবসায় ক্ষেত্র থেকে বাঙালী হটেছে, বিতাড়িত হয়েছে। বর্ত্তমানে কলকাতার জনসংখ্যা যত, তার অর্দ্ধেকও বাঙালী নয়, অথচ কলকাতা বাংলার প্রধান সহর। এই সহরের যে সব স্থানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার হয়, সেখানে বাঙালীকে কচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! ভাবলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়! এদেশে ইংরেজী শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—সহজে চাকরী জুট্‌বে। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বাঙালী যে পরিমাণে ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রসর হতে লাগ্‌ল, চাকুরীর মোহ তার সেই পরিমাণে বেড়ে গেল। তারপর যখন ডেপুটি-কলেক্টরী, মুন্সেফী প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হল এবং গবরমেণ্ট আফিসে অল্লাধিক বেতনের কেরাণীগিরির দ্বার উন্মুক্ত হল, তখন দশ পনেরো বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার এক চরম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল শীঘ্র শীঘ্র পাশ করে এইরূপ একটা পদলাভ করা। ক্রমে ইংরেজীনবীশ বঙ্গযুবকেরা কেরাণী, উকীল, মাষ্টার, ডাক্তার হয়ে উত্তর-ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়্‌লো—মনে ভাবলে এই নূতন শিক্ষা দীক্ষা ও সাহেবীয়ানার চক্‌চকানি নিয়ে তারা না জানি কোন্ দিগ্বিজয়ে বাহির হয়েছে। কিন্তু কেউ তখন বুঝ্‌লে না যে বিপদের মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠছে। এদিকে অবসর বুঝে তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বিশেষতঃ মাড়বার থেকে একদল লোক 'লোটাকম্বল' মাত্র সম্বল করে কল্‌কাতায় এসে আপন পুরুষকারের বলে, অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের সহায়তায় বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য

হস্তগত করে নিলে। বাঙালীর মুখে তখন ইংরেজী বুলি আর অন্তরে মাড়োয়ারীর প্রতি ঘৃণা,—তাহারা অসভ্য ছাতুখোর। কিন্তু ইংরেজীশিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা ছাপ এ ক্ষেত্রে বাঙালীকে রক্ষা করতে পারলে না। বাঙালী হটে গেল; ব্যবসা গেল, বাণিজ্য গে , কৌস গেল; তারপর চাকুরীও আর মেলে না। প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের সামঞ্জস্য রইল না—পাশ-করা ছেলের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল কিন্তু সে পরিমাণে অজস্র চাকুরী সৃষ্টি হল না। তাই বাঙালী এখন দরিদ্র, রোগগ্রস্ত; মধ্যবিত্তের আজ অন্নসমস্যা, অস্তিত্ব-সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু মোহ ঘুচেছে কি?

শিক্ষা সকলের চাই—ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মেণী জাপান প্রভৃতি দেশে আপামর সাধারণের মধ্যে যে প্রকার শিক্ষার বিস্তার হয়েছে তার তুলনায় আমরা যে কোথায় পড়ে আছি তার স্থিরতাই হয় না। কিন্তু শিক্ষার অর্থ কি শুধু ডিগ্রী নেওয়া? বিলাতের মাট্রিকুলেশান এদেশের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার প্রায় কাছাকাছি। সেখানে মাট্রিক পাশ করে শতকরা ১০।১৫ জন ছাত্র কলেজে প্রবেশ করে। বাকী যায় কোথা? তারা অবশ্য উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে না অথবা সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় না। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবিধ ক্ষেত্রে নানারূপে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করে এবং হাতে কলমে কাজ শিখে, ভবিষ্যতে প্রায় সকলেই কাজের লোক হয়ে ওঠে। কিন্তু এদেশে ম্যাট্রিক পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে না পারলে যুবকগণ ভাবেন জীবনটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। তারপর আই-এ পাশ করলে বি-এ পড়তে হবে, আই-এসসি পাশ করলে বি-এসসি; নইলে উপায় নেই। এমার্সন্ বলেন University makes a havoe of originality!" দলে দলে ১ম, ২য় ও ৩য় বিভাগে পাশ করানো যেন কল থেকে ১, ২, ৩নং সুরকী বার করা; এখানে ভাল পোড়ের ইট আমা-ঝামার সঙ্গে পেষাই হয়ে গিয়ে সুরকীতে পরিণত হয়। যার স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তি যেমনই হোক না কেন, সকলকেই যেতে হবে সেই এক গোল গর্ত্তের মধ্যদিয়ে। এতে মানুষের মৌলিকতা বড় নষ্ট হয়ে যায়। কথাগুলি খুব সত্য; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই সহজ সত্যগুলি আমরা এত সহজে অস্বীকার করি যে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে এই একই কথা বার বার বলতে হচ্ছে। দু'চারজন যাঁহারা ক্ষণজন্মা, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ধার ধারেননি; যেমন—কেশব সেন, প্রতাপ মজুমদার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, নলিনবিহারী সরকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ ডিগ্রী নিয়ে হাইকোর্টে প্রবেশ করলে 'গীতাঞ্জলি' পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। ব্যবসাক্ষেত্রে যে ক'জন বাঙালী কৃতী হয়েছেন, স্যর রাজেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। তাঁর ডিগ্রী কি? Calendar খুজলে পাবেন না। সেটা বড় শুভক্ষণ যে তিনি বি-ই হননি, হলে বড় জোর গবরমেণ্টের অধীনে মোটা মাহিনার একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকতেন।

ব্যবসা সম্পর্কে বাঙ্গালাদেশে পাটের কথা আগে মনে হয়।

পাট জন্মায় শুধু বাংলায়। সিরাজগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পাটের খুব বড় বড় আড়ত আছে। কিন্তু আমরা সে দিকে তাকাই না। দেশের উৎপন্ন দ্রব্য থেকে সেই দেশের লোকে যে সহজে টাকা রোজগার করতে পারে এ ধারণা আমাদের স্পষ্ট হয় না। আমরা অপদার্থ; ছেলে পাস হবার পর তার চাকরীর জন্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়ে nomination চাই, তাঁকে শত অনুনয় করি, খাঁটি (তাও আর মেলে না) সরিসার তৈল মর্দ্দন করি। পনেরো টাকার নকলনবীশির জন্য সাহেবের বড় বাবু ও তাঁর আফিসের পেয়াদার খোসামদ করে ছ মাস কাটাতে আমাদের লজ্জাবোধ হয় না। এদিকে আমাদেরই জমিতেকে এসে দাদন দিয়ে পাটের কারবার একচেটে করে নেয়? সে মাড়োয়ারী আর্ম্মিনিয়ান, আর ইংরেজ। ইংরেজ সোজা চাষার বাড়ী যায়, মিষ্টি কথা বলে, তাঁর ছেলেপুলের সঙ্গে খেলে ও খেলনা দেয়, আর স্বকার্য্য সাধন করে আসে। জমিদারেরা কি চেষ্টা ক'রে, এত বড় ব্যবসাটা আপন হাতে রাখতে পারে না? একেবারে কিছু র‍্যেলিব্রাদার্স হওয়া যায় না; কিন্তু আত্মচেষ্টায় আস্তে আস্তে হতে পারা যায় ত বটে। পাটের সময় অনেক নিরক্ষর চাষী বিভিন্ন গ্রাম থেকে পাট নিয়ে নিকটবর্ত্তী আড়তে জোগান দিয়ে এসে তিন চার মাসের মধ্যে ১০০০।১২০০ টাকা রোজগার করে নেয়।

বজবজ থেকে আরম্ভ করে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গঙ্গার দুধারে সর্ব্বসুদ্ধ ৭১টি পাটের কল আছে; কলের মালিক সবাই ইংরেজ। তাঁরা শতকরা ১০০ থেকে ১৫০ টাকা ডিভিডেণ্ড দিচ্ছেন। এক একটা পাটের কলের মূলধন ২৫।৩০ লাখ টাকা হবে। তবেই দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক পাটের কল ২৫.৩০ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। আমাদের বর্দ্ধমানের মহারাজার আয় অধিকাংশ পত্তনী বিলি বলিয়া বার লক্ষ টাকার বেশী হবে কিনা সন্দেহ। শুনেছি দ্বারভাঙ্গার মহারাজার ২৫।৩০ লাখ টাকা আয় হবে, অর্থাৎ এক এক একটী পাট কলের আয় আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদারের আয়ের সঙ্গে সমান। এই কয় বৎসরে সমস্ত পাটের কলে বৎসরে ১০.১২ কোটি টাকা রোজগার কলওয়ালারা বিদেশে নিয়ে গেছেন। এ লাভের কারবারে এদেশীদের কোন হাত নেই,—সব বিদেশীর। ভারতবর্ষের লোকেরা পাটকলের কুলি।

কলকাতায় দশহাজার ভাটিয়া আছেন। তাঁদের সকলেরই কারবার আছে। সবাই অবস্থাপন্ন, তাঁদের মধ্যে কেরাণী নেই। কলকাতায় মাড়োয়ারীর সংখ্যা ৯০,০০০ থেকে ১০০,০০০ মধ্যে। সকলেই সঙ্গতিপন্ন। যাঁর খুবই কম আয় তিনি মাসে ১০০ টাকা রোজগার করেন। আর কল্‌কাতার লক্ষপতিরা যে অনেকেই মাড়োয়ারী একথা কারও অবিদিত নাই। ছেলে নকুরী (চাকরী) করবে এরূপ ভাবতে মাড়োয়ারী অপমান

বোধ করেন। দিল্লীওয়ালাও কলকাতায় অনেক আছেন। মুরগীহাটায় তাঁদের বড় বড় দোকান। আমড়াতলার গলিতে প্রকাণ্ড দ্বিতল ত্রিতল বাড়ী তাঁরা হাজার টাকায় ভাড়া করেছেন। সেখানে বিস্কুট, ঔষধ, দিয়াশলাই প্রভৃতি জিনিষ বোঝাই করা আছে। এ সব বিদেশী মালের এঁরা একমাত্র এজেন্ট। পূর্ব্ববাংলা, সুদূর দিল্লী ও রেঙ্গুণ প্রভৃতি স্থানে এঁরা পাইকারী হিসাবে মাল পাঠান। এঁদের আয় যথেষ্ট। দিল্লীওয়ালা মুসলমান ব্যবসা বোঝেন। বাঙ্গালী মুসলমান বোঝেন না। তাঁরা হিন্দুদের চেয়ে এই বিষয়ে নির্জ্জীব ও উপায়বিহীন।

ব্যবসায়ক্ষেত্র থেকে এম্নি করে সব দিকে হটে গেলে আমাদের অন্নসমস্যার মীমাংসা হবে না, অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ইংরেজ, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা—যাঁরা কল্‌কাতার সকল প্রকারের ব্যবসা একচেটে করেছেন—তাঁদের চরণতলে বসে ব্যবসার প্রথম পাট আমাদের শিখতে হবে। তাঁরা যে উপায়ে কৃতী হয়েছেন আমাদেরও সেই উপায় অবলম্বন কর্‌তে হবে। আলস্য ও বিলাস ছাড়িতে হবে।

—প্রবাসী"।

শিল্পের ভবিষ্যৎ

যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণী শিল্পে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে ইংলণ্ডের অনেক শিল্প জার্ম্মাণীর হস্তগত হইয়াছিল। দেখা গিয়াছে, জার্ম্মাণীর সরকার শিল্পসম্বন্ধে এমন নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন—পণ্যের উপকরণ ও পণ্য আমদদানি রপ্তানী সম্বন্ধে রেলে ও জাহাজে ভাড়ার এমন সুবিধা করিয়া দিয়াছেন যে, বিলাত হইতে উপকরণ লইয়া যাইয়া জার্ম্মাণীতে পণ্য প্রস্তুত করিয়া সেই পণ্য আবার বিলাতে বেচিয়াও জার্ম্মাণী লাভ করিয়াছে। যুদ্ধের পর যাহাতে আবার সেইরূপ না ঘটে, সেজন্য চেষ্টা চলিতেছিল। যাঁহারা এককালে অবাধ বাণিজ্যের অবাধ সমর্থক ছিলেন, তাঁহারাও আপনাদের পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনেক জিনিষ কেবল জার্ম্মাণীতেই প্রস্তুত হইত—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত বর্ণ জার্ম্মাণী প্রস্তুত করিত; যুদ্ধের সময় সেই রঙের অভাবে বিলাতের কাপড়ের শিল্পও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। শেষে বিলাতি সরকার সাহার্য্য দিয়া দেশে রঙের কারখানা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছিলেন। যে সব শিল্পের উপর অন্য শিল্প নির্ভর করে, সেই সব মূল শিল্প বা Key Industries যাহাতে বিলাতের প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট হয়, সেজন্য বিলাতে বিশেষ চেষ্টা এবং প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠাও করা হইয়াছিল।

এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে—কিন্তু জার্ম্মাণীর শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে বৃটিষ শিল্প রক্ষা করিবার উপযুক্ত উপায় হইল না। তাই লোক আবার শঙ্কিত হইতেছে! ইহার

উপরে বিলাতে শ্রমজীবীদিগের গোল। তাহারা যুদ্ধের সময় যেরূপ অধিক পারিশ্রমিক পাইয়াছে, এখন তাহাই চলিতেছে—না পাইলে ধর্ম্মঘট করিতেছে। শ্রমজীবীদিগের সহিত এই দ্বন্দে মহাজনরা পরাভব মানিতেছেন। বিলাতে শ্রমজীবীদিগের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইয়াছে—কারণ, এই যুদ্ধের সময় মহিলারা যে সব কাজ করিয়াছে, পূর্ব্বে তাহারা সে সব কাজ করিত না। তাহারাও এখন সে সব কাজ করিতে চাহিবে। তাহা হইলে প্রয়োজন সরবরাহের সাধারণ নিয়মে পারিশ্রমিকের হার কতকটা কমিয়া যাইবে। যাইলেও পারিশ্রমিক আর পূর্ব্ববৎ হইবে না—বাড়াইতেই হইবে।

এখন বিলাতের ব্যবসায়ীরা ভয় করিতেছে জার্ম্মাণীর, জাপানের ও মার্কিণের প্রতিযোগিতায় বিলাতের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বিলাতের বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি সার অকল্যাণ্ড গেডেস কথার আলোচনা করিয়া লণ্ডনে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন ও সেই বক্তৃতায় বৃটিষ ব্যবসায়ী দিগকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি তিন দেশের কথা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিয়া অভয় দিয়াছেন—"মা ভৈঃ!" ব্যবসার ক্ষেত্রে ইংরাজের প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়ায় এমন কেহ নাই। জার্ম্মাণীই বল, আর জাপানই বল, আর মার্কিণই বল সকলেরই 'গৌর' হ'তে অনেক বাকি।

বিদেশীর সহিত ব্যবসা—"ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স সম্বন্ধে স্যার জর্জ্জ বার্ণেস বলিয়াছেন যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের দ্বারা গঠিত কমিটি কর্ত্তৃক ঐ সমস্যাটী পরীক্ষা করিয়া দেখা হউক। আমি বলি, আমদানি রপ্তানি শুল্ক সম্বন্ধে সমস্ত কথাই প্রস্তাবিত কমিটী বিচার করিয়া দেখুন। তাঁহারা যেন ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের কেবল একটা দিক দেখিয়া নিরস্ত না হন। এ বিষয়ে জনসাধারণের সাক্ষ্যও যেন তাঁহারা লইতে পারেন। যাঁহারা বলেন যে, মাঞ্চেষ্টরের মালে ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স নীতি প্রয়োগে ভারতবাসীর যত আপত্তি জাপান প্রভৃতি দেশজাত দ্রব্যের সম্বন্ধে ততটা আপত্তি নাই, তাঁহাদের উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমি ঐরূপ অনুযোগের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। যে ভাবে এবং যে উপায়ে ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স নীতি প্রথমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহারই প্রতিবাদ আমি করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়ে ভারতবাসী জনসাধারণের মতামত জানা কর্ত্তব্য। প্রাদেশিক গবরমেণ্ট সমূহে শিল্পবিভাগের কর্ত্তৃত্বভার বৈদেশীয় মন্ত্রিদের হাতে ন্যস্ত হওয়ায় আমি তাঁহাদের নিন্দা করিতেছি। এতদিন এদেশে শিল্পোন্নতি না হওয়ার প্রধান হেতু এই যে, সিভিল সার্ভিস দলভুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীরাই সকল বিষয়ে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন; অথচ ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের মূল ধারার সহিত তাঁহাদের যোগ ছিল না।

"আজকাল এদেশে অনেক নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অবশ্য নূতন কোম্পানীর পরিচালন ভার বিশেষজ্ঞগণের হাতে দেওয়া উচিত এবং তাঁহাদের পক্ষেও

খুব সাবধানতার সহিত কাজ করা কর্ত্তব্য। তবে আনন্দের বিষয়, আমাদের দেশের ব্যবসাদারেরা ব্যবসায়ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কিং, সিপিং (জাহাজ পরিচালন) ও ইন্সিওরেন্সের (বিমার) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন। নূতন ব্যবসাদারগণের সর্ব্ববিধ অসুবিধা দূর করা, অস্বাভাবিক বাধা-বিঘ্ন সরাইয়া দেওয়া ও সাফল্য লাভ বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা গবরমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, গবরমেণ্ট এখনও কোম্পানীসমূহের হাত হইতে রেলের পরিচালন ভার নিজেদের হাতে লইতেছেন না। উহাতে লোকের যাতায়াতের এবং মাল চালানের সুবিধা যদি বাড়ে, তাহা হইলে অতিরিক্ত ব্যয় সহ্য করিতে ভারতবাসী কুণ্ঠীত হইবে না।

"অধুনা এদেশে কারেন্সী ও এক্সচেঞ্জ (বাটা) সমস্যা বড়ই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের সময় এদেশে সোণা আমদানি বন্ধ করায় এই কুফল দেখা দিয়াছে। আমাদের মতে এদেশে সোণা আমদানির পথ অবারিত করিয়া দেওয়াই ইহার একমাত্র প্রতিকার।

স্যার টমাস হলাণ্ডের নেতৃত্বে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশন যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। ভারত গবরমেণ্টের অধীনে শ্রমশিল্প বিভাগ অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করা হউক। দুঃখের বিষয় ভারতের সওদাগর শ্রেণীর কোন প্রতিনিধিকে মন্ত্রিসভায় যাইতে দেওয়া হয় নাই। ভবিষ্যতে কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্ব্বে ভারতীয় সওদাগরগণের মতামত যেন লওয়া হয়। মেসোপেটেমিয়ায় ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতের পক্ষে এক একজন ট্রেড কমিশনার এবং অন্যান্য স্থানে বৃটিশ কন্‌সালগণের (রাজদূতগণের) তাঁবে ভারতব্যবসায়ীদলের এক একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করা হউক। পূর্ব্ব আফ্রিকার ভারতীয়গণকে হটাইয়া দিবার জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহা নিতান্ত গর্হিত।

ভারতে শ্রমিকদলের যোগ্যতা বাড়াইয়া তোলা এবং তাহাদিগকে শিক্ষিত কর নিতান্ত দরকার। ইহাই প্রকৃত উন্নতির মূল। শাসন-সংস্কার আইনের বলে যদি আমরা জনসাধারণের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে পারি এবং তাহাদিগকে শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে পথ দেখাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে অধুনা শ্রমিকদলের বেতন, বাসগৃহ, অস্বাস্থ্যতা, মাদকতা প্রভৃতি যে সকল সমস্যার আলোড়নে আমরা বিব্রত হইয়াছি তাহার স্থলে শান্তি আনন্দ ও উন্নতি দেখা দিবে। বিগত ২৪শে জানুয়ারি তারিখে শ্রমশিল্প কন্‌ফারেন্সের বৈঠকে শ্রীযুক্ত যমুনদাস দ্বারকাদাস এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, এদেশে শ্রমিকগণের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের নিমিত্ত বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিগণের সমবায়ে এক কমিশন নিয়োগ করা হউক। অতঃপর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করা হয়, এই কন্‌ফারেন্সের মতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রস্তাব সংক্রান্ত বিলটি আগাগোড়া প্রকাশ করিয়া ঐ সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের মতামত জানিতে

চাওয়া কর্ত্তৃপক্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধারণের অভিমত না শুনিয়া কোন ব্যবস্থা পাক করা উচিত নহে। নুতন প্রস্তাব অনুসারে ব্যাঙ্কসমূহের সম্মিলন ব্যবস্থায় ভারতীয়গণের স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষিত হইবে না। অতএব যে পর্য্যন্ত না সকল বোর্ডে উপযুক্ত সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়, সে পর্য্যন্ত গবরমেণ্ট প্রস্তাবিত স্কিমটী সমাপন না করেন। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমুহের সহিত প্রতিযোগিতায় আশঙ্কায় প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কটীর কোন ন্যায়সঙ্গত ব্যাঙ্কিং অধিকার যে ক্ষুণ্ণ করা না হয়।

এই প্রস্তাটী সভায় সানন্দে পরিগৃহীত হইলে আর একটী প্রস্তাব এই মর্ম্মে পাশ হয় যে, ভারতীয় রেলরোডসমুহ গভরমেণ্টর তত্ত্বাবধানে লওয়া হউক এবং রেলের পরিচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের নিমিত্ত যে, কমিটী বসিবে তাহাতে যেন উপযুক্ত সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়।

অনারেবল শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস প্রস্তাব করেন যে, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল (শ্রমশিল্প বিষয়ক) ও কমার্শিয়াল (ব্যবসার বিষয়ক) কংগ্রেস সম্মিলিত হউক। উহার গঠন সম্বন্ধে নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত জন্য প্রতিষ্ঠাবন ব্যক্তিগণের সমবায়ে এক কমিটী নিয়োগ করা হউক। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডে ও অন্যান্য স্থানে যথা প্রয়োজন বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।

পরবর্ত্তী প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, ভারতে মাদকতা রোধ কল্পে মদ চোয়ান, মদ আমদানি করা এবং উহা বিক্রয় করা বন্ধ করিতে হইবে। এই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইলে বড়ই আনন্দের বিষয়।

ইহার পর সভাপতি স্যার ফজলভাই করিমভাই প্রস্তাব করেন যে. সারা পৃথিবীর প্রধান বানিজ্য কেন্দ্রে শ্রমশিল্প সম্পর্কে ও ব্যবসাবানিজ্যে ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টী রাখিবার জন্য ব্যবসায়াভিজ্ঞ ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। অতএব কনফারেন্সের পক্ষ হইতে গভরমেণ্টকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান হইতেছে যে, মার্কিণ রাজ্যে, জর্ম্মণীতে, ফ্রান্সে, জাপানে ও চীনে বৃটিশ রাজদূতের তাঁবে এক একজন ভারতীয় বাণিজ্য-সহকারী নিয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং আফ্রিকায় ও মেসোপোটেমিয়ার ভারতের ট্রেড-কমিশনার রাখা নিতান্ত দরকার। এ প্রস্তাবটী গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইলে ভারতে বাণিজ্যের প্রসার বাড়িবে এরূপ আশাকরা যায়।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২০শ খণ্ড। | ফাল্গুন, ১৩২৬ সাল। | ১১ সংখ্যা

দারিদ্র সমস্যা

রাঙা বউ দেখিবার সাধ কেন ?

(১)

নিম্ন শ্রেণীর কথা ছাড়িয়া দি, আমাদের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও দারিদ্র্যের একাধিক কারণ আছে। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা 'স্বখাত সলিলে' ডুবিয়া মরিতেছি।

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের মধ্যে ভবিষ্যৎ দৃষ্টির যে কতকটা অভাব, একটি ব্যাপারে তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। বাঙ্গালী পিতারা অধিকাংশ সময়েই অল্প-বয়সে ছেলের বিবাহ দিয়া থাকেন। আমাদের মধ্যে গোঁড়ারা অল্প বয়সে মেয়ের বিবাহ দিয়া থাকেন; (তাঁহাদের মতে) নাহলে চিরাচরিত আচার-ধর্ম্ম বজায় থাকে না! বেশ, এটাও যেন চোক-কাণ বুজিয়া কোন রকমে মানিয়া লইলাম। কিন্তু এদেশে অল্প বয়সে ছেলের বিয়ে দেওয়া হয় কেন? আচার-ধর্ম্ম ত মেয়ের মত ছেলেকেও অরক্ষণীয় বলে না!

বঙ্গালী পরিবারের মধ্যে সাধারণত ষোল-সতেরো হইতে সুরু করিয়া বাইশ তেইশ বৎসরের মধ্যেই বেশীরভাগ ছেলের বিবাহ শেষ হইয়া যায়। এ-বয়সে ছেলেরা প্রায়ই স্কুল-কলেজের ছাত্র থাকে। ফলে সুধুই যে তাহাদের পড়াশুনার ক্ষতি হয়, তাহা নয়; তাহাদের ভবিষ্যতের আশা-ভরসাও সমস্ত ফরসা হইয়া যায়।

এমন অল্প বয়সে ছেলের বিবাহ দিলে মায়ের "রাঙা বউ দেখিবার সাধ" এবং বরপণের দৌলতে বাপের শূন্য পকেট পূর্ণ হইয়া যায় বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিষবৃক্ষে যে কি মারাত্মক ফল ফলে, তাহার কথা কি একবারও ভাবিয়া দেখেন?

আমরা দেখিয়াছি, স্কুল-কলেজ ছাড়িতে না ছাড়িতেই অনেক বাঙ্গালী যুবক দুই এক সন্তানের পিতা হইয়া পড়িয়াছে! একেই ত আজ কালকার দিনে বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত পরিবারের দুর্দ্দশার সীমা নাই, তাহাদের আজ আনিতে কাল কুলায় না। তাহার উপরে জীবন-সংগ্রামে উপযোগী এবং অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হইবার আগেই যুবকেরা যদি সন্তান-জনক হইয়া পড়ে, তবে তাহাদের জীবনের সকল আশার আলো কি অন্ধকারের ঝাপটায় নিবিয়া যায় না?

ছাত্র-জীবনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যুবকদের জীবনে যে সময়টা আসে, সেটা হইতেছে স্থিরভাবে চিন্তা করিবার সময়। কারণ, জীবনের ঐ সময়টাতেই আমরা সকলেই ভবিষ্যতের পথ চিনিয়া লইতে চাই। সংসার অরণ্যে পথ ত আর একটি দুটি নয়—তাহার নানা দিকে নানা পথ! কোন্ পথ কাহার উপযোগী, সেটা অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, অনেক ভুগিয়া-ঠকিয়া স্থির করিয়া লইতে হয়। এ সময়ে মানুষ যদি স্বাধীন থাকে, তাহা হইলে সে পথ হারাইবার ভয় না রাখিয়াই নূতন পথের খোঁজে বিপথে গিয়া পড়িলেও সে আবার ফিরিয়া আসিয়া নূতন করিয়া সুপথের সন্ধান করিতে পারিবে। মানুষ যখন স্বাধীন, তখন তাহার দু-চারটি বিভিন্ন পথে ঘুরিয়া, অবশেষে আপনার উপযোগী পথ চিনিয়া লইবার সময় ও সুযোগ থাকে—প্রথম চেষ্টাতেই ঠিক পথটি চিনিবার সৌভাগ্য খুব অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া যায়।

কিন্তু পথ চলিবার আগেই যে হতভাগ্য যুবকের স্কন্ধে স্ত্রী-পুত্র কন্যার ভার অর্পিত হয়, তাহার ভাগ্যে এমন হাতে-নাতে পরখ করিয়া, বহু পথের ভিতর হইতে নিজের উপযোগী পথ চিনিয়া লইবার অবকাশ ত ঘটে না। নূতন পথে চলিতে সে ভয় পায়—"কি জানি, যদি বিপথে গিয়া পড়ি, তবে আমার স্ত্রী-পুত্রের দশা কি হইবে? তার চেয়ে বেশী লোভ ছাড়িয়া সকলের চলা পরিচিত পুরাতন পথেই অগ্রসর হওয়া ভালো!"

এই "পরিচিত, পুরাতন পথ, বা উপায়টি কি? সবাই যা করে—অর্থাৎ, হয় পঁচিশ-ত্রিশ টাকা মাহিনায় পরের দাসত্ব স্বীকার করা, নয় মক্কেল-হীন উকিল বা রোগী-শূন্য ডাক্তার হওয়া! অল্পবয়সে বিবাহ, তার ফলে অসময়ে পুত্র-কন্যা এবং তার ফলে দুশ্চিন্তায় অন্ধ হইয়া দারিদ্র্য-কূপে ঝাঁপ দিয়া পড়া,—মধ্যবিত্ত পরিবারের অধিকাংশ যুবকের জীবনেই এই করুণ কাহিনী দেখা যায়।

পিতা যখন সাধ করিয়া ঘটা করিয়া পুত্রের বিবাহ দেন, তখন উৎসবের আনন্দে তাঁহার আর কিছু ভাবিবার অবসর হয় না। যাহার পরিবার প্রতিপালনের শক্তি নাই, যে রোজগার করিতে জানে না, তাহার মাথার উপরেই তিনি অন্যের ভার চাপাইয়া দেন। তখন একথা তাঁহার মনে পড়ে না যে, তিনি অমর নন। আজ তিনি চোখ মুদিলে, কাল তাঁহার ছেলে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পথে গিয়া দাঁড়াইবে। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই মূর্খতার অভিনয়।

অসময়ে, অল্প-বয়সে বিবাহ করিয়া বাঙ্গালী তাহার দারিদ্র্য-সমস্যাকে আরো গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। অনেক অল্প বয়সে বিবাহের স্বপক্ষে একটি যুক্তি দেখান—বিবাহের সঙ্গে যে স্বপ্নময় কোমলতা ও সুমধুর কবিত্বের ভাব মাখানো থাকে, বেশী বয়সে প্রজাপতির কৃপাদৃষ্টি লাভ করিলে, মানুষ আর তাহার রস উপভোগ করিতে পারে না—প্রথম যৌবনেই কবিত্বের সাড়া পাওয়া যায়। বয়স-বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সংসারকে যত-বেশী চিনিতে পারে, যত-বেশী বাস্তবতার সংস্পর্শে আসে, তাহার প্রাণ ততই কাঠ-কঠোর হইয়া পড়ে, তাহার কবিত্বের স্বপ্ন ততই ঘোলাটে হইয়া আসে। অতএব, যথার্থ উপভোগের যুগেই বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু যেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি, সেখানে কবিত্ব-প্রকাশ করা কি সাধারণ মানুষের পক্ষে অশোভন নয়? স্থান-কাল-পাত্রের বিচার ভুলিলে জগতে আমাদিগকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। বাঙ্গালাদেশে যাঁহাদের ট্যাকে দক্ষিণ যন্ত্রের উপায় আছে, যাঁহাদের অবকাশের অভাব নাই, যাঁহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মুখ শুকাইতে হয় না, তাঁহারা অল্পবয়সে বিবাহ করুন, কবিত্বের নেশায় মস্‌গুল্ থাকুন, দুনিয়াকে স্বপ্ন বলিয়া ভাবুন,—আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু যেখানে দারিদ্র্যের অন্ধকার ওৎ পাতিয়া আছে, সেখানে এই অসাময়িক কবিত্বের উৎপাত যেমন সাংঘাতিক, তেমনি অশোভন,—প্রত্যেক বাঙ্গালী পিতার এই সত্যকথাটি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত!

বাঙ্গালাদেশে এখন দারিদ্র্য-সমস্যা হইতেছে, সব-চেয়ে বড় সমস্যা। এ সমস্যা এদেশে অনেকদিন হইতেই আছে; কিন্তু গত যুদ্ধের পর হইতে তাহার মুর্ত্তি যেমন অধিক-স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তেমন আর কখনও হয় নাই।

সকালে-সন্ধ্যায় পথে পথে ঐ যে কাতারে কাতারে কেরাণীর দল চলিয়াছে, তাহাদের মুখে-চোখে কি যে দুশ্চিন্তার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া আছে, আপনারা তাহা কি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন? ভদ্র পরিবারে তাহাদের জন্ম এবং তাহাদের অনেকেরই কপালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপ মারা আছে। কিন্তু বংশগৌরবে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যতটা সহজ,—অর্থলাভ করা ততটা সহজ নয়। তাহাদের জীবনেও একদিন 'আকাশভেদী' উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু সে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আজ "নিশার স্বপনে" পরিণত হইয়াছে।

মন-গড়া কথা বলিতেছি না,—স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কোন কোন কেরাণীর পরিবারে এখন একবেলার বেশী কেহ খাইতে পায় না। আমরা আর-একটি পরিবারকে জানি, একসময়ে সে পরিবারের অবস্থা বেশ উন্নত ছিল। কিন্তু আজ সে পরিবারের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সকালে উঠিয়া মিষ্টান্নের অভাবে কি খায় জানেন—ভাতের ফেন!

ভদ্রতার বালাই এখন এই শ্রেণীর লোকদের পক্ষে কাল হইয়া উঠিয়াছে। এখান-

কার বাজারে বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ টাকার কেরাণাগিরি করা, আর তিলে-তিলে মৃত্যুমুখে পড়া,—একই কথা। তার চেয়ে দেশে এমন অনেক কাজ আছে, যাহাতে বাবুত্বের খাতির পাওয়া যায় না, তবে প্রাণরক্ষার উপায় করা যায়। কিন্তু অত্যন্ত 'ভদ্র' বাঙ্গালী প্রাণপণ করিয়া বসিয়া আছে, যাহাতে বাবুত্বের মহিমা ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে, সেদিকে এক পা অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব—রাত্রে সূর্য্যোদয়ের মত একেবারেই অসম্ভব!

অথচ যে আমেরিকা এখন সমস্ত সভ্য দেশের আগে-আগে চলিয়াছে, মানে-জ্ঞানে-ধনে—সব দিকেই যে এখন অগ্রণী, সেই আমেরিকায় 'ছোটকাজ' বা 'বড়কাজ' বলিয়া কার্য্যের কোন শ্রেণী-বিভাগ নাই। যে কাজ অন্যায় নয়, সে কাজ সবাই করিতে পারে—ভদ্র-অভদ্র নির্ব্বিশেষে। সুধু আমেরিকা কেন, ইংলণ্ডেও স্বাবলম্বনের জন্য কোন কাজই হীন কাজ নয়। তাহার ফলে, কত কুলি-মজুর, কশাই-মুচীর ছেলে আজ স্যর-ব্যারোনেট-ব্যারন উপাধি পাইয়া কুলীন-সম্প্রদায়ের এক-একটী শিরোমণি হইয়া আছেন, তাহা আর বলা যায় না। এই সেদিন বিলাতী খবরের কাগজে পড়িলাম, সেখানে সুধু পুরুষ নয়,—অনেক গ্রাজুয়েট ভদ্রমহিলাও আজকাল অসঙ্কোচে হোটেলে, চায়ের দোকানে খানসামার কার্য্যগ্রহণ করিতেছে এবং সেজন্য সমাজে তাঁহাদের মাথা হেঁট হইয়া যাইতেছে না।

পাশ্চাত্য দেশে যে-সব বাঙ্গালী যায়, তাহাদের গায়েও স্বাধীন দেশের এই অবাধ হাওয়া লাগিতে বিলম্ব হয় না। আমেরিকায় গিয়া অনেক গরিব বাঙ্গালী ছাত্র লেখাপড়ার খরচ চালাইবার জন্য যে-সব কাজ করিয়া শরীর খাটাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, সে-সব কাজের নাম শুনিলেও বোধ হয় এদেশের অনেক পনেরো টাকা মাহিনার 'ভদ্র' করাণী কানে আঙুল দিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িবেন। কিন্তু আমেরিকায় কেহ তাহাদিগকে ঘৃণা করে না। কারণ স্বাবলম্বন সেখানকার মূলমন্ত্র। কোন বিশেষ কাজ করে বলিয়া কেহ সেখানে ঘৃণা-নিন্দার পাত্র হয় না,—ঘৃণিত-নিন্দিত সেখানে অলস-নিষ্কর্ম্মার দল, বাঙ্গ'লার ঘরে-বাইরে যাহাদিগকে যত্র-তত্র দলে-দলে দেখা যায়! সেখানে যিনি কোটিপতির সন্তান, তিনিও আপিসে-কারখানায় কুলি-মজুরের সঙ্গে সমানভাবে মিলিয়া-মিশিয়া হাতে-নাতে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক, কোন কাজের সঙ্গেই 'ছোটত্ব' বা 'বড়ত্ব' মাখানো নাই। নিজের দোষে গুণেই মানুষ শ্রেয় বা হেয়। চোর পুরোহিত এবং সাধু মুচী,—এ দুইয়ের মধ্যে মধ্যে কে বেশী শ্রদ্ধার পাত্র?

যে কার্য্য সমাজ-বিধি বা সুনীতির পরিপন্থী নয়,—সে কাজ সবাই করিতে পারে। বাঙ্গালাকে—অর্থাৎ এদেশের তথাকথিত ভদ্র বাবুদিকে এমন সর্ব্বদাই এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। পৃথিবীতে এখন যে সময় পড়িয়াছে, যে বাতাস উঠিয়াছে, যে স্রোত

রহিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, যাহারা কাজকে ঘৃণা করিবে, তাহারা জীবন-সংগ্রামে নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই রসাতলে যাইবে,—এককথায় তাহারা নিশ্চয়ই মরিবে!

অনাহারে-অর্দ্ধাহারে, দুঃখে দুশ্চিন্তায় আমাদের দিন কাটিয়া যাইতেছে, তবু আমরা বাবুত্বের সখের খোলস ছাড়িতে পারিতেছি না, মাথার উপরে দুঃসময়ের দুর্য্যোগ আসন্ন-প্রায়, তবু আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক ধোয়া জল খাইয়াই শূন্য উদরকে আত্মগৌরবে স্ফীত করিয়া রাখিতেছি; আর ও দিকে ভারতের অন্য প্রান্ত হইতে মাড়োয়াড়ীরা পঙ্গপালের মত ছুটিয়া আসিতেছে এবং আমাদের চোখের উপরেই আমাদের দেশের উপরে জাঁকাইয়া বসিয়া, আমাদের দেশের টাকা হাতাইয়া আবার আমাদিগকেই তাহাদের আপিসের কেরাণীর কাজে খাটাইয়া লইতেছে। এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য অসম্ভব হইল কেন? কারণ, আমাদের মত মাড়োয়াড়ীরা কাজের ভিতরে উঁচু-নীচু, ছোট-বড় দুই শ্রেণী বিভাগ করে নাই।

ভারতবর্ষে আগে একটি বাঁধা নিয়ম ছিল। তখন প্রত্যেকেই প্রায় আপন আপন জাতিগত কাজ-কর্ম্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। বামুনের ছেলে কবিরাজী বা বৈদ্যের ছেলে কাঁসারীর কাজ করিত না।

একালে অন্যান্য বিভাগের মত এদিকেও ভেদাভেদ চলিয়া গিয়াছে। কোন কাজই বা কোন ব্যবসাই এখন আর জাতিগত নয়। এখন যার যে কাজ খুসি, তাহাতেই যোগদান করিতেছে। অসিজীবী ক্ষত্রিয়-পুত্রকে এখন মসীজীবী কেরাণী হইতে দেখিলেও, কেহ কোন কথা কহে না।

আগেকার বাঁধা নিয়মে যে কয়েকখানি সঙ্কীর্ণতা ছিল, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অধিকাংশ ক্ষত্রিয়ের চেয়ে অস্ত্রচালন-বিদ্যায় সমধিক নিপুণতার প্রকাশ্য পরিচয় দিয়া, অ-ক্ষত্রিয় একলব্য কি কঠিন শাস্তিভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ বাঁধা নিয়মের সবটাই মন্দ ছিল না, তাহার মধ্যে ভালোর ভাগও যথেষ্ট ছিল।

আমাদের বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের একটি প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, এখন সকলেই এক-একটী বিশেষ কাজের দিগে অন্ধের মত ছুটিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণের পৌরহিত্য ব্যবসায় ছাড়া আর কোন ভদ্রোচিত ব্যবসাই এখন জাতিগত নয়।

স্কুল-কলেজে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ হইতে সুরু করিয়া আজকাল চাষা; মুচী প্রভৃতি জাতি পর্য্যন্ত পড়া-শুনা করিতেছে। বেশ, এ ভালো লক্ষণ। বিদ্যার যতই প্রচার হয়, ততই মঙ্গল।

কিন্তু এমন করিয়া বাহির হইতে না দেখিয়া, ছাত্রদের মনের ভিতরে যদি দৃষ্টিপাত করি, তবে আমরা কি দেখিব। বাঙ্গালাদেশের সাড়ে পনেরো আনা ছাত্রেরই আশা-

আকাঙ্খা একটী বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাহাদের উদ্দেশ্য বিদ্যালাভ নয়,—বিদ্যাকে উপলক্ষ করিয়া তাহাদের অনেকে চাহে কেরাণী হইতে, কেহ চাহে ডাক্তার হইতে, কেহ চাহে উকিল হইতে।

এমন কি, চাষা, মুচী ও ছুতারের ছেলেও বিদ্যালাভের পরে, আধুনিক উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসারী হইয়া আপন আপন জাতিগত ব্যবসাকে একালের উপযোগী করিয়া তুলিতে রাজি নয়। তাহারা সকলেই "ভদ্রলোক" হইতে—অর্থাৎ চাকুরী বা ডাক্তারী বা ওকালতী করিতে চায়। পুরাণে দেখা যায়, অব্রাহ্মণে তখন ব্রাহ্মণ হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিত। একালে বাঙ্গালা দেশে ছোট জাতিরা, ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে "ভদ্রলোক" লাভের জন্য প্রাণপণে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে!

ফলে দেশে যেমন অসংখ্য কেরাণী, ডাক্তার ও উকিল প্রভৃতির সৃষ্টী হইতেছে, তেমন কাজের লোক, ব্যবসায়ী, শিল্পী ও চাষী প্রভৃতি তৈয়ারি হইতেছে না। পূর্ব্বকথিত তিনটি বিশেষ বিভাগের মধ্যেই সকল জাতির অধিকাংশ লোক একত্র হইয়াছে বলিয়া, ক্রমেই সকলকার আর্থিক উন্নতিও কমিয়া আসিতেছে। এখম অধিকাংশ কেরাণীই যথেষ্ট মাহিনা পায় না এবং অধিকাংশ ডাক্তার ও উকিলই রোগী ও মক্কেলের দেখা পান না।

এককাজে অনেক লোকের সমাগম, এটা যেন এখন এদেশের নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। গোটাদুই ছোট ছোট দৃষ্টান্ত দিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। অধিকাংশ বাঙ্গালীই ব্যবসা করিতে বসিলে বিনা চিন্তায় এক একখানি "ষ্টেশনারি" দেকান খুলিয়া বসে। ফলে এক এক পাড়ায় অনেকগুলি মনিহারীর দোকান হওয়ার দরুণ কাহারোই লাভ হয় না।

যতদিন আমাদের এমন এক কাজে অনেকের ভিড় করার অভ্যাস থাকিবে, ততদিন এদেশের দারিদ্র দূর হইবে না। মানা দিকে নানা লোককে মাথা খাটাইতে হইবে। নুতন পথে চলিতে এবং যেখানে পথ নাই, সেখানেও বুদ্ধি খরচ করিয়া নুতন পথ কাটিয়া লইতে হইবে। তবেই সকলের পক্ষে অর্থোপার্জ্জন সম্ভবপর। দু চারটি মাত্র পাত্রের জলে দেশশুদ্ধ লোক তৃষ্ণা মিটাইতে চাহিলে, কাহারোই তৃষ্ণা নিবারণ হইবেনা, এই সহজ কথাটা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত।

শিল্প-বাণিজ্য কন্‌ফারেন্স

গত ৩০শে জানুয়ারি বোম্বায়ে ইণ্ডিয়ান ইনডাষ্ট্রীয়াল কন্‌ফারেন্স ও ইণ্ডিয়ান কমার্শিয়াল কনফারেন্স, এই দুইটী সভার সম্মিলিত বৈঠকে অনারেবল স্যার ফজলভাই করিমভাই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে আধুনিক শ্রমশিল্প সম্বন্ধে প্রধান প্রধান সমস্যার কথা আলোচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ ভারতে ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স (বিলাতী মালের বিশিষ্টতর সুবিধা) নীতির প্রয়োগ, সরকারী শ্রমশিল্প বিভাগ গঠন, কারেন্সি সমস্যা, শ্রমিকদলের অবস্থায় উন্নতিসাধন প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তিনি আপন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শাসন-সংস্কার আইন সম্বন্ধে তিনি বলেন, "এই আইনটী পাশ করিয়া বৃটিশ গবরমেণ্ট বিপুল মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই ব্যাপারে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগুর কীর্ত্তিকথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নূতন আইন অনুসারে ভারতে আমদানি রপ্তানি শুল্কের উপর দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। অবশ্য উহার মধ্যে বিধি-নিষেধ এখন কতকটা আছে বটে, তথাপি যতটুকু অধিকার দেশবাসীর হস্তে আপাততঃ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই জন্যই বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ বিশেষ ভাবে দেওয়া উচিত। ইহাই শুল্ক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রথম সোপান। এই আইন পরিপুষ্টি লাভ করিলে ক্রমশঃ এদেশজাত কার্পাশ বস্ত্রের উপর শুল্ক উঠিয়া যাইবে।"

প্রথম জার্ম্মাণীর কথা। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, জগতের প্রধান পণ্যোৎপাদক জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে জার্ম্মাণীর এখনও অনেকদিন লাগিবে। জার্ম্মাণীতে পণ্যের উপকরণের অভাব—তথায় শ্রমজীবীরা অবসন্ন ও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে, আর কাজ করিতেছে না। বিলাতে খেলানা প্রস্তুতকারীরা জার্ম্মাণী হইতে খেলানা আমদানী বিষয়ে সরকারকে যাহা জানাইয়াছেন, তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, যুদ্ধ বিরতের পর হইতে বিলাতে জার্ম্মাণী হইতে অতি অল্প পরিমাণ খেলনা আমদানী হইয়াছে। জার্ম্মাণী কি কাজ করিতে পারে নাপারে বৃটিশ খেলনা প্রস্তুতকারীদিগকে তাহা দেখাইবার জন্যই বোর্ড অব ট্রেড সে খেলনা আমদানী করিয়াছেন। জার্ম্মাণীর প্রতিযোগিতার ভয় ভিত্তিহীন;

দ্বিতীয় জাপানের কথা। জাপানে শ্রমজীবীর পারিশ্রমিকের হার বাড়িয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে তাহারা কয় আনা করিয়া পাইত—এখন আর তাহা নাই। ওদিকে তাহাদের খাদ্য চাউলের দাম চতুর্গুণ হইয়া উঠিয়াছে। জাপানী শ্রমজীবী নৈপুণ্যে বৃটিশ শ্রমজীবীর সমকক্ষ নহে।

তৃতীয়, মার্কিণের কথা। জগতের সব দেশে বাণিজ্যের সুবিধাটা আমেরিকার নাই। মার্কিণের গোলও আছে—ব্যবসার প্রতিবন্ধক বিদ্যমান। বাট্টার হিসাবেও মার্কিণের অসুবিধা আছে। যদি বৃটিশজাতি রপ্তানী মালের ব্যবসার উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর

হয়, তবে মার্কিণ কখনই জগতের ব্যবসার বাজার হইতে বিলাতী ব্যবসায়ীদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিবেন না। জগতের যে দেশে যে জিনিষের অভাব, তাহা সরবরাহ করিবার সুবিধা বিলাতে যত আছে, আর কাহারও তত নহে।

উপসংহারে সার অকল্যাণ্ড বলেন, শ্রমজীবীরা যে ভালভাবে থাকিতে চাহে, তাহাদের সে আকাঙ্খা ন্যায়সঙ্গত এবং তাহার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি বিদ্যমান। তবে পণ্যের পরিমাণ আরও বাড়াইতে লইবে। যে সব কারবারী পণ্যের দাম চড়াইবার জন্য উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ কমাইতে চেষ্টা করে, তাহারা বিশ্বাস ঘাতক।

এ দেশে কোন কোন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র এই কথায় পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন। যখন বৃটিশ বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি অভয় দিয়াছেন, তখন আর ভাবনা কি? বৃটিশ ব্যবসা অপরাজেয়। কিন্তু এমন ভাবে নিশ্চিন্ত থাকিলে অনেক সময় বিপদ ঘটে—A false sense of security—নিরাপদ বলিয়া ভ্রান্ত বিশ্বাস অনেক সময় মানুষকে ও জাতিকে বিপন্ন করে। জার্ম্মাণী ব্যবসাবিষয়ে কিরূপ অসাধারণ উন্নতি করিতেছিল, প্রায় বিংশ বর্ষ পূর্ব্বে কোন কোন ইংরাজ তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পরই জোসেফ চেম্বার্লেন বিলাতে সংরক্ষণনীতির প্রবর্ত্তন করিতে বলেন। কিন্তু তখন বৃটিশজাতি সে দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই। শেষে কিন্তু যুদ্ধের সময় দেখা গেল, বৃটিশ জাতি পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছ। তখন তাহার প্রতিকারের জন্য প্রবল চেষ্টা করিতে হইল। সার আকল্যাণ্ডের যুক্তিতে যে সব ত্রুটি আছে সে সকলও অসাধারণ। জার্ম্মাণীতে যদি পণ্যের উপকরণের অভাব হয়, তবে জার্ম্মাণী যুদ্ধের পূর্ব্বে কেমন করিয়া বাণিজ্যব্যাপারে অসাধারণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল? জার্ম্মাণ শ্রমজীবীরা আজ অবসন্ন বা নিরাশ হইতে পারে কিন্তু তাহাদের এই অবস্থা ঘুচিয়া যাইতে কত দিন? জার্ম্মাণীতে আবার শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইলেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। তখন বৃটিশ ব্যবসায়ীরা কি করিবে? মার্কিণেরও যাইবার অসুবিধা চিরস্থায়ী হইবে না। এ সব কথা বিবেচনা করিলে কখনই বলা যাইতে পারে না, বৃটিশ ব্যবসায়ীরা নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে পারে।

কিন্তু সার অকল্যাণ্ডের দুইটি কথায় আমাদের ভয় আছে। প্রথমতঃ জাপানে জাপানের চাউলের দাম চতুর্গুণ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবীর পারিশ্রমিক-হার চড়িয়াছে। তাহাতেই নির্ভর করিয়া তিনি বলিয়াছেন, জাপান প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডকে পরাভূত করিতে পারিবে না। ভারতের শ্রমজীবীর হার বিলাতের তুলনায় অতি অল্প। ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠার পক্ষে তাহা বিশেষ সুবিধার কারণ। কিন্তু আমাদের বাণিজ্যনীতির জন্য আমরা যাঁহাদের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য তাঁহারা যখন জাপানে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে পারিশ্রমিকের হার বাড়ায় বৃটিশ ব্যবসায়ীর সুবিধা দেখিতেছেন, তখন ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিয়া বিলাতের সহিত প্রতিযোগিতায় আমরা তাঁহাদের নিকট কতটুকু

সাহায্যের আশা করিতে পারি? এই জন্যই ত ভারতবাসী শিল্পবাণিজ্যব্যপারে বিধি-নিয়ম প্রবর্ত্তনের অধিকার আপনারা পাইতে চাহে।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বলিয়াছেন—বিলাতে পণ্যের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। বিলাতে বড় বড় কারখানায় যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত হইয়াছে। যুদ্ধের পর সে সব কারখানায় পণ্য প্রস্তুত করিয়া বিদেশে পাঠাইতে হইবে। প্রত্যাগত পুরুষদিগকে এবং যুদ্ধকালে তাহাদের কার্য্যে শিক্ষিত স্ত্রীলোক দিগকে কাজ দিতে না পারিলে বিষম গোল ঘটিবে। সে গোল পরিহার করিতে হইলেও পণ্যের পরিমাণ ‑ভাব বাড়াইতে হইবে। তাহা হইলেই বৃটেন জগতের যে দেশে যে দ্রব্যের সে দেশে তাহা সরবরাহ করিতে—to supdly the shortge of tne world's goods—চেষ্টা করিবে ভারতবর্ষ ত ইংরাজেরই কাজেই ভারতে যে দ্রব্যের—অভাব সে দ্রব্য যোগাইবার বাবস্থা সর্ব্বাগ্রেই হইবে। তাহা হইলে বিলাতের পণ্যের প্রবল প্রতিযোগিতা কিপরূ দুঃসাধ্য হইবে দুঃসাধ্য হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

পরবর্ত্তী প্রস্তাবে দক্ষিণ আফরিকায় ও পুর্ব্ব আফ্রিায় ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলম চলি‌.াছে, তাহার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং বলা হয় যে সকল বৃটিশ উপনিবেশে ভারতীয়গণের প্রতি ব্যবহার বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে সেই সকল উপনিবেশের নাগরিকগণকে যেন কোন বৃটীষ চাকুরীতে অথবা ভারতীয় চাকুরীতে লওয়া না হয়, তাহাদের দেশে কাঁচামাল পাঠান না হয় এবং দক্ষিণ আফিকার কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়াইবার জন্য যেন ইম্পিরিয়াল নাগরিক সমিতির উদ্যোগে মিঃ সি এফ এণ্ডরুজের নেতৃত্বে একদল ডেপুটেশন প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রস্তাবটীও সভায় পরিগৃহীত হয়।

অতঃপর মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত পাণ্ড প্রস্তাব করেন যে কারেন্সী ও ফাইনান্স কমিটির রিপোর্ট অবিলম্বে প্রকাশ করা হউক এবং এ সম্বন্ধে সাধারণের মতামত প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিলম্ব করা কর্ত্তব্য। ইতিমধ্যে মুল্যবান ধাতু আমদানির নিষেধাজ্ঞা রদ করা হউক।

পরবর্ত্তী প্রস্তাবে ভারতে রঙ আমদানির বিধিনিষেধ সম্বন্ধে প্রতিবাদ ভারতীর কাল নির্ম্মিত বস্ত্রের উপর শুল্ক নির্দ্ধারনের অন্যায্যকা খ্যাপন, জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার প্রার্থনা এলং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক শিল্পবিজ্ঞান শিকার ব্যবস্থা হওয়ায় তাহার সমর্দ্ধন জ্ঞাপন করা হয় এবং এরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয় যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

২৪শে জানুয়ারি বোম্বাই হইতে প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, করাচি মিঃ জামসেদ মেটা ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করেন,—সম্প্রতি চামড়া রপ্তানি সম্বন্ধে যে আইন পাশ হইয়াছে, তাহাতে ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স

নীতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা দেখিয়া এই কনফারেন্স তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন এবং দাবী জানাইতেছেন যে, হে পর্য্যন্ত না এদেশের শিল্প জীবি ও ব্যবসাজীবি নানা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের সমবায়ে গঠিত কমিটীর দ্বারা সমগ্র সমস্যাটী আগাগোড়া পরীক্ষিত হইতেছে, সে পর্য্যন্ত ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সমূলক কোন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ কমিটী যেন ভারত সচিবের ডেনপ্যাচ অনুযায়ী আমদানী রপ্তানি শুল্ক সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের সাক্ষ্য লইতে পারেন এবং ভারতী শিল্প কমিশনের রিপোর্ট আলোচনা করিতে পারেন।

এই প্রস্তাবটী পরিগৃহীত হইলে নিম্নলিখিত মর্ম্মে আর একটী প্রস্তাব সভায় পাস হয়,—এক কনকায়েন্স দৃঢ়ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন যে, (২) প্রস্তাবিত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কেমিকাল সার্ভিসে ভারতীয় কর্ম্মচারীর নিয়োগে যেন অধিক সুবিধা দেওয়া হয়; (২) এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইবার পক্ষে, রেল ও জাহাজ পরিচালন পক্ষে এবং কাঁচমাল হইতে জিনিসপত্র তৈয়ারী পক্ষে ভারতীয় উদ্যোক্তাগণকে বেশী সুবিধা দেওয়া হয়; (৩) গবরমেণ্টের ও রেল কোম্পানী সমূহের প্রয়োজণীয় দ্রব্যাদি যেন দেশীয় কল-কারখানা হইতে ক্রয় করা হয়। এই কনফান্সে ভারত গভরমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে, ভারতে শ্রমিকদলের মজুরী, শিক্ষা, বাসস্থান, কার্য্যকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে তদন্তের নিমিত্ত কমিশন নিয়োগ করা হউক। এ প্রস্তাবটীও সর্ব্বশেষে পরিগৃহীত হয়।

পল্লীর স্বাস্থ্যরক্ষা

কিছুদিন পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশে সাধারণ স্বাস্থ্যবোর্ডের অধিবেশনে প্রকাশ পাইয়াছ, জিলাবোর্ডের মজুদ তহবিল হইতে পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতিকর কার্য্যে অর্থব্যয়ের জন্য যে যে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা পালিত হয় নাই। স্বাস্থ্য-বোর্ড নিরুপায় হইয়া সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সরকার যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন, তাহা করুন। সরকার হইতে প্রদত্ত অর্থের বহু পরিমাণ সহরের স্বাস্থ্যোন্নতিকর ব্যবস্থায় ব্যয়িত হয়—তবুও সে অর্থ যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না। আর, পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতিকর কার্য্যের জন্য সামান্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তাহারও সদ্ব্যবহার হয় না। ইহা যে একান্তই পরিতাপের বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অথচ পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতির প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। পল্লীতেই বৎসর বৎসর সংক্রামক ব্যাধি সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যুর

কারণ হয় এবং পল্লীগ্রামের অধিবাসীরাই সরকারী রাজস্বের অধিকংশ প্রদান করিয়া সরকারের ভাণ্ডার পূর্ণ করে। এ অবস্থায় পল্লীগ্রামের মূক জনগণের স্বাস্থ্যোন্নতিকর ব্যবস্থা করাই সরকারের ও বোর্ডের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। আমাদের স্মরণ আছে, ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইবার সময় লর্ড কার্জ্জন যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন এ দেশের অধিকাংশ লোক কৃষক—তাহারা সহরের সমৃদ্ধি ভোগ করে না—তাহারা সংবাদপত্র পাঠ করে না—তাহারা রাজনীতি বুঝে না; কিন্তু তাহারাই সরকারী রাজস্বের অধিকাংশ প্রদান করে, তাহারাই মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া জমী চাষ করে। তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করাই সরকারের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এ অবস্থায় যদি সহরের স্বাস্থ্য-রক্ষাই ব্যবস্থা হয়, আর, পল্লীর স্বাস্থ্যের প্রতি সরকারের তেমন মনোযোগ না থাকে, তবে তাহা কলঙ্কের কথা। সরকার পক্ষ হইতে অবশ্যই বলা যাইতে পারে, বোর্ডে প্রজাদিগের প্রতিনিধিরাই অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করেন—যাহাতে প্রজাদিগের প্রকৃত অভাব দূর করা হয়, সেই জন্যই সরকার স্বায়ত্তশাসননীতির অনুসরণ করিয়া লোকাল বোর্ড ও জিলা বোর্ড গঠিত করিয়াছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই কথাতেই সরকারের দায়িত্বের অবসান হয় না। কারণ, যুক্তপ্রদেশে অধিকাংশ জিলা-বোর্ডের কর্ত্তা সরকারী কর্ম্মচারী। বাঙ্গালায় বে-সরকারী চেয়ারম্যান-নিয়োগের ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে যেরূপ হইত, যুক্তপ্রদেশে এখনও সেইরূপ হইতেছে। তাই প্রয়াগের সহযোগী 'লীডার' বলিয়াছেন—"The district boards under their official chairmen appear to have utterly failed to do their duty in the matter" অর্থাৎ সরকারী কর্ম্মচারীরা বোর্ডের কর্ত্তা এবং তাঁহাদের কর্তৃত্বাধীনে জিলা-বোর্ডগুলি এ বিষয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে নাই।

যদি বাঙ্গালায় দেশের লোককে আবশ্যক ক্ষমতা ও অর্থ জিলা বোর্ড সংস্থাপনকাল হইতেই দেওয়া হইত, তবে বোধ হয়, বাঙ্গালার পল্লীর অবস্থা এক শোচনীয় হইতে পারিত না। বাঙ্গালায় প্রজা যে তাহার আবশ্যক অর্থ এই বাবদে পায় নাই, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। এ দেশের রোড সেসের ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে এ কথা বুঝাইতে বিলম্ব হইবে না। বঙ্গালায় যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয়, বাঙ্গালার জমীদাররা যখন "হাজা শুখা ফৌতী ফেরারী"র ওজর না করিয়া ৪ কিস্তিতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে খাজনা পরিশোধ করিবার চুক্তিতে বদ্ধ হয়েন, তখন কথা ছিল, খাজনা আর বাড়িবে না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভাল কি মন্দ—সে বন্দোবস্ত বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী কি না—সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু চুক্তি ছিল, সরকারের খাজনার আর নড়চড় হইবে না। যখন পথকর বসান হয়, তখন সে চুক্তি ভঙ্গ করিয়া সেস বসান হয়। বাঙ্গালার জমীদাররা তাহাতে আপত্তি করেন। সে আপত্তি যে যুক্তিযুক্ত, সরকার তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং

সেই জন্যই ভারত-সচিব ডিউক অব আর্গাইল তাঁহার ডেসপ্যাচে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন—সেসের অর্থ প্রজার প্রত্যক্ষ উপকারেই ব্যয়িত হইবে, তাহা সরকারের সাধারণ তহবিলভুক্ত হইবে না। এই কথা বাঙ্গালার প্রজাকে আরও বিশদ ভাবে বুঝাইয়া জমীদারদিগের প্রতিবাদ প্রহত করিবার জন্য বাঙ্গালার ছোটলাট সারজর্জ্জ ক্যাম্পবেল যে ঘোষণা করেন, তাহাতে বলা হয়—প্রত্যেক করদাতাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইতেছে যে, যে সব রাস্তায় ও পয়ঃপ্রণালীতে তাহার স্বার্থ আছে, সেসের টাকা সেই সব রাস্তায় ও পয়ঃপ্রণালীতে ব্যয়িত হইবে—ইত্যাদি।

কার্য্যকালে কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই—ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মিশিয়াছিল। সেসের টাকা সরকারের সাধারণ তহবিলে মিশিয়া গিয়াছিল। 'অমৃতবাজার' পত্রিকা' ও 'সোমপ্রকাশ' সে বিষয়ে সেকালে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহার পর বাঙ্গালার বহু পত্রই সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। শেষে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পরলোকগত সদস্য আনন্দমোহন বসু মহাশয় এ কথার আলোচনা করিলে সরকার সেসের টাকার অধিকাংশ বোর্ডে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। আজকাল পথকর ও পাবলিক কর উভয় করের টাকাই বোর্ডে প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু বহু দিনের অবজ্ঞার ফল একদিনে নষ্ট করা যায় না। এত কাল অর্থাভাবে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতিকর ব্যবস্থা হইতে পায় নাই—সহসা তাহার সংশোধন হইতে পারে না। বাঙ্গালায় নদী হাজিয়া মজিয়া গিয়াছিল—৫০ বৎসর পূর্ব্বে যদি সে সকলের সংস্কার আরব্ধ হইত, তবে তাহাতে ব্যয়ও এত অধিক হইত না—এতদিন দেশও শ্মশান হইত না। কিন্তু তাহা হয় নাই। আজ লর্ড রোণাল্ডসের সরকার হাজামজা নদীর সংস্কারে জলনিকাশ-কার্য্যে যেরূপ মন দিয়াছেন, যদি ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সরকার সে বিষয়ে অবহিত হইতেন। লর্ড কার্মাইকেল বাঙ্গালায় পানীয় জলের দুরবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে ছোট লাট সার জন উডবার্ণ দেশের পানীয় জলের ব্যবস্থার ভার জমীদারদিগের স্কন্ধে ন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। অথচ প্রজা সেই জন্যই পথকরের টাকা দিতেছিল। এমন কি, এ দেশে যে রেলরাস্তা রচিত হইয়াছে, তাহাতেও দেশে জল-নিকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করা হয় নাই।

আবার যখন পথকরের টাকা বোর্ডকেই প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইল, তখনও জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটই বোর্ডের চেয়ারম্যান—বাজেট বহাল বাতিল করিবার অধিকার কমিশনারের। যে স্থলে জিলার সর্ব্বেসর্ব্বা ম্যাজিষ্ট্রেটই কর্তা, সে স্থলে যে কর্তার ইচ্ছাতেই কর্ম্ম হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সে স্থলে যে প্রজার প্রতিনিধিদিগের প্রস্তাবও অনেক সময় ভাসিয়া যাইত, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, এতদিন পরে সে অবস্থা সংশোধিত হইয়াছে। লর্ড কার্মাইকেলের

সরকার প্রথমতঃ জিলাবোর্ডে বেসরকারী চেয়ারম্যান-নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সেও ভয়ে ভয়ে। তখন করা হয়, যদি রাজা বনবিহারী কাপুর ও রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন চেয়ারম্যান হইতে সম্মত হয়েন, তবে বর্দ্ধমানে ও বহরমপুর জিলা-বোর্ডে বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হইবে। বৈকুণ্ঠনাথ স্বীকার হইলে প্রথমে বহরমপুরেই ফল পরীক্ষা করা হয়। ফল আশানুরূপ সন্তোষজনক হইয়াছিল। তাহার পর, ২৪ পরগণা, যশোহর, বরিশাল, বহরমপুর ও বর্দ্ধমান এই সব জিলায় বেসরকারী চেয়ারম্যান-প্রদানের ব্যবস্থা হয় এবং সদস্যরাই চেয়ারম্যান-নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করেন। তাহার পর এবার বাঙ্গালী সরকার বাঙ্গালার প্রায় সব জিলাবোর্ডকেই চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহাতে বেসরকারী চেয়ারম্যানদিগের আমলে কাজ ভালই হইয়াছে—দেশের স্বাস্থ্যোন্নতিকর ব্যবস্থায় অধিক মন দেওয়া হইয়াছে। বর্দ্ধমানে রাজা মণিলাল, যশোহর যদুনাথ, বহরমপুরে বৈকুণ্ঠনাথ ও বরিশালে চৌধুরী মহম্মদ ইসমাইল লোকের হিতকর কার্য্যে বোর্ডের অর্থ ব্যয় করিয়াছেন—পল্লীগ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা দেশবাসীর—করদাতৃগণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

কিন্তু পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের যে অবস্থা, তাহাতে আরও অর্থের প্রয়োজন—আরও উৎসাহী কর্ম্মীর প্রয়োজন। জিলায় যেমন জিলা-বোর্ড, মহকুমায় যেমন লোক্যাল বোর্ড, তেমন ইউনিয়ন। যাহাতে এই সব ইউনিয়ন হইতে গ্রামসমূহের প্রয়োজন-কথা বোর্ডের গোচর করিয়া অভাব-মোচনের উপায় হয়, তাহা করিতে হইবে। যাহাতে বোর্ডের আবশ্যক বুঝিয়া ব্যয়িত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সরকারকেও বুঝিতে হইবে, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় করা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সে জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হইবে, তাহা দিতেই হইবে। কারণ, প্রজার প্রাণরক্ষা করা সরকারের কাজ।

কৃষির কথা কহিতে বসিয়া আমরা বাঙ্গালায় স্বাস্থ্যের কথা কহিতেছি কেন তাহার প্রধান কারণ চষীরা বাঁচিলে. চাষীরা সুস্থ থাকিলে তবে আমাদের শিল্প বাণিজ্য রাজনিতি সব বাঁচিয়া থাকিবে। ক্ষেত্র, চাষী, মূলধন এই তিনটি চাষের প্রধান উপাদান। ইহারই মধ্যে চষীই সর্ব্বপ্রধান, সুস্থ সবলকায় চাষীর অভাবে অন্য দুইটি অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকিবে।

কৃষিবিভাগ

ভারতীয় কৃষি-বিভাগের কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, গত বৎসর কৃষিবিভাগে ভারত সরকারের ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ভারতবর্ষে শিল্পপ্রতিষ্ঠারজন্য যত কেন আয়জন হউক না, এখনও বহুকাল ভারবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশই থাকিবে। বরং আমেরিকার মত আমরা যাহাতে কৃষির উপর আমাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি—কৃষিজ পণ্যের পরিমাণ বাড়াইয়া সেই উদ্বৃত্ত আয় হইতে কৃষিজ উপকরণ লইয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টায় সাফল্য-লাভ করিতে না পারিলে আমাদের পক্ষে শিল্পপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে না—হইতে পারে না।

কৃষিই এ দেশের অধিকাংশ লোকের জীবিকার উপায়। বাস্তবিকই এ দেশের অধিকাংশ লোকের কাছে কৃষিকথাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কথা। আবার এ দেশে কৃষির যে কত উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কাজেই কৃষিবিভাগকে কার্য্যোপযোগী করিলে আমাদের যত উপকার হইবে, আর কিছুতেই তত হইবে না। সুতরাং এই বিভাগে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ কিছুতেই অধিক বলা যায় না। কারণ এই খরচ হইতে যে লাভ পাইবার সম্ভাবনা, সে লাভের তুলনায় খরচ নিতান্তই সামান্য। আর, সেই জন্যই আমরা বহুবার এ দেশের কৃষি-বিভাগের ক্রুটী দেখাইয়া সে সকলের সংশোধনপথ দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এবার এই ৭৫ লক্ষ টাকা খরচের লথায় 'পাইওনীয়ার' বলেন, ইহাতে কতটা লাভ হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না—কারণ ফশলের অনিষ্টকারী কীট প্রভৃতির বিষয়ে অনু-সন্ধানেও বিভাগের মনোযোগ দিতে হয়—

It is impossidle to measure the productiveness of this expenditure, as the activities of the scientific staff are partially to protective work in connection with diseases of plants and the ravages of insect pests."

কিন্তু এই বিবরণে দেখা যায়, কৃষিবিভাগের চেষ্টায় দেশের কৃষির উন্নতিহেতু অর্থাগমের পথও প্রশস্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালার কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টার বলেন কৃষিবিভাগের বাছাই করা ধানের চাষ বাঙ্গালায় ২ লক্ষ ৫০ একর জমীতে হইয়াছে এবং ১ লক্ষ একর জমীতে কৃষি-বিভাগের বাছাই করা পাটের চাষ হইয়াছে। ইহাতে একর প্রতি ধানের ফলন ৫ মণ

ও পাটের ফলন ২ মণ করিয়া বাড়িয়াছে। এই পরিক্ষীত ধান ও পাট হইতেছে ইন্দ্রশালী ধান ও কাকিয়া বোম্বাই পাট। ইহা ব্যতীত যে ভাল ধান ও পাট নাই ইহা আমরা নিঃসংঙ্কোচে বলিতে পারি না তবে কৃষিবিভাগ যাহা পরিক্ষা করিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষিবিভাগের মত শত লোকের শত চেষ্টা না হইলে আশানুরূপ কার্য্য হইবে না। যাহা হউক কৃষিবিভাগের কার্য্যে বাঙ্গার কৃষকের আয় মোটের উপর ৪০ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। যদি এই সাফল্য দেখিয়া বাঙ্গালার সব কৃষক কৃষিবিভাগের বাছাই করা ধানের ও পাটের বীজ লইয়া আবাদ করে, তাহা হইলে বাঙ্গার কৃষকের বার্ষিক আয় ১২ কোটি টাকা বাড়িবে।

পাঞ্জাবের বিবরণে দেখা যায়, আজ কাল প্রায় সর্ব্বত্রই কৃষিবিভাগের বাছাই করা বীজ লইয়া মার্কিণ তুলার চাষ করা হইয়াছে। তাহাতে স্থানীয় তুলা অপেক্ষা একর প্রতি ১৮ টাকা অধিক আয় হইবে। কৃষকেরা এই মার্কিণ তুলার চাষের লাভ বুঝিয়া তাহারই আদর করিতেছে। ফলে আলোচ্য বর্ষে ৫ লক্ষ ১১ হাজার একর জমীতে এই তুলার চাষ হইয়াছিল। একর প্রতি বাড়তি আয় ১৮৲ টাকা ধরিলে ইহাতে তুলার চাষে পঞ্জাবে প্রতিবর্ষে ৯০ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইয়াছে।

এ দেশে ইক্ষুর চাষের বিষয় কিছুদিন হইতে কৃষিবিভাগের অনুসন্ধানাধীন রহিয়াছে। বর্ত্তমানে শর্করা কমিশনও তাহার তদন্ত করিতেছেন। কৃষিবিভাগের কর্ত্তা মিষ্টার ম্যাকেনা বলেন, পূর্ব্বে এ দেশে যে পরিমাণ আকের চিনি উৎপন্ন হইত, তাহাতে দেশের লোকের অভাব মোচন করিয়া বিদেশেও রপ্তানী করা চলিত। অল্পদিন পূর্ব্বেও এ দেশে যত আকের চিনি উৎপন্ন হইত, তত আর কোন দেশে হইত না। সমগ্র জগতে যত জমীতে আকের চাষ হয়, এক ভারতে তাহার অর্দ্ধেক জমী থাকিলেও ভারতে উৎপন্ন আকের চিনির পরিমাণ জগতে উৎপন্ন চিনির এক চতুর্থাংশ মাত্র। ফলে আজকালকার চড়া দরেও ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে চিনি আমদানী করিতে হইতেছে। যাহাতে এই অস্বাভাকি অবস্থার প্রতীকার হয়, তাহার উপায় করিতে পারিলে যে ভারতের বিশেষ উপকার হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বাস্তবিক কৃষিবিভাগের উন্নতির সঙ্গে এদেশের আর্থিক উন্নতির সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, কৃষিবিভাগের উন্নতির কথা—আমরা সাগ্রহে শুনিয়া থাকি। বাঙ্গালার কৃষিবিভাগ কর্ত্তৃক বাছাই করা ধানের ও পাটের চাষে ফলন-বৃদ্ধির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আজ আমরা কোন কথা বলিব না কারণ, ইদ্রশাল ধানের ও কাকিয়া-বোম্বাই পাটের আলোচনা আমরা অনেকবার করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস, এই ধান ও এই পাট বাঙ্গালার সকল স্থানেই উপযোগী নহে এবং সর্ব্বত্র ইহার চাষে সুফলও ফলিতে পারে না, কিন্তু কেবল যে ইন্দ্রশাল ধানের ও কাকিয়া বোম্বাই পাটের আবাদই করিতে হইবে, একন কোন কথা নাই। যে জিলার পক্ষে

যে ফসলের চাষ অধিক উপযোগী, তাহা দেখাই বিভাগের কর্ত্তব্য। মামুলী প্রথার কিরূপ পরিবর্ত্তনে ফলন বাড়িবার সম্ভাবনা, পরিক্ষার দ্বারা তাহা বুঝিয়া লোককে বুঝানই কৃষিবিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। মার্কিণে বিজ্ঞানানুমোদিত অনুসন্ধানের দ্বারা কৃষিকার্য্যে অসাধারণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এমন কি, আয়ারলণ্ডেও এই বিভাগের কার্য্য উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাঙ্গালায় কৃষিবিভাগের চেষ্টায় যে অধিক কাজ হইয়াছে, একন কথা বলিতে পারিলে আমরা সুখী হই। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালায় কৃষিবিভাগের দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ এপর্য্যন্ত হয় নাই। কেবল উদ্যোগ ও আরম্ভ দেখিতেছি, ফল ফলিতে এখন বহু বিলম্ব। দেশের লোক উদ্যোগী না হইলে কাজ অগ্রসর হইবে না—তাহারা উদ্যোগী হইলে কৃষি-বিভাগকে তাহার উপযোগী হইতেই হইবে। এপর্য্যন্ত বিশেষ ফল যে হয় নাই তাহার প্রমাণ—

চিনির কথাই ধরা যাউক। পর্য্যটক বার্ণিয়ার বলিয়াছেন, এই বাঙ্গালা দেশ হইতে পূর্ব্বে আরবে ও পারস্যেও চিনি রপ্তানি হইত। আর, আজ বাঙ্গালা বিদেশ হইতে চিনি আনিয়া—১২ আনা সের দরে কিনিয়া খাইতেছে। ইহার কারণ কি? বাঙ্গালায় নানাস্থানে চিনির কারখানা ছিল। বিশেষ বাঙ্গালার খেজুর গাছের অভাব ছিল না। খেজুরের সুবিধা এই যে, আকের মত তাহার আবাদ বৎসর বৎসর করিতে হয় না—জমী পাট করিতে হয় না—জলসেচন করিতে হয় না। একবার বাগান করিতে পারিলে অন্ততঃ ৪০ বৎসর গাছ হইতে রস পাওয়া যায়। এই খেজুরের চিনির কোনরূপ উন্নতি হইতে পারে কি না, সরকারী কৃষিবিভাগ তাহার কন্তকটা পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য সকলে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু জানিতে পারে নাই। যদি তিনি উন্নতির কোন উপায় করিয়া থাকেন, তবে তাহা কৃষকদিগের গোচর করিবার কোন উপায় অবলম্বিত হইয়াছে কিনা তাহা আমরা অবগত নহি?

সেইরূপ বাঙ্গালার বাহিরে বনে জঙ্গলে যে মহুয়া গাছ জন্মে, তাহার ফুলের ও ফলের সদ্ব্যবহার করিবার কি চেষ্টা কৃষিবিভাগ করিয়াছেন? অথচ বিদেশেও অনুসন্ধানফলে দেখা গিয়াছে, মহুয়ার ফুল ও ফল হইতে অনেক জিনিষ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে দেশের লোক প্রভুত পরিমাণে লাভবান্ হইতে পারে।

গত বৎসর কৃষিবিভাগে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার দ্বিগুণ ব্যয় করিতেও ভারত বাসীর আপত্তি নাই। কিন্তু যাহাতে সেই টাকায় দেশের প্রকৃত লাভ হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে। তাহা না হইলে দেশের কোন উপকার হইবে না—অল্প অর্থের ব্যয় ও তাহার যৎকিঞ্চিৎ ফল কিছুতেই সমর্থিত হইতে পারে না।

শাসন-সংস্কার ব্যবস্থায় এই বিভাগের কাজ ভারতীয় মন্ত্রীর হাতে আসিবে। আমরা আশা করি, তাঁহারা দেশের অবস্থাবিষয়ে আবশ্যক অনুসন্ধান করিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তাহা করিবেন এবং তাঁহাদের কার্য্যের ফলে দেশের লোক উপকৃত হইবে।
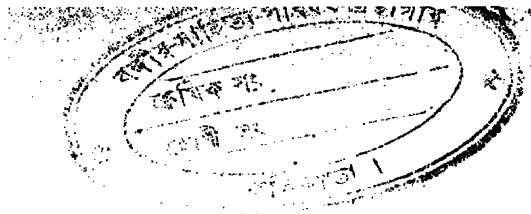
রবার Rubber.

জনসমাজে রবার বহুদিন হইতে জানা থাকিলেও প্রায় দেড়শত বৎসরের উপর হইতে ইহা শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে এবং ব্যবহারের আধিক্য অনুযায়ী মূল্যও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আজকাল শিল্পজগতে ইহার যেরূপ অপর্য্যাপ্ত ব্যবহার উৎপন্নের পরিমাণ কিন্তু তদ্রুপ প্রচুর নহে, এজন্য জর্ম্মণি ও অন্যান্য দেশে ময়দা হইতে কৃত্রিম উপায়ে রবার প্রস্তুত হইতেছে। বিশুদ্ধ রবারের ব্যবহার অতি অল্প, দ্রব্যান্তর মিশ্রিত করিয়া রবার অধুনাতন শিল্পে ব্যবহার হইয়া থাকে। চাদর, কোট, স্প্রিং, ওয়াটারপ্রুফবস্ত্র, গাড়ীর চাকা ও টায়ার, ম্যাটিং, পাপোষ, ইরেজর, জুতা, সুখতলা, নল, পাইপ, ব্যাগ, কেস, খেলনা, চিরুণী অস্ত্রাদির বাঁট, নানাবিধ ডাক্তারী যন্ত্র ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্পে ইহার ব্যবহার হয় এবং ভবিষ্যতে আরও কতপ্রকাব শিল্পে যে ইহার ব্যবহার হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই; অধিকন্তু অনেক উদ্ভিজ্জাত দ্রব্য অপেক্ষা ব্যয় অধিক বলিয়াই ইহার চাষ বিশেষ লাভের ব্যবসায়।

মেদ, মজ্জা, ঘৃত, তৈলাদি স্নেহপদার্থ রূপান্তরিক হাইড্রোকার্ব্বন (Hydro-carbon জলজন (Hydrogen) এবং অঙ্গারজন (Carbon) এই উভয়ের রাসায়নিকমিশ্রনে রবার উৎপন্ন হয়, ইহা একশ্রেণীর হাইড্রো-কার্ব্বন। ইহা অগ্নিগুণবহুল, মোমের ন্যায় চটচটে ও স্নিগ্ধ পদার্থ, সামান্যভাবে বিস্ফোরক গুণও বর্ত্তমান আছে, এবং যে রবারে রজনের (resin) অংশ অধিক তাহা জ্বলিয়াও থাকে; উদাহরণ স্বরূপ কাঁটালের আঠার উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইহার আঠায় রবার প্রস্তুত হয় অথচ আমাদের দেশে ইহার দ্বারা মশালের কাজও হইয়া থাকে। রবার উৎপাদনকারী উদ্ভিদের মধ্যে বটজাতীয় বৃক্ষগুলি প্রমেহ ও প্রমেহপীড়াদি রোগে বিশেষ উপকারী। রবারের বিশেষগুণ স্থিতিস্থাপকত্ব, এজন্য শিল্পজগতে ইহার প্রচুর ব্যবহার ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজত্ব। যে রবার অবনমিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে পরক্ষণেই পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাই উৎকৃষ্ট কিন্তু বিলম্বে যাহা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। উপায়বিশেষ দ্বারা বৃক্ষবিশেষের ক্ষীরের জলভাগ শোষিত ও বায়ুসংস্পর্শে কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইলেই রবার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা সুরাসার (Alchohol) অম্ল (Acid) বা জলে ইহা দ্রবীভূত হয় না কিন্তু ইহা (Aether Sulph), টার্পিণ (Oil Terebinth) ন্যাফথা (Napetha) ক্লোরোফরম্ (Chloroform), ভূর্জ্জ তৈল (Oil Cajeput) নানাবিধ গন্ধতৈল ও মেটেতেল (Petroleum) সহযোগে ইহা সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হয়। পূর্ব্বে টার্পিনের তৈলে রবার বিগলিত করিয়া ওয়াটারপ্রুফ বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত কিন্তু টার্পিণের তীব্রগন্ধ অনুভূত হইত বলিয়া অধুনা ন্যাফথা বা মুদ্দারজনিত বাষ্প

(Coal gas) দ্বারা এই ক্রিয়া সুসিদ্ধ ও তজ্জাত দ্রব্য সুলভ হইয়াছে। বহুদিবস কোন গুরুভারদ্রব্য বিলম্বিত রাখিলে রবারের স্থিতিস্থাপকত্বগুণের বিশেষ হ্রাস হইয়া থাকে, কিন্তু গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিসন্তাপে বিগলিত করিলে যে রবার প্রস্তুত হয় তাহার স্থিতিস্থাপকত্বগুণ অব্যাহতই থাকে ; উহা দীর্ঘস্থায়ী ও বহুমূল্য হয়, কিন্তু ইহার দোষ উষ্ণবায়ুতে বা স্থানে কিছুদিবস রাখিলে ফাটিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এজন্য এই জাতীয় রবার সর্ব্বদা শীতলজলে নিমজ্জিত রাখা হইয়া থাকে, ইহাকে ভালক্যানাইজড রবার (Vulcanized rubber) কহে, বিবিধ স্থূল ও সূক্ষ্ম নল, পাইপ, শিটচাদর ও ডাক্তারীযন্ত্র ইহা হইতে প্রস্তুত হয় ; বাজারে ভাল্‌ক্যানাইজ্‌ড্‌ ইণ্ডিয়া রবারও পাওয়া যায়, ইহা দেখিতে রক্তবর্ণ। ভাল্‌ক্যানাইজ্‌ড্‌ রবার আবার যন্ত্রযোগে অতি প্রখরতর তীব্র অগ্নিসন্তাপে দ্রবীভূত ও শীতল করিলে ইহার পূর্ব্বের সমস্তগুণ বিকৃত হইয়া অতি কঠিন কৃষ্ণবর্ণ পদার্থে পরিণত হয়, তখন ইহাকে ইবনাইট রবার (Ebonite rubber) কহে। এই কৃষ্ণবর্ণ রবার হইতে অস্ত্রশস্ত্রাদির বাঁট, তরবারির খাপ, থার্ম্মমিটারের কেস, বাক্স, নস্যদানী প্রভৃতি বহুবিধ মূল্যবান, সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিকৃষ্টজাতীয় রবার হইতেই এ সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয়, উৎকৃষ্টজাতির রবার অন্যান্য বহুমূল্য ও উৎকৃষ্ট শিল্পে ব্যবহার হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে বহুবিধ রবারের উদ্ভিদ জন্মে কিন্তু উৎকৃষ্ট অপেক্ষা নিকৃষ্টজাতির সংখ্যাই অধিক ; আমরা অনায়াসে দেশীয় নিকৃষ্টজাতীয় রবার হইতে উল্লিখিত শিল্পদ্রব্যসমূহ প্রস্তুত করিয়া বিশেষ লাভবান হইতে পারি।

বৃক্ষ, (Tree) গুল্ম, (Shrnb) এবং লতা (Vine) শ্রেণীভেদে রবার তিনপ্রকার ; এই কয় শ্রেণী হইতেই উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বিবিধ প্রকার রবার উৎপন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীতে ক্ষীরনিঃস্রবী বহুপ্রকার উদ্ভিদ আছে, ইহাদের ক্ষীরে রজন (Resins), প্রোটীড্‌ অর্থাৎ ওজঃ ধাতুবর্দ্ধক পদার্থ (Protid) ও রবার (Coutchouc) প্রভৃতি দ্রব্য বিদ্যমান থাকে। যে সকল উদ্ভিদের ক্ষীরে রজন ও প্রোটীডের অংশ অল্প এব রবারের অংশ অধিক শিল্পে ব্যবহারের নিমিত্ত তাহাদেরই প্রাধান্য। কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদে বিশুদ্ধ রবারের পরিমাণ এত অল্প যে তদ্দ্বারা কোন ব্যবসায় বা শিল্পকার্য্য হইতে পারে না। (Hevea) ফণ্টুমিয়া (Funtumia), ল্যাণ্ডল্‌ফিয়া (Landolphia), ফাইকাস (Ficus) প্রভৃতি শ্রেণীর বহুবিধ বৃক্ষ হইতে ক্ষীর নিঃসৃত হইলেও বিশেষ বিশেষ কয়েকটী হইতেই শিল্প ও ব্যবসায়োপযোগী প্রচুর পরিমাণ রবার পাওয়া যায়, অবশিষ্ট গুলিতে রবারের অংশ অত্যন্ত অল্প সুতরাং চাষের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। আবার বিশেষ বিশেষ স্থান ব্যতীত যথাতথা এইগুলি ভালরূপ জন্মেনা, সুতরাং স্থানভেদে বৃক্ষভেদ হওয়ায় রবারের চাষ বিশেষ প্রসার লাভ করিতেছে না। পূর্ব্ব ও পশ্চিম মধ্যআফ্রিকা, উগাণ্ডা, নাইজিরিয়া, স্বর্ণোপকুল, সেরালোন, গ্যাম্বিয়া, কঙ্গো, নেটাল, ল্যাগস, রোডেসিয়া, সুদান, মাদাগাস্কার, সিংহল, ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তরাঞ্চল, মহীশুর,

মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর, ব্রহ্ম, মালয়,ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি, সিংহল, ফিজি, দক্ষিণ ও মধ্যআমেরিকা, মেক্সিকো, ব্রেজিল, বলিভিয়া, পেরু ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, ইকোয়েডর গায়েনা, জ্যামেকা, ট্রিনিডাড, ডমিনিকা, পানামা, হণ্ডুরাস প্রভৃতি বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বস্থ সমশিতোষ্ণ দেশগুলিই রবারের সাভাবিক জন্মস্থান। আফ্রিকা ও আমেরিকা যথায় এই সকল বৃক্ষ জন্মে ও দিক্‌দিগন্তব্যাপী ঘোরতর অরণ্য পরিণত হয়, তথায় বিলাত, ইয়ুরোপ ও আমেরিকার বড় বড় ধনী সম্প্রদায় এই সকল জঙ্গল জমা লইয়া রবার নিষ্কাশন করতঃ প্রচুর ধন সঞ্চয় করিতেছেন। অধুনা অনেক বড় বড় বিলাতী ধনীকোম্পানী দক্ষিণভারতবর্ষ, সিংহল, মালয় ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া রবারের চাষ করিতেছেন। আসামেও এইরূপ বিস্তর রবারের জঙ্গল আছে এবং সরকারও প্রতিবৎসর জঙ্গলে নূতন চারা রোপণ করিয়া বৃক্ষের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতেছেন; আবার চাকর সাহেবেরা চা বাগিচায় ইহার চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। বিলাতী ধনীরা ইহার ফলভোগ করিতেছেন আর আমরা ইংরাজের বুদ্ধির বাহাদুরী দিয়াই নিশ্চিন্ত রহিয়াছি—আমরা কুলি ও কেরাণীগিরি করিতেছি। ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজ, কূর্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, কুচবিহার, ও তদুত্তরবর্ত্তী দুয়ার (Dooars) অঞ্চলে রবারের চাষ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে আসামজাত রবারই সর্ব্বপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। অধুনা শিল্পব্যবহার্য্য অধিকাংশ রবারই মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার জঙ্গল হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ব্রেজিলের হেভিয়া ও ম্যানিহট (Hevea and Manihot), আফ্রিকা ও মধ্য আমেরিকার ক্যাষ্টিলোয়া (Castilloa or Ule tree) এবং আফ্রিকার ল্যাণ্ডল্‌ফিয়া (Landolphia) প্রভৃতি সর্ব্বপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও প্রচুর পরিমাণ উৎকৃষ্ট জাতীয় রবার উৎপাদক। ভারতবর্ষের মধ্যে আসামের ফাইকাস্ ইলাষ্টিকা (Ficus-elastica) নামক বটজাতীয় রবারবৃক্ষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার রবার কিছু সুগন্ধি বলিয়া মূল্যবান, কিন্তু আসামজাত রবার অপেক্ষাকৃত দুর্গন্ধযুক্ত ও সামান্য হীনগুণ হইলেও শিল্পবিদেরা তাহা অগ্রাহ্য করেন না। ভারতবর্ষের ফাইকাস্ ইলাষ্টিকা ব্যতীত অন্যান্য বৃক্ষ হইতে রবার বাহির করিবার চেষ্টা হয় নাই, কিন্তু আমরা সচেষ্টা হইলে এই সকল বনজবৃক্ষ হইতে বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করিতে পারি।

পৃথিবীর ব্যবহার্য্য রবারের ১৬ অংশের ৮ অংশ আমেরিকা,৫ অংশ আফ্রিকা ও অবশিষ্ট ৩ অংশ নানাস্থানীয় আবাদজাত রবারবৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধুনা আবাদী রবারের বাগিচার সংখ্যা দিন দিন এরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে যে আগামী ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর রবার আবাদজাত বৃক্ষ হইতেই উৎপন্ন হইবে আশা করা যায়। যথায় সূর্য্যে প্রখর উত্তাপ সত্ত্বেও ভূমি সরস এবং বায়ুমণ্ডল সর্ব্বদা প্রচুর উষ্ণ বাষ্পে পরিপূর্ণ সেই সকল স্থানে রবারবৃক্ষ সুন্দর বর্দ্ধিত হয়, সাধারণতঃ রবারবৃক্ষ মাত্রই

দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে। জাতিবিশেষে প্রথম প্রথম ইহাদিগকে ৫ হইতে ৮ হস্ত অন্তর রোপণ করা উচিৎ, গাছ যত বাড়িতে থাকিবে, মধ্যের এক একটী গাছ কাটিয়া উঠাইয়া দিলে উন্মুক্ত স্থানলাভ বশতঃ অবশিষ্ট বৃক্ষের বৃদ্ধির বিশেষ সুবিধা ঘটে। অধিকাংশ রবারের বীজ ও কলম হইতে চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, যাহার যেরূপ সুবিধা ঘটিবে, তাহার সেই প্রকারেই চারা প্রস্তুত করা উচিত। যে সকল বৃক্ষ হইতে অধিক পরিমাণ রবার উৎপন্ন হয়, তজ্জাত বীজ বা কলম হইতেই চারা প্রস্তুত করা বিধেয়, কারণ তাহাতে পিতৃগুণ সঞ্চারিত হইতে পারে। বংশীবট, ক্যাষ্টিলোয়া ও ফাণ্টূমিয়া ব্যতীত অপরাপর বৃক্ষগুলির পরিধি ২০।২২ইঞ্চ। খরচা পোষাইবার জন্য ক্ষত করিয়া রবার সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

রবার চাষ—রবারের চাষ বিশেষ কিছু কঠিন ব্যাপার নহে, কিন্তু লাভের নিমিত্ত ব্যবসায় করিতে হইলে বহুপরিমাণ ভূমি লইয়া চাষ করা উচিৎ; তাহা না পারিলে গৃহস্থ ও ধনীগণ ভবিষ্যৎ পুরুষগণের কার্য্যপ্রবৃত্তির নিমিত্ত অন্ততঃ ২।১০ বা ১০০।২০০টা বৃক্ষ নিজ নিজ উদ্যানে পরীক্ষার্থ রোপণ করিতে পারেন। বহুপরিমাণ ভূমি লইয়া চাষ করিতে হইলে প্রথম ৫।৭ বৎসরকাল বিস্তর পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হয়, কিন্তু গাছ বড় হইলে তাহারা বাৎসরিক যে পরিমাণে রবার প্রদান করে, তাহাতে শীঘ্রই চাষের সমস্ত খরচা উঠিয়া লাভ দাঁড়াইতে থাকে। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জাতীয় রবার সাধারণতঃ পাউণ্ড প্রতি ৫ হইতে ৩ শিলিং পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। আমদানীর অল্পতা বা আধিক্য অনুযায়ী এই দরের সদা-সর্ব্বদা কমিবেশী হইয়া থাকে। লণ্ডনই ইহার বিক্রয়ের প্রধান আড়ত; এদেশের আফিম বিক্রয়ের ন্যায় প্রতিমাসে হাটে হাটে ইহার বিক্রয় হয়। হাটে বাক্সবন্দী রবারেরই আদর অধিক।

বৃক্ষজাতীয় রবার—Tree Rubbers

১। হিভিয়া ব্রেজিলিয়ান্‌নিস্‌ Hevea Braziliensis—ব্যবসায়ীমহলে ইহার নাম প্যারারবার (Para rubber)। পৃথিবীর সকল জাতীয় রবার উৎপাদক বৃক্ষের মধ্যে হিভিয়া হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অতিবহুল পরিমাণ রবার উৎপন্ন হইয়া থাকে; এজন্য রবারজাতীয় বৃক্ষের মধ্যে ইহা সর্ব্বপ্রধান পরিগণিত হয়। আমেরিকার ব্রেজিল দেশ ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান; সাধারণতঃ অধিকাংশ জাতীয় রবারবৃক্ষ নিজ জন্মস্থান ব্যতীত অন্যত্র ভাল জন্মেনা কিন্তু হিভিয়া সম্বন্ধে এ নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারেনা। ইহা হইতে উৎপন্ন রবারের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক এবং চাষআবাদ সুকর, এজন্য অধুনা উষ্ণ-কোটীবন্ধের আফ্রিকা, দাক্ষিণাত্য, সিংহল, মালয় ও ভারতসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে কোটী কোটী টাকার যৌথসংস্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগিচায় ইহার চাষ হইতেছে। আমেরিকার বনজাত হিভিয়ায় নানাবিধ দ্রব্য মিশ্রণের জন্য কৃত্রিমতা আছে, কিন্তু বাগিচাজাত

রবার অতিবিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট বিধায় দিন দিন ইহার আদর ও চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইং ১৮৭৫ সালে উল্লিখিত স্থানসমূহে ইহার চাষসম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ হয় এবং তাহার ফল সন্তোষজনক প্রমাণিত হওয়ায় বিগত ৮।১০বৎসর কাল হইতে ইহার চাষ লোকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

সিংহলে হিভিয়ায় চাষ এরূপ সফল হইয়াছে এবং দিন দিন এরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র এমন কি ব্রেজিল পর্য্যন্তও সিংহলজাত বীজ প্রেরিত হইতেছে। বঙ্গদেশের সহিত সিংহলের জলবায়ুর অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, সুতরাং বঙ্গদেশে ইহার চাষ সফল হইবে আশা করা যায়। আমাদের ইহার চাষ করিতে হইলে সিংহলজাত বীজসংগ্রহ করিতে হইবে। কলম প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে ইহার চারা প্রস্তুত হইলেও বীজ হইতে চারা উৎপাদন করাই সর্ব্বপেক্ষা সহজ। অত্যন্ত তৈলপূর্ণ বলিয়া বীজের উৎপাদিকাশক্তি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য প্রাপ্তিমাত্রই ইহার বীজবপন করা কর্ত্তব্য; অধিকন্তু ইহার বীজের ক্রেতাসংখ্যা এত অধিক যে পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিকমাসে অর্ডার রেজিষ্ট্রী না করিলে বীজ পাওয়া দুর্ঘট। নিম্নলিখিত ক্যাটি-লোয়ার নিয়মানুসারেই ইহার চারা প্রস্তুত করা উচিৎ।

সমুদ্রতট (Sea level) হইতে ৩ সহস্র ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ ভূমিভাগের মধ্যেই হিভিয়া সুন্দর জন্মিয়া থাকে; উচ্চভূমিতে বৃষ্টির আধিক্য থাকিলে ইহা ভাল জন্মে না কিন্তু নিম্নভূমিতে (Low altitude) অধিক বৃষ্টিপাত হইলেও বৃক্ষের কোনপ্রকার অনিষ্ট হয় না বরং সতেজে বৃদ্ধি পায়। প্রচুর উষ্ণ বাষ্পময় ও উদ্ভিজ্জসারপূর্ণ (Humus) নদী বা সাগরোপকূলবর্ত্তী সরস দোয়াঁশ মৃত্তিকা ইহার চাষের জন্য মনোনীত করা উচিত; এরূপ ভূমিতে অল্পবারিপাত হইলেও হিভিয়ার কোন ক্ষতি হয় না। জলা বা বাদাভূমির জল নিকাশীর সুবন্দোবস্ত থাকিলে তাহাতেও ইহা জন্মিতে পারে। ভূমি উর্ব্বরা না হইলে মধ্যে মধ্যে সার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নতুবা বৃক্ষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ক্ষীরে জলের পরিমান অধিক হয় এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচুর রবার প্রদান করে না। সারের মধ্যে গোময় ও নানাবিধ উদ্ভিজ্জসার প্রশস্ত।

ভূমি যথাযথরূপে প্রস্তুত করিয়া বর্ষার প্রথমেই চারাগুলি উঠাইয়া লইয়া ১৪হস্ত অন্তর প্রতি লাইনে ১০হস্ত অন্তর বসাইতে হইবে। চারাগুলি নূতনপত্র ফেলিতে থাকিলে ভূমি মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া পরিষ্কার ও গোড়াখুলিয়া দেওয়া ব্যতীত অপর কোন পাইট নাই। সাধারণতঃ এই নিয়মেই হিভিয়া, ক্যাষ্টিলোয়া প্রভৃতি রবারবৃক্ষ রোপিত থাকে। কেহ কেহ ১৬ বা ২০ হস্তঅন্তর গাছ রোপণ করিয়া থাকেন, ইহাতে বৃক্ষের বৃদ্ধির বিশেষ সুবিধা ঘটে সত্য কিন্তু ২৫।৩০ বৎসরের ন্যূনে বৃক্ষটি বিশালকায় হইয়া অত পরিমাণ ভূমি আচ্ছন্ন করিতে পারে না; ততদিবশ এত পরিমাণ ভূমি উন্মুক্ত ফেলিয়া রাখিলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই, বিশেষতঃ পাঁচবৎসরকালেই যথন হিভিয়া হইতে রবার

বাহির হয়, তখন ঘনভাবে হিভিয়া রোপন করাই কর্ত্তব্য। ইহাতে অল্পদিবসের মধ্যে সমগ্রভূমি ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষসমুহে আচ্ছন্ন হইয়া হইয়া পড়ে, অথচ কালাতিক্রমে ক্ষেত্রটী যখন অত্যন্ত জঙ্গলময় হইয়া উঠে ও মূল সকলের পরস্পর জালবৎ প্রসারণ বশতঃ বৃক্ষের বৃদ্ধি স্থগিত বোধ হয়, তখন মধ্যের এক একটী বৃক্ষের রবার নিঃশেষে নিঃসারণকরতঃ (৬।৭ বৎসরের এরূপ এক একটী বৃক্ষ হইতে ৮।১০সের পর্য্যন্ত রবার পাওয়া যাইতে পারে) সমুলে উৎপাটন করিয়া দিলে অবশিষ্টগুলি কালে প্রকাণ্ডবৃক্ষে পরিণত হইতে পারে। বৃক্ষগুলি দুর ক্রমে রোপণ করিলে মধ্যে মধ্যে স্থায়ীভাবে অন্য বৃক্ষ রোপণের বিশেষ অসুবিধা ঘটে; অথচ ঘনরোপণে ইচ্ছানুযায়ী কাটিয়া পাতলা করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। অনেকে দুরান্তরে রোপণ করিয়া যতদিন না বৃক্ষগুলি সম্পূর্ণরূপে ক্ষেত্রটী আচ্ছন্ন করে, ততদিন মধ্যস্থ ভূমিতে চা, কফি, তুলা, কর্পূর, কোকো প্রভৃতি কয়েক বৎসরকাল জন্মাইয়া লাভের মাত্রা বাড়াইয়া থাকেন। বৃক্ষগুলি সতেজ ও পত্রবহুল হইলে অধিক পরিমাণ রবার প্রদান করে নতুবা বৃক্ষ নিংস্রবার্থ আঘাত সহ্য করিতে পারে না। এক একার (প্রায় তিনবিঘা) পরিমাণ ভূমিতে নিম্নলিখিত সংখ্যক বৃক্ষ রোপিত হইতে পারে;—

১০ × ১০ ফিট—৪৩৫	২০ × ২০ ফিট—১১০
১০ × ১৫ ঐ—২৯০	২০ × ২৫ ঐ—৮৭
১৫ × ১৬ ঐ—১৯৩	২৫ × ২৫ ঐ—৭০
১৫ × ২০ ঐ—১৪৫	

চারা দূরক্রমে অর্থাৎ পাতলা বসাইলে ছাঁটিবার আবশ্যক হয় না এবং ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে অত্যন্ত স্থূলকাণ্ড প্রকাণ্ডবৃক্ষে পরিণত হয়। ১০।১২ বৎসরকালে এরূপ বৃক্ষ হইতে রবার বাহির করা হইয়া থাকে, কিন্তু ঘন বসাইলে উহা দীর্ঘে বৃদ্ধি পায় ও কাণ্ডদেশ তত স্থূল হয় না। পত্রদ্বারা বৃক্ষ সকল শ্বাসপ্রশ্বাস ও বায়বীয় আহার গ্রহণ করে; অধিক আহার করিতে পারিলে শরীরও অত্যন্ত পুষ্ট হয়, এজন্য দেখা যায় পত্রবহুল বৃক্ষের কাণ্ড ও ত্বক শীঘ্র স্থূলত্ব লাভ করে। হিভিয়ার কাণ্ড ত্বক্ যত শীঘ্র স্থূলত্ব লাভ করে তত শীঘ্রই রবার বাহির করিবার উপযোগী হয়, এজন্য আজকাল ছাঁটিবার প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। গাছগুলি ৬ হইতে ১০ হস্তের মধ্যে উচ্চ হইলেই এই ছাঁটন ক্রিয়া সম্প্রাদন করা উচিত, কারণ কাণ্ডদেশের ভূমি হইতে ৭হস্ত উর্দ্ধ পর্য্যন্ত ভাগই ক্ষত করিয়া ক্ষীর বাহির করিবার বিশেষ শুবিধা হয়, ইহার উর্দ্ধে ক্ষত করিতে হইলে অধিক ব্যয় ও পরিশ্রম পড়ে। বৃক্ষের সর্ব্বোর্দ্ধ পত্রমুকুল (teraminal bud)ছিন্ন করিয়া দিতে হয়, ইহাতে তন্নিম্নবর্ত্তী গ্রন্থি হইতে নুতন শাখা সকল বাহির হইতে থাকে; এইরূপ এক বা দুইবৎসরকাল প্রতি ৩ বা ৬ মাস অন্তর নুতন উৎপন্ন শাখা সকলের সর্ব্বাগ্র পত্রমুকুলভাগ ছিন্ন করিয়া দিলে, বৃক্ষ আর উর্দ্ধে বৃদ্ধি না পাইয়া ছাতিম, সিমুল

বা পাতবাদাম বৃক্ষের ন্যায় ছত্রাকারে পার্শ্বে বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেক শাখা হইতে বহুসংখ্যক পত্রবাহির হয় সুতরাং কাণ্ড ও ত্বক্‌ভাগ—ছাঁটা না হওয়া হেতু স্বল্পপত্র বৃক্ষ অপেক্ষা শীঘ্র স্থূলত্ব লাভ করে। সখের হিসাবে দূররোপিত বৃক্ষ ছাঁটিবার আবশ্যক হয় না। যথায় ভূমির নিঃসারতা বা নীরসতাবশতঃ বৃক্ষের বিশেষ বৃদ্ধি হয়না তথায় ছাটিলে বৃক্ষের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হয়না।

৫।৬ সৎসরে মধ্যে অর্থাৎ কাণ্ডের পরিধি ৩২।৩৪ ইঞ্চি স্থূল হইলেই ক্ষত করিয়া হিভিয়ার ক্ষীর নিঃসারণ করা হইয়া থাকে। এই সময়েপ্রত্যেক বৃক্ষ হইতে বৎসরে গড়ে ১ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধসের পরিমিত বিশুদ্ধ শুষ্ক রবার পাওয়া যায়; ইহা অপেক্ষা অল্পদিনের বৃক্ষ হইতে রবার বাহির হইলেও তাহা পল্পপরিমাণ ও অপকৃষ্টগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বৃক্ষ ১০।১২ বৎসরের হইলে তদ্‌জাত রবারের পরিমাণ বাৎসরিক ⁄২॥ সেরে পরিণত হয় এবং ২৫।৩০ বৎসরে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইতে সাধারণতঃ ৭ হইতে ১০ সের পর্য্যন্ত রবার পাওয়া যায়। বৃক্ষটী মরিয়া যাইতে পারে এরূপ ভীষণ ক্ষত করিয়া নিঃশেষে ক্ষীর বাহির করিলে এমন কি ৩০ সেরে ও উপর বিশুদ্ধ রবার পাওয়া গিয়া থাকে। হিভিয়া ব্যতীত অপর কোন জাতীয় বৃক্ষ হইতে এত অধিক রবার উৎপন্ন হয় না; ইহার নিম্নে এদেশীয় ফাইকাশ ইলাষ্টিকা পরিগণিত হয় কিন্তু তাহাও এত অল্পদিনে রবার নিঃসারণের উপযোগী হয় না; এই সুবিধার নিমিত্ত হিভিয়ার চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কোথাও কোথাও ফাইকাস ইলাষ্টিকা, বা চা, কফি ও কোকার আবাদ উঠাইয়া দিয়া মাত্র হিভিয়ার চাষ হইতেছে,আবার কোথাও পরস্পর মিশ্রিতভাবে ইহাদের চাষ হইতেছে।

ভূমিতল অনাবৃত থাকিলে সূর্য্যোত্তাপে রস শোষিত হইয়া বৃক্ষের পোষণের ব্যাঘাত ঘটে, অতিরিক্ত বর্ষায় মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যায়, অধিকন্তু ইহার চাষে ভূমির উৎপাদিকাশক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া আসে বলিয়া হিভিয়ার সহিত অরহর, ভূরা, ধঞ্চে, অ্যালবিজিয়া মলাকানা (Albizzia moluccana) প্রভৃতি ক্ষুদ্র২ বৃক্ষের চাষ করা হইয়া থাকে, ফলে ইহারা ভূমি আচ্ছন্ন রাখায় রসও শোষিত হইতে পারে না এবং প্রচুর পরিমাণ সার সঞ্চিত রাখে বলিয়া বৃক্ষ সতেজে বর্দ্ধিত হয়।

ভূমির উপরিস্থ ৩ হস্ত অবধি উর্দ্ধতন ২০ বা ৩০ হস্ত পর্য্যন্ত কাণ্ডদেশ এবং দুই ফিট পরিধি বিশিষ্ট বৃহৎ শাখা প্রশাখা হইতে ইহার ক্ষীর বাহির হইতে পারে। এরূপ উচ্চদেশ হইতে ক্ষীর সংগ্রহ করিতে বিশেষ ব্যয়াধিক্য ঘটে, এজন্য সাধারনতঃ ৫।৬ হস্ত হইতে বড় জোর ১৯ হস্ত পর্য্যন্ত ক্ষত করিয়া ক্ষীর সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। উর্দ্ধ বা নিম্নদেশ হইতে যে ক্ষীর অধিক বাহির হয় তাহার কোন স্থিরতা নাই, এবিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে, তবে ক্যাষ্টিলোয়ার নিম্ন অপেক্ষা উর্দ্ধদেশ হইতেই অধিক ক্ষীর বাহির হইয়া থাকে। হিভিয়ার শতকরা ২।১০টা বৃক্ষ হইতে আদৌ ক্ষীর বাহির হয়না বা অতি সামান্য

পরিমাণে বাহির হয় ; আবার কোন কোন বৃক্ষ নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত বা পুরাতন না হইলে ক্ষীর প্রদান করেনা ; এরূপ স্থলে এ সকল বৃক্ষোৎপন্ন বীজ ক্রয় করা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ তদুৎপন্ন বৃক্ষে পিতৃগুণ সঞ্চারিত হইতে পারে। সপ্তাহ, পক্ষ, মাস বা বৎসরান্তে ক্ষত করিয়া ক্ষীর বাহির করিলে তাহা শীঘ্রই ঘনীভূত হয় কথনও তরল থাকে না কিন্তু এরূপ কালবিলম্বিত ক্ষতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পপরিমাণ ক্ষীর বাহির হয় ও অতি নিকৃষ্ট ধাতুর রবার জন্মে। এক দিবস অন্তর ক্ষত করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ক্ষীর বাহির হয় ও বৃক্ষের কোন বিশেষ অনিষ্ট ঘটে না, কারণ হিভিয়া জাতীয় বৃক্ষের ২৪হইতে ৪৮ঘণ্টার মধ্যে ক্ষত আরোগ্য হয়, এবং তৎপরে একদিবশ অন্তর যত ঘন২ ক্ষত করা যায় ততই অধিক পরিমাণে ক্ষীর বাহির হয়। প্রত্যহ ক্ষত করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষীর বাহির হয় ও অনেক সময় তাহা জমেনা (Coagulate) এবং বৃক্ষ ভীষণরূপে আহত হওয়ায় অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বৃক্ষ প্রত্যহ বা একদিবস অন্তর ক্ষত করিলে শতকরা ৮।১০দিবসের ক্ষীর আদৌ ঘনীভূত হয় না, জলবৎ তরল থাকে সুতরাং কোন রবার পাওয়া যায় না। শীত অপেক্ষা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অধিক পরিমাণ ক্ষীর পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ষাকালে ক্ষীরে জলীয় অংশ অধিক থাকে। সাধারণতঃ ছয়মাসকাল নির্য্যাস বাহির করা হয় এবং আবশ্যক বুঝিলে সম্বৎসর ধরিয়াও ক্ষীর বাহির করা যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২০শ খণ্ড। চৈত্র, ১৩২৬ সাল। ১২ সংখ্যা

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের কৃষি শিল্পাদি

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের অগোচরে কত সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তাহা আমরা স্থূল দৃষ্টিতে অনুভব করিতে পারি না। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে দেশের যেরূপ অবস্থা ছিল, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে দেশের যেরূপ অবস্থা ছিল, এখনকার সহিত তুলনা করিলে, বোধহয় যেন যুগ পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। দেশের জল বায়ু, স্বাস্থ্য আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, কৃষি শিল্প ব্যবসায় প্রভৃতি সকল বিষয়েরই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত সাধিত হইয়াছে। (এক্ষণে লেখকের বয়স ৬৫ বৎসর অতীত হইয়াছে।) অর্দ্ধশতাব্দী বা তৎপূর্ব্বের ঘটনা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইবে, তাহা আমার কল্পন প্রসূত নহে। আমি যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, এই প্রস্তাবে তাহারই অবতারণা করিব। 'কৃষক' কৃষি শিল্প বিষয়ক পত্র, সুতরাই এই প্রবন্ধে কৃষি শিল্প বিষয়ে এই সুদূর পল্লীগ্রাম অঞ্চলে যেরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহাই লিখিত হইল।

লেখকের দুইটি মাত্র উপায়ক্ষম পুত্র ছিল। ঐ দুইটী পুত্রই এবং পত্নী, কন্যা দুইটী দৌহিত্র একবৎসরের মধ্যে পরলোক গমন করায়, এই বৃদ্ধ বয়সে তাহাদের দুর্বিসহ শোকানলে দগ্ধীভূত হইয়া নিতান্ত অশান্তিতে কালযাপন করিতেছি। তজ্জন্য মনের অশান্তিতে মধ্যে মধ্যে ভ্রম প্রমাদ ঘটাও বিচিত্র নহে। আশাকরি সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সকল ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করিয়া আমার এই প্রস্তাবটী কৃষক পত্রে প্রকাশিত করিয়া অনুগ্রহিত করিবেন।

অর্দ্ধশতাব্দী বা তৎপূর্ব্বে এ প্রদেশে দুরন্ত ম্যালেরিয়ার আদৌ প্রাদুর্ভাব ছিল না। তখন এ প্রদেশের সকলেই সুস্থ সবল পরিশ্রমী, বিলাস-বিমুখ ছিল। মোটা ভাত,

মোটা কাপড়েই সন্তুষ্ট ছিল। তখনকার কৃষণেরা এরূপ বলবান ও পরিশ্রমী ছিল যে তখন একজনে যে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে এখন দুইজনেও তাহা করিতে পারে না। তখনকার লোকে আহারও অনেক অধিক করিত। তখন অনেকেই একসের চাউলের অন্ন একবারে অনায়াসে ভোজন করিতে পারিত। তখন বিলাসিতা মোটেই ছিল না। মোটামুটি আহার পরিচ্ছদেই সন্তুষ্ট হইত। এখনকার অপেক্ষা তখন পুষ্টিকর খাদ্য অনায়াসেই খাইতে পাইত। তখন সকল গৃহস্থের বাটীতে গাভী ও পুকুর থামার দুগ্ধ ও মৎসের অভাব হইত না। এখন আর সকলে গাভী প্রতিপালন করিতে পারে না, কারণ উহা প্রতিপালন করা বহু ব্যয় সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যদিও কাহারও বাটীতে গাভী আছে বটে, কিন্তু গাভীতে আর পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ দেয় না। পল্লীগ্রামে মানুষের ন্যায় গো জাতিরও নিতান্ত অবনতি হইয়াছে। তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে কৃষকে প্রকাশ করিয়াছি। পুকুর যদিও আছে, তাহাও নামে মাত্র। প্রায় সমস্ত পুষ্করিণীই মজিয়া গিছে, প্রায় সকল পুকুরেই সম্বৎসর জল থাকে না। সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় মৎস্য জন্মে না। পূর্ব্বের ন্যায় মৎস্য উৎপাদনের জন্য যত্ন করাও হয় না। সুতরাং পল্লীগ্রামেও দুগ্ধ ও মৎস্যে নিতান্ত দুর্লভ ও বহুমূল্য হইয়াছে।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এ প্রদেশে বিলাতি বস্ত্র প্রবিষ্ট হয় নাই। তখন সকলেই মোটা কাপড় ব্যবহার করিতেন। বিশেষ ধনী লোক ব্যতীত কি ইতর কি ভদ্র সকলেই মোটাকাপড় পরিতেন। তখন এ প্রদেশের প্রায় সকল গ্রামেই প্রচুর পরিমাণে কার্পাসের চাষ হইত। গ্রামের নিকটবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে কাপাসের চাষ করা হইত। এজন্য ঐ সকল জমিকে কাপাসে জমি বা দো জমি বলিয়া থাকে। ঐ সকল জমিতে বারমাসে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুই তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রকমের ফসল হইত বলিয়া উহাকে "দো" জমিও বলিয়া থাকে। যেসকল জমিতে কেবল ধান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ফসল জন্মে না, সেই সকল জমির রাজস্ব অপেক্ষা কাপাসে বা দো জমির রাজস্ব ৩,৪ গুণ অধিক। প্রথমতঃ ঐ সকল জমিতে আশু ধান বপন বা কেলেন ধান রোপণ করা হয়। অশ্বিন মাস মধ্যেই ঐ সকল ধান কাটিয়া আনা হয়। কাপাসে জমি মাত্রেই বারমাস জল সেচনের সুবিধা ছিল, এখন আর জল সেচনের সুবিধা নাই। যে সকল পুষ্করিণী বা জলাশয় হইতে জল সেচন করা হইত, সেই সকল পুষ্করিণী বা জলাশয় মজিয়া যাওয়ায় বারমাস জল থাকে না। অনেকস্থলে পুষ্করিণীর অধিকারী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া বলপূর্ব্বক স্বার্থ প্রমোদিত হইয়া আনেক পুকরিণী হইতে জল সেচন বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দরিদ্র কৃষকগণ জল সেচনের স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে অক্ষম বলিয়া জল সেচন স্বত্বে বঞ্চিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ঐ সকল জমিতে আউশ, কেলেস ধান ব্যতীত ইক্ষু, মটর, মসুর, খেসারী, সরিষা, গম, যব, কাপাস, তিল প্রভৃতি নানাপ্রকার ফসল উৎপন্ন হইত। এখন আর ধান ব্যতীত কোন

ফসলই উৎপন্ন হয় না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন ঐ সকল জমিতে প্রতি বৎসরেই প্রচুর পরিমাণে কার্পাস জন্মিত। পূর্ব্বে আমাদের এ প্রদেশে যে প্রণালীতে কার্পাস চাষ হইত, তাহা পূর্ব্বে কৃষকে প্রকাশিত হইয়াছে। কার্পাসের কোষের মধ্যে যে তুলা পাওয়া যায়, তাহা বীজের সহিত সংযুক্ত থাকে। পূর্ব্বে থাউই নামক যন্ত্র দ্বারা তুলা হইতে বীজ পৃথক করা হইত। ঐ তুলা ধুনিয়া পাঁইজ প্রস্তুত করিয়া চরকার সাহায্যে সূতা কাটা হইত। সেই সূতা দিয়া তাঁতির নিকট হইতে মোটা কাপড় বুনাইয়া লওয়া হইত। তৎকালে ধনী লোকের বাড়ীর স্ত্রীলোক ব্যতীত এ প্রদেশের কি ইতর কি ভদ্র সকল বাড়ীতেই প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই এক একটী চরকা ছিল। সংসারিক কাজকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া সকল স্ত্রীলোকেই চরকার দ্বারা সূতা প্রস্তুত করিতেন। এখনকার স্ত্রীলোকদের ন্যায় তাস খেলিয়া বা নাটক নভেল পরিয়া সময় কাটাইতেন না। তখন প্রায় সকল গৃহস্থকেই কাপড় কিনিয়া পরিতে হইত না।

তখন কেবল তন্তুবায় জাতিতেই কাপড় বুনিত তাহা নহে। অনেক জাতিতেই কাপড় বুনিত। মুসলমান, জোলা, মুচি, নমশূদ্র, বাগ্দী প্রভৃতি অনেক জাতিকেই কাপড় বুনিতে দেখিয়াছি। আমাদের ন্যায় অনতি বৃহৎ গ্রামে ও ২০।২৫ খানি তাঁত চলিত। প্রতি হাতে (২০ ইঞ্চ) বহর বুনানির ভাল মন্দ অনুসারে এক পয়সা হইতে দুই পয়সা পর্য্যন্ত বানি দিয়া কাপড় বুনাইতে হইত। সূতার মাড় দিবার জন্য কিছু চাউল দিতে হইত। অনেক অবিরা (পতিপুত্রহীনা) স্ত্রীলোকেরা চরকার সুতা কাটিয় আপন ভরণ পোষন নির্ব্বাহ করিত। প্রথমতঃ কনো প্রকারে একপোয়া তুলা সংগ্রহ করিয়া, সেই তুলায় সূতা প্রস্তুত করিয়া তুলা ও সুতার ব্যবসায়ীর নিকট সুতা দিয়া তাহার দুই গুণ কি আড়াই গুণ তুলা পাইত। সুতা মোটা করিয়া কাটা হইলে দ্বিগুণ তুলা পাওয়া যাইত। খুব সূক্ষ্ম সুতা কাটা হইলে আড়াই গুণ তিনগুণ তুলাও পাওয়া যাইত; আবার সেই তুলার দ্বারা সুতা তৈয়ার করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে তুলা লইত। এইরূপ করিয়া অধিক সুতা তৈয়ার হইলে বিক্রয় করিত। দিন রাত পরিশ্রম করিয়া মাসে দেড় টাকা দুই টাকা উপার্জ্জন করিত। তখন সকল দ্রব্যই শস্তা থাকায় আমাদের ন্যায় পল্লীগ্রামে একটি লোকের দেড়টাকার মধেই খাওয়া পরা কষ্টে সৃষ্টে চলিয়া যাইত। এইরূপে তৎকালে অনেক স্ত্রীলোকেরই কাটনা কাটা উপজিবিকা ছিল। সে সময় অনেক অবিরা স্ত্রীলোক পরাধীনা (যে পরের গলগ্রহ) না হইয়া এরূপ স্বাধীন ভাবে দিন গুজরাণ করিত। তখন সকল স্ত্রীলোকেই কাটনা কাটিতে পারিত।

এখনকার ন্যায় সেকালে সভ্যতা ও বিলাসিতা ছিল না। দেশে যত সভ্যতা ও বিলাসিতা বৰ্দ্ধিত হইবে, লোকের অভ্যাস সেই পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইবে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের লোকে জামা, জুতা, ছাতা এক প্রকার জানিত না বলিলেও চলে। যখন আমরা ৭।৮ বৎসরের বালক, সে সমায়ে যদি গ্রামে জামা জুতা পরিয়া কোন লোক

আসিত, তাহা হইলে কে আসিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্ত দৌড়িয়া যাইতাম। মনে করিতাম কত বড় লোকই না আসিয়াছে। হায় কালের কি মহিমা! এখন দীন দরিদ্র পথের ভিখারীও জামা জুতা ব্যবহার করিতেছে। অর্দ্ধশতাব্দীতেই যখন এত পরিবর্ত্তন দেখিলাম, পূর্ণ শতাব্দীতে যে কতই পরিবর্ত্তন হইবে তাহা বলাই বাহুল্য !! কাপড়ের ছাতা তখন পল্লীগ্রামে প্রায় ব্যবহার ছিল না বলিলেই চলে। তখন গোল পাতার ছাতা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা সকল কালেই গোল পাতার ছাতা ব্যবহৃত হইত। তাহা ছাড়া বর্ষা কালে তাল পাতার ছাতা, তাল পাতার পেকে ব্যবহৃত হইত। এখন আর গোল পাতার ছাতা বা তাল পাতার ছাতা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও এ প্রদেশের কৃষকেরা বর্ষা কাল তাল পাতার পেকে ব্যবহার করিয়া থাকে। বর্ষা কালে বৃষ্টি আসিলে ঐ পেকে মাথায় লাগাইয়া সকল প্রকার চাষের কার্য্য করা চলে। ছাতার দ্বারা সেরূপ চলে না।

এখন যেমন জর্ম্মণী বিলাত প্রভৃতি হইতে আমদানী সার্জ্জ র‍্যাপার, আলোয়ান, প্রভৃতি শীত বস্ত্র অল্প মূল্যে পাওয়া যায়, তখন সেরূপ ছিল না। সাল, জামিয়ার প্রভৃতি শীত বস্ত্র সকল বহুমূল্য ছিল। তখন বনাত ও শীত বস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হইত। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণে ঐ সকল শীত বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিত না। কাটনা কাটার সুতার বস্ত্র হইতে শীত বস্ত্র তৈয়ারী করা হইত। দেড় হাত বহরের কাপড় খুব ঘণ করিয়া ২৪হাত লম্বা থানের ন্যায় বুনাইয়া লওয়া হইত। তাহা দুই পাল্‌টা করিয়া সেলাই করিলে বহর তিন হাত হইত। তাহাই দুই ভাঁজ করিয়া গায়ে দেওয়া হইত। লেপ তৈয়ার করিতে বা লেপের ওয়াড় করিতেও ঐ রূপ কাপড় ব্যবহৃত হইত। লেপ তৈয়ার সময় কাপড় ইচ্ছামত রং করা হইত। কাটনা কাটা সুতার তৈয়ারী কাপড় খুব মজবুত ও দীর্ঘ কাল স্থায়ী। এমন কি ঐ কাপড় বর্ষাধিক কাল ব্যবহার করিলেও ছিন্ন হইত না। আমরা ১৫।১৬বৎসর পর্য্যন্ত ঐ রূপ বোনা কাপড় ব্যবহার করিয়াছি। তৎকালে সাধারণ লোকের অষ্টপ্রহর ব্যবহার জন্য ঐ রূপ মোটা কাপড় চলন ছিল। তৎকালে বালকেরা পূজার সময় এক একখানি করিয়া "চন্দ্রকোনার" অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম কাপড় পোষাকী রূপে পাইত। তখনও জুতা জামা আমাদের ন্যায় সুদূর পল্লীগ্রামে সাধারণের মধ্যে খুব কম ব্যবহার করিতে দেখা যাইত।

অর্দ্ধশতাব্দীর পর হইতে মাঞ্চেষ্টারের বিলাতী কাপড় দুই এক প্রদেশে যাইতে লাগিল। দশ বৎসরের মধ্যে বিলাতী কাপড় মোটা কাপড়ের স্থান অধিকার করিল। ক্রমে ক্রমে ১০।১৫বৎসরের মধ্যে চরকা ও কার্পাস চাষ অন্তর্হিত হইল। তাঁতী কুল ও নির্ম্মূল হইল। কার্পাস চাষ ও উঠিয়া যাইলেও ২।৪ জন তাঁতী মোটা (৩০।৪০নম্বর)

সুতার কাপড় বুনিয়াছিল। আমাদের গ্রামে আমি ২০।২৫টী তাঁত অনবরত চলিতে দেখিয়াছি; এখন আর একখানিও তাঁত নাই। যদিও এখন এ প্রদেশের কোন কোন গ্রামে ২।১ খানি তাঁত চলিয়া থাকে, তাহতে বিলাতী মোটা সুতার কাপড় বা গামছা বোনা হইয়া থাকে। সে সময়ে অনেক স্ত্রীলোকও স্ব হস্তে বস্ত্র বয়ন করিত। তখন ভদ্র ঘরের অনেক স্ত্রীলোকেরা চরকায় সূতা কাটিয়া এবং ইতর ঘরের অনেক স্ত্রীলোক তাঁত চালাইয়া আপনাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিত। পরাধীন হইয়া বা অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকিত না। এখন লোকের বিলাসিতা এতই বর্দ্ধিত ও রুচির এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে লোকে আর মোটা কাপড় ব্যবহার করিতে চায় না। এক্ষণে বিলাতী কাপড় অপেক্ষা দেশী মিলের কাপড় অপেক্ষাকৃত মোটা বলিয়া বিলাতী কাপড় অপেক্ষা শস্তা স্বত্বেও দেশী মিলের কাপড় ব্যবহার করিতে অনেকেই অনিচ্ছুক। আমরা বাল্যকালে চরকায় সুতার দেশীয় তাঁতি দ্বারা প্রস্তুত যেরূপ মোটা কাড় ব্যবহার করিয়াছি, তাহার তুলনায় দেশী মীলে প্রস্তুত কাপড় অনেক অংশে সুক্ষ্ম ও সুচিক্কণ। দেশের রুচি অনুসারে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

এক্ষণে বস্ত্রের মুল্য যেরূপ মহার্ঘ্য হইয়াছে, তাহাতে সাধারণের লজ্জা নিবারণ করা সুকঠিন ব্যপার হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীগ্রামের অনেকেই যেরূপ জীর্ণ ছিন্ন শত গন্থি-যুক্ত বস্ত্র ব্যবহার করিয়া কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করে, তাহা দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বিশেষতঃ ঐরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া স্ত্রীলোকগণের গৃহের বাহির হইবার উপায় নাই। এই দারুণ শীতে বস্ত্রাভাবে অনেকেই যে কিরূপ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের অনুভব করিবার উপায় নাই। এখনও যদি পূর্ব্বের ন্যায় কাপাস ও চরকার প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে সাধারণকে বস্ত্রের জন্য এরূপ দারুণ যন্ত্রনা উপভোগ করিতে হইত না। আমরা এক্ষণে প্রায় সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের আর কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র ও স্বাবলম্বন নাই। স্বদেশী অন্দোলনের সময় বিদেশী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের জন্য যেরূপ উত্তেজনা ও প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, দেশে কার্পাস চাষ প্রচলন, বস্ত্রবয়ন জন্য যেরূপ আন্দোলন দেখা গিয়াছিল, এখন যদি তাহার শতাংশের একাংশ থাকিত তাহা হইলে দেশবাসীকে আর বস্ত্রের জন্য এরূপ ক্লেশ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। আমাদের উত্তেজনা অল্প দিনের মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায় বিশিষ্ট না হইলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না, চাকরী প্রিয় বাঙ্গালীর সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায় কৈ? নচেৎ বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণ এখানে আসিয়া কোটীপতি হইয়া যাইতেছেন আর আমরা তাঁহাদের অফিসে দাসত্ব ভিক্ষার জন্য লালায়িত!! হায় ভগবান কত দিনে আমাদের হৃদয়ে বল ও সুমতি প্রদান করিবেন।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, পল্লীগ্রামে জাতিগত ব্যবসায়ের বিলক্ষণ প্রচলন ছিল। তখন পল্লীগ্রামে বিংশশতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবিষ্ট হয় নাই। কুম্ভকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, মালাকার, তৈলকার, শঙ্খকার, কাংসকার, চর্ম্মকার, রজক, বারুই গোপ, বণিক, মোদক প্রভৃতি জাতিগণ স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ে অভিনিবিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত উগ্র ক্ষত্রিয়, সৎগোপ প্রভৃতি জাতিগণের কৃষিই প্রধান উপজীবিকা ছিল। এ প্রদেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত অপর সমস্ত জাতিই স্বহস্তে হল চালনা করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতিগণ নিজ নিজ ব্যবসায় ব্যতীত প্রায় সকলেই স্বহস্তে কৃষিকার্য্যও সম্পন্ন করিত, এখনও করিয়া থাকে। তখন এ প্রদেশের প্রায় সমস্ত লোকেরই কৃষিই প্রধান উপজীবিকা ছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতিগণ যদিও স্বহস্তে লাঙ্গল ধরেন না বটে, কিন্তু প্রায় সকলেই বেতনভোগী কৃষাণ ও বলদ রাখিয়া চাষ করিতেন। তখন চাকরীজীবী খুব কমই ছিল। তৎকালে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন এ প্রদেশে খুব কম ছিল। এখনকার ন্যায় তখন বর্দ্ধিষ্ট গ্রাম মাত্রেই স্কুল ছিল না। খুব কম লোকেই ইংরাজী শিক্ষা করিয়া চাকরী করিতেন। তৎকালে এ প্রদেশের সর্ব্বসাধারণের কৃষিই প্রধান অবলম্বন ছিল। চাষ করিয়া অনেকেই তৎকালে দোল, দুর্গোৎসব, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, শিবপ্রতিষ্ঠা, বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে এখনকার ন্যায় কৃষির শোচনীয় অবস্থা ছিল না। তখন আমরা যেরূপ প্রচুর পরিমাণে নানাপ্রকার শস্য উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি এখন আর সেরূপ দেখিতে পাই না। এখন ধান ব্যতীত অন্য শস্যের চাষ প্রায় এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে সময়ে গৃহস্থের প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত দ্রব্যই কৃষি হইতে উৎপন্ন হইত। সে সময়ে এ প্রদেশে সভ্যতা ও বিলাসিতা প্রবিষ্ট না হওয়ায়, এখনকার ন্যায় বিলাসিতার জন্য নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হইত না। পরিধেয় বস্ত্র খাদ্য কৃষি হইতেই উৎপন্ন হইত। সে সময়ে সকল দ্রব্যই পল্লীগ্রামে এতই শস্তা ছিল যে, অনেক পাঠক সেকথা শুনিলে চমৎকৃত হইবেন। তখনকার অপেক্ষা এখন প্রায় সকল দ্রব্যের মূল্যই আটগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। অধিকাংশ লোককেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রায়ই কিছুই কিনিতে হইত না। লবণটী সকল গৃহস্থকেই ক্রয় করিতে হইত।

তৎকালে এ প্রদেশে টাকা খুব কম ছিল। প্রায় সকলেই কৃষিজীবী কৃষিজাত দ্রব্য না বেচিলে একটী টাকা পাওয়া যাইত না। শস্য বিক্রয় করিতে হইলে সহর বা গঞ্জ ব্যতীত বিক্রয় হইত না। যে সময় গ্রামে গ্রামে যে ২।১টী করিয়া দোকান থাকিত, সেই দোকানে গৃহস্থের নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত দ্রব্যই ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত। দোকানে নগদ পয়সায় দ্রব্যাদি খুব কমই বিক্রীত হইত। শস্যের পরিবর্ত্তে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

এখনও এখানে ধানচাল দিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করার প্রথা সামান্যরূপ চলিয়া আসিতেছে। ধান চাল বা অন্য শস্যের পরিবর্ত্তে দোকানের জিনিস বিক্রয় করিয়া দোকানদারেরা দ্বিগুণ লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর ধানচাল বিক্রয়ের জন্য সহর বা গঞ্জে যাইতে হয় না। ধানচালের খরিদার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একারণ দোকানে দুই আনার ধান দিয়া এক আনার দ্রব্য লইতে এখন আর সহজে যায় না। তরিতরকারী ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে সপ্তাহে দুইদিন করিয়া হাট বসে। পূর্ব্বে হাটে ধানচালের পরিবর্ত্তে তরিতরকারী পাওয়া যাইত। লোকে পয়সার অভাবে ধানচাল দিয়া তরিতরকারী ক্রয় করিত। পূর্ব্বে বাড়ির দ্বারাও ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্য চলিত।

পূর্ব্বে চাষের যেরূপ উন্নতিছিল, যেরূপ প্রচুর পরিমাণে নানাপ্রকার শস্য উৎপন্ন হইত, এখন আর সেরূপ নাই। পূর্ব্বে এ প্রদেশে আউশ কেলেস ধান কাটিবার পর সেই সকল জমিতে মসুর, শর্ষপ, কার্পাস, পলাণ্ডু তৎপরে তিল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। যে জমিতে ইহাদের চাষ হইত, সে জমিতে আমন ধান দেওয়া চলিত না। তখন প্রতি কৃষকেরই প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু জন্মিত। এ প্রদেশে যে প্রণালীতে ইক্ষু চাষ হইত, তাহা পূর্ব্বে কৃষকে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন যেমন লৌহনির্ম্মিত কলে বলদের সাহায্যে ইক্ষুর রস বাহির করা হয়, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। কাষ্ঠ নির্ম্মিত কল চালনা করিলে "কঁা কোঁ" শব্দ হইত। প্রতি গ্রামের ৩।৪ স্থানে বৃহৎ গ্রাম হইলে ৭।৮ স্থানে ঐরূপ কল চলিত। পৌষমাসের শেষ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তিনমাসকাল ঐরূপ কল সকল অনবরত পরিচালিত হইয়া গ্রাম সকলকে মুখরিত করিয়া তুলিত। তখন গুড় এত শস্তা ছিল যে, পাঠক তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইয়া যাইবেন। তখন সকল দ্রব্যই এত শস্তা ছিল যে, সে সময়ে এক মণের মূল্য যত ছিল, এখন এক মণের মূল্য তাহা অপেক্ষা আটগুণ হইতেও বেশি হইয়াছে তৎকালের নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইবে।

ইংরাজীভাষা শিক্ষা না করিলে ভাল চাকরী হয় না। চাকরী না করিলে উন্নতি ও ভদ্রতা থাকে না। এই ধারণার বশীভূত হইয়া এখন সকল জাতিই চাকরীর জন্য লালায়িত। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত অন্যান্য জাতিগণ স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট জাতিগত ব্যবসায় শিক্ষা না দিয়া আপনাদের পুত্রগণকে ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট করিয়া দিতেছেন। এখন চাকরী যেরূপ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও চাকরী পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এখন শিক্ষায় যেরূপ ব্যয়-বাহুল্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সকলে যে আপন আপন পুত্রগণকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারিবেন, সে আশা নাই। ব্যয় স্বীকার করিলেও সকলে বি, এ, বা এম, এ, পাশ করিতে

পারিবে না। এমন অবস্থায় অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকের চাকরী মিলা সুদুস্কর। যদি চাকরী পাওয়া যায়, ২০৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা বেতনের অধিক হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন সমস্ত খাদ্য দ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্র মহার্ঘ্য হইয়াছে, তাহাতে বিদেশে থাকিয়া ঐ বেতনের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, নিজের গ্রাসাচ্ছাদন বাদে পরিবার প্রতিপালন করিতে কিছুতেই পারিবে না। পল্লীগ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি আপন আপন পৈত্রিক ব্যাবসয় ও কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হন, তবে দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মনোযোগী হইলে আপনাদের পৈত্রিক ব্যবসায় ও কৃষিশিল্পের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারেন। ইহাতে দেশের উন্নতি, সেই সঙ্গে চাকরী অপেক্ষা নিজেও অধিক লাভবান হইতে পারেন।

কর্ম্মকার যদি পুত্রকে শিক্ষিত করিয়া নিজ ব্যবসায়ে অর্থাৎ অস্ত্রাদি নির্ম্মাণে নিয়োজিত করেন, তবে চাকরী অপেক্ষা যে অধিক লাভবান হয়, তাহার সন্দেহ নাই যে সকল কর্ম্মকার ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, কাটারি, কাস্তে, কোদাল, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে সুপটু হন, ঐ সকল অস্ত্রে ভাল করিয়া পান দিতে সক্ষম হন, তিনি শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিতে পারেন। ক্রমে অনেক লোকজন রাখিয়া বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিতে পারেন। বর্দ্ধমান জেলার কয়েক স্থানে কর্ম্মকারগণ লৌহ অস্ত্র ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করিয়া আপনাদের অবস্থা বেশ উন্নত করিয়াছেন। কেবল জাতীয় বৃত্তি কর্ম্মকার বলিয়া নহে, সকলেই যদি মনোযোগী হইয়া আপনাদের শিল্পাদি কর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে নিজের অবস্থার সহিত দেশেরও বহুল পরিমাণে উন্নতি সাধন করিতে পারেন। এখন দেশের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে উচ্চশিক্ষিত হইয়া চাকরী জন্য লালায়িত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালীর চাকরীর পরিসর এখন সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এখন আর প্রদেশান্তরে চাকরী পাইবার উপায় নাই। এখন অন্নের জন্য দেশের অধিকাংশ লোককেই লালায়িত হইতে হইয়াছে। এখন যদি সকলেই আপনাদের পৈত্রিক ব্যবসায় কৃষি শিল্পাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া চাকরীর চেষ্টা করে, তবে আরো অন্নকষ্ট বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। এখন জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে যদি অনেকেই কৃষিশিল্পাদি বিষয় মনোযোগী হন এবং ঐ সকল বিষয়ের উন্নতি সাধনের জন্য যদি বদ্ধপরিকর হন, তবে এই সুজলা সুফলা বঙ্গ মাতার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে করি। হায়! বাঙ্গালীর এ সুমতি কত দিনে হইবে।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যদিও এখনকার ন্যায় সভ্যতা, পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য ছিল না বটে, কিন্তু অন্ন বস্ত্রের কষ্ট প্রায় কাহারও ছিল না। এখন যেমন দেশের আপামর সাধারণ রুগ্ন, দুর্ব্বল, পরিশ্রম বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তখন দেশে ম্যালেরিয়া না থাকায় সকলেই সুস্থ সবল ছিল। আহারাভাবে কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইত না। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কারণ

স্বত্বেও যে পরিমিত ও পুষ্টিকর আহারাভাবে যে দেশের অধিকাংশ লোকই রুগ্ন, দুর্ব্বল ও পরিশ্রম বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বের ন্যায় আর গ্রামে গ্রামে সুনির্ম্মল পানীয় জল পাওয়া যায় না, পূর্ব্বে যে সকল জলাশয় বা পুষ্করিণীতে নির্ম্মল পানীয় জল পাওয়া যাইত, এখন সেই সকল জলাশয় বা পুষ্করিণী মজিয়া যাওয়ায়, পূর্ব্বের ন্যায় সুনির্ম্মল পানীয় জল পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মকালে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এত জল কষ্ট হয় যে, তখন নিতান্ত দূষিত জল পান করিতেই বাধ্য হইতে হয়। এখন দেশের অধিকাংশ লোকেই পুষ্টিকর পরিমিত আহারের ও সুনির্ম্মল পানীয় জলের অভাবে এরূপ রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইতেছে সেইজন্য অকালে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ প্রদেশে বহুসংখ্যক সুবৃহৎ পুষ্করিণী স্বত্বেও এরূপ জল কষ্ট নিতান্ত দুঃখের বিষয়। ঐ সকল পুষ্করিণীর প্রায় অধিকাংশই এখন মজিয়া গিয়াছে। উহার জল এখন দূষিত ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ সাধারণের উপকারার্থে নিঃস্বার্থভাবে অনেক মহাত্মা ব্যক্তি পুষ্করিণী খনন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেন, এখন আর সেরূপ দেখা যায় না। এখন নূতন পুষ্করিণী খাত হওয়া দূরে থাকুক, পুরাতন পুষ্করিণী গুলির পঙ্কোদ্ধারও হইতেছে না। যদিও কেহ কোন পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করেন, তাহা নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারের জন্য করেন না। মৎসাদি পুনঃ পুনঃ ধরাইবার জন্য তাহার জল পরিষ্কৃত থাকে না, পাড়ের উপর রোপিত বৃক্ষের পাতা পড়িয়া পুষ্করিণীর জল দূষিত হইয়া উঠে। এখন প্রায় সকলেই স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া পুষ্করিনীর উন্নতি সাধন করেন। আবার সকল পুষ্করিণীর (যাহাতে বাস্তর জল পড়ে) জল পরিস্কৃত হয় না। এক পুরুষ পরেই পুষ্করিণী সাজায় হইয়া পড়ে,— "সাজার মা, গঙ্গা পায় না" এইপ্রবাদ বাক্যের ন্যায় সাজার পুষ্করিণীর উন্নতি সাধিত হয় না। গবর্ণমেণ্ট বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড যদি পল্লীগ্রামের সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা না করেন, তবে পল্লীগ্রামে উত্তরোত্তর মৃত্যু সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে। এক্ষনে পল্লীগ্রামে মৃত্যু সংখ্যা কিরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, আমাদের গ্রামের লোক সংখ্যার তালিকা হইতে তাহা নিম্নে দেখান হইয়াছে।

আমাদের গ্রামে খৃঃ ১৮৮১ সালের গণনায় লোক সংখ্যা প্রায় এক হাজার হয়, খৃঃ ১৮৯১ সালের লোক সংখ্যা পূর্ব্ব গণনার প্রায় একশত কম হইয়া প্রায় ৯০০ জন লোক হয়। ১৯০১ সালের গণনায় ৮৩০ জন হয়, খৃঃ ১৯১১ সালের ৬৬০ জন হয়। আগামী বৎসরের গণনায় যে কত কম হইবে বলা যায় না। গত বৈশাখ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত এই কয়েক মাসে গ্রামে ৫০।৬০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু পাঁচ জন লোক জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। এইরূপ ভাবে যদি লোক কম হইতে থাকে, একশতাব্দীর মধ্যে এপ্রদেশের পল্লীগ্রাম সমূহ লোক শূন্য হইয়া যাইবে। এখন হইতে প্রতিকার

না করিলে, উত্তরোত্তর লোক ক্ষয় বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। পরিমিত ও পুষ্টিকর খাদ্য ও সুপেয় পানীয় জলের অভাবে পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকেই দুর্ব্বল, রুগ্ন ও পরিশ্রম বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ সুস্থ ও সবল না থাকিলে জন্ম সংখ্যা কখনও বর্দ্ধিত হতে পারে না, বরং মৃত্যু সংখ্যাই বর্দ্ধিত হয়। গত বৎসর ও এবৎসর অনেক লোকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া রোগে মারা গিয়াছে। উপরে উক্ত কারণ ব্যতীত শীতকালে উপযুক্তরূপ গাত্রবস্ত্র না পাওয়ায় উক্তরোগে এত অধিক সংখ্যক লোকের মৃত্যুর অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়। এ প্রদেশে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধ লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। আমার সমবয়স্ক বা আমা অপেক্ষা বয়জ্যেষ্ঠ গ্রামের মধ্যে ২।৩টির অধিক নাই। এখন অধিকাংশ লোকই অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তজ্জন্য প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করিয়া খুব অল্প সংখ্যক লোকই বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়।

অর্দ্ধশতাব্দী পুর্ব্বে এপ্রদেশে ইংরাজী শিক্ষিত লোক কমই ছিল, যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা বিদেশে থাকিয়া চাকরী করিতেন। এরূপ লোকেয় সংখ্যা এক আনার অধিক হইবে না। ঐরূপ লোক ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে অধিক ছিল। উন্নত অবস্থাপন্ন ২।১জন সৎগোপ ইত্যাদি জাতিও ইংরাজি ভাষা লিখিতে ও বলিতে শিখিয়াছিল। তৎকালে এ প্রদেশে কি ভদ্র কি ইতর সলেরই কৃষি প্রধান উপজিবীকা ছিল। যে সকল জাতীয় শিল্পাদি জাতীয় বৃত্তি ছিল, তাহা ব্যতীত তাহারাও সহস্তে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিত; অবকাশ মতে জাতীয় বৃত্তি শিল্পাদি কার্য্যে মনোযোগী হইত। ফলতঃ সে সময়ে কি চাকরী উপজীবী কি শিল্প ব্যবসায়ী সকলেরই কৃষি একটী অন্যতম প্রধান উপজীবিকা ছিল। এখনকার ন্যায় বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা, বিলাসিতা,উচ্চাভিলাষ ছিল না, তখন প্রায় সকলেই গ্রাসাচ্ছাদনেই সন্তুষ্ট হইত। তখন অধিকাংশ লোকের মনে বিলাসিতা ও উৎকৃষ্ট ভোগেচ্ছা না থাকায়, কৃষিজাত সামান্য আয়েই সকলে সন্তুষ্ট হইতে পারিত। এখনকার দুরাকাঙ্খ ব্যক্তিগণ কখনই মনে শান্তি লাভ করিতে পারে না। এখনকার ন্যায় তখন অনাবশ্যক পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর ছিল না। ইতর লোকের কথা দূরে থাকুক, ভদ্রলোককে যদি গ্রামান্তরে কুটুম্ব বা আত্মীয়ের বাড়ী যাইতে হইত, তাহা হইলে একটু পরিস্কৃত একখানি মোটা ধুতি পরিয়া, কন্ধে একখানি উত্তরীয় বস্ত্র লইয়া গমন করিতেন। ২।৪ ঘণ্টার জন্য যদি স্থানান্তরে যাইতেন, তবে স্কন্ধে গামছা ফেলিয়া যাইতেন। এখন তাঁহার পুত্রপৌত্রগণের পোষাক পরিচ্ছদের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কেবল পোষাক পরিচ্ছদ কেন এখন সকল বিষয়েই বিলক্ষণ ব্যয় বাহুল্য হইয়াছে। এখন পুত্র কন্যার বিবাহ যে কিরূপ বহু ব্যয় সাধ্য হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এখন পুত্র বা পৌত্রের বিবাহে গাত্রহরিদ্রা পাঠাইতে যাহা ব্যয় হয়, তাঁহাদের নিজের বিবাহের সমস্ত ব্যয়ও বোধ হয় তত হয় নাই। যাঁহাদের কেবল কৃষি উপজিবিকা, এখনও তাঁহারা ততদূর বিলাসী ও সুসভ্য হয়েন নাই। এখনও তাঁহারা মোটা মুটি ভাবে চলিয়া থাকেন।

কৃষিই যাহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল বা এখন ও আছে তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা অন্য কোন জাতির আবাদি জমি জায়গা আছে, কিন্তু স্বহস্তে চাষ আবাদ করেন না, বেতন ভোগী কৃষাণ রাখিয়া ও ঠীকা জন মজুর খাটাইয়া চাষ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে প্রথম শ্রেণী ভুক্ত করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্যান্য যে সকল জাতির আবাদি জমি জায়গা আছে বেতন ভোগী কৃষাণ না রাখিয়া, স্বহস্তে চাষ আবাদের কার্য্য করেন এবং আবশ্যক হইলে সময়ে সময়ে কেবল মাত্র ঠিকা জন মজুর দ্বারা চাষের কার্য্য করান তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত করা যাইতে পারে। যে সকল লোকের নিজের স্বত্ব-বিশিষ্ট জমি জায়গা নাই, চাষ করিবার জন্য লোকের নিকট বার্ষিক খাজনা দিবার কড়ারে অস্থায়ী ভাবে ঠিকা জমি জমা করিয়া লইয়া কিম্বা অর্দ্ধেক শস্য জমির অধিকারীকে দিবার কড়ারে ভাগ জোতে জমি লইয়া স্বহস্তে চাষ করে, তাহাদিগকে তৃতীয় শ্রেণীর ভুক্ত করা যাইতে পারে।

১ম শ্রেণীভুক্ত লোকের চাষে লাভবান হইতে পারেন না। কৃষাণের খোরাক পোষাক ও বেতন, ভূমির রাজস্ব, গরু প্রতিপালন ইত্যাদি নানা বিষয়ে খরচপত্র করিয়া প্রায় লাভ কিছুই থাকে না। পূর্ব্বে সমস্ত দ্রব্যই এখনকার অপেক্ষা অনেক শস্তাছিল, কৃষাণের বেতনাদিও গো প্রতিপালনের ব্যয় খুব কম ছিল, এখনকার অপেক্ষা তখনকার কৃষাণেরা খুব বলবান ও পরিশ্রমী ছিল, এমন কি তখনকার একজন কৃষাণে যে কার্য্য সম্পন্ন করিত, এখনকার একজন কৃষাণে সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না, এত সুবিধা স্বত্বেও তখনকার ১ম শ্রেণীভুক্ত চাষীরা লাভবান হইতে পারিতেন না। তাহার কারণ তখন কৃষিজাত শস্য বিক্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া লভ্যাংশ খুব কমই থাকিত। যে বৎসর সুবর্ষা হইয়া প্রচুর শস্য জন্মিত, সেই বৎসর সামান্য লাভ হইত বটে কিন্তু আমাদের ন্যায় দেব মাতৃক প্রদেশে প্রতি বৎসর সুবর্ষাও হয় না, ভাল শস্যও জন্মেনা; সুতরাং ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। মোটের উপর লাভ কমই হইত। এখনও শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইলেও খরচের মাত্রা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি হওয়ায় লভ্যাংশ কমই হইয়া থাকে।

২য় শ্রেণীভুক্ত কৃষকের বিলক্ষণ লাভবান হইয়া থাকে। তাহাদের চাষে খরচপত্র খুব কমই হয়। এই শ্রেণীর কৃষকেরা যেরূপ যত্ন পরিশ্রম সহকারে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, বেতনভোগী কৃষকেরা সেরূপ করে না। মনিবের লাভ লোকসানের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি থাকে না। এই শ্রেণীভুক্ত কৃষকের একজনের কার্য্য বেতন ভোগী দুই জন কৃষক না হইলে সম্পন্ন করিতে পারে না। উগ্র-ক্ষত্রিয়, সৎগোপ, মুসলমান প্রভৃতি জাতি ২য় শ্রেণীভুক্ত কৃষক। ইহারা নিজ হস্তে যেরূপভাবে ভূমি কর্ষণ করে, বেতনভোগী কৃষাণেরা সেরূপ করে না। এই শ্রেণীভুক্ত কৃষকেরা

যেরূপ বহুদূর হইতে গোবরাদি সার অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়া জমিতে দেয়, জোটো করিয়া যেরূপ আবাদের কার্য্য সম্পন্ন করে, ১ম শ্রেণীভুক্ত কৃষকেরা সেরূপ পারেন না। ২য় শ্রেণীভুক্ত কৃষকেরা আবশ্যক মত ২।৪ টাকার মজুর খাটাইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। "খাটে খাটায় দ্বিগুণ পায়, তার অর্দ্ধেক ছাতি মাথায়, ঘরে ব'সে পুছে বাত, একবৎসর যেমন তেমন আর বৎসর হা ভাত।" ২য় শ্রেণীভুক্ত কৃষকেরা "খাটে খাটায়" সুতরাং তাহারা দ্বিগুণ শস্য প্রাপ্ত হয়। ১ম শ্রেণীভুক্ত চাষীদের মধ্যে কেহ বা মাঠে গিয়া ছাতা মাথায় দিয়া আইলে বসিয়া কৃষাণদের খাটায়, কেহ বা ঘরে বসিয়া চাকরকে আদেশ করিয়া থাকেন,এ কারণ ইহারা অধিক লাভবান হইতে পারেন না। ২য় শ্রেণীভুক্ত অনেক কৃষকই আপনাদের অবস্থা বেশ উন্নত করিয়াছেন ও করিতেছেন। পূর্ব্বে যাহারা স্বহস্তে নিজের জমিতে হল চালনা করিয়া চাষ আবাদ করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদির অবস্থা খুব উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি স্বহস্তে লাঙ্গল ধরেন না। তাঁহাদের অনেকেই এক্ষণে ব্যবসায়াদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উত্তরোত্তর আপনাদের অবস্থা আরো উন্নত করিতেছে। উগ্র ক্ষত্রিয়, সৎগোপ প্রভৃতি জাতিগণ এইরূপ অনেকেই বেশ উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাঁদের গোলায় হাজার হাজার মণ ধান সঞ্চিত থাকে। "গুড় বেচিবে শালে, ধান বেচিবে কালে কালে।" এই প্রবাদ বাক্য অনুসারে ইহারা কার্য্য করিয়া থাকেন। অজন্মা বশত ধান মধ্যে মধ্যে খুব মহার্ঘ হয়, সেই সময়ে ইহারা ঐ সঞ্চিত ধান বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভবান হইয়া থাকেন। আমাদের এ প্রদেশে অনেক উগ্র-ক্ষত্রিয় এইরূপ করিয়া বিলক্ষণ সম্পত্তিপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাদের ন্যায় বলবান পরিশ্রমী মিতব্যয়ী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা এইরূপে সঞ্চয় করিয়া বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া বিলক্ষণ ধনশালী হইয়া উঠিয়াছেন।

৩য় শ্রেণীভুক্ত কৃষকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ইহাদের না আছে পেটে ভাত, না আছে গাত্রে বস্ত্র। ইহাদের নিজের চাষের জমি নাই। ইহারা অধিক খাজনায় ২।১ বৎসর করারে চাষ করিবার জন্য জমি জমা করিয়া লয়, অথবা অর্দ্ধেক শস্য দিবার করারে ভাগজোতে চাষ করিয়া থাকে। জমি ভাল করিয়া আবাদ না করিলে. বা জমিতে ভাল শস্য না জন্মিলে ভূস্বামী তাহার নিকট হইতে জমি ছাড়াইয়া লইয়া অপর ব্যক্তিকে জমি বিলি করিয়া থাকেন। আমাদের এখানে জমিতে সার না দিলে ভাল ধান বা অন্য শস্য জন্মে না। ইহারা জমিতে প্রায়ই সার দেয় না, সার দিবেই বা কি করিয়া। গোবর ছাই গোহালের ওচলা যাহা আমাদের এখানে সাররূপ ব্যবহৃত হয় তাহা চাষের জমিতে না দিয়া অভাব জন্য বেচিয়া ফেলে। ভাল বীজ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না। মহাজনের মরাই হইতে

ধান বাড়ী লইয়া সেই ধানই বীজরূপে ব্যবহার করে। ইহাদের চাষের গরুর অবস্থা আরও শোচনীয়। চাষে জমার জমিতে ও ভাগ জোতের চাষে যে খড় পায়, তাহা অভাব জন্য বেচিয়া ফেলে, না বেচিলেও যে খড় পায় তদ্বারা বাস গৃহ ও গো গৃহ ছাদন করিয়া গরুর সম্বৎসরের আহার চলে না। আমাদের এখানে খড় গরুর প্রধান খাদ্য। বর্ষার পূর্ব্বেই গরুর খাদ্য খড় এই শ্রেণীর কৃষকের প্রায়ই থাকে না। এখানে খইল যেরূপ দূর্ম্মূল্য হইয়াছে, গরুর আহারের জন্য এই শ্রণীর কৃষকেরা ক্রয় করা দূরে থাকুক, ১ম, ২য়, শ্রেণীভুক্ত কৃষকেরাই গরুর আহারের জন্য পরিমিত খইল ক্রয় করিতে অক্ষম হইয়াছে। ইহারা অধিক মূল্য দিয়া বৃহৎ, বলবান, দ্রুত গমন শীল বলদ ক্রয় করিতে পারে না। আহারাভাবে ইহাদের গরু নিতান্ত দুর্ব্বল, রুগ্ন ও কার্য্যে অক্ষম। এই শ্রেণীর অনেক কৃষকই অল্প মুল্য দিয়া এঁড়ে গরু কিনিয়া থাকে। অহারাভাবে এই সকল গরু নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন হইয়া পড়ে। এই সকল বৃষই এ প্রদেশের গোসমূহের জন্মদাতা ; সুতরাং এ প্রদেশে গোজাতির ক্রমশ অবনতি ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে এই শ্রেণী কৃষকের ও গো জাতির এত অবনতি হয় নাই। তখন খড় খইল খুব শস্তা ছিল, গোচারণের মাঠ থাকায় গরু অবাধে স্বেচ্ছামত চরিতে পারিত। গত বৎসরে "কৃষকে" গোজাতির অবনতি" প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। এই শ্রেণীর অধিকাংশই এরূপ ঋণ জালে জড়িত যে, জীবনে তাহাকে সে ঋণ জাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। এখনকার সর্ব্বশ্রেণী কৃষকেরই ধান প্রধান চাষ। অন্য ফসলের চাষ মোটেই করে না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুষ্টিকর নিয়মিত আহারাভাবেই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক, ইহারা নিতান্ত দুর্ব্বল, বিলাসী, রুগ্ন ও অলস হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর কৃষকের পিতা পিতামহেরা যেরূপ বলবান, পরিশ্রমী ছিল, পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে উহাদের অধস্তন পুরুষগণের এরূপ অবনতি নিতান্ত খোভের বিষয়, সন্দেহ নাই। ইহাদের চাষে খুব কম শস্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ইহাদের অধিকাংশেরই মাদক প্রিয়তা সর্ব্বনাসের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাভাবে সকল সময়ে মাদক দ্রব্য ক্রয় করিয়া খাইতে পারে না। তাল ও খেজুর রস তাড়িতে পরিণত করিয়া প্রতিদিন পান করিয়া থাকে। মত্ততা জন্য অনেকেই অধিকাংশ সময় বৃথা কালক্ষেপ করে। মাঘ ফাল্গুন মাসে ধান ঝাড়া হইলে রাজা মহাজনের ঋণও পরিশোধ হয় না। অন্নের জন্য সকলে লালায়িত হয়। যখন ইহাদের নিজের চাষের কার্য্য না থাকে তখন এই শ্রেণীর কৃষকেরা দৈনিক মজুরিও করিয়া থাকে। এ প্রদেশের অধিকাংশ ইতর জাতিই এই শ্রেণীর কৃষক। ইহাদের অনেকেই এত অলস যে আপনাদের অবস্থার জন্য একটুও মানাযোগী হয় না। ইহাদের পূর্ব্বে পুরুষগণ (পিতা পিতামহ) একাকী যে কার্য্য সম্পন্ন করিত এখন ইহাদের দুইজনে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে কি না সন্দেহ। ইহা-

দিগকে আমি অনেক সময় কৃষির উন্নতি জন্য পরিশ্রম করিতে উপদেশ দিয়াও বিফল মনোরথ হইয়াছি। এই শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে যাহারা উদ্যোগী ও পরিশ্রমী তাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। এই শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে উন্নত অবস্থার লোক খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশেরই অন্নাভাব। এ প্রদেশের বার আনা রকম কৃষকই ৩য় শ্রেণী ভুক্ত। ইহাদের অবস্থা এত শোচনীয় স্বত্বেও ইহার এরূপ বিলাসী ও ব্যসনাসক্ত যে হস্তে কিছু সঞ্চয় হইলে, তাহা প্রয়োজনীয় কার্য্য ব্যয় না করিয়া বিলাসিতা ও ব্যসনে খরচ করিয়া থাকে। সকলেই যে এইরূপ বিলাসী বা বাসনাসক্ত, তাহা নহে। কিন্তু এই শ্রেণীই কৃষকই দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ইহাদের অবস্থার উন্নতি না হইলে, দেশের কিছুতেই উন্নতি হইতে পারে না। ইহাদিগকে উন্নতি সোপানে উঠাইতে হইলে সুশিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। কেবল মৌখিক উপদেশ দানে সুফল ফলিবে বলিবে বলিয়া আশা করা যায় না। কোন শস্যের কিরূপ সার প্রয়োজন, কিরূপ যত্ন পরিশ্রম সহকারে কৃষি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিরূপে অল্প জমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, স্থানে স্থানে "আদর্শ কৃষিক্ষেত্র" স্থাপন করিয়া এই সকল কৃষকদিগকে তাহা শিক্ষা দিতে হইবে নচেৎ দেশের দুর-অবস্থা ঘুচিবে বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক। ঐ সকল কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি জন্য দেশের শিক্ষিত ও ধনীগণেরও নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। সকলের সমবেত চেষ্টায় উহাদিগকে উন্নতি মার্গে লইয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর কৃষকের মধ্যে ১ম শ্রেণীর কৃষকদের ক্ষেত্রে ২য় শ্রেণীর কৃষকদের ন্যায় ধান্যাদি শস্য ভাল জন্মে না বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। এই শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে অনেকেই কেবল চাষের উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করে না। পূর্ব্বে বা এখন এ প্রদেশের যাহারা চাকরী করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই এই শ্রেণীর কৃষক। ইহা ব্যতীত এই শ্রেণীর কৃষকদিগের মধ্যে অনেকেরই অন্যান্য ব্যবসায় আছে। ২য় শ্রেণীর কৃষকগণ কেবল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় গুণে আপনাদের অবস্থা উন্নত করিয়াছেন। পূর্ব্বে শস্যের মুল্য খুব কম থাকায় এই শ্রেণীর কৃষকেরা তাদৃশ লাভবান হইতে পারেন নাই। শস্যের মূল্য বৰ্দ্ধিত হওয়ায় ২য় শ্রেণীর কৃষকেরা বিলক্ষণ উন্নত লাভ করিতেছে। এই শ্রেণীর কৃষকদিগের মধ্যে যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত তাহারা শস্যের মুল্য খুব বৃদ্ধি না হইলে বিক্রয় করেন না। এই-রূপে বৰ্দ্ধিত মূল্যে কৃষিজাত শস্যাদি বিক্রয় করিয়া অনেকেই বেশ উন্নতি লাভ করিতেছেন। ৩য় শ্রেণীর কৃষকদিগের অবস্থা পূর্ব্বেও যেরূপ শোচনীয় ছিল এখনও সেইরূপ শোচনীয় আছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা খুব উদ্যোগী পরিশ্রমী মিতব্যয়ী ও অধ্যবসায়ী তাহারাই আপনাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত করিয়া ২য় শ্রেণীর কৃষকে পরিণত হয়।

শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সহিত ভূমির মূল্যও খুব বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে রায়তী স্বত্ব বিশিষ্ট জমির মূল্যই ছিল না। বিনা মূল্যে ভূম্যাধিকারীর নিকট হইতে অল্প রাজস্বে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া যাইত। কখনও বা ২।১ টাকা বিঘাপ্রতি দিলেই হইত। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে নিষ্কর জমিরও মূল্য খুব কম ছিল। ৮।১০ টাকা মূল্যে এক বিঘা জমি ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত। সে সময়ে রায়তী স্বত্ব বিশিষ্ট জমার জমির বার্ষিক রাজস্ব ১৲ হইতে ১।০ টাকার বেশী ছিল না। অনেক স্থানে আবার ইহা অপেক্ষাও কম ছিল। এ প্রদেশের অনেক স্থানেরই ভূম্যধিকারী আপন আপন অধিকারস্থিত জমির রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া প্রতি বিঘায় ১৷৷০ হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। এখন ঐ সকল রায়তী স্বত্ববিশিষ্ট এক বিঘা জমির মূল্য একশত হইতে দুইশত টাকা। ইহার উপর আবার ভূম্যধিকারীর সেরেস্তার সাবেক নাম খারিজ দিয়া আপন নামে দাখিলা আনিবার জন্য মূল্যের অন্যূন শতকরা ২৫ টাকা হইতে ৩০৲ পর্য্যন্ত খারিজ ফি দিতে হয়। নাম খারিজ না করিলে ভূম্যধিকারী খরিদারের নিকট রাজস্ব গ্রহণ করিয়া প্রজা স্বীকার করেন না। জমি খাসদখলে লইবার জন্য চেষ্টা করেন। নিষ্কর জমির মূল্য স্থানবিশেষে প্রতি বিঘা ১৫০ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত। প্রতি বৎসরই জমির মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যে নিষ্কর জমির মূল্য ৮।১০ টাকা দেখিয়াছি, এখন স্থান বিশেষে সেই জমি প্রতি বিঘা ১৫০ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকায় বিক্রিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে রায়তি স্বত্ব বিশিষ্ট জমির মূল্য ছিল না, বা ২।১ টাকা মূল্য ছিল, এখন সেই জমির বিঘা স্থান বিশেষ ১০০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতেছে। পূর্ব্বে (অর্দ্ধশতাব্দী বা তৎপূর্ব্বে) যে সকল ব্রহ্মত্তর (নিষ্কর) জমি ৮।১০ মূল্যেও খরিদার পাওয়া যাইত না। এখন সেই সকল ব্রহ্মত্তর বা নিষ্কর জমির মূল্য স্থান বিশেষে ১৫০ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সহিত জমির মূল্য বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ২য় শ্রেণীর কৃষকেরা পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, বিলাসিতা শূন্য থাকায় সময়ে সময়ে মহার্ঘ দরে ধান্যাদি শস্য বিক্রয় করিয়া ক্রমশঃ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিতেছেন। এক্ষণে তাঁহারা খুব উচ্চমূল্যে আবাদী জমি ক্রয় করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছেন। এ প্রদেশের অধিকাংশ জমিই তাঁহারা ক্রয় করিতেছেন। ৩য় শ্রেণীভুক্ত দরিদ্র কৃষকেরা বরাবরই হীন অবস্থায় কাল যাপন করিতেছে। তাঁহাদের নিজেরও আবাদী জমি নাই, জমি খরিদ করিবারও শক্তি নাই। এই সকল কৃষকগণের মধ্যে যে পরিবারে ৪।৫ জন খুব পরিশ্রমী উদ্যোগী মিতব্যয়ী লোক একান্নভুক্ত থাকিয়া বিশেষ মনোযোগী ও পরিশ্রম সহকারে কৃষিকার্য্য করে, তাহারা প্রায়ই সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠে। ক্রমে তাহারা ২য় শ্রেণীর কৃষকে পরিণত হয়, অর্থাৎ তাহারা নিজের কৃষিলব্ধ শস্য বিক্রয় করিয়া আবাদী জমি ক্রয় করিতে থাকে। ক্রমে তাহারা আপনাদের কৃষির উপযোগী জমি ক্রয় করিয়া কোরফা (অধিক

খাজনায় অল্প দিনের জন্য) জমি ও ভাগ জোতের জমির চাষ ত্যাগ করিয়া আপনাদের খরিদা জমির চাষ করিয়া ক্রমশ সঙ্গতিপন্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত অন্যান্য অনেক জাতি এইরূপে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। এইরূপে সকলে সঙ্গতিপন্ন হওয়া সময় সাপেক্ষ ; এমন কি এইরূপ সঙ্গতিপন্ন হইতে ২।১ পুরুষ লাগে। ২য় শ্রেণীর কৃষকেরা এইরূপ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলে তাঁহারা বা তাঁহাদের বংশধরগণ ১ম শ্রেণীর কৃষকে পরিণত হন ; তাঁহারা বা তাঁহাদের বংশধরগণ আর স্বহস্তে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করেন না। চাকর কৃষাণ রাখিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করেন। এ প্রদেশের উগ্রক্ষত্রিয়, সৎগোপ প্রভৃতি অনেক জাতি এইরূপে কৃষিকার্য্যদ্বারা উন্নত হইয়া উঠিয়াছেন ও উঠিতেছেন। উগ্রক্ষত্রিয় জাতিরা খুব বলবান পরিশ্রমী, উদ্যোগী, মিতব্যয়ী এজন্য এখানকার উগ্রক্ষত্রিয়েরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক সঙ্গতিপন্ন। ইহাদের অনেকেই এক্ষণে কৃষি কার্য্যব্যতীত ব্যবসায় বাণিজ্যেও মনোযোগী হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

বিহারে কৃষক-কনফারেন্স

প্রজাদের দাবী

আগামী মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত মতিহরি ষ্টেশনের ৬ মাইল দূরে অবস্থিত হার্দ্দিতে এক বিরাট মেলা হইবে। এই হার্দ্দিতে উপরি উক্ত দিবসত্রয়ে অন্যূন দশ সহস্র কৃষক সমবেত হইবে। এই কনফারেন্স হইতে, উহারা জমিদারের নিকট নিম্নলিখিত দাবী জানাইবে—

(১) জমিদারের বিনা অনুমতিতে "কাস্তকারি" জমি হস্তান্তরিত হইতে পারে।

(২) ঠিকা জমিতে প্রজাদের গাছ পুঁতিবার অধিকার আছে এবং গাছ কাটিবার ও বিক্রয় করিয়া মূল্য গ্রহণ করিবার অধিকার আছে।

(৩) "কাস্ত" জমিতে প্রজাদের কূপ খনন করিলে, বাড়ী নির্ম্মাণ করিলে তাহার 'কাস্ত' জমি বাজেয়াপ্ত হইবে না।

(৪) যতদিন গবর্মেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া না দেন, তত দিনে জমির খাজনা বাড়ান হইবে না।
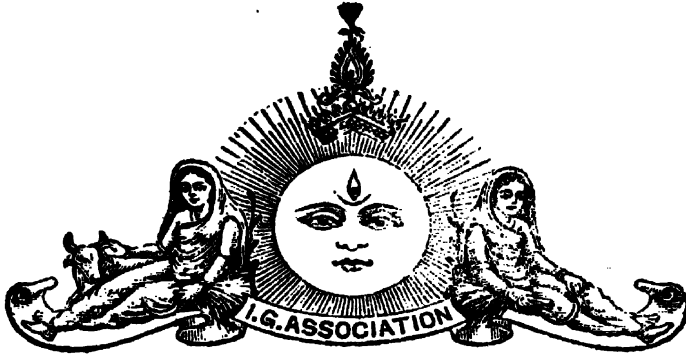
চৈত্র ১৩২৬ সাল

ভারতীয় কৃষি সমিতি

কৃষি প্রধান ভারতে কৃষি-সমিতি স্থাপনের আবশ্যকতা কাহাকেও অধিক বুঝাইতে হয় না কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের অভাব মরমে মরমে অনুভব করিয়াও তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করি না—আমাদের অভাব মোচনের জন্য কোন উত্তেজনা আসে না—আমরা একেই প্রাণহীন—তার উপর অভাবের গুরুত্ব আমাদিগকে জড়ও অসাড় করিয়া তুলিয়াছে।

উদ্দেশ্য আমাদের কৃষির উন্নতি করা—গভর্ণমেণ্ট কৃষির উন্নতির জন্য যতটুকু করিতেছেন তাতে আমাদের কি ফল হইবে, কতটুকু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? রাজা প্রজা জমিদার সকলে এক জোটে কাজ না করিলে আমরা কোন দিন কোন কাজে পূর্ণমাত্রায় লাভবান হইতে পারিব না।

আসল অভাব রৈল একদিকে কিন্তু আমাদের কার্য্য চলিয়াছে অন্য দিকে—যথা তথা হইতে যেমন তেমন বীজ সংগ্রহ করিয়া বেচিতে পারিলেই লাভ, যে কোন প্রকারে চারা কলম সংগ্রহ হইল আর ভাবনা কি—সেগুলি বেচিয়া ত ব্যবসা হইতেছে—ছোট বড় অনেকেই ত এই কাজেই লাগিয়া গিয়াছেন, দেশের ভাল মন্দতে তাহাদের কি আসে যায়। এই দুর্জ্জয় স্বার্থপরতাই আমাদিগকে অধঃপাতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান হইতে চাই কিন্তু দশে মিলিয়া আমরা কাজ করিতে চাই না বা শিখি নাই। বিদেশের বীজ আনাইয়া আমরা বাহবা লইতে রাজী তবু দশে মিলিয়া ভারতে বীজ ক্ষেত্র আজিও খুলিতে পারিলাম না।

১৮৯৭ সালে ভারতীয় কৃষি-সমিতি স্থাপিত হইয়া তাহার সত্বামাত্র বজায় রহিয়াছে কিন্তু সামর্থাভাবে ও সাধারণের সহযোগিতার আমরা অভাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন

কার্য্য করিতে পারি নাই—যাহা আমরা করিয়াছি তাহা প্রকৃত কাজের সূচনা বা আরম্ভ বলা যাইতে পারে এইমাত্র।

আমাদের পরীক্ষা ক্ষেত্র

ই, বি রেল লাইনের দক্ষিণ শাখার ধারে বারুইপুর ও গোবিন্দপুর দুইটি পরীক্ষাক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছি—জমির পরিমাণ ৫০ বিঘার কম হইবে না—এই সকল ক্ষেত্রে সম্ভবমতঃ ভাল দেশী বীজ উৎপাদন করা হয় এবং বিভিন্ন ফসলে বা ফল ফুলের গাছে সার পরীক্ষা করা হয় কিন্তু এই মুষ্টীমেয় বীজ কইয়া দেশের কি উপকার হইবে? সাধারণ সহযোগীতা ব্যতীত আমাদের পরীক্ষার ফল কোন কাজে লাগিবে?

ফুল কপির বীজ আমরা উৎপন্ন করিতে পারিয়াছি কিন্তু আজিও বাঁধাকপি, ওলকপি, সালগম বীটের বীজ তৈয়ারি করিতে পারিতেছি না। ঘুম পাহাড়ের জঙ্গবীর বাহাদুর কালিপঙে ১০ একর জায়গা দিতে চান কিন্তু কেবল জায়গা পাইলে কি হইবে? বিলাতী বীজ উৎপাদনের সাজ সরঞ্জাম অনেক—তাহার যোগাড় কৈ?

আমরা বারুইপুর রেল ষ্টেশনের ধারে রেল কোম্পানীর নিকট হইতে ২০০ বিঘা জায়গা যোগাড় করিতে পারি এবং সেটা গোচারণ ভূমি করিয়া লইতে পারিলে আমরা তথায় কতকগুলি গরু মহিষ রাখিয়া দুধের অভাব পুরণের চেষ্টা করা যাইতে পারে—ইহাতে দেশের অভাব মোচন হইবে না কিন্তু যে দশজন মিলিয়া এ কাজ করিব তাহাদের অভাব পূরণ হইতে পারে ত! দশের অভাব মিটিলে ক্রমে দশ দশ করিয়া শত সহস্রের অভাব মিটিবে।

রেলের ধারে জমি পাইলে পক্ষীপালন, মাংসার্থ ছাগাদি পশুপালন সন্নিহিত জলাশয়ে মৎস্য পালন প্রভৃতি কার্য্যারম্ভের সুযোগ ঘটিতে পারে।

ভারতীয় কৃষি সমিতি ডায়মণ্ডহারবার সব ডিবিসনে ৩০০ বিঘা একখণ্ড ধান জমির যোগাড় করিয়াছে। ইহা চরভরাট জমি ইহাতে ধান ব্যতীত তরিতরকারি ও সব্জী উৎপন্ন করা যাইবে। এখানে আরও অধিক জমি সংগ্রহ হইতে পারিবে এবং তখন আমরা ২০০ বিঘা জমির মালিক হইতে পারিব এরূপ আশা করা যায়।

ভারতীয় কৃষি সমিতির উদ্দেশ্য যে যাঁহারা এই সমিতিতে যোগ দিবেন তাঁহারা খাদ্য-শস্য ফল মূল, সবজী, দুধ, মাছ, ডিম, মাংস সবই যোগান পাইবেন। আপনাদের টাকায় আপনারা ব্যবসা করিব, আমাদের অভাব বুঝিয়া দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিব।

ইহা ছাড়া ফুলগাছ, ফুল বিক্রয়, বাগান সাজান ও পুরাতন বাগান মেরামত করিয়া, বাড়ী সাজাইয়া, কৃষিমেলা বসাইয়া অনেক পয়সা রোজগার করিতে পারিব। এই আয় হইতে আমরা আমাদের কারবার বাড়াইব এবং বাড়তি আয় ঘরে লইয়া যাইব।

কৃষি যন্ত্র

কৃষি যন্ত্র বলিলেই আমরা কলের লাঙ্গল, বাষ্পচালিত পম্প, ধানগম কাটা কল কলের বিদে ইত্যাদি পাশ্চাত্য দেশের বহুদামী কল কবজার কথা বুঝিলেও জানা উচিত কৃষিকার্য্যে

উদ্যানকার্য্যে ছোট ছোট আরও অনেক কৃষিযন্ত্রের আবশ্যক হয়। ভারতীয় কৃষি সমিতি আবশ্যকানুযায়ী নিড়ানি, খুরপী, কাস্তে, কুঠার, খোন্তা, কোদাল, কলম বাঁধাছুরী, গাছ ছাটা দাও, সালিব, পিকচারি ইত্যাদি তৈয়ারি করিতে পারিয়াছে। এই সকল ছোট ছোট যন্ত্রের জন্য ছোট খাট কারখানা স্থাপন করিতে পারিলে সুবিধা হয়।

তারপর আমরা আমাদের দেশের জলমাটীর উপযুক্ত কলের যন্ত্রাদি আনাইয়া ভাড়ায় খাটাইতে পারি। শসা ক্ষেত ঘেরার জন্য তারের জাল, আখমাড়া কল, জল তোলা পাম্প অনায়াসে ভাড়ায় খাটিতে পারে। চাষীরা জোট বাধিয়া এথ সকল যন্ত্র খরিদও করিতে পারে। সব কাজেই দশের সমাবেশ হইলে অনেক সুযোগ হয়; সহ মিলে কাজ করায়

জমিতে সার দেওয়া

বিলাতী সার ব্যবসায়ীগণ জমির সারের কথা বলিয়া আমাদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। তাহারা আমাদের হাড় লইয়া গুড়া করিতেছে, আমাদের ঘরের সোরা চালিয়া বাহির করিতেছে। আমাদের পরিত্যাক্ত শুষ্ক মাছের গুঁড়া লইয়া সার তৈয়ারী করিতেছে, আমাদের খনিগুলি উজাড় করিতেছে। আমাদের খৈল লইয়া গুঁড়া করিয়া অগ্নিমুল্যে আমাদিগকেই বেচিতেছে আর আমরা বোকার মত হাঁ করিয়া রহিয়াছি। তাদের পয়সা আছে, তারা একত্র জোট বাধিতে জানে, একতার বলে পয়সার বলে, তারা অসম্ভব ও সম্ভব করে না করিবে কেন?

কত অগ্রাহ্য করা জিনিষ, কত অযত্নে পরিত্যক্ত জিনিষ যে আমরা কাজে লাগাইতে পারি এবং কত সস্তায় কত ভাল সার যোগান যায় তাহা ভারতীয় কৃষি-সমিতি জানে—চাই কেবল উদ্যোগ চাই আয়োজন।

কৃষক

ভারতীয় কৃষি সমিতির প্রধান সাক্ষী "কৃষক"। ২২ বৎসর পুর্ব্বে 'কৃষক' প্রচার আরম্ভ হয়। কৃষকের বহুল প্রচার না হইলেও এতাবত কৃষক সমভাবেই চলিতেছে ক্রমশঃ কৃষক বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ও শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহারা কৃষকের ভৃষ্ঠ পোষক ও গ্রাহক এবং কৃষিকার্য্যভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার লেখক। তাহা হইলেও কৃষক প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধি হইয়াছে একথা আমরা বলিতে পারি না। বাঙলার প্রত্যেক স্কুল এবং গ্রাম্য পাঠশালে যদি 'কৃষক' পড়া হয় এবং কৃষি কথার আলোচনা করা হয় এবং চাষীদের লইয়া একযোগে কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ হয় তবে বাঙ্গলা একদিন কৃষির আদর্শক্ষেত্র হইবে। কোন দুরূহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যদি "কৃষক" তাহার লাউ, কুমড়া, শসা, ঝিঙ্গা, করল্লার উন্নতি সাধন করিতে পারে তবুও তাহার শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিবে। বীজ নির্ব্বাচনের অভাবে আমাদের দেশে দেশী ফসলেরও এত অবনতি ঘটিয়াছে, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ এত কমিয়া যাইতেছে।

"কৃষক" প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝাতে চাহে যে, বীজ নির্ব্বাচন স্থানে গাছ নির্ব্বাচন ; সতেজ গাছের সুপুষ্ট ফল হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে, তবে ত ফসলের উন্নতি হইবে। 'কৃষকের' এই সহজ শিক্ষা প্রণালীর জন্য "কৃষক" চাষীর নিকট এত আবশ্যকীয়, গৃহস্থের নিকট এত আদরের, জমীদারগণের নিকট এত মূল্যবান।

"কৃষক" কে অবলম্বন করিয়া আমরা অনেক কৃষি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই কয়খানির নাম করা যাইতে পারে—

সরল কৃষি বিজ্ঞান	রেশম বিজ্ঞাপন
কৃষি রসায়ন	কার্পাস চাষ
Jute in Bengal	কার্পাস প্রসঙ্গ
খাদ্যতত্ত্ব	ফসলের পোকা
কৃষি সহায়	বীজ বপনের সময় নিরুপন পঞ্জিকা
	তামাক চাষ

এই সকল পুস্তক যাহাদের কিছু লেখা পড়া জ্ঞান আছে তাহাদের জন্য। যাহাদের কেবল মাত্র ভাষাজ্ঞান আছে তাহাদের নিমিত্ত আমরা একআনা দামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচার করিতে প্রস্তুত আছি পুস্তিকার বিষয় হইবে ধান, গম, যব, চৈ, ইক্ষু' তুলা, আলু, কন্দমূল প্রভৃতি যে কোন একটি ফসল। দুই খানি পুস্তিকা (১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা, (২) মশালা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ভাষার ছটা নাই দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নাই সরল ভাষায় কাজের কথা গুলি বলা হইয়াছে। এই গুলি 'কৃষকের' মূল কাণ্ডের শাখা প্রশাখা। বাঙলার কৃষকগণ, কৃষিকার্য্যানুরাগী ব্যক্তিগণ সহায় হইলে মূল কাণ্ডেরও বৃদ্ধি হইবে এবং শাখা প্রশাখা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে। আমরা কি করিতে পারি না পারি তাহা বলা হইল আমাদের মনে হয় যে, মিলিয়া মিশিয়া আমরা করিতে না পারি কি ? আমরা যদি ভাবি যে অদম্য উৎসাহী ইয়োরপ, এমেরিকা, জাপানের নরনারীগণ কি না করিতেছেন ! ব্যবসা ক্ষেত্রে, শিল্প ক্ষেত্রে, কৃষি ক্ষেত্র সর্ব্বত্র তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠার মূল—সংহতি—ধনী, কর্ম্মীর একত্র সমাবেশ। যাহা একের বোঝা তাহা দশের পক্ষে সহজ।

আমরা কি মনে করলে এমন একটি কৃষিকেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিনা যেখানে আমরা চাষাবাদ করিব, দুধের জন্য গো পালন করিব, মাংসের জন্য ডিমের জন্য পশু-পক্ষী পালন করিব, মৎস্যের আবাদ করিব। চাষা কলম ফুল তৈয়ারি করিব। সুবন্দো-বস্ত মত কাজ করিতে পারিলে আমরা বিঘায় ১০০৲ টাকা লাভ করিতে পারি। যাহারা আমাদের সমিতিতে যোগ দিবেন তাঁহাদের ঘরে আমরা খাদ্য শস্য, সব্জী, ফল, ফুল, ঘী, দুধ, মাছ, মাংস-ডিম যাহা আবশ্যক তাহা যোগাইতে পারি। ইহাতে ঘরের লাভ ঘরেই থাকিবে যাহা বাজারে বিক্রয় হইবে তাহাতে উপরন্ত লাভ হইবে। তাজা জিনিষ সময় মত পাওয়া তাহাও একটা কম লাভ নহে। যদি এই কার্য্য পরিচালনের লোক

মিলে, যদি দশজন একত্র হওয়া অসম্ভব না হয়, যদি দশের কাজ দশের মনোমত করিয়াই করা হয়, যদি ইহাতে কাহারও একাধিপত্য না থাকে, যদি শঠতা প্রবঞ্চনার ভয় না থাকে তবে আমরা ইহা করিতে মন করিনা কেন? ইহার উত্তর খুজিলে অনেক সময় উত্তর পাওয়া যায়—আমরা অলস, উদ্যম ও উৎসাহহীন তাই কোন কাজে মন যায় না। আমাদের ঘর অন্যে দখল করিয়া লইতেছে—আমরা অচল নিশ্চেষ্ট।

অন্নাভাব কি ঘুচিবে না—অভাব, অভাব, চারিদিকে কেবলই অভাবের তীব্র কশাঘাত। এরূপ অবস্থায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের অবস্থা ভাবিলে হৃদয় দুঃখে আপ্লুত হইয়া যায়। এ অভাব কি ঘুচিবে না? দেশে ধান হইয়াছে, অন্যান্য শস্যও মন্দ হয় নাই। এরূপ অবস্থায় কৃষকদিগের দুঃখ ঘুচিবে বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের অবস্থাও একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। নূতন ধান কাটা শেষ হইয়াছে এমন সময়ই যখন চাউলের দর ৭।০।৭॥০টাকা তখন দুদিন পরে যে কি অবস্থা হইবে তাহা কল্পনা করিতেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তাই বলি সময় থাকিতে সরকার বাহাদুরের এদিকেদৃষ্টি প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। দেশের নেতৃবৃন্দকেও আমরা এবিষয়ে একটু দৃষ্টিপ্রদান করিতে বলিতেছি। তাঁহারা কেহ খাদ্য শস্যের এই মহার্ঘতার কারণ একটু ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কোনক্রমেই নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। অর্থনীতি শাস্ত্র কি বলে তাহা আমরা জানি না, কিন্তু সমাজে মানুষের দুর্দ্দশার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। —ত্রিপুরাহিতৈষী

সখের জিনিষের হিসাব
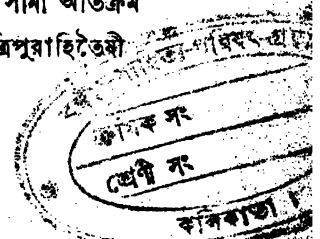
গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতে বিদেশ হইতে যে সমস্ত বিলাসের সখের জিনিষ আমদানী করা হইয়াছিল তাহার মূল্য ১১২,২৬,৯০,০০০ কোটি টাকা এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এক জানুয়ারী মাসেই ঐ সমস্ত জিনিষ বাবদ তাহাকে বিদেশীর হাতে ১৩,৩২,৫০,০০০ কোটি টাকা তুলিয়া দিতে হইয়াছে।

আমরা নিম্নে ঐ বিলাস দ্রব্য গুলি এবং তাহাদের মূল্যের একটী তালিকাঃ প্রস্তুত করিয়া দিলাম। হিন্দুস্থানের পাঠকগণ তাহা হইতেই ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

	জানুয়ারী, ১৯২০	১৯১৯ সাল
তামাক	৫,২৩,৩৫,০০০	৪২,৭০,১০,০০০

মদ	১,৪২,১০,০০০	১৯,১০,৭০,০০০
স্পিরিট	৬৯,৮০,০০০	৭২০,৪০,০০০
মোটরকার	১৫,৩০,০০০০	৭,২০,৪০,০০০
সিনেমা ছবি	৪,৯০,০০০	১,১২,৬০,৭০০
বাদ্যযন্ত্র	১২,৭০,০০০	৪৪,০০,০০০
সিল্ক দ্রব্য	২,০৯,৮০০০০	২২,৯৪,৬০০০০
ঘড়ি	১,৭৩,৪০,০০০	২৬৮,৯০,০০০
পশম ও চামড়ার দ্রব্য	১,৭৩,৪০,০০০	৭,৪৯,৮০,০০০
অন্য বিলাসদ্রব্য		১০,৬০,০০০
	১৩,৩২,৫০,০০০	১১২,২৬,৯০,০০০

এই তো গেল আমদানীর হিসাব। কিন্তু বিলাত ভারত নহে। সে ব্যবসা বোঝে এবং ব্যবসার বলে দুনিয়ার প্রায় সমস্তগুলি জাতিকেই পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং এই আমদানী করা দ্রব্যগুলি ছাড়া তাহার ঘরে যে সমস্ত বিলাস-দ্রব্য তৈরী হইয়া উঠিয়াছে সেগুলির ব্যবহারে কথা ধরিলে বিলাতের সৌখীনতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন হইয়া পড়ে।

কেবল মাত্র চুরুট ও মদের খরচে বৎসরে তাহাদের ব্যয় হইয়া যায় ৫১০ কোটি টাকা। বিলাতের লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে চারকোটী। সুতরাং হিসাব করিয়া দেখিলে তাহার প্রত্যেকটী লোক চুরুটের ধোঁয়ায় পোড়াইয়া এবং মদের নেশায় উড়াইয়া দেয় প্রতিবৎসর প্রায় ১১৩ টাকা।

এই বিলাতের সহিত ভারতের তুলনা করিয়া দেখিলে বোঝা যায় ভারতবর্ষ—কত দরিদ্র—কত নিঃস্ব। তাহার উপার্জ্জন প্রতি বৎসরে জন-প্রতি ৩০ টাকা মাত্র। ঐ ৩০ টাকা হইতে তাহার অশনবসন বিলাস বাসনার খরচা যোগাইতে হয়, কিন্তু এই যে নিঃস্ব দেশ রাজ্যশাসন ব্যাপারে সে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদশালী দেশ গুলিকেও হার মানাইয়াছে। সে তাহার আমলাদিগকে যে মাহিয়ানা দেয় তাহা জগতের কোথাও আর দৃষ্টি গোচর হয় না। যে ইংলণ্ড বিগত যুদ্ধে হাজার হাজার কোটী টাকা ব্যয় করিয়াও চুরুটের ধোঁয়ায় এবং মদের গেলাসে জন-প্রতি ১১৩ টাকা ব্যয় করিতে পারে সেই ইংলণ্ডও এবিষয়ে তাহাকে জিতিতে পারে নাই। ইংলণ্ড যেখানে দেয় তাহার মন্ত্রীকে বাৎসরিক পাচ হাজার পাউণ্ড মাত্র আমাদের মন্ত্রীকে সেইখানে আমরা মাহিনা দিই প্রায় আট হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ৮০ হাজার টাকা। কেন যে আমাদের পেটে অন্ন নাই—আমাদের দেশ কেন যে কলেরা বসন্ত প্রভৃতির মহামারীর চিরদিনের প্রজা হইয়া যাইতেছে ঐখানেই তাহার চমৎকার নির্দ্দেশ রহিয়া গিয়াছে। আমার যে এই সোজা কথাটা বুঝিতে পারিতেছি না—সেই আমাদের দুর্ভাগ্য।

হিন্দুস্থান।

কৃষক-কন্‌ফারেন্স—পূর্ব্বে কৃষকেরা সভাসমিতিতে যোগদান করিত না এখন করিতেছে—বাধ্য হইয়া তাহাদের সত্তা বজায়ের চেষ্টা করিতেছে। যাদের দায় তাদের উদ্যোগ চাই।

মজঃফরপুরের অন্তর্গত হার্দ্দির মেলায় কৃষকদের একটী বিরাট কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছে গিয়াছে। এইরূপ কন্‌ফারেন্সে কৃষকেরা জমি-সংক্রান্ত অধিকার পাইবার জন্ম জমিদারের নিকট তাহাদের দাবী জানাইতেছে।

এতদিন যে সমস্ত সভা-সমিতি হইত, সে সমস্ত কেবল ইংরেজি-শিক্ষিত লোক লইয়া যথা ন্যাশন্যাল কংগ্রেস, সোশিয়াল কনফারেন্স, মডারেট কনভেন্‌সন প্রভৃতি। আজ এই ইংরেজি-অনভিজ্ঞ কৃষকগণের তাহাদের সামান্য সামান্য দাবী দাওয়া করিবার জন্য যে কনফারেন্স হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা খুসী হইয়াছি। ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ও বর্ত্তমান বড়লাট বাহাদুর তাঁহাদের যুক্ত রিপোর্টে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের কৃষকগণ মরিয়া যাইয়াও সন্তুষ্ট হইয়া আছে। এই 'মরিয়া'-সন্তোষ ভাবের বনিয়াদের উপর দায়িত্ব-মূলক শাসন-সৌধ দাঁড়াইতে পারে না। দায়িত্ব মূলক শাসন পদ্ধতি দাঁড়াইতে হইলে কৃষকদিগকে তাঁহাদের দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে। অতএব শাসন-সংস্কার-আইন পাশের সহিত বিহারের কৃষকদের এই সজীবতা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

ভূপেন্দ্রনাথের কথা—

আজকালের শিক্ষা—গত শনিবার বিকাল বেলায় অপার চিৎপুর রোডে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নামক বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। এই সভার প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলে। সভাপতির বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির মূলেই গোলমাল রহিয়াছে। আমি একজন ছাত্রকে জানি, সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করিয়া বিলাতে পড়িতেছেন, কিন্তু মেক্সিকো দেশটী কোথায় অবস্থিত তাহা সে জানিত না। আর একটী উদাহরণ দিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, আর একজন ভারতীয় গ্রাজুয়েট ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু বোম্বাই সহর ভারতের কোন প্রদেশে তাহা তিনি জানিতেন না।

বাগানের মাসিককার্য্য

ফাল্গুন মাস

সব্জী বাগান—তরমুজ, খরমুজ, সশা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি যেসকল সব্জী চাষ মাঘ মাসে প্রায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে। সব্জীক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। চাঁপানটে বীজ এইসময় বপন করিলে ও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়া যায়।

কৃষি-ক্ষেত্র—ছোলা, মটর যব, সরিষা, ধনে প্রভৃতি সমুদয় এতদিনে ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করা হইয়াছে। এই সময় ক্ষেত্র চষিয়া তখিরাতে পাট, ধান প্রভৃতি শস্তের জন্য তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে।

ফলের বাগানে—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কার্য্য নাই।

ফুলের বাগান—এখন বেল, জুঁই, মল্লীকা প্রভৃতি ফুলগাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুলগাছগুলির তদ্বির না করিলে জলদি ফুল না ফুটিলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

টব বা গামলার গাছ—এই টবে রক্ষিত পাতবাহার, পাম প্রভৃতি ও মূলজ ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বদলাইয়া দিতে হয়।

পান চাষ—পান চাষ করিবার ইচ্ছা করিলে এই সময় পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

বাঁশের পাইট—বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পাতার এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাঁশের গোড়ায় সারের কার্য্য করে এবং নিম্ন-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়া প্রকোপ অধিক, সেইখানে এই প্রকার বহুদূরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুন দ্বারা পোড়াইলে এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

চৈত্র মাস

সব্জীবাগান।—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাসে জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাসের জন্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সেচন এখন একটী প্রধান কার্য্য। চেঁড়স স্কোয়ার বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভুট্টা দানা এই মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্ত অনেক গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্ত রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশুক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ হুলদী ফলাইবার জন্ত ইতিপূর্ব্বে বেগুন বীজ বুনিতে থাকে।

কৃষিক্ষেত্র।—এমাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেতে চাষ দিতে হইবে এবং আউস ধানের ক্ষেত্রে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন জল গাছে এই সময় পাঁকমাটী ও সার দিতে হয়। এক্ষনে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য লোককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। "ফাল্গুনে আগুন, চৈত্রে মাটী, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটি দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিকে নাই।

এ মাসে ধঞ্চে, পাট অরহর, আউস ধান বুনিতে হয়।—চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে। কিন্তু নবি ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—শীতকালের বিলাতী মরসুমি ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল। শীতেরও শেষ হইল গোলাপেরও ক্রমে ফুল করিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশুক। শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগ্নোনেট, ক্যাণ্ডিটাফ্ট, পপি, ষ্টাষ্টারসম, ফক্স প্রভৃতি ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলু বসান হইতেছে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্ত কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জলদি লিচু এই সময় পাকিতে পারে, সেই লিচু গাছে জাল দ্বারা ঘিরিতে হইবে।

বৈশাখ মাস

সব্জীবাগান—মাথম সীম, বরবটী লবিয়া প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করা উচিত। টেপারি কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টে'পারির বীজ বসাইবার এখন সময় হয় নাই। টেপারি বীজ জৈষ্ঠ আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বসান চলে। শসা, বিলাতি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতি কদু, পালা ঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাক বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজবপন কার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশু বেগুনের চারা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজ ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্র—বৈশাখ মাসের শেষভাগে আশুধান্য, ধনিচা, অরহর, পাট প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই সময় রিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাসবীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে "যো" হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত, যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

কিঞ্চিৎ অধিক বারী পতন হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৈশাধথর শেষভাগে গাছগুলি তৈয়ারী হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধেই বীজ ইক্ষুক বা আখের টাঁক বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্র বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। দুই শ্রেণী আখের মধ্যস্থল হইতে মটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ইক্ষুক্ষেতে ও শসাক্ষেতে জলের আবশ্যক হইলে সেচ দিতে হইবে। চুবড়ী আলু ও ওল এই সময়ে বা জৈষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। কলা, বাঁশ ও তুঁত গাছের গোড়ায় পাঁক মাটি এই সময় দিতে হয়।

ফুল বাগান।—বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারন্থাস, দোপাটী, গ্নোব আমরান্থাস্ সনফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, লজ্জাবতী, মার্টিনিয়াভায়াণ্ড্রা, মেরিগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেলা ও যুঁইফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপরির্য্যাপ্ত ফুটিবে।

ফলের বাগান—আম, লিচু, কাঁটাল প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে প যত্ন পাইলে ফলগুলি বড় হয়।

আদা, হলুদ, আর্টিচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে সবগুলি বসাইতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।